কিন্তু কেন ?

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অণিমা প্রকাশনী
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকাল ঃ শ্রীপঞ্চমী, ৮ই মাঘ, ১৩৫৮ / ২৩ জানুয়ারী, ১৯৫১

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর ঃ শ্রীশেফালিকা রায়, লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সহধর্মিণী
শ্রীমতী উমা দেবীর করকমলে—

গ্রন্থকার

এক

চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন মিঃ ঘটক। এও কি সম্ভব? অনুর অবস্থা এমনই হয়েছে! অনুপমা মুখার্জী, সেই অনু!

নাঃ, সে নয়, সে হতেই পারে না। কিন্তু এতগুলো ব্যাপার মিলে যাবে? স্বামীর নাম, আদি নিবাস, বয়স, সবগুলোর মধ্যে এমন মিল কি করে হয়! হাতের লেখাটাও অনুর বলেই মনে হচ্ছে।

চিঠিখানা ভালভাবে আগাগোড়া দেখলেন। হ্যাঁ, এ সেই, সে ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।

চিঠির প্যাডটা টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। দু'লাইন লিখেই কাগজখানা টেনে ছিঁড়ে ফেল্লেন। নাঃ, এই প্যাডে লিখলে হবে না। অনু টের পাবে। তারপর কোন জবাবই দেবে না। ঠিকানা বদলে অন্য কোথাও পালাবে, কোন পাত্তাই আর মিলবে না।

তাহলে? তা হলে আজই ওখানে যেতে হয়। ঐ শ্যামপুকুর স্ট্রীটের ঠিকানায়। একেবারে সামনাসামনি গিয়ে হাজির হতে হবে।

দালানের ঘড়িতে মধুর শব্দে ডুং-ডাং করে তিনটে বাজল। তিনটে! পাঁচটার সময় মিঃ জালানের আসার কথা। শ্যামবাজারে যেতে হলে জালানের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখা সম্ভব নয় অথচ আজকের এই সাক্ষাৎ-কারটা খুবই জরুরী। কাল অফিসে—

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে জালানকে ডাকলেন। মিঃ জালান? নমস্কার। না, এইমাত্র খবর পেলুম, নর্থ ক্যালকাটায় আমার এক আত্মীয় নিদারুণ অসুস্থ; আমাকে এখনই সেখানে ছুটতে হবে। হ্যাঁ, নিজে না গেলে উপায় নেই। কাইণ্ডলি যদি আগামী কাল আমার অ·সে আসেন। যে কোন সময়ে,—আপনার সুবিধে মত। ইয়েস স্যার এভার এ্যাট ইওর সার্ভিস। ধন্যবাদ, বেলা দুটো থেকে আড়াইটে মা এ· ·মি আর কোন কাজ রাখব না। নিশ্চয়। ও. কে.।

টেলিফোন ছাড়লেন। আর একটা বোতাম টিপলেন, ভেতরের দিকে ঘণ্টা বাজল। ক্ষণপরেই গেঞ্জীগায়ে এক ছোকরা এসে ঘরে ঢুকল। ঘটক তার দিকে চেয়ে বল্লেন, বাদল, আমায় চা দিতে বল। এখনই বেরুব।

বাদল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চা খেয়ে কি ভেবে ঘটক সাহেব ড্রেসিংরুমে রাখা ধোবিখানার বাক্স খুলে কাচতে যাবার জন্য যে সব জামা, কাপড়, প্যাণ্ট সেই বাক্সে ফেলেছিলেন সেগুলোর ভেতর থেকে একটা সার্ট জামা বার করে দেখলেন ধুতি কাপড় সেখানে একটাও নেই। মনে পড়ল, এ সপ্তাহে একবারও ধুতি পরার সুযোগ তাঁর হয় নি। ঘরের পুরানো আলমারিটা খুলে একখানা মোটা মিলের কাপড় বের করে দেখলেন বহুদিন পূর্বে কাচানো সেই কাপড়টা একটু যেন ময়লা ময়লা হয়ে রয়েছে। কাপড়টা খুলে পাট ভেঙ্গে বেশ একটু অগোছাল করে সেই কাপড় এবং ময়লা সার্ট পরে ঘড়িটা হাতের কব্জিতে লাগাতে গিয়ে খুঁত খুঁত করতে লাগলেন। কিন্তু উপায় নেই। একটা রুপোর ঘড়ি হলেই ভাল হোত, কিন্তু তা ত আর নেই। হ্যাঁ, আছে বটে একটা বাদলের, কিন্তু তার কাছ থেকে এক বেলার জন্যও ঘড়িটা চেয়ে নেওয়া ত যায় না। ছিঃ, কি ভাববে সে?

জামা কাপড় পরে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখে নিয়ে বিভূতি ঘটক সকালে বেড়াতে যাবার মোটা রবার সোল মস্ক সু পরে বৈজু ড্রাইভারকে আজ বিকালের জন্য ছুটি দিয়েছেন মনে থাকা সত্ত্বেও বাদলকে ডেকে বল্লেন, বৈজুকে গাড়ী বার করতে বল রে।

বাদল ইতস্তত করে বল্ল, বৈজু ত নেই! সে আপনার কাছে ছুটি নিয়ে—

ঘটক বল্লেন, হ্যাঁ, হাঁা, তাকে ছুটি দিয়েছি বটে! তা হলে এক কাজ কর, গাড়ীর চাবি নিয়ে আয়, আর গ্যারেজটা খোল, আমি বেরুব।

সাহেবের পোষাকের দিকে নজর পড়ায় বিস্মিত মনে বাদল মনিবের হুকুম তামিল করল।

যোধপুর পার্কের ফটক থেকে এ্যামবাসাডার গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল। ঘটক সাহেব নিজেই চালিয়ে চল্লেন শ্যামবাজারের দিকে।

গাড়ী চলতে লাগল রাস্তা দিয়ে, সেই সঙ্গে ঘটকের মনও পিছিয়ে চলল জীবন-পঞ্জীর উল্টে দেওয়া পাতাগুলোর ওপোর দিয়ে। গাড়ী যায় উত্তরমুখে, মন যায় পশ্চাৎমুখে। গাড়ী গড়িয়াহাট রোডে যাবার আগেই মন চলে গেছে স্বাধীন যুগ থেকে পরাধীন যুগে, দ্বিতীয় যুদ্ধ-পূর্ব কালে, উনিশশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সালে।

ঘটকের বৃদ্ধ পিতা মার্চেন্ট অফিসের দরিদ্র কেরানী মুরারি ঘটককে রামকান্ত বসু স্ট্রীটের এক পুরাতন বাড়ীর একতলায় একখানি ঘর ভাড়া করিয়ে সেখানেই দেশ থেকে আনিয়ে ছিল তাঁর বড় ছেলে অর্থাৎ আজকের এই বিভূতি ঘটক। ওদের দেশ ছিল বর্দ্ধমান জেলায় মেমারির কাছে। মুরারিবাবু প্রায় সারাটা জীবনই মেমারি থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছেন। সকাল সাড়ে ছ'টায় বাড়ী থেকে নেয়ে খেয়ে বেরিয়ে দেড় মাইল পথ হেঁটে সাতটা ষোল'র ট্রেন ধরে নটা কুড়িতে হাওড়া ; সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে পৌনে দশটা নাগাত লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটের অফিসে ঢুকতেন, আবার পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে সস্তায় প্রয়োজনীয় বাজার সেরে কোনদিন ধরতেন ছ'টা বাহান্নর ট্রেন, কোনদিন সাতটা চল্লিশের। বাড়ী পৌঁছতে কোন রাত্রে দশটা, কোন রাত্রে পৌনে এগারটা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই সমান। শীতের ভোরে সবাই যখন লেপ জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে, তখন মুরারি ঘটক অন্ধকারে পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করছেন, মুরারি-পত্নী রান্নাঘরে কুপি জ্বেলে ডাল ও আলুভাতে ভাত নামিয়ে ঝোল সাঁৎলাচ্ছেন এই চিত্র বিভূতির চোখে আজও ভেসে ওঠে। বর্ষার রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, বিভূতি অঘোরে ঘুমিয়ে আছে ময়লা একটা মশারির ভেতর, মা এসে ডাকছেন, বিভু, বিভু, একটু ওঠ্-না রে! ছাতাটা নিয়ে একটু

এগিয়ে দেখ-না, বারোটা বাজল, এখনও আসছে না কেন! কোথায় আটকে পড়ল, না কি হোল! বিভূতি মায়ের ওপোর রাগ করেছে, ঝঙ্কার দিয়েছে, কিন্তু শুয়ে থাকতে পারে নি। উঠেছে, কাপড়খানা হাঁটুর ওপোর তুলে মালকোচা মেরে, গোলপাতায় ছাওয়া বাঁশের বাঁটের ছাতাখানা ঘাড়ের ওপোর তুলে এক হাত দিয়ে সেটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে অন্য হাতে হ্যারিকেন নিয়ে খালি পায়ে কাদা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় দেখতে পেয়েছে দূর থেকে কে একজন ছাতা মাথায় দিয়ে ভূতের মতো আসছে। বিভূতি দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই দূরের লোকটি নিকটবর্তী হয়ে বলেছেন, তুই আবার এই জল কাদায় বেরুলি কেন বাবা, আজ বাদে কাল তোর একজামিন, শেষে অসুখ-বিসুক করলে কি হবে বল্ ত? বিভূতি ঠোঁট ফুলিয়ে রাগ দেখিয়ে বলেছে, তুমি এত দেরি করলে কেন? সেই জন্যেই ত মা আমাকে পাঠাল!

আমি কি করব বল্ বাবা, ট্রেনটা আজ কি জানি কেন আধ ঘণ্টার ওপোর লেট হয়ে গেল। তারপর এই কাদায় পা টিপে টিপে আসছি, তাতেও ত দেরি হয়। তা তুই এই পুঁটলিটা নিতে পারবি?

বিভু হাত বাড়িয়ে বল্ত, দাও।

মুরারিবাবু বলতেন, না থাক, এটা ভারী আছে, তুই পারবি না, বরঞ্চ আমার এই জুতো জোড়া নে।

বিভু বলত, না না, দুটোই আমাকে দাও, তুমি এই হ্যারিকেনটা নাও।

এ সব হোল উনিশশো আটাশ-উনত্রিশ-ত্রিশের কাহিনী। স্টিয়ারিং ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিলেন উনিশ শো উনসত্তরের মিঃ বি. ঘটক, মন তাঁর চলে গেছে চল্লিশ বছর পিছিয়ে।

সেকেণ্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করে পুরো তিনটে বছর বিভূতি বাড়ীতে বসে ছিল। মুরারিবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোথাও কোন কাজ ওর জোটাতে পারেন নি। উনিশশো তেত্রিশে মেমারির প্রাইমারি

স্কুলে বিভূতি যেদিন ষোল টাকা মাইনের মাস্টারি পেল, তার পরের পূর্ণিমায় বিভূতির মা সিন্নী দিলেন বাবা সত্যনারায়ণকে। সেই উপলক্ষে মুরারিবাবু একদিনের জন্য অফিসে ছুটি নিয়েছিলেন। পাড়ার প্রবীণরা সত্যপীরের পাঁচালি শুনে সিন্নী খেয়ে আনন্দ করে বলেছিলেন, এবার মুরারি, ছেলের বিয়ে দাও। ষেটের কোলে কুড়ি বছর বয়স হোল, ঠাকুরের কৃপায় দু'পয়সা আনতেও শিখল, তোমার বংশের বড় ছেলে, বুড়ীকে দিয়ে আর কদ্দিন হাঁড়ি-হেঁসেল ঠেলাবে? এবার বৌমা নিয়ে এস, সে-ই সংসারের ভার নেবে।

মুরারি-পত্নীর ইচ্ছাটাও ঐ রকমই ছিল, কিন্তু মুরারিবাবু অনিচ্ছুক। তিনি বলতেন, বিভুর কাজ কি আর একটা কাজ! মাস গেলে কুল্লে ষোলটা টাকা। নিজেই বা খাবে কি, আর বৌকেই বা খাওয়াবে কি?

স্ত্রী বলতেন, কেন গো? মোটা ভাতের অভাব তো ঠাকুর আমাদের রাখেন নি। বিশ বিঘে ধানের জমি, নতুন বৌ এসে কত খাবে খাক না।

মুরারিবাবু হাসতেন। ম্লান হাসি। বলতেন, বিশ বিঘে জমি আছে তোমার, তিন ভাগ করলে বিভুর ভাগে কতটা পড়বে হিসেব করেছ?

কেন গো? ভাগই বা হবে কেন? ওরা তিনভাই কি এমনই হতচ্ছাড়া হবে যে ভাগাভাগি করে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারবে।

মুরারিবাবু বলতেন, তা হলে তোমরাই বা ভাগাভাগি করলে কেন? তুমি কি তোমার জায়েদের সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পেরেছ?

মুখ গম্ভীর করে ঝঙ্কার দিয়ে স্ত্রী বলতেন, সে কি আমার দোষ? তোমার ঐ বড় ভাই আর ছোট ভাদ্দর বৌকে জিজ্ঞেস করো, তারা কেন ভাগাভাগির জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। মিছি মিছি একের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিও না।

সেই রকমই, মুরারিবাবু শান্ত কণ্ঠে বলতেন, তোমার তিন ছেলে ত তিন থাকবে না। বিয়ে দিলেই ছয় হবে। সেই বাইরের তিনটি মেয়ে

এ বাড়ীতে বৌ হয়ে এসে কে যে কি মূর্তি ধরবে তা কি আর এখন থেকে বলা যায়!

খুব যায়, গৃহিণী জোর দিয়ে বলতেন, ভদ্র গৃহস্থ ঘর থেকে সুলক্ষণা মেয়ে বেছে নিয়ে আসব। কোন অশান্তি হবে না। তুমি বাপু বাজে বাজে অলুক্ষুণে কথা বলে বিপদ আপদ টেনে টেনে এনো না।

স্বামী-স্ত্রীর এই জাতীয় কথা বিভূতির কানেও মাঝে মাঝে আসত। বিয়ের কথায় বিভূতি মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যেত, খরচপত্র সামলাবে কি করে! আবার রাত্রে আহারাদির পর নিজের তক্তপোষে মলিন মশারির মধ্যে এপাশ ওপাশ করতে করতে মনে হোত অবস্থা কি আর কোন দিন ফিরবে! বাবা ত সারাজীবন পরিশ্রম করে এখন পাচ্ছেন মাত্র একশ' বত্রিশ টাকা! তাও কলকাতায় সাহেব বাড়ীর চাকরি! এখানে এই স্কুলে যেখানে হেডমাস্টার পান চৌত্রিশ টাকা, সেখানে আর আমাদের কি হবে!

এক একবার মনে হোত আই. এ., বি. এ. পড়লে হয়। স্কুলের শিক্ষক হিসেবে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়া যায়। বি. এ., বি. টি. হতে পারলে,—আঃ, তাহলে আর পায় কে? ও পাড়ার নগেনদা' বি. এ. পাশ করে এতদিন মাস্টারি করে মাত্র এক বছর আগে যেমনই বি. টি. পাশ করলে অমনি হাইস্কুলে এ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার হয়ে গেল। তিন লাফে এগিয়ে গিয়ে মাইনে হোল নব্বুই টাকা, কুড়ি টাকা মাইনের দুটো বাঁধা টিউশানি, পরীক্ষার আগে চারটে টিউশানিও করে। দু'দিন পরে হেডমাস্টার রিটায়ার করলে ও-ই হেডমাস্টার হবে। তখন একেবারে একশ' কুড়ি টাকা মাইনে হবে। একশো কুড়ি ওকে প্রথমে না দিলেও একশো ত দেবেই, তারপর আস্তে আস্তে বাড়বে—

সেদিনের সেই সব চিন্তা স্মরণ করে স্টীয়ারিং হুইলে বসে বসে বিভূতি আর একবার হেসেছিল,—ম্লান অবজ্ঞার হাসি। ছত্রিশ বছর আগেকারের সেই সব ফেলে-আসা দারিদ্র্যের কুয়াশাভরা দিন!

তারপর এক রাত্রে বাবা সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এক মুখ হেসে

বলেছিলেন, বিভু, কাল তুই স্কুলে আর যাসনি। আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। সাহেব তোকে দেখতে চেয়েছে।

সে রাত্রে কত আশা, কত আনন্দ! মুরারিবাবুর অফিসে নতুন একটা কাজ আরম্ভ হয়েছে। রপ্তানীর কাজ। সেই কাজের জন্য বাড়তি একজন ক্লার্ক চাই। মুরারিবাবুকে সাহেব বলেছেন, ঘটকবাবু, তোমার যে ছেলের জন্য বলেছিলে, তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

খেতে খেতে মুরারিবাবু বল্লেন, ওরা ঐ রকমই গো। যাকে ভাল-বাসে তার ছেলেকে ডেকে চাকরি দেয়। আর দেবে নাই বা কেন! এই যে এতদিন এক নাগাড়ে কাজ করছি, কামাই বলে আমার কিছু আছে কি! জ্বরজাড়ি হোলে তোমরা বল যেও না, কিন্তু আমি কি পারতপক্ষে কখনও কামাই করি? শিশিভর্ত্তি সাবু বার্লি নিয়েও অফিসে গিয়ে সারাদিন কাজ করেছি। শেষে সাহেবই আমার অবস্থা দেখে বলেছেন, ঘটক, দু'দিন ছুটি নাও। শরীর সারিয়ে তারপর এসো। ওদের সব দিকে নজর থাকে গো। আমার ওপোর সাহেবের কি দয়া?

তারপর ছেলেকে পাখী-পড়া করে শিখিয়েছেন, কি করতে হবে, কেমন করে দাঁড়াতে হবে, কি ভাবে সেলাম দিতে হবে, সব কথায় ইয়েস স্যার বলে কি ভাবে জবাব দিতে হবে, এই সমস্ত শেখাতে সেদিন রাত্তির বারোটাই বেজে গিয়েছিল। সেদিন বাবার কথায় বিভূতির লজ্জাও হয়েছিল, ভয়ও হয়েছিল, আবার বিরক্তিও এসেছিল। পরের দিন ট্রেণে যেতে যেতে বাবা যখন সেই সব কথাই বলছিলেন তখন বিভূতির রাগও হয়েছে। বাবা যেন কি! এক কথা হাজারবার ঘিজিয়ে ঘিজিয়ে বল্লে কার ভাল লাগে। তাও আবার রেলগাড়ীর কামরায়। পাশের লোকগুলো কি ভাবছে কে জানে!

ঘ্যাঁচ করে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে সামলে নিতে না পারলেই হয়েছিল আর কি? পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার রং লাইন দিয়ে এমন বেপরোয়া চালাচ্ছে—

সেই চাকরিই বিভূতি পেয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর রেলের টিকিট। রেলের মান্থ্লির দামটা বাবা চেয়েচিন্তে সাহেবের কাছ থেকে যোগাড় করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বিভূতির বিপদ হোল বাবার সঙ্গে রোজ তারিখে একসঙ্গে এক কামরায় যাওয়া আসায়। এক সঙ্গে হেঁটে বাড়ী থেকে মেমারি স্টেশন এবং হাওড়া থেকে লিণ্ড্সে ষ্ট্রীটের অফিস, সারাদিন এক অফিসে এক ঘরে কাজ, বিড়ি টানার কোন ফুরসতই নেই, অথচ স্কুলে মাস্টারি পাবার আগে থেকেই ধূমপানে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ধোঁয়ার অভাবে সমস্ত মন-মেজাজ বিগড়ে যেত। বাবার সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। নিজে তিনি রেমিংটনের ফিতের রং-চটা খালি কৌটো থেকে লাল সুতোর বিড়ি প্রতিবার বেছে বেছে বার করে নিয়ে সেই বিড়ির উল্টো দিকে জোরে ফুঁ দিয়ে তারপর ধীরে সুস্থে ধরিয়ে দু'তিন বার আস্তে আস্তে টান দিয়ে শেষে একটা জোর টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া আস্তে আস্তে ছাড়তেন আর সেটা দেখে দেখে বিভূতির সমস্ত পরিবেশটা তেতো হয়ে উঠত। সারা গাড়ীতে বাবার সহযাত্রী বন্ধুও থাকত অনেকগুলি। কেউ উঠত ব্যাণ্ডেলে, কেউ চন্দননগরে, কেউ চুঁচড়োয়; বৈদ্যিবাটী শ্রীরামপুর থেকে অনেকেই উঠত, উত্তরপাড়া বালি বেলুড়ে ত কথাই নেই। ওখানে যারা উঠত তারা আর বসার জায়গা পেত না। ডেলি-প্যাসেঞ্জার অনেকেই বাবার পরিচিত। ওঁরা গল্প করতেন, বিড়ি সিগারেট খেতেন, কেউ কেউ তাসও খেলতেন, বিভূতিকে কেউই আমল দিতেন না। বড় জোর মুরুব্বিয়ানা চালে কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন, কি হে, কাজকম্ম কেমন হচ্ছে? কেউ বলতেন সাহেবের মন রেখে চোলো হে, আখেরে উন্নতি হবে। প্রাইমারী স্কুলের সহকর্ম্মীদের সঙ্গে বিভূতি মাঝে মাঝে স্বদেশীয়ানার কথা, কংগ্রেসীদের কথা আলোচনা করে আনন্দ পেত, কিন্তু এখানে এই সব নিত্যযাত্রীরা সে কথা আদৌ বলতেন না, বরঞ্চ ঐ রকম কথা উঠলে, কিংবা কারুর হাতের খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরে ছাপা কোন কংগ্রেসী সংবাদ

দেখলে তাঁরা সকলেই একবাক্যে উপহাস করে বলতেন, সসাগরা পৃথিবী যাদের পায়ের তলায়, তোরা করবি তাদের সঙ্গে ঝগড়া। ছি ছি, রাম কহো! প্রথম প্রথম ওগুলো শুনতে বিভূতির খারাপই লাগত, শেষে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দু'তিন মাস এইভাবেই চালিয়েছিল। তারপর বিভূতি বাবাকে হিসেব করে বুঝিয়ে দিল যে, দু'জনের মাসিক টিকিটে যা লাগে তাতে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকা যায়। দেশ থেকে চাল নিয়ে গিয়ে বাসায় কুকারে রান্না করে খেলে খরচ এমন কিছু বেশী হয় না অথচ রোজ তারিখে ভোর থেকে রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত শরীরের ওপোর এত ধকল সহ্য করতে হয় না।

কুকারের রান্নায় বাবার ছিল আপত্তি। বিভূতি বলেছিল, কুকারের রান্না সে খেয়েছে, ভাত ডাল তরকারি এক সঙ্গে বিনা পরিশ্রমে হয়ে যায়; তাদের স্কুলের এক শিক্ষক বারোমাস কুকারে খায় ইত্যাদি। বিভূতিই চেষ্টা করে অফিসের অন্য এক কর্ম্মচারীকে ধরে বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে একখানি ঘর ভাড়া করিয়েছিল মাসিক আট টাকায়, কল পায়খানা বারোয়ারী।

গাড়ী চালাতে চালাতে মিঃ ঘটক ভাবলেন, এই তার কলকাতার প্রথম বাসা, মাসিক মূল্য যার আট টাকা। তারা হোল সাব-টেনাণ্ট।

গোটা বাড়িটা পয়তাল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ব্যাঙ্কের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। দোতলার তিনখানা ঘরে তিনি সস্ত্রীক থাকতেন। একটা রাতদিনের ঝি ছিল তাঁর। একতলার সামনের ঘরটা ছিল তাঁর বৈঠকখানা। তক্তপোষে সতরঞ্চি পাতা থাকত। বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ছুটির দিনে দাবা খেলতেন অথবা রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তেন। ভেতরের দুখানা ঘরের একখানায় ছিল এক পূর্ববঙ্গীয় গৃহস্থ। চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে নিয়ে তারা ঐ একখানা ঘরে কায়ক্লেশে থাকতেন, অন্য ঘরটা নিয়ে ছিলেন মিঃ ঘটক। বিভূতির ইচ্ছা ছিল চিৎপুর রোডের দোকান থেকে দুখানা তক্তপোষ

কেনে। কত আর পড়বে! দরদামও সে করেছিল। সাড়ে তিন টাকায় তু'খানা তক্তপোষ কিনবে মনস্থ করে বাবাকে বলতেই বাবা খিচিয়ে উঠলেন। বল্লেন, বড্ড তালেবর হয়েছ? বাসা বাড়ীতে তক্তপোষ কিনবে! বলি, বাসা যখন উঠিয়ে দেবে তখন তক্তপোষ তুটো নিয়ে যেতে পারবে? ও তুটো নিয়ে যেতে যে ঢাকের দামে মনসা বিক্রী হবে।

বিভূতির মনে আছে ও-বাড়ীতে তক্তপোষ কেনা হয় নি। ন'-আনা দিয়ে একজোড়া মোটা কাঠির মাতুর কিনে তার ওপোর দেশ থেকে আনা কাঁথা বিছিয়ে পিতাপুত্রে রাত কাটাত। সপ্তাহান্তিক তুটো রাত, শনি ও রবিবার দেশের বাড়ীতেই থাকত ওরা।

কলকাতায় বাসা করে বিভূতির প্রথম প্রথম যে পরিমাণ আনন্দ হয়েছিল তার চেয়েও অনেক বেশী নিরানন্দ হোল বাসা করার মাস চারেক পরে। এই অবস্থা যে এত শীঘ্রই হ'বে সেটা জানা থাকলে বিভূতি কখনই বাসা করার জন্য উঠে পড়ে লাগত না। বেচারার বিয়ে হোল অগ্রহায়ণের প্রথমেই, বাসা নিয়েছিল শ্রাবণের মাঝ বরাবর, দোসরা আগস্ট থেকে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাবা বাসা নিতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু বিয়ের পর বাসা ছেড়ে রোজ তারিখে বাড়ী ফেরার কোন প্রকাশ্য যুক্তি বিভূতি খুঁজে বার করতে পারে নি। সাতদিনের সপ্তাহে মাত্র তুটো দিন শনি ও রবিবার। সপ্তাহের পাঁচটা দিন বিভূতি নিতান্তই মনমরা হয়ে থাকত। নিজের বোকামির জন্য নিজেকে মনে মনে অভিশাপও দিত।

মিঃ ঘটক গাড়ী চালাতে চালাতে আর একবার নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ধিক্কার দিলেন সনাতন প্রথাকে। সে আমলে শনিবারে বাড়ী ফিরে বাবা, মা, ভাই ও বোনের গল্প এবং কথার ভিড় ঠেলে নিজের ঘরে ঢোকার পরেও যে কতখানি দীর্ঘ সময় অন্য জনের প্রতীক্ষায় থাকতে হোত তার ইয়ত্তা নেই। মা ছিলেন ভয়ানক কড়া। পুরুষদের খাওয়ার পর তবে মেয়েরা খেতে বসবে। তারপর রাতের

বাসন রাতেই মাজতে হবে এবং সে কাজ বাড়ীর বউয়ের। অতএব তিনি যে কতক্ষণে আসবেন তার ঠিক নেই।

শুধু তাই নয়। এর পরেও বিপদ ছিল। কোন সপ্তাহে বাড়ী ফিরে অনেক আশায় নৈশ আহার তাড়াতাড়ি শেষ করার পর মা-জননী হয়ত উপযুক্ত পুত্র বিভূকে বল্লেন, বাবা বিভু, আজ তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়গে। বউমার শরীর খারাপ, বউমা আজ আমার কাছে থাকবে।

প্রথম যেদিন কথাটা শুনেছিল সে দিন বিভূতি চিন্তিত হয়েছিল। শরীর খারাপ? কি হোল? এই ত এক-গলা ঘোমটা দিয়ে খাবার জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে মুছে আসন পাতল দেখলুম। অবিশ্যি ওদের পরিবেশনটা সে আজ করল না বটে। পরিবেশন করল বিভুর বোন্‌টা। আগের সপ্তাহে বোন কাছে বসেছিল, বউই পরিবেশন করেছে, তা এ সপ্তাহে হোল কি?

ভয়ে ভয়ে কথাটা মাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বল্লেন, অসুখ কিছু নয়, ওটা মেয়েদের হয়েই থাকে। এ সময় একলা থাকতে হয়, বিছানাতেও শুতে নেই। ও জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না, তুমি দরজা দিয়ে শোও গে।

শনিবার সারাটা রাত এবং রবিবার গোটা দিন এবং রাত একেবারে নিষ্ফলা। চোখের দেখাটা পর্যন্ত পায় নি, অথচ গত সপ্তাহের পাঁচদিন ধরে কত কষ্ট করে বাবাকে ফাঁকি দিয়ে তরিতরকারির পয়সা থেকে চুরি করে নিজে হেঁটে লিণ্ডসে স্ট্রীট থেকে বাগবাজারে যাতায়াত করে, জলখাবার না খেয়ে সেই পয়সা বাঁচিয়ে দশ আনা দিয়ে এক শিশি হেজলীন স্নো এবং পাঁচ আনা দিয়ে এক কৌটো পাউডার এনেছিলেন সেদিনের সেই নব বিবাহিত মিঃ বি ঘটক। গত সপ্তাহে বউ যেন কথায় কথায় বলেছিল, বিয়ের স্নো-পাউডার সমস্ত ফুরিয়ে দিয়েছে দু'জন ননদে খাব্‌লা খাব্‌লা মেখে। বড় বোন তার আগের সপ্তাহে বাচ্ছা নিয়ে এসে পাঁচ সাত দিন থেকে গিয়েছিল। সেই বড় বোনই বাড়ীর

বউয়ের স্নো-পাউডার এই শীতকালেও যত পেরেছে মেখেছে এবং ছোট বোনটাকেও মাখিয়েছে। বিভূতি এ কথার কোন উত্তর দেয় নি কিন্তু সেই দিনেই মনে মনে স্থির করেছিল, আগামী সপ্তাহে আসার সময় স্নো পাউডার নিয়ে আসবে। নিয়েও এল, কিন্তু এক বাড়ীতে দু'রাত একদিন একটানা বাস করেও এমন একটা নিরালা মুহূর্ত সে পেল না যখন কিনা ওগুলো তার হাতে তুলে দেওয়া যায়। কি করেই বা সম্ভব? এ সময়ে দেখা হওয়াটা নিষেধ, মায়ের হুকুম। একরাশ বিরক্তি নিয়ে সোমবার সকালে বাবার সঙ্গে বিভূতি ফিরে এসেছিল।

বিভূতিকে সাহেব ডেকে বল্লেন, বিভু, তোমাকে আমি গ্যালিফ স্ট্রীটের গোডাউনে প্লেস করতে চাই। ওখানকার গোডাউন ক্লার্ক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি তার বাড়ীতে গিয়ে কাজকর্ম্ম বুঝে এসে ওখানেই বসবে।

সাহেবের নির্দেশে বিভূতি মনে মনে খুসি হয়েছিল। বাবার চোখের সামনে সারাদিন থাকতে হবে না, তা ছাড়া কর্মস্থল বাড়ীর খুবই কাছে হয়ে গেল।

একজন সহকর্মী হাসিমুখে অভিনন্দন জানাল। কানে কানে বল্ল, দুটো পয়সারও মুখ দেখবেন, শুকনো মাইনে নিয়ে হাত গুটিয়ে থাকতে হবে না।

কি রকম?

রকম বুঝতেই পারবেন। আপনার মশাই জোর কপাল!

তা উপরি পাওনা গুদামে হোত মন্দ নয়। গড়ে দৈনিক তিনটে টাকা আমদানী হোত। দারোয়ান এবং কুলী সর্দারকে ভাগ দিয়ে বিভূতির থাকত একটাকা পাঁচসিকের মতন। মন্দ কি? চারটে রোববার বাদ দিয়ে ছাব্বিশ দিনে তিরিশ বত্রিশ টাকা উপরি লাভ। এবং সব চেয়ে বড় লাভ এই যে, এ টাকা বাবাকে দিতে হবে না। এই উপার্জনের কথা বাবা জানবেও না।

গুদামের দারোয়ান বল্ল, ঘটকবাবু, একঠো কাম করলে আরও কিছু নাফা হয়। ঐ ও পাশের গুদামে ওরা করে।

কি ?

খালের শুকনো গঙ্গামাটি তুলে এখানকার গুদামের মেঝে ঝাঁট দিয়ে পড়ে থাকা বিলায়তি মাটির সঙ্গে সেই গঙ্গামাটি মিশিয়ে বোরা ভরতি করে সেই বোরা আমরা উড়িয়া দালাল ধরে বিক্রী করলে আরও কিছু নাফা হবে।

সাহেব যদি জানতে পারে ?

কি করে জানবে বাবু ? কাগজের বাড়তি বোরা কোম্পানীই দিয়ে থাকে। সেই সব কাগজের বোরার হিসাব থাকে না। আমি আর সর্দার ভোর ভোর উঠে সেই সব বোরা ভর্ত্তি করে আলাদা রাখব। আপনি শুধু হুকুম দিন বাবু। দিন তিন চার বস্তা বাড়তি সিমেন্ট আমরা বানিয়ে নেব।

মুরারি বাবু বল্লেন, হ্যাঁরে বিভু, গুদাম বাবুরা শুনেছি বেশ দু'পয়সা কামায়। তা তুই ত কই সে বাবদ এক পয়সাও আমাকে দিস্ না।

বিভু বলেছিল, বাজে কথা বাবা। এই ত প্রায় তিন মাস হতে চল্ল গুদামে রয়েছি, পয়সার ত মুখ দেখছি না। আর কি করেই বা হবে ? গোনাগুনতি বস্তা আসে, হেড অফিসের চালান-মত গোনা-গুনতি বেরিয়ে যায়। পার্টিরা কখনও-সখনও দু আনা চার আনা বখ্‌সিস্ দেয়। তা সে ঐ সর্দার এবং কুলীরাই ভাগ করে নেয়।

মুরারি বাবু বলতেন, কি জানি, তোমার আগে যিনি ছিলেন তিনি ত এই কাজের জন্য হায় হায় করেন, কিন্তু সাহেব তাকে গুদামে আর পাঠাবে না। কি কারণে ঠিক বুঝি না, সাহেব তার ওপোর ভারি নারাজ। বোধ হয় তাকে ছাড়িয়েই দেবে।

তিনি কি এখন আমার কাজে বসছেন ?

না না, সে বিত্তে তার নেই। সাহেব তাকে ডক্‌-বাবু করে পাঠিয়েছে। সেখানেও সে ঠিকমত চালাতে পারছে না। দু'মাস ধরে রোগে ভুগে প্রথমতঃ তার শরীরটাও বেশ সারে নি, তা ছাড়া ডকের কাজে খাটুনিও আছে। ভদ্দর লোক নিজেই বোধ হয় ছেড়ে দেবে।

প্রায়ই কামাই করে। তা ছাড়া তার ছেলেটিও ভাল উপায়-পত্তর করে। কিন্তু বিভু, তুমি একটু চোখ-কান খুলে রেখে চলবে। সবাই ব'লে গোডাউনে উপরি আছে, তুমি বলছ, কিচ্ছু নেই। তা কি হয় না কি? চোখ কান খুলে রেখে দেখো, বোধ হয় ওরা তোমাকে ফাঁকি দেয়।

বিভূতির মনে আছে গুদামের উপরি পাওনা সে তবুও বাবাকে দেয় নি। তার বিয়ে হয়েছে, বউ-এর জন্য দু'একটা জিনিষ কিনতে হয়। নিজেও বিড়ি ছেড়ে সিগারেট ধরেছে। বিড়ি খেলে কুলীদের কাছে মান থাকে না। তা ছাড়া বিড়িটা ভালও লাগে না। ক্যাভেণ্ডার সিগারেট সে তুলনায় অনেক ভাল। জামা কাপড় কাচানোর খরচও অনেক বেড়ে গেছে। গুদামের ধুলোয় এবং ঘামে একটা জামা কাপড় দু'দিনের বেশী পরা যায় না। গুদামে যেতে হয় সাড়ে সাতটায়, দুপুরে এক ঘণ্টা ছুটি, বিকালে ছুটি পায় সাড়ে চারটেয়। বেরুতে-বেরুতে পাঁচটাই বাজে। তারপর বিকালে অন্য কাজ না থাকায় শ্যামবাজারে কোন কোন দিন বায়োস্কোপও দেখে। কোনদিন চার আনার টিকিটে, কোন দিনে ভিড় থাকলে আট আনার টিকিটও কাটে। সব টাকাই যদি বাবাকে দেয় তা হলে তার চলে কি করে। তা ছাড়া বাবাকে দিলে দরকারের সময় বাবার কাছে চাইলে যে এক পয়সাও পাওয়া যাবে না তা সে ভালভাবেই জানে।

গুদামের কাজে আর একটা মস্ত সুবিধে দুপুরে এক ঘণ্টা ছুটি পাওয়া যায়। সকালে পাঁউরুটি খেয়ে কাজে যায়, দুপুরে বাসায় ফিরে ভাত খায়। ভোরে উঠে বিভূতি কুকার চাপিয়ে দেয়। বাবা কাজে যাবার আগে কুকার খুলে খেয়ে বাকী সব ঢাকা দিয়ে রেখে যান। বিভূতি দুপুরে এসে খেয়ে কুকারের বাসন-পত্র থালা-গেলাস বারোয়ারী চৌবাচ্চার জলে মেজে ধুয়ে আবার অফিসে চলে যায়। রাত্তিরে রান্না-খাওয়া দেরি করেই হয়। সাড়ে দশটা এগারটার আগে বাবা খেতেই পারেন না, চিরকেলে অভ্যাস, তা ছাড়া বাড়ীওয়ালা সুরেন মুখুজ্জে

মশাইয়ের সঙ্গে বাবা বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। দাবা খেলতে অথবা কথামৃত শুনতে কোন কোন রাতে সাড়ে এগারটাও বাজে। বিভূতি বিরক্ত হয়, কিন্তু উপায় নেই, অপেক্ষা তাকে করতেই হয়।

পাশের ঘরের পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক বল্লেন, মুরারি বাবু, আট দশ দিনের জন্য দেশে যাচ্ছি। ভাইঝির বিয়ে।

বাবা বলেছিলেন, বিয়ের জন্য এত দিন?

তিনি বল্লেন, ঠিক বিয়ের জন্যই নয়, জমি জায়গারও কিছু ব্যাপার আছে। তাছাড়া অনেক দিন দেশে যাইনি, উনিও অনেকদিন বাপের বাড়ী ছাড়া। এই সব মিলিয়ে দশটা দিনই লাগবে। ছুটিও পেলুম দশ দিনের জন্য—

কবে যাচ্ছেন?

কাল যাব। কাল অফিস থেকে সকাল সকাল ফিরে সন্ধ্যের বরিশাল এক্সপ্রেসে যাব আর ফিরে আসব বাইশ তারিখ সকালে। বাইশে অফিসে জয়েন করতে হবে। তাই বল্‌ছিলুম ঘরখানার দিকে একটু নজর-টজর রাখবেন। রাত-বিরেতে কোন শব্দ সাড়া হোলে—

ভাল ভাবে তালা দিয়ে যাচ্ছেন ত?

হ্যাঁ হাঁ, ত্নটো তালা দিচ্চি শোবার ঘরে, আর রান্না ঘরে একটা তালা। বাসনকোসন সমস্তই শোবার ঘরে রেখে যাব।

যাক, বাড়ীখানা অন্ততঃ ক'দিনের জন্য ঠাণ্ডা হোল। সেই ভোর থেকে রাত ত্নপুর পর্য্যন্ত ঐ বরিশালবাসীর চ্যাঁ ভ্যাঁ-র ঠেলায় তিতি-বিরক্ত। ছেলেমেয়েদের ঝগড়া, কান্না, তাদের মায়ের প্রহার, কর্তা ঘরে থাকলে কর্তার গর্জন,—বাপ্‌, রামকান্ত বসু স্ট্রীটের সেই পরিবেশ-টাই ছিল যন্ত্রণাদায়ক। সেদিন বিভূতির আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে প্রাতঃকৃত্যের জন্য এই দশটা দিন ঘটি হাতে লাইন দিতে হবে না। কল পায়খানা একেবারে নিজস্ব অধিকারে থাকবে।

কিন্তু ত্নঃখের মতো আনন্দও একা আসে না। ত্নঃখ যেমন অনেক ত্নঃখ পর পর টেনে আনে, এখানে খালি বাড়ীর আনন্দও তেমনি অনেক

না হলেও অন্তত একটা অভাবনীয় আনন্দ এনেছিল। সে আনন্দ সে কালের বিভূতির কাছে অভাবনীয় ত বটেই, অভূতপূর্বও। চৌরঙ্গী দিয়ে গাড়ী চালাতে চালাতে সেই সব পুরানো কথাই বিভূতির মনে পড়ছিল।

যে রাত্রে ওঁরা চলে গেলেন তার পরের দুপুরে বিভূতি স্নান এবং আহারাদি সেরে কলতলায় বাসন মাজছিল ; এমন সময় ওপোরের বউ মিসেস্ মুখার্জী নিচের কলতলায় এসেছিলেন। এটা একটা অভিনব ব্যাপার। তিনি নীচে এর আগে কখনও নেমেছেন বলে বিভূতির মনেও পড়ে না। তাঁর নামবার দরকারও ছিল না। ওপোরেই ছিল ওঁদের শৌচাগার। ওপোরের বারাণ্ডা থেকে দড়ি বেঁধে বালতি নামিয়ে নীচের চৌবাচ্চা থেকে জল তোলার বন্দোবস্তও ছিল, তা ছাড়া ওপোরে ছিল গঙ্গাজলের কল। খাবার জলটা ওদের ঝি সকালে বিকেলে ঘড়া ভর্তি করে ওপোরে নিয়ে যেত, কাজেই বউয়ের সঙ্গে নীচের সম্বন্ধ ছিল কালে-ভদ্রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানার সামনের চলন পথ দিয়ে বাইরে গিয়ে পাখি-তোলা, আটঘাট-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে প্রবেশ করা এবং তেমনই একটা গাড়ীতে চেপে বাড়ী ফিরে ঘোমটা দিয়ে প্রায় অন্ধকার সিঁড়িতে অদৃশ্য হওয়া। এ বাড়ীতে আসা-ইস্তক এর চেয়ে বেশী কিছু বিভূতি দেখে নি। আজ দুপুরে নির্জন বাড়ীতে নিচের কলতলায় সেই মুখার্জী গিন্নীকে দেখেই বিভূতি ঘটক সসম্ভ্রমে মাথা নামিয়ে নিল।

বউটির হাতে ছিল ছোট একটা বাল্‌তি। বিভূতির পাশ দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে চৌবাচ্চার ধারে এসে বাল্‌তি ডুবিয়ে জল তুলতে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে বাল্‌তিটা চৌবাচ্চার ভেতরেই পড়ে গেল।

যাঃ, কি হবে, বউটি নিজেই বলে উঠল।

এই প্রথম বিভূতি ওপোরের বউয়ের কণ্ঠস্বর শুনল। তারপর আরও বিস্ময়। সপ্রতিভ বউটি অনুনয়ের সুরে বলেছিল, বাল্‌তিটা তুলে দিন-না।

বিভূতি কোন কথা বলে নি। ঘটীর জলে হাত ধুয়ে চৌবাচ্চার পাড়ের ওপোর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জলে হাত ডুবিয়ে বাল্‌তি তুলে দিয়েছিল।

বউটি ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, ধন্যবাদ। খুব উপকার করলেন। তা এতই যখন করলেন তখন এক বালতি জলও তুলে দিন। আমি তুলতে গেলে আবার যদি পড়ে যায়!

বিভূতি এক বাল্‌তি জল তুলে সাহসে ভর করে বলেছিল, ওপোর থেকে জল তোলার দড়িটা ছিঁড়ে গেছে বুঝি?

বউ বলেছিল, না ভাই, ছেঁড়ে নি; আমি ঐ দড়ি টেনে তুলতে পারি না। হাতে ব্যথা হয়ে যায়। পারুলের মা-টা থাকলে—

কেন? সে কি চলে গেছে?

হ্যাঁ। খাওয়া-দাওয়ার পর কোথায় যেন গেছে। তার দেশের লোক কোথায় বুঝি ওপাড়ায় আছে, সে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

উঠোনে বাল্‌তিটা বসিয়ে রেখে বউটি কথাই কইতে লাগল। বল্ল, কি রাঁধলেন আজ?

ওর সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে সেদিনের বিভূতি বিস্মিত হয়েছিল। এই কি সেই একগলা ঘোমটা-দেওয়া ওপোরের বউ, যার পদযুগল ছাড়া আর সবই দামী কাপড়-ঢাকা অবস্থায় সে কালে-ভদ্রে দেখেছে। ওর কথাবার্ত্তায় সহজ অন্তরঙ্গ সুর, ভাই সম্বোধনে বিভূতি সেদিন আশ্চর্য হয়েছিল। মুখে বলেছিল, রাঁধলুম ডাল ভাত তরকারি।

মাছ হয় নি?

না। মাছ হয়নি। কুকারে মাছ রান্নার অসুবিধা আছে।

ওমা, তা হলে আপনাদের মাছ খাওয়া হয় না? ফরসা মুখের ওপোর বড় চোখ দুটো আরও বড় করে মিসেস্ মুখার্জী বোধ হয় যেন অনুকম্পাই প্রকাশ করেছিলেন।

বিভূতি বলেছিল, হয়। শনি রবিবার, দেশে গিয়ে।

তা দেশ ত আপনাদের মেমারিতে, তাই না?

কি করে জানলেন ?

জানি, জানি। সব খবরই আমার কানে আসে। তা বউকে আনেন না কেন ? তাহলে ত আর নিজেকে বাসন মাজতে হয় না। বউ-রান্না ভাত খেয়ে বাপ-বেটায় দিব্যি আপিস করতে পারেন। আর সেই সঙ্গে—

সেই সঙ্গে কি ?

শ্রীমতী মুখার্জী বল্লেন, সেই সঙ্গে,—সে অবশ্য আপনাদের কিছু নয়, আমি একজন বন্ধু পাব। সারা দিন একলাটি থাকি, আপনার বউ এলে দিব্যি গল্পগাছা করে দুপুরটা কাটানো যাবে।

সেদিনের বিভূতি মিসেস্ মুখার্জীর সমবেদনায় বিগলিত হয়ে বলেছিল, তা ত হয়, কিন্তু এখানে একখানি মাত্র ঘর—

ওঁকে বল্লেই পারেন। উনি এঁদের উঠিয়ে দিয়ে ঐ ঘরখানা আপনাদের দেবেন।

মনের দুঃখ মনে চেপে বিভূতি বলেছিল, দেখি, বাবাকে বলি। তিনি যদি রাজী হন,—কিন্তু মনে মনে বিভূতি জানে, বাবা এই বাড়তি খরচে কিছুতেই রাজী হবেন না।

বউটি কথা বলছিল আর মাঝে মাঝেই উঠোনের শেষ প্রান্তের সদর দরজার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। দরজাটা ভেজানো ছিল, কিন্তু হুড়কো দিয়ে বন্ধ করা ছিল না। ঐ দরজায় হুড়কো পড়ত রাত্রে সকলের সব কাজ সারা হয়ে যাবার পর। সারাটা দিন ঐ দরজাখানা ভেজানই থাকত।

বউ বল্ল, কালও ত এই সময় খেতে আসবেন বাড়ীতে ?

হ্যাঁ।

খাবার আগে আমাকে ডাকবেন। আপনার জন্য মাছের তরকারি রাখব।

সে কি ? না না না, ও সব ঝঞ্ঝাট করবেন না, প্রবলভাবে আপত্তি করেছিল বিভূতি।

বউ বল্ল, ঝঞ্ঝাট করব কি করব না সে আমি বুঝব। মোটের ওপোর কাল দুপুরে যখন খেতে বসবেন তখন যেন আমি জানতে পারি।

বাল্‌তিটা হাতে নিয়ে বউটি যাবার উপক্রম করে বল্ল, উঃ, পিঠে একটা এমন ব্যথা লেগেছে—

এর পর বিভূতিকে বলতেই হোল, বাল্‌তিটা ওপোরে তুলে দিয়ে আসব ?

রাগ করবেন না ত ? হাসতে হাসতে বউটি বলেছিল।

না না, তাতে কি। বিভূতি বাল্‌তিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে চল্ল।

বউ বল্ল, সদরটা আগে বন্ধ করুন। আপনার ঘরটা খোলা রইল না ?

সদরে হুড়কো দিয়ে বউয়ের পেছন পেছন বিভূতি সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠেছিল। ওপোরে সিঁড়ির মুখে ছিল একটা দরজা। সেই দরজা পার হয়ে দোতলার সরু বারাণ্ডায় গিয়ে বৌ বল্ল, দিন বাল্‌তি দিন, আর খাটাবো না আপনাকে।

বিভূতি বাল্‌তিটা নামিয়ে দেবার আগেই বউ নিজে বাল্‌তির হাতলটা ধরতে গিয়ে বিভূতির হাতে হাত ঠেকে গেল। ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বালতিটা নিয়ে ঐখানেই নামিয়ে রেখে বল্ল, রাগ করছেন না ত, আপনাকে অনেক খাটালুম।

সেদিনের বিভূতি মুখ কাচুমাচু করে বলেছিল, এ আর কি খাটুনি! এক বাড়ীতে রয়েছি। আপনার দরকারে যদি কিছু করেই দি—

আপনি ত আপনার ঘর আমাকে দেখালেন না। আমার ঘর দেখবেন ?

কি অমায়িক তার আহ্বান! বিভূতি বল্ল, কটা বাজে ? আবার আমাকে বেরুতে হবে কি না—

নিজের খোলা ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বউ বল্ল, এই মোটে দেড়টা।

বউয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে বিভূতি দেখল দেওয়ালের ক্লক ঘড়িতে

ছুটো বাজতে মাত্র দশ মিনিট। বিভূতি বল্ল, সে কি? ছুটো বাজতে দশ যে—

বউ বল্ল, ও অনেক ফাস্ট আছে। এখন দেড়টাই হবে।

কিন্তু বিভূতির মনে হোল দেড়টা কিছুতেই হোতে পারে না। একটার পরে সে গুদাম থেকে বেরিয়েছে। তারপর বাড়ী এসে জামা কাপড় ছেড়ে চান করে খেয়ে বাসন মেজে—এখন দেড়টা কিছুতেই হোতে পারে না। পৌনে ছুটো ত অবশ্যই হবে। সে বল্ল, না, আজ আর ঘরে যাব না। ছু'টোর সময় অফিসে যেতে হবে। অন্যদিন আপনার ঘর দেখব।

তা হলে কাল তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আপনার জন্য তরকারি রাখব।

বিভূতি কোন উত্তর না দিয়ে ওপোর থেকে নেমে জামা কাপড় পরে নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে সদর দরজা খুলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত, ওপোর থেকে এক জোড়া ডাগর চোখ তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।

এতদিন পরেও বিভূতির মনে আছে সেদিন অফিসে পৌছাতে তার প্রায় আট মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল। হেড অফিস থেকে ডেলিভারী অর্ডার নিয়ে পার্টি এসে গুদামের অফিসে বসে ছিল। পাঁচ টন সিমেন্ট ডেলিভারী দিতে হবে। লরীও তৈরী, শুধু বিভূতির জন্যই সবাই অপেক্ষা করছিল।

ওদের বিদায় করে সিগারেট ধরিয়ে বিভূতি ভেবেছিল, কি ব্যাপার! যাকে কোন দিন সামনাসামনি দেখার সুযোগই হয় নি সেই বউ—

আবার মনে হোল সুরেন বাবু বাবার বয়সী, তার বউ? ওর বয়স বড় জোর পঁচিশ, কমও হোতে পারে। এটাই বা কি করে সম্ভব! দ্বিতীয় পক্ষ! তৃতীয় পক্ষ? কে জানে?

সে যাই হোক, বউটিকে সুন্দরী বলা যায়। পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গীর

সৌন্দর্য, গোলগাল মোহনীয় চেহারা, রংটি ফর্সা, বেশ ফর্সা, মুখের গড়নটিও ভাল, পাৎলা ঠোঁট, বড় বড় চোখ, কপাল পর্য্যন্ত চুল। ও যখন সিড়ি দিয়ে ওপোরে উঠছিল তখন পেছন থেকে ওকে যেন মায়াপুরীর রাজকন্যে মনে হয়েছিল সে দিনের বাল্তিবাহক তরুণ বিভূতির, আবার সংস্কারবশে সন্দেহ হয়েছিল, বউটা কি রকম? খারাপ না কি? ছি, ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে এ রকম চিন্তাও পাপ। বিভূতি মনে মনে নিজকে শাসায়, মনকে প্রবোধ দিয়ে স্মরণ করে যে ঐ বউটি বিভূতিকে ভাই বলেছে। হয়ত ওর ঐ রকম কোন ভাই আছে, থাকতেও পারে, নিশ্চয়ই আছে। কুকারের রান্নায় মাছ হয় না শুনে কি দুঃখ ওর! এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে মাছের তরকারি দেবার জন্য কি আগ্রহ! সত্য কথা বলতে কি বিভূতিদের মাছ হয় না কুকারে রান্নার অসুবিধার জন্য নয়, মাছের দামের জন্য। কাটা পোনা মাছ ওদের বাপ-বেটার জন্য অন্ততঃ এক পোয়ার মত না আনলে হবে না, অথচ ঐ এক পোয়ার দাম কমপক্ষে ছ' পয়সা, তারপর তেলের খরচ আছে। ছ' আনা সের সর্ষের তেল। মাছ যে বিভূতি আগে আনে নি তা নয়, কিন্তু খরচের জন্য বাবা ভয়ানক রাগারাগি করেন। সত্যিই ত, গরীব গেরস্ত ঘরের লোক ওরা, তালেবর ত নয়। কথাটা বাবা হামেশাই মনে করিয়ে দিতেন। তারপর এখন ত মাছ কেনার সময়ই নেই। ভোর বেলা উঠেই কুকার চড়িয়ে মুখ ধুয়ে আগের রাত্তিরের কিনে রাখা পাঁউরুটি চায়ে ভিজিয়ে খেয়ে বিভূতিকে বেরিয়ে পড়তে হয়। মাছ আর আনবে কখন? তরি-তরকারি যা কেনে তা সেই রাত্তিরে। সেদিন রাতে বাজারে গিয়ে চিংড়ি মাছ দেখে বিভূতির খুবই লোভ হয়েছিল, বাগ্‌দা চিংড়ি, বেশ টাট্‌কা, দামও বলেছিল পাঁচ আনা সের, কিন্তু নেওয়া হয় নি। নিলে রাত্তিরে কুটে ধুয়ে ভেজে রাখতে হোত, তারপর সকালে ভেজে নিয়ে শেষে কুকারে—কিন্তু বাবা নির্ঘাত রাগারাগি করবেন। বলবেন, সবই যদি পেটে পুরবে তা হলে বিদেশে গোলামি করতে

এসেছ কেন? ছুটো পয়সাই যদি ঘরে নিতে না পারব তা হলে বাপ বেটায় বিদেশ বিভুঁয়ে মুখে রক্ত উঠে মরছি কেন? হপ্তায় ছু' দিন, ছু'দিন কেন আড়াই দিন নিজের পুকুরের মাছ খেয়ে আশা মেটে না এমনই বা কি নোলা! বিভূতি বাবাকে ভয় করত, মনে মনে কখনও-কখনও ঘৃণাও করেছে, কিন্তু কোন দিনও অবাধ্য হতে পারে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বাঙ্গালী ছেলেরা সচরাচর বাপের বাধ্যই থাকত।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটের মোড় বরাবর এসে গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে ঘটক চিঠির নম্বরটা আর একবার দেখে গাড়ীখানা রাস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে থামলেন। তারপর বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চাবি দিয়ে ছু'পাশের বাড়ীর নম্বর দেখতে দেখতে মন্থর গতিতে চলতে সুরু করলেন। একবার ঘড়িটা দেখলেন, সওয়া চারটে বেজেছে।

দ্বারিক ঘোষের আদি দোকানের ধার দিয়ে শ্যামপুকুরে ঢুকে বাড়ীর নম্বর দেখতে দেখতে কিছুটা এগিয়ে স্পষ্ট বুঝলেন, যে-নম্বরটা খুঁজছেন সেটা বাঁ দিকের সরু গলির ভেতরেই হবে।

গলিটা অত্যন্ত সরু, চার ফুটও হবে কি না সন্দেহ। ইটপাতা গলিতে মাঝে মাঝেই গর্ত্ত। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে কিছু পরিমাণ ছাই, মাছের আঁশ, কাগজে মোড়া অন্য রকম নোংরারও অভাব নেই। কোন বাড়ীটা একতলা, কোনটা দোতলা, কোন বাড়ীর দরজা থেকে জল বেরিয়ে সরু গলিতে সেই জল থৈ থৈ করছে। কোন রকমে জল ডিঙ্গিয়ে একজন লুঙ্গি-পরা, খালি গা, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে নম্বরটা জিজ্ঞাসা করে তার নির্দেশে আরও এগিয়ে চোঙা প্যান্ট ও স্যাণ্ডেল পরা এক জোড়া মস্তান গোছের ছোকরা সামনে পেয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারা বল্ল, কাকে খুঁজছেন? কার বাড়ী?

নামটা বল্‌তে ঘটকের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না বলেও পারলেন না। বলতেই হোল, শ্রীমতী অনুপমা মুখার্জী।

একটি ছেলে অপরের মুখের দিকে চেয়ে বল্ল, অনুপমা মুখার্জী কে

রে? তারপর ভেবে বল্ল মুখার্জী ত আছে ঐ পাগলাটা, তা ছাড়া অন্য কোন মুখার্জী ত এখানে নেই।

ওর মায়ের নাম হতে পারে, অপর ছোকরা উত্তর দিল।

কোন বাড়ী? ঘটক প্রশ্ন করলেন।

ওদের মধ্যে একজন আঙ্গুল তুলে বল্ল, ঐ দিকে এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে একটা গলি পাবেন। সেই গলির শেষের দিকের বাঁহাতে টিনের চালা ঘরে ঐ মুখার্জীরা থাকে। পাগলাটার নাম বোধ হয়,—কি নামটা রে?

অপর ছোকরা মুখ বেঁকিয়ে বল্ল, কে জানে!

তারপর ঘটককে বল্ল, দেখুন-না ঐদিকে গিয়ে। যে নম্বর চাইছেন সেটা ঐদিকেই হবে।

ছেলে দুটো ঘটকের গা ঘেঁষে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে পড়ল।

ওদেরই নির্দেশমত ঘটক আরও কিছু এগিয়ে ডান দিকে ততোধিক সরু এক গলি পেলেন। এই গলির মেঝেয় ইট পাতাও নেই। এটা একটা মেটে গলি। পাশের বাড়ীর রান্নাঘরের জাল-দেওয়া জানলা থেকে গল্‌গলিয়ে কয়লার ধোঁয়া বেরিয়ে সমস্ত জায়গাটা ঢেকে ফেলেছে, সামনের দিকে কিছুই দেখা যায় না। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হবার উপক্রম।

নাক চোখ বুজিয়ে ধোঁয়ার ভিড় ঠেলে ঘটক এগিয়ে পড়লেন। এক জায়গায় গর্তে পা পড়ে তাঁর পাটা মচকেই গেল। তখন মনে হোল, না এলেই ছিল ভাল, কিন্তু এসেই যখন পড়েছি—

শেষে বাঁ দিকের টিনের চালাটা নজরে পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে ইতস্তত নজর করতেই ডানদিকের খোলা দরজা দিয়ে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কাকে চাই?

এখানে মুখার্জীরা থাকেন কোথায়?

কে মুখার্জী?

শ্রীমতী অনুপমা মুখার্জী, মরিয়া হয়ে নামটা মিঃ ঘটক উচ্চারণ করলেন।

কত নম্বর বাড়ী ? নিরস কণ্ঠের বিরক্তিকর প্রশ্ন।

টিনের বাড়ী থেকে কোলকুঁজো ধরনের শীর্ণ এক অকাল-বৃদ্ধ একমাথা এলোমেলো চুল ও মাকুন্দে মুখ নিয়ে গামছা-পরা অবস্থায় বেরিয়ে বল্ল, কি নাম গো ?

শ্রীমতী অনুপমা মুখার্জী।

দাঁড়াও।

ভেতর দিকে মুখ করে সেই লোকটি হাঁক দিল, মা, মা রে—

নেপথ্য থেকে বামাকণ্ঠে সাড়া এল, যাই।

ঘটক দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোকটি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, আপনার নাম কি ? কি চান ?

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে ঘটকের ইচ্ছাই হোল না। তিনি যেন শুনতেই পেলেন না এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সে লোকটি বল্ল, আপনাকে ত আগে দেখি নি! আপনার দোকান কোথায় ? শ্যামবাজারে, না হাতিবাগানে ?

মুখ তুলে ঘটক বল্লেন, দোকান ? দোকান মানে ?

সে বল্ল, দোকান মানে দোকান। জামা প্যাণ্ট করতে হবে, না ঠোঙা চাই ?

না। কিছুই চাই না।

তবে ? তবে কি জন্যে এসেছ ?

বিরক্তির শেষ সীমায় আসার আগেই একজন স্ত্রীলোক ভেতর থেকে এসে বল্ল, কাকে চাই ?

মহিলার দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে ঘটকের মনে হোল, এই সেই। পরিশ্রমের সার্থকতায় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি ধীরে ধীরে নামটা উচ্চারণ করলেন, শ্রীমতী অনুপমা মুখার্জী।

আমি। সসংকোচে মহিলাটি প্রশ্ন করল, কোথা থেকে আসছেন ?

পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে এগিয়ে ধরলেন ঘটক, বল্লেন, এই চিঠিটা পেয়ে আসছি।

সেই কোলকুঁজো লোকটা এগিয়ে এল চিঠি নিতে। তাকে সরিয়ে দিয়ে মহিলাটি বল্লেন, তুই সর সর, সরে যা। তোর এ সব খবরে কি দরকার? চিঠিখানা তিনি নিজে নিলেন। কোলকুঁজো লোকটা গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ভেতরে ঢুকে গেল।

মহিলাটি প্রশ্ন করল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ঘটক বল্ল, যোধপুর পার্ক থেকে।

মহিলাটি সম্ভবত জানত না যোধপুর পার্ক কোথায়। ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করল, সেটা কোথায়? কলকাতায়?

হ্যাঁ। দক্ষিণ কলকাতায়। আচ্ছা, আপনারা কি এক সময় রামকান্ত বসু স্ট্রীটে থাকতেন?

মহিলাটি তীক্ষ্ণভাবে ঘটকের দিকে চেয়ে বল্ল, হ্যাঁ। আপনি জানেন?

তারপর আর একটু এগিয়ে ঘটককে আগাগোড়া দেখে সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল, আপনি—আপনার নামটা কি বলুন-না!

শেষের দিকের কথাগুলো আগ্রহে পরিপূর্ণ।

ঘটককে নীরব দেখে বল্ল, বিভূতি বাবু? বিভু কি?

হাসিমুখে ঘটক বল্ল, হ্যাঁ অনু, আমি সেই।

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল অনু। বোধ হয় যেন কাঁপছিল। কথা বলার শক্তিও কি তার ছিল না!

ঘটক বল্লেন, ঘরে চলো, বসা যাক, অনেক কথা আছে।

ধীরপদে অনু বাড়ীর ভেতর এগিয়ে চল্ল। পেছন পেছন ঘটক। বাড়ী থেকে একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। দেখে মনে হোল ঠিকে-ঝিয়ের কাজ করে। বোধ হয় কাজে গেল।

ছোট্ট একটি খুপ্‌রি ঘরের মধ্যে ঢুকে অনু মাদুর বিছিয়ে দিল। আর্ত্ত সিক্ত কণ্ঠে বল্ল, বোসো।

ঘটক বসলেন। ঘরের সর্ব্বত্র চেয়ে চেয়ে দেখলেন। রামকান্ত

বসু স্ট্রীটে এই অনুপমার ছিল কত আসবাব! খাট, আরশি দেওয়া আলমারি, ইজি চেয়ার, দেওয়াল ঘড়ি, ভাল ভাল ছবি, গ্রামোফোন, রেডিও, লোহার সিন্দুক, সেই সিন্দুকের ওপোর সেলাই কল, সেখানে বসে সেলাই করার জন্য গদি-আঁটা চেয়ার, কি শৌখীন সব ব্যবস্থা! পাশের ঘরখানায় ছিল ভাঁড়ার ও অনেকগুলো বাক্স তোরঙ্গ। তৃতীয় বা শেষের ঘরখানায় রান্না হোত। সেখানে ছিল কল-লাগানো জলের ড্রাম, যে-ড্রাম রোজ সকালে ঝি ভর্তি করে দিত। পেতল কাঁসার ঝক্‌ঝকে বাসন; এ্যালুমিনিয়ম, কলাই এবং কাঁচের বাসনই কি কম ছিল! অনুর পরম বিলাসিতা ছিল বাসন কেনা। সে সব গেল কোথায়? ছোট্ট প্রায়-অন্ধকার ঘরের মেঝেয় দেওয়ালের ধারে গুটানো দুটো বিছানাই শুধু দেখা যাচ্ছে। সেই বিছানার একটার তলায় পাতা মাদুরটাই অনু টেনে পেতে দিয়েছে। ঘটকের সামনাসামনি দেওয়ালের ধারে দেখার মত ছিল এক বোঝা বাদামী কাগজ, ব্রাউন পেপার, যেগুলো দিয়ে ছেলেরা বইয়ে মলাট দেয়। ঘটক এক নিমেষে সবটা দেখে নিল।

কে মা? ও কে?

তুমি একটু বাইরে বেড়িয়ে এসো বাবা, আমি ততক্ষণ তোমার মামার সঙ্গে কথা বলি।

আমি শুনব, মামার কথা শুনব, সেই কোলকুঁজো লোকটা আবদার করল।

ছিঃ, অসভ্যতা করতে নেই। তুমি বাইরে যাও। আচ্ছা খোকা, তুমি এই দশ নয়াটা নাও, বাইরে গিয়ে চীনাবাদাম খাও গে।

বাদাম? বাদাম খাব? বুড়ো খোকা আনন্দে নেচে উঠল। ঘরের খাটানো দড়ি থেকে ফস্‌ করে একখানা কাপড় টেনে কোমরে জড়িয়ে মায়ের হাত থেকে দশ নয়াটা ছোঁ মেরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর দিকে চেয়ে রইলেন মিঃ ঘটক। মনে পড়ল গলির মধ্যে দেখা সেই মস্তানযুগলের কথা যারা এই ছেলেকে পাগ্‌লা বলেছিল, এর

নামটা যারা মনে করতে পারে নি। তারা নিশ্চয় এর কথাই বলেছিল।

সামনে মেঝের ওপোর অনু চুপ করে বসে ছিল।

চতুর চৌকস ব্যবসাদার মিঃ ঘটক বলার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, অথচ এমনই একটা অবস্থায় যে অনুকে দেখবেন সেটা ঠিক ভাবতে না পারলেও পূর্বের অবস্থায় যে পাবেন না সেটা তাঁর বোঝা অবশ্যই উচিত ছিল। তিনি আনন্দবাজারে বক্স-নম্বরে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এমন একটি স্ত্রীলোকের জন্য যে তাঁর মায়ের কাছে দিনরাত থাকবে, রুগ্ন মায়ের সেবাশুশ্রূষা করবে। তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিবঙ্গের মধ্যবয়সী ব্রাহ্মণকন্যা, সেই জন্যই স্বামীর নাম, আদি নিবাস এই সব জানিয়ে বক্স-নম্বরে দরখাস্ত পাঠাতে বলেছিলেন। যতগুলো চিঠি এসেছিল তার মধ্যে অনুর চিঠিখানাই তাঁকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছিল। এই চিঠির মধ্যে তিনি এমনই এক হারানিধিকে পেয়েছিলেন যে, মিঃ জালানের জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট টেলিফোনে বাতিল করে নিজেই কলকাতার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে দৌড়ে এসেছেন। কিন্তু এসে তিনি কি দেখলেন ?

অনু বল্ল, কি করছ এখন ? ছেলেপুলে কি হয়েছে ?

তিনি বল্লেন, এক ছেলে, এক মেয়ে।

ওদের বিয়ে হয়েছে ?

মেয়ের হয়েছে। ছেলে এখনও পড়ছে।

বৌ ?

নেই।

সে কি ? তিনি—

সাত বছর হল গত হয়েছেন।

আর বিয়ে কর নি ?

না।

নিজের কপালে হাত বুলিয়ে অনু বলল, ভাল করেছ।

কেন ?

আর একজনের জীবন যে নষ্ট কর নি এজন্য তোমার তারিফ করি।

দুষ্টামির ছলে ঘটক বললেন, বিয়ে করলে কি আর একজনের জীবন নষ্ট হোত ?

ম্লান-কণ্ঠে অন্নু বলল, হোত বই কি! এই আমাকে দেখছ না? তুমি তো সবই জানো। তাঁর বয়স চুয়ান্ন, আমার বয়স উনিশ। এই বিয়ের ফল কি, তা তো নিজের চোখেই দেখছ। তোমার বয়স এখন কত হোল?

ছাপ্পান্ন।

তা তো হবেই, আমারই ধর-না-কেন প্রায় চুয়ান্ন।

তোমার ছেলে কত বড় হোল ?

ওর হোল ত্রিশ। এই ভাদ্রে একত্রিশে পড়বে।

ছেলেটি ওরকম কেন ? কাজকর্ম কিছু করে ?

কিছু না। ওর জন্যই ত আমার জ্বালা! ও যদি মানুষ হোত—

লেখাপড়া করেছে কিছু ?

কিচ্ছু না। তিনি কি ওকে পড়ালেন, না মানুষ হোতে দিলেন। কত বলেছি। আমার কথায় তিনি কানই দেন নি।

সে কি ? নিজে ত তিনি গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। ছেলেকে—

ম্লানমুখে অন্নু বল্ল, তোমরা চলে যাবার ছ' মাস পরে ও হোল। ও হবার আগে নোংরামি ত কম হয় নি! আমি ভেবেছিলুম—' কিন্তু তিনি এ সবে আমলই দিলেন না। তবে এমন এক উল্টো উৎপাত হোল যে তাইতেই খোকার জীবনটা মাটি হয়ে গেল।

কি হোল ? কোন ভারী-গোছের অসুখ-বিসুখ ?

না না, সে সব কিছু নয়।

একটু থেমে অন্নু বল্ল, ছেলে জন্মাবার একদিন আগে উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ওঁকে বলছেন, তুই আমাকে এত ডাকিস, আমি তোর ঘরে আসছি। তুমি তো জানতে তিনি ঠাকুরকে কত ভক্তি করতেন। এই স্বপ্ন দেখার পর খোকা ভূমিষ্ঠ হোল। সেই

দিনেই উনি আমার আঁতুড়ের দরজায় এসে বল্লেন, এই ছেলেই দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ, আমি এর নাম রাখলুম গদাধর। এই নামই যে ওর কাল হবে তা কি তখন জানতুম!

কেন? নামের জন্য হোল কি?

ওকে তিনি স্কুলে দিলেন না, পড়াশোনা করালেন না। বল্লেন, ঠাকুর কি কখনও পড়াশোনা করেছিলেন? ওর নিজের মধ্যে যে মহাজ্ঞান আছে সেই জ্ঞানই ওকে ওর নিজের মাহাত্ম্যে ফুটিয়ে তুলবে, ইংরাজী স্কুলের অবিদ্যায় ওকে নষ্ট করতে চাই না। এ জন্য কত ঝগড়া করেছি, কত কেঁদেছি, কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই শোনেন নি। ও হওয়ার দু' মাস পরেই তাঁর পেন্সন হোল। তারপর উনি প্রায় বিশ বছর বেঁচেছিলেন। নিজে বাপ হয়ে ছেলেকে দেবতার মতো পূজো করতেন। পূজোই বলব, সে যা ব্যবহার তা যদি তুমি দেখতে তা হলে আশ্চর্য হোতে। আর খোকারও সব আশ্চর্য ব্যাপার। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলত যে বড় বড় লোকদেরও তাক্ লেগে যেত। ওঁর বন্ধুরাও মাঝে মাঝে এসে ঐ ছেলের কথা শুনে অবাক হোত। ঐ ছেলে মাঝে মাঝে বাপকে মথুর বলে ডাকত। তাঁরও বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি পূর্বজন্মে মথুরই ছিলেন।

তুমিও তাই বিশ্বাস করেছ?

এক একবার মনে হোত বৈকি? আশ্চর্য সব কথাবার্তা শুনলে কার না মনে হবে!

তারপর?

তারপর আর কি? তিনি চলে গেছেন আজ প্রায় দশ বছর। কত ধাক্কাই না খাচ্ছি, ওর কিন্তু চৈতন্য আর হোল না। এখনও ঐ ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার। ঐ ব্যবহারকেই তিনি বলতেন, ঠাকুরের বালক-ভাব। এখন দেখছি বালকভাব তো বটে, কিন্তু এই ভাবে তো পেট চলে না। এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে কি করব, কি হবে কিছুই বুঝতে পারি না।

এখানে কতদিন আছ ?

তা প্রায় বছর চারেক হোল। সেই যেবার পাকিস্তানের সঙ্গে হিন্দুস্থানের লড়াই হোল. সেই সময় ও-বাড়ী থেকে বাড়ীওয়ালা উঠিয়ে দিল।

দেশে গেলে না কেন ? কলকাতায় তোমার এখন কি দরকার ? তোমাদের দেশ তো তারকেশ্বরে ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে কথা আমি কাউকেই বলি নি। তোমার কাছেও সে সব কথা গোপন রেখেছিলুম। আমার বিয়ের পরেই উনি আমার সতীনপো-দের নামে দেশের সব কিছু লিখে-পড়ে দিয়েছিলেন।

অ। তা তোমার বাপের বাড়ী ?

ম্লান হেসে অনু বল্ল, হুঁঃ, বাপের বাড়ীর জোরই যদি থাকত তা হলে কি আর এখানে বিয়ে হোত ! জাটতুতো মামা এঁর হাতে ফেলে দিয়ে কোন রকমে ঘাড় থেকে দায় নামিয়ে ছিল। তা ছাড়া তাদের কে দেখে তার ঠিক নেই। এ রকমটা হবার পর অনেক চেষ্টা করেছি, কোথাও কেউ সাহায্য করার মতো ছিল না বলেই ত এই হাল হয়েছে। যদি লেখাপড়া কি গান বাজনাও জানতুম তা হলে মেয়ে ইস্কুলে চাকরি করেও দু'পয়সা পেতুম। তাও ত জানি না।

তা হলে চলে কি করে ? তিনি ত গেছেন বলছ দশ বছর।

হ্যাঁ। তিনি যাবার পর নগদ যা ছিল তাই দিয়ে কিছুদিন চলেছিল। তারপর জিনিস পত্তরের দাম যা বাড়ল তাতে আর কদিন চলবে ? বাসন কোসন থেকে খাট আলমারি সবই বিক্রী করতে হোল। রেডিও, ঘড়ি, ক'খানা গয়না ঐ ও বাড়ীতেই একদিন চুরি হয়ে গেল। তারপর প্রায় দেড় বছরের মত বাড়ীভাড়া দিতে পারি নি। বাড়ীওয়ালা মকোদ্দমা করে তুলে দিল। এখানে এই ঘরখানা ভাগ্যিস পেলুম তাই, না হোলে পথে বসতে হোত।

তা এখন তোমার চলে কি করে ? ঘটক চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলেন।

চলে ? শুনবে ? তবে শোন। তোমার কাছে লুকোবার মত

কিছুই ত আমার নেই! আমি ঐ বড় রাস্তার এক বাড়ীতে দু'বেলা রান্না করি। তারা দেয় তিরিশ টাকা, আর মাঝে মাঝে দোকানদাররা কিছু কিছু কাপড় দিয়ে যায়। তাদের ফরমাশ-মত ছোট ছেলে মেয়েদের জামা, প্যাণ্ট, ফ্রক, বড়দের সায়া, আণ্ডারপ্যাণ্ট এই সমস্ত তৈরী করেও কিছু পাই। কিন্তু সেই অর্ডারও আর তেমন পাই না। রিফিউজীরা ঐ বাজার একচেটিয়া করে ফেলেছে। ঐ যে কাগজ দেখছ, ঐ কাগজ দিয়ে ঠোঙ্গা তৈরী করি। দোকানদাররা কাগজ দিয়ে ঠোঙ্গা করিয়ে নিয়ে যায়, মজুরী দেয়। এইভাবে কোন রকমে এক বেলার মত দুটো পেট চলে। কিন্তু আর পারছি না। শরীর আর বইছে না। তাই তোমার ঐ বিজ্ঞাপনটা যে বাড়ীতে রান্না করি সেই বাড়ীর কাগজে দেখে মন-মন চিঠিখানা লিখেছিলুম, কিন্তু ঐ যে গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে খোকা, ঐ ওকে নিয়ে যাব কোথায়? তবে তুমি রাখতে পারো, তোমার রাখা উচিত।

বড় বড় চোখ দুটো করুণ ভাবে ঘটকের দিকে তুলে ধরল উনিশশ' উনসত্তোরের অনুপমা। ঘটক নীরবেই বসেছিলেন।

সব ত শুনলে, এবার বলো আমার কোন ব্যবস্থা করতে পারবে কি না? প্রার্থীর দীনতায় অনুপমা প্রশ্ন করল।

ঘটক বল্লেন, সেই জন্যই ত দৌড়ে এসেছি। আজ দুপুরে তোমার চিঠি পেয়ে বুঝলুম, এ আমার সেই অনুপমা। সে জন্যই সব রকম জরুরী কাজ ফেলে নিজে এলুম। এর আগেও তোমার খোঁজ করেছিলুম কিন্তু পুরানো বাড়ীতে কেউই তোমাদের কোন খবর দিতে পারে নি।

আমিও তোমাকে খুঁজেছি। এই রকমটা হবার পর নিজে আমি তোমাদের গ্যালিফ স্ট্রীটের গুদামে খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলুম কিন্তু ওখানে যারা ছিল তারা তোমার নাম বলতে কেউ চিনতেও পারল না।

ঘটক বল্লেন, তারা আর চিনবে কি করে? ওখানকার কাজ আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি। তোমাদের ও বাড়ী ছাড়ার দু'বছর পরেই লড়াই

বেঁধে গেল এবং তার পরেই আমি ওকাজ ছেড়ে অন্য কাছে লেগে-ছিলুম।

এখন কি করছ ?

একটু আধটু ব্যবসা করি।

দেশ থেকেই আসা যাওয়া করছ ?

না, এখন কলকাতাতেই থাকি।

ভাড়া বাড়ী, না বাড়ী-করেছ ?

করেছি একটু বাড়ী।

কোথায় ?

যোধপুর পার্কে।

হ্যাঁ, তাই বল্লে বটে। তা এ পাড়া ছেড়ে অত দূরে গেলে কেন ?

ওখানে জমিটা সস্তায় পেলুম।

তা বটে। এ পাড়ায় জমির যা দর উঠেছে। আমাদের তিনি ত বাড়ী করব করব করেও করতে পারলেন না, আর করবেনই বা কি করে। ঐ যে এক ঠাকুর ঠাকুর বাতিক মাথায় চাপল, ওতেই সর্বনাশ হয়ে গেল। তা যাক, তোমার বউ ত নেই বল্লে, তাহলে তোমার বাড়ীতে এখন আছে কে ?

মা আছেন, আর ছেলে।

হ্যাঁ, মেয়ে ত শ্বশুরবাড়ী। বাবা—

তিনি বহুদিন গত হয়েছেন। উনিশ শ' চল্লিশ সালে। তিনি যাবার পরেই আমি আমার পুরানো অফিস ছেড়ে অন্য কাজে লেগেছিলুম।

তোমার অন্য দুই ভাই ?

তারা দেশে থাকে।

মা থাকেন তোমার কাছে ?

মা ? মা আগে থাকতেন না, এই মাসখানেক হোল তাঁকে এনেছি। তাঁর খুব ভারী অসুখ হয়েছিল। খবর পেয়ে দেশে গিয়েছিলুম।

তারপর দেশ থেকে এনে চিকিৎসা করিয়ে এখন একটু সেরেছেন বটে কিন্তু কর্ম্মক্ষম হতে আর পারবেন না বলেই মনে হয়। সেই তাঁকেই দেখাশোনা করার জন্য লোক চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম।

অ। তা, তা-হলে আমাকে দিয়ে কি সেকাজ হবে?

হবে না কেন? তুমি রাজী নও?

অনুর শীর্ণ মুখে ম্লান হাসি। অনেকটা স্বগত উক্তির মত অনু বল্ল, আমি এখন রাজী-অরাজীর বাইরে। আমার মত বা ইচ্ছে বলে এখন আর কিছুই নেই বিভু, কিন্তু আমার পরিচয় পেলে তোমার মা কি তোমাদের বাড়ীতে আমাকে ঢুকতে দেবেন?

কেন?

তোমার বাবা ত আমাকে নিয়ে কম কেলেঙ্কারী করেন নি? সে আমি এখনও ভুলিনি। তোমার মাও সে সব কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। তাই বলছিলুম—

বাধা দিয়ে ঘটক বল্লেন, আমি জানি। সেসব কথা ভেবেওছি, কিন্তু তুমি যে সেই লোক, সেকথা মা জানবে কি করে? তারপর তুমিও বুড়ো হয়েছ, আমিও বুড়ো হয়েছি, মাও অথর্ব হয়েছেন, এখন আর কোন গণ্ডগোল হবে না বলেই মনে হয়। গণ্ডগোলটা করবে কে?

সে তুমি বোঝো। তবে আমার যে ঐ খোকা রয়েছে! ও থাকবে কোথায়?

আমার কাছেই থাকবে। ও ত আমার পর নয়!

বড় বড় চোখ তুলে অনু আর একবার চেয়েছিল ঘটকের দিকে, মুখে বলেছিল, সেকথা যদি মনে রাখো, আর ওর যদি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার, তাহলে আমার এ জীবনে দুঃখু বলে আর কিছুই থাকবে না। তোমার আশ্রয়ে শান্তিতে চোখ দুটো বুজতে পারব।

ঘটক বল্লেন, আমি ভার নিলুম। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার বাড়ীতে চল।

ঝোঁকের মাথায় কথাগুলো উচ্চারণ করেই মিঃ বি ঘটক নিজের

জিভ্ কামড়ালেন। আবার ভাবলেন, কথা যখন দিয়েই ফেল্লুম তখন ঠিক আছে, জবানের খেলাপ কখনও হবে না।

কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ বি ঘটকের এই শিক্ষা হয়েছিল তাঁর বাণিজ্যগুরু জি. আর. হাণ্ডার কাছে। পাঞ্জাবী হিন্দু মিঃ হাণ্ডা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বড় বড় কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে চাকরি নিয়ে কাজ শিখেছিলেন বিভূতি ঘটক, শেষে তাঁর পার্টনারও হয়েছিলেন। হাণ্ডার কারবার যেদিন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয় সেদিন সেই কোম্পানীর শতকরা চল্লিশখানি শেয়ারের মালিক হন মিঃ বি ঘটক। হাণ্ডা অসুস্থ হবার পর ঘটকই হন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। যুদ্ধ শেষ হবার পরে ঘটকের চেষ্টায় টালিগঞ্জ বি. এল. সা রোডে মিঃ হাণ্ডা এক কারখানা স্থাপন করেছিলেন। হাণ্ডা পাঞ্জাবী হলেও দীর্ঘদিন কলকাতায় কাজ এবং বাস করে এক রকম বাঙ্গালীই হয়ে গিয়েছিলেন। মাতাল ও চরিত্রহীন হাণ্ডা ছিলেন অকৃতদার। দুনিয়ায় আপন বলতে কেউই তাঁর ছিল না। ঘটকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে হাণ্ডা তার শেষ শয্যায় সমস্ত শেয়ার ঘটককেই দান করে যান। এও প্রায় পনর বছর আগেকার কথা। ঘটক সেই হাণ্ডার কাছে সম্পত্তি যা পেয়েছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান উপদেশ পেয়েছিলেন, অন্ততঃ ঘটক সেই সব উপদেশগুলি বিশেষ মূল্যবান বলেই মনে করেন। একটা হল জবানের দাম। হাণ্ডার বিশ্বাস ছিল যে, কোন কথা অতর্কিতে বলে ফেলার মানে, অল্ মাইটি সেই কথাটা মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। সেই কথার কোন নড়চড় যেন কোন মতেই না হয়। অনুর ভার নেবার কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার পর ঘটক জানেন, নিজের জীবন দিয়েও সেই জবান তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। তাঁর বিশ্বাস, এই নীতিই তাঁকে ষোল টাকা মাইনের ইস্কুল মাস্টারি থেকে ধনী বণিকে পরিণত করেছে।

অনুপমা সেদিন সেই বিকেলে ঘটকের সামনে অঝোর ধারে কেঁদেছিল। নিজের শীর্ণ দু'খানা হাত দিয়ে ঘটকের ডান হাতের ভারী থাবাখানা চেপে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, ঠিক ত, ঠিক ত বিভু?

এই এতগুলো বছর আমি মন-মন তোমাকে যে কত ডেকেছি তা আর কি বলব! আজ বুঝছি আমার সেই ডাক বিফল হয় নি। এদ্দিন পরে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। তোমার ছেলের ভার এবার তুমিই নাও বিভু। আর আমি? আমি যেন তোমার কাছেই আমার জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে কাটাতে পারি।

কবে যাবে? ঘটক প্রশ্ন করেছিলেন।

যেদিন বলবে।

আজই চলো।

আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে প্রকৃতিস্থ হয়ে অনু বল্ল, আজই কি হয়! যে বাড়ীতে রান্নার কাজ করি তাদের বলতে হবে। যারা ঐ কাগজগুলো দিয়ে গেছে তাদের ফরমাশ মতো ঠোঙ্গা বানিয়ে যদি নাও দিই তা হলেও তাদের কাগজগুলো বুঝিয়ে ফেরৎ দিতে হবে। বাড়ীওয়ালার ভাড়া বাকি আছে দু'মাস, তারপর এ মাসেরও এতগুলো দিন হয়ে গেল—

ভাড়া কত? ঘটক প্রশ্ন করলেন।

পনর টাকা হিসেবে দু' মাসের ত্রিশ, তারপর এই ক'দিনের,—ধরো সব শুদ্ধ চল্লিশ, কিন্তু তাই কি নেবে—

ঠিক আছে, তিন মাসের পঁয়তাল্লিশ টাকাই দিও। তা হলে সব গুছিয়ে কবে যেতে পারবে বলো। কাল? পরশু?

অনুকে নীরব দেখে ঘটক বল্লেন, কালই চলো।

মাসের মাঝখানে হঠাৎ ছাড়লে যে-বাড়ীতে কাজ করি তারা কি আর এ মাসের মাইনে দেবে?

ছেড়ে দাও। তুমি আজই তাদের জানিয়ে দাও যে, কাল থেকে তুমি যেতে পারবে না। তারপর আজই ঠোঙ্গার কাগজ ফেরৎ দিয়ে বাড়ীভাড়া চুকিয়ে কাল সকালে—কিম্বা এক কাজ করলে হয় না, আজই সব কিছু চুকিয়ে যেতে পার না?—ঘটকের মুখে-চোখে আগ্রহ।

এতদিনই যখন অপেক্ষা করেছ তখন আজকের দিনটাও ছেড়ে দাও। আমি কাল যাব, অনুপমা ধীরে ধীরে একটি একটি করে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিল?

কখন?

এমন সময়।

ভেবে নিয়ে ঘটক বল্লেন, ঠিক আছে। আমি এই সময়, কিম্বা কাল সোমবার ত, হয়ত আসতে আরও একটু দেরি হোতে পারে, তবে আসব আমি নিশ্চিত, তুমি তৈরী থেকো। তোমার জিনিষপত্র বলতে যা দেখছি এই ত?

অনু বল্ল, হ্যাঁ। বলতে গেলে কিছুই নেই, থাকার মধ্যে আছে ঐ সেলাইয়ের কলটা। ওটা দিয়ে কিছু কিছু উপায় করি। আর ঐ ওপাশে দুটো পোটম্যাণ্টো আছে।

ঘটক বল্লেন, একটা কথা বলব অনু, যদি কিছু মনে না কর—

বল-না, অত সমীহ কিসের? ঘটকের মুখের দিকে অনুর সভীত দৃষ্টি।

তুমি তোমার বিছানাগুলো নিয়ে যেও না। তোমার বাক্স আর সেলাই কলটা নিয়ে গেলেই হবে।

বামুনদিদি,—বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল।

কে রে? রাখাল? অনু তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও যাচ্ছ না, মা বকছে।

অপরাধীর মত অনু বল্ল, হ্যাঁ বাবা, আমার দেরি হয়ে গেছে। আমার দেশ থেকে লোক এসেছে, তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে —তুই যা বাবা, দৌড়ে গিয়ে বল্‌গে যা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

সবগুলো কথাই ঘটকের কানে গেল। এই সেই রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের মিসেস্ মুখার্জী, তৎকালীন ব্যাঙ্ক-সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের দ্বিতীয় পক্ষের আদুরে দাম্ভিক গৃহিনী! কথার অবাধ্য হোলে ঝিকে

এমন বাজখাঁই গলায় ধমক দিতেন যা পাড়ার সকলেই শুনতে পেত।

রাখাল নামক ছেলেটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে তিন লাফে গলি পার হয়ে চলে গেল।

ও কে? যাদের বাড়ী কাজ করো—

হ্যাঁ, তাদের বাড়ীর ছোঁড়া চাকরটা। আমাকে খুব ভালবাসে।

ঘটক ঘর থেকে বেরুতেই অনু দরজায় শেকল তুলে দিল। বল্ল, দেখি, তিনি আবার কোথায়?

কে? ঘটক প্রশ্ন করল।

খোকা। আছে ঐ বড় রাস্তার রোয়াকে-টোয়াকে বসে।

তারপর নিজের মনেই বল্ল, নাঃ, তালাটা দিয়েই যাই, বাড়ী তেমন সুবিধের নয়।

বাইরে বেরিয়ে ঘটক বল্ল, খোকা এলে ঘরে ঢুকবে কি করে?

যাবার সময় বাইরে পেলে চাবিটা ওকে দিয়ে যাব, না হয় ত ও-বাড়ীতে গিয়ে চাবি চেয়ে আনবে।

পাকাপোক্ত ঠিকে ঝি-রাঁধুনীর কথাবার্তা। পাড়ায় পরিচয় 'বামুনদি' নামে, সে জন্যই অনুপমা মুখার্জী বলায় কেউ চিনতে পারেনি।

গলি থেকে রাস্তায় বেরুবার মুখে ঘটক বল্লেন, হ্যাঁ, বাড়ী ভাড়া মিটিয়ে সেবার টাকাটা রাখ। ভাগ্যিস, আর একটু হলে ভুল হোত। তা তুমি ত চাও নি?

অনু কোন উত্তর দেয়নি। স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ব্যাগ খুলে ঘটক দেখলেন তিয়াত্তর টাকার মতন আছে। তিনি বল্লেন, সত্তরটা টাকা রাখো, আরও কিছু দেনা-টেনা কোথাও যদি থাকে—

নীরবেই হাত পেতে টাকাটা নিয়েছিল এ কালের অনু। টাকাটা পেট-কাপড়ে গেরো দিয়ে বাঁধল,—ঐ সব ঝি-রাঁধুনীরা যেমন করে বাঁধে। চেয়ে চেয়ে দেখলেন আজকের মিঃ ঘটক।

গলি থেকে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে বেরিয়ে অনু গেল পুবদিকে, ঘটক পশ্চিমে, যেদিকে তিনি গাড়ী রেখে এসেছিলেন। অনু ওঁকে জিজ্ঞাসাও করল না, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ। ট্রাম অথবা বাস ধরতে হলে পূবদিকেই যেতে হবে। ঘটক ভাবলেন ভালই হোল, গাড়ীখানা অনু আজ দেখল না, আগামীকাল এটা হবে তার পক্ষে বিস্ময়। অনুও হয়ত ভেবেছিল, ভালই হোল, মনিববাড়ীর দিকে ঘটক গেলে অনুর অপমানটা বোধ হয় যেন বেশীই হোত।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে ঘটক ভাবলেন, অবস্থার চাপে মানুষ কত বদলায়! সেই রামকান্ত বসু স্ট্রীটে ঘটক একদিন অতি আগ্রহে ইংরাজী অক্ষর 'A' লেখা একখানা লেডিস্ রুমাল কিনে তাকে দিয়েছিল। সে নেয়নি, ফেরৎ দিয়েছিল। সেদিনের বিভূতি ভেবেছিল রুমালটা ওর না রাখার কারণ বোধ হয় ধরা পড়ার ভয়। ঐ রুমাল কোথা থেকে এল, কে দিল এই সব কৈফিয়তের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই সে বোধ হয় ওটা রাখল না। এই ভেবে সেদিনের বিভূতি আর একদিন ভাল সন্দেশ এনে গিয়েছিল দুপুরের নির্জন অভিসারে। সেদিন অনু ওকে কড়া ভাবে ধমক দিয়ে বলেছিল, তুমি কি ভেবেছ? আমি কি খেতে পাই না যে দিতে এসেছ? না আমি পাবার লোভে তোমাকে ভালবাসি! শেষে বলেছিল, সন্দেশ আমি নিতে পারি যদি ওর দামটা তুমি আমার কাছ থেকে নিতে রাজী হও। অনু বলেছিল, আমি অন্যকে দিয়ে থাকি, অন্যের কাছ থেকে নিই না। অনুর এই দম্ভে, এই দেমাকে বিভূতি মনে মনে যত আঘাত পেত ততই তাকে নিবিড়ভাবে ভালবাসত। ঘটকের ইচ্ছা ছিল, আজ অনু তার কাছ থেকে বাড়ী ভাড়ার টাকাটা চেয়ে নিক। সে জন্যই ঘটক অন্যমনস্কতার ভান করে ঘরে বসে টাকাটা দেন নি, কিন্তু অনু যখন চাইল না তখন বাধ্য হয়েই নিজে থেকে টাকাটা এগিয়ে দিলেন। অনু আজ নিতে আপত্তি করল না। এতে ঘটক যতটা আনন্দ পেলেন, দুঃখও পেলেন ততটাই। মানুষের মন কি বিচিত্র!

এ্যামবাসাডার ছুটছিল দক্ষিণ দিকে, ঘটক ভাবছিলেন উত্তরের, শ্যামপুকুরের কথা।

অনু হয়ত এতক্ষণে মনিব-বাড়ী ডাল তরকারি রাঁধছে। সে বাড়ীর গিন্নী হয়ত বকাবকি করছে। এখনও পুরো চব্বিশ ঘণ্টা অনুকে এই জীবনই যাপন করতে হবে। সেই অনু, সে-দিনের সেই মিসেস্ মুখার্জী। স্টিয়ারিং-এ বসে ভাবছিলেন এ দিনের মিঃ ঘটক।

কেমন যেন বিভোর হয়ে গাড়ী চালাচ্ছেন। ওকে কোথায় থাকতে দেব? ওর ঐ ছেলেটাই বা থাকবে কোথায়?

ওর ছেলে। সে কি বিভূতির ছেলে নয়? লোকে যাই জানুক না কেন, অনু জানে, বিভূতিও জানে ঐ পাগল ছেলেটা কার। সে আমলেই কানাঘুষো হয়েছিল। মুরারিবাবু পা থেকে চটি খুলে বিভূতিকে মারতে গিয়েছিলেন। সেই দিনেই পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ঘর ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে মুরারিবাবু দেশে গিয়েছিলেন। সব শুনে বিভুর মা বিভুকে গালমন্দ করেছিলেন, উদ্দেশ্যে কলকাতার ডাইনী রাক্ষুসী অনুকেও শাপ দিয়েছিলেন। বিভুর স্ত্রী ক্ষোভে দুঃখে স্বামীর সঙ্গে কথা কয়নি, মেঝেয় বিনা মশারিতে সারারাত ছট্‌ফট্ করেছে। গ্লানি ও লজ্জায় সে রাত্রে বিভূতি স্ত্রীকে ডাকতে সাহস পায়নি। ভোর রাতে বাবার ধমকে ঘর থেকে বেরিয়ে কোনমতে ফার্স্ট ট্রেন ধরে চাকরিস্থলে এসেছিল, প্রাতঃকৃত্যাদি হয় নি, সারাদিন খাওয়াও হয় নি। তারপর বাবাই জোর করে বাবার চেনা এক মেসে বিভুর জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই পিতাপুত্রের সম্বন্ধে ফাটল ধরেছিল। সেই থেকেই বাড়ীর সঙ্গে বিভূতির মনান্তর হোল পাকাপাকি ভাবে। আজ এই গাড়ীতে বসে বিভূতির মনে হোল, সংসারের সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ তাঁর কেটে গেছে সেই থেকেই। যেটুকু ছিল সেটুকু লোক-দেখানো যান্ত্রিক সম্বন্ধ মাত্র।

যে-বাপ বয়স্ক ছেলেকে কড়া শাসনে পুতুল বানিয়ে রাখতে চায়, সেই বাপের মৃত্যুতে ছেলে মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করলেও মনে পায়

মুক্তির আনন্দ। সে আনন্দ বিভু পেয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই। তারপর কেমন যেন অজান্তে, অলক্ষ্যে বিভূতির মন থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল সংসার, সরে গেল মা, ভাই ও বোনেরা। স্ত্রী? বিভূতির হাসি এল। সনাতন হিন্দুর ঘরে স্ত্রী হোল সংসারের দাসী। স্বামীর সঙ্গিনী সে হয় না, হবার সুযোগ সে পায় না, তাকে দেওয়া হয় না সেই সুযোগ, যা সে হয় তা হচ্ছে বড় জোর সেবিকা। স্ত্রী হচ্ছে বংশ রক্ষার যন্ত্র। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনাৎ',—কি প্রচণ্ড স্বার্থপরতা! 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি'। এই শাস্ত্রকে দূর থেকেই নমস্কার। হিন্দুর চলতি কথা, 'চোখ বুজলে অন্ধকার'! এ যেন সেই পরম স্বার্থপর রাজা, যিনি দেশের সর্ব্বনাশ জেনেও কোন প্রতিকার করেন নি, বলেছিলেন, 'After me the deluge'। সেই রাজাকে ইতিহাস ঘৃণা করে, কিন্তু সেই রাজাই সনাতন হিন্দুর প্রতিটি সংসারে কায়েম হয়ে রয়েছেন। বলছেন, চোখ বুজলে অন্ধকার। যতক্ষণ বেঁচে আছ ততক্ষণ ভোগ কর। কি দিয়ে ভোগ করবে? দারৈরপি ধনৈরপি, স্ত্রী এবং অর্থ দিয়ে সম্ভোগ কর। বিয়ে করবে কেন? বিয়ে করবে পুত্রার্থে। ছেলে চাই। উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর পর সেই ছেলে পিণ্ড দেবে। সংস্কৃত শ্লোকের মধ্য দিয়ে জীবনে-মরণে সর্বাঙ্গীন স্বার্থপরতাই তীব্রভাবে ফুটে বেরুচ্ছে।

একদিকে অসংসারী, চরিত্রহীন হাওার অতি-স্থূল, সফল পার্থিব চিন্তাধারা, অপরদিকে জঙ্গীবিভাগীয় দুর্ধর্ষ সাহেবদের ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উন্নাসিক মন্তব্যে পূর্ণবিশ্বাসী ঘটক যিনি প্রথম জীবনে সাংসারিক নিয়ম-নীতির বন্ধনে, আর্থিক অনটনে ও সামাজিক বিড়ম্বনায় বিপর্যস্ত এবং মধ্য জীবনের প্রারম্ভ থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতির যাবতীয় বেহিসাবী প্রাচুর্য ও উদ্দাম গতির সমস্ত সুযোগে নিজের বঞ্চিত জীবনের যাবতীয় বাস্তব বুভুক্ষার নিরাকরণে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ প্রচলিত সঙ্কীর্ণ মনোভাব, পল্লীগ্রামের অভাবী প্রবীণদের যুক্তিহীন নির্দেশ ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা,

নিরক্ষরা গৃহকর্ত্রীদের অন্ধ সংস্কার সমস্ত মিলে মিশে এক হয়ে যে হিঁদুয়ানির আবহাওয়া তাঁর মানসিক পরিমণ্ডলকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই কুয়াশা ভেদ করে মিঃ ঘটক হিন্দুকৃষ্টি সম্বন্ধে এর অধিক আর কিছু ভাবতে পারতেন না। তিনি স্পষ্টতঃই অনুভব করতেন যে, যে জাতি ডুবতে বসেছে এ হচ্ছে সেই জাতির জীবন-দর্শন। বাপ-মা পরমাগ্রহে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন। বিয়ের সময় বউয়ের চাইতেও দেনা পাওনার দিকে বেশী নজর। বিয়ের পর বউ ছেলের কাছে যাবে না দিনের আলোয়। বিভূতির মনে হয় এই জন্যই আগেকার দিনের প্রায় সকলেরই বাইরে বাইরে অন্য বন্দোবস্ত থাকত। এখনকার এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের তুলনায় গত শতাব্দীর এমন দিনে বাংলাদেশের সমাজে যত ছিল চরিত্রহীন তত ছিল সন্ন্যাসী। এই দুটো অবস্থার কারণ কিন্তু মূলতঃ একই, বাড়ীতে ক্ষুণ্ণিবৃত্তির অভাব। হাণ্ডা বলতেন, উপায় কর, ভোগ কর, যতটুকু পার লোকের উপকার কর। প্রাণ ভরে খাও, মন ভরে দাও। পেয়ে এবং দিয়ে তোমার নরজীবন সার্থক কর। বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা পাঞ্জাবী হাণ্ডাই বিভূতির আদর্শ, যার কাছে প্রথমে সে ছিল কর্মচারী, মধ্যে সহকর্মী, পরে বন্ধু এবং শেষে পুত্রস্থানীয়—

এ কি গাড়ীটায়—

সর্বনাশ, তৈল নেই! অয়েল মিটার একেবারে শেষ সীমায়!

এদিকে টাকাও ত নেই। গোটা তিনেক টাকা বোধ হয় ব্যাগে পড়ে আছে।

কাছাকাছি পেট্রল পাম্পে গাড়ীটা ঢুকিয়ে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ঘটক বল্লেন, দু' লিটার। দু' লিটার অর্ডার দিতে মনটা বড়ই খারাপ হোল। আগেকার দিনে চার গ্যালনের কম তেল তিনি কখনও নিতেন না। এখনও নেন কমপক্ষে দশ লিটার, কিন্তু আজ তিন লিটার নেবার পয়সাও পকেটে নেই।

দু' লিটার তেল নিয়ে দাম দিয়ে প্রায় শূন্য ব্যাগটা পকেটে পুরে

স্টার্ট দিতে গিয়ে হঠাৎ মনে হোল, এটা কিসের ইঙ্গিত? ব্যবসাদার লোকদের বাস্তব জ্ঞান যত প্রখর, অবাস্তব ইঙ্গিত ও লক্ষণ সম্বন্ধে তারা তত বেশী সচেতন। অমন যে হাণ্ডা, যিনি কোন কিছুই গ্রাহ্য করতেন না, তিনিও কোন মোটা রকম টেণ্ডারে সই দেবার আগে পরীক্ষা করতেন তাঁর কোন্ নাক দিয়ে বেশী নিঃশ্বাস পড়ছে। বাঁ নাক দিয়ে বেশী নিঃশ্বাস পড়লে তিনি কখনই সই করবেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস, ওটা অলক্ষণ। মুখ ধুয়ে নাকে জল দিয়ে অফিস ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে অনেকক্ষণ কাটিয়ে যখন বুঝবেন যে ডান নাক দিয়ে বেশী পরিমাণ নিঃশ্বাস পড়ছে তখন তিনি কলমটি বাগিয়ে ধরে টেণ্ডারে সই দিতেন। এটা যে তাঁর পাগলামি সেটা তিনি ভালভাবেই বুঝতেন। পাগলামি বলেই এই দুর্ব্বলতা তিনি প্রাণপণে গোপন রাখতেন সকলেরই কাছ থেকে, ঘটকও এ জিনিসটা দীর্ঘকাল জানেন নি। একদিন একটা টেণ্ডার নিষ্ফল হবার পর মনোদুঃখের অসতর্ক মুহূর্তে হাণ্ডা সাহেব নিজেই প্রকাশ করেছিলেন তার জীবনের এই গোপন তথ্য। গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটকের মনটা খিচড়ে গেল। এতকাল পরে আজ নতুন করে যার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করলুম, যার সারা জীবনের সমস্ত ভার আজ স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলুম, তার সম্পর্কে আসা মাত্রই এই অভাববোধ কেন? অভাবটা যতই সাময়িক হোক না কেন, অভাব অভাব! এত বড় গাড়ীখানা পেট্রলপাম্পে ঢুকিয়ে মাত্র দু'লিটার তেলের অর্ডার দেওয়ায় লজ্জাই কি কম? ছিঃ। কিন্তু কেন? কি জন্য?

এ নিয়ে বেশী কিছু ভাবতে আর ইচ্ছেই হোল না। বাড়ী ফিরে গ্যারেজে গাড়ী তুলে জামা কাপড়গুলো ধোবির বাক্সে ফেলে ধোপদস্ত পাজামা ও নাইলনের গেঞ্জী পরে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

এ বেলা কেমন আছ মা? চেয়ারটা টেনে নিয়ে মায়ের মুখের কাছে বসলেন বিভু ঘটক।

আছি অমনি এক রকম, উত্তর দিলেন শয্যাশায়িনী। আজ রবিবারও সেই দুপুর থেকে কোথায় ঘুরছিস্ রে ?

কাজ ছিল মা। হ্যাঁ, ভাল কথা। তোমার কাছে রাতদিন থাকার জন্য একটি ভদ্র ঘরের বিধবার সন্ধান পেয়েছি মা। কাল বিকেলে সে আসবে।

ভাল। যা বোঝো তাই করো। মায়ের উত্তরে কেমন যেন হতাশার সুর। একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, কত দিতে হবে ?

সে কথা কিছু হয় নি ; যা দিতে হয় দেওয়া যাবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে মা বল্লেন, আমি যা বলেছিলুম সেটা আর একবার ভেবে দেখ্ বিভু। ছোট বউমাকে আনিয়ে নে। তার ছেলেপুলে কিছু নেই, ঝাড়া হাত পা মানুষ, কলকাতায় থাকার সখও তার খুব। তাকে বল্লেই সে ফুর্ত্তি করে আসবে। সে আর শম্ভু এলে আমার দায়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। বাইরের কাজ-কম্ম শম্ভু সমস্ত করবে, আর সেই সঙ্গে যদি ছেলেটার কোন হিল্লে হয়ে যায়—

বিভূতি বল্ল, এক কথা বার বার বলে কি লাভ আছে মা ? ওরা দু'জনের কেউই মানুষ নয়। আমি কি ওদের জন্যে চেষ্টা করি নি ? পরেশকে এনে ত কাজে বসালুম। চুরি চামারি করে এমনই কাণ্ড করলে যে আমার মাথা কাটা যায় !

তোমার যেমন কথা ! মা'র পেটের ভাই, তার সম্বন্ধে রেখে ঢেকে বলো বাবা। কবে একবার ভুল করে কি করেছে সেইটাই চিরকাল মনে রাখতে হবে ! আর তা ছাড়া পরেশের কথা ত আমি বলছি না, আমি বলছি শম্ভুর কথা। মেজ'র দোষে ছোটকেও ত্যাগ করবে ?

আচ্ছা মা, তুমি ওরকম অবুঝ হও কেন ? তোমার এই অসুখের সময় আমি টাকা পাঠাতুম কার নামে ? সে কি তোমার জন্য টাকাটা খরচ করত ?

নাই করুক ! মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তার অভাব। তাদের কি দাও কিছু ? তার বউ কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে ? তোমার

পাঠানো টাকা থেকে আমিই যদি তার বউকে দু'খানা কাপড় কিনে দি', তা হলে কি এমন অপরাধ হোল বাবা? সেও ত এ বাড়ীরই বউ, না অন্য কেউ?

বিভূতি বল্ল, থাক মা, অত সব কথায় দরকার নেই। আমার বিশ্বাস কাজ পেতে গেলে বাইরের মাইনে-করা লোক দিয়ে যেমন পাওয়া যায়, ঘরের লোক দিয়ে তেমন হয় না।

বাইরে বাইরে থেকে তোমার মতিগতি এমনই হয়েছে বিভু। তুমি ঘরের লোককে ফেলে দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে অচেনা উট্‌কো মাগীর জন্য। কি জাত তার ঠিক নেই, নষ্ট দুষ্টু কি না তাও জানা নেই—

হাসতে হাসতে বিভূতি বল্ল, যে আসছে, যাকে ঠিক করেছি সে আমার খুবই বিশ্বাসী এক বন্ধুর চেনা। এরা ভাল বামুন, মুখুজ্জে, তোমার কোন ভয় নেই। এদেশী গেরস্ত ঘরের গিন্নীবান্নি বিধবা, তোমার খাওয়া ছোঁয়ার কোন অসুবিধে হবে না।

কে আছে এর?

একটিমাত্র ছেলে। নিরীহ বোকা-বোকা গোছের। সেও তোমার নিজস্ব হয়ে থাকবে, ফাইফরমাশ খাটবে।

সে কি এখানেই থাকবে?

হ্যাঁ। আমি ঠিক করেছি নীচের একটা ঘরে তাকে থাকতে দেব।

ছেলেটা কত বড়?

তা হবে তিরিশ বত্রিশ।

ও, তা হলে ত বেশ ডাগর ছেলে। কিছু করে না?

না, লেখাপড়া তেমন শেখে নি, আর বুদ্ধিশুদ্ধিও খুব মোটা। ফাইফরমাশ খাটতে পারবে, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

তা হলেও দু'জনের খাওয়া-পরা তোমায় চালাতে হবে ত!

সে যা হয় দেখা যাবে, সে জন্য তুমি ভেবো না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বৃদ্ধা বল্লেন, তবেই দেখ, তোমায় সেই

দু'জনের ভারই নিতে হবে, অথচ নিজের ভাই ভাদ্দরবৌকে তুমি আমল দিলে না।

অসহিষ্ণুর মত মাথা নেড়ে বিভূতি বল্ল, তুমি বুঝছ না মা। ভাই ভাদ্দরবৌ কি আমার বশে থাকবে? বাইরের লোক যেমন খেটে তোমার সেবা যত্ন করবে, বাড়ীর লোক তেমন করবে না। তুমি হয়ত ভুলতে পারো কিন্তু আমি ভুলিনি,—সে মাসে দু'দফায় তিনশ টাকা পাঠালুম তোমার চিকিৎসার জন্য। গিয়ে দেখলুম, বর্দ্ধমান থেকে ভাল ডাক্তার আনার পরিবর্তে পাড়ার হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তোমাকে প্রায় শেষ করে এনেছে। শম্ভুটা তোমার জন্য মোটমাট পাঁচটা টাকা খরচ করেছে কি না সন্দেহ, অথচ তারই নামে তিনশ টাকার মনি অর্ডার আমি পাঠিয়েছি।

মা নীরব রইলেন। বিভূতি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুই

গাড়ী ছুটছে। চালাচ্ছে বৈজু, বৈজুর পাশে ঘটক, পেছনের সিটে অনু ও খোকা। ওদের বাক্স তোরঙ্গ পেছনের লাগেজ বক্সে, সেলাই-কলটাও সেখানেই আছে। অন্যান্য টুকিটাকি জিনিষ নিজেদের কাছে।

অন্য একখানা গাড়ীর ডানদিক দিয়ে ওদের গাড়ীখানা দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ হাসি ও হাততালির শব্দে চমকে উঠলেন ঘটক। দুয়ো, ভোঁকাট্টা, হেরে গেল।

বৈজু ড্রাইভারও ঘাড় ঘুরিয়ে না দেখে পারে নি। বেহারী বৈজু বহুদিন বাংলায় থেকে বাঙ্গালী হয়ে গেছে।

অনু চাপা গলায় ছেলেকে ধমক দিল। ছেলে বল্ল, কি হয়েছে, রাগ করছিস্ কেনে ?

অনু বল্ল, ছিঃ, চেঁচাতে নেই, চুপচাপ দেখো, অসভ্যতা কোরো না।

ওমা, সে কি ! অসভ্যতা আবার কি করলুম ? হ্যাঁ মা,, বল্-না মা, অসভ্যতা কি করলুম ?

আঃ, খোকা। চুপ করে থাকতে পারো না ?

তবে তাই, চুপ করেই থাকি। মুখ গোমড়া করে ত্রিশ বছরের খোকা মায়ের পাশে বসে রইল।

গাড়ী ছুটছে।

খোকা একটা খেলা পেয়ে গেল। হাতল ঘুরিয়ে জানলার কাঁচখানা একবার তুলছে, একবার নামাচ্ছে।

আড়চোখে দেখে নিলেন মিঃ ঘটক। কিছু বল্লেন না।

খট্।

ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে বাঁ হাতে স্টীয়ারিং ধরে ডান হাতটা পেছনে দিয়ে দরজাখানা চেপে ধরল। খেলার ছলে খোকাবাবু দরজার লক্‌টা খুলে ফেলেছে।

তারপর ড্রাইভার গাড়ীখানা রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষিয়ে প্রায় থামিয়ে দরজাখানা অল্প খুলে টেনে বন্ধ করে দরজার ছিটকানিটা নামিয়ে লক্ করে দিল।

ঘটক দেখলেন বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্চে। গম্ভীর মুখে বল্লেন, চুপ করে বোসো খোকা, কোন কিছুতে হাত দিও না।

অনু তার ছেলেকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। খোকা বল্ল, আঃ, ছেড়ে দে, গরম লাগছে।

চাপা গলায় অনু বল্ল, চুপ্। মামা বকবেন।

কেনে? বকবেন কেনে? ওরা দরজা খুললে দোষ হয় না, আমি খুললেই দোষ হয়?

ছেলের কথায় অনু কোন জবাব দিল না, তাকে ছাড়লও না।

ক্ষণপরেই খোকা বল্ল, মামাবাবু, আমি রোজ রোজ মটরগাড়ী চড়ব, কিন্তু মাকে নিয়ে একদিনও যাব না।

তৃতীয় ব্যক্তি বৈজুর উপস্থিতিতে ঘটক লজ্জিত হচ্ছিলেন। খোকার কথাগুলো ইচ্ছে করেই শুনতে পেলেন না।

মামাবাবু, আমি চড়ব ত? পেছন থেকে ঘটকের পিঠে খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করল।

আঃ, ধম্‌কে উঠল অনু, কি হচ্চে কি?

ঘটকের তরফ থেকে কোন প্রশ্রয় না পেয়ে খোকা মুখ গোঁজ করে বসে রইল। তার মনে হোল ঐ মামাবাবুটা কি অসভ্য। ভদ্দরলোকদের কাছে, বয়স্কদের কাছে এই রকম ব্যবহার সে যতবারই করেছে ততবারই সকলে 'বালকভাব' বলে ওকে আস্কারা দিয়েছে, এমন কি ভক্তিও করেছে, কিন্তু এ লোকটা কি? ঠিক তাঁদের অসভ্য বাড়ীওয়ালার মতো বোকা এবং বজ্জাত। খোকা যে কতো বড় মহাপুরুষ তা এরা বুঝতেই পারে না।

দূর হোক, গোল্লায় যাক, খোকা লাথি ছুঁড়ল।

ধুম্ করে লাথিখানা লাগল ড্রাইভারের পেছনের ব্যাক্ রেস্টে।

সশঙ্ক ড্রাইভার আর একবার পেছন ফিরে দেখল। ঘটকও দেখলেন। কেউ কিছুই বল্লেন না।

ঘটকের মনে হোল, ছোঁড়াটাকে ঘাড় ধরে রাস্তায় নামিয়ে দি। আবার ভাবলেন, ওর দোষ কি? এইভাবেই মানুষ হয়েছে। যদি একেবারে বর্ন্ ইডিয়ট না হয় তা হলে হয়ত সাইকিক ট্রিটমেন্ট করলে সেরে যেতেও পারে। চেষ্টা করে দেখতে হবে, একটা লোককে যদি জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তা ছাড়া ও ত পর নয়।

দূরত্বটা কোনমতে অতিক্রম করে গাড়ী এসে বাঁক নিল যোধপুর পার্কের বাড়ীর গেটে। ড্রাইভার হর্ন দিল। মালি বাগানে কাজ করছিল। গাড়ী দেখে দৌড়ে এসে লোহার গেটখানা খুলে দিল। গাড়ীটা গেট দিয়ে ঢুকে ফোয়ারা ঘুরে গাড়ী বারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল। অনু অবাক হয়ে দেখছিল। খোকা বল্ল, এ কোথায় এলি মা, হাবড়ার ইস্টিশান?

থামো। মা চাপা গলায় ছেলেকে থামাতে চাইলেন। ছেলে থামতে চায় না। মুখার্জীর জীবদ্দশায় ওরা একবার হাওড়া দিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল। সেদিনের সেই স্মৃতিতে খোকার ধারণা ওরা হাওড়াতেই এসেছে। কোথায় যাবি মা, তারকেশ্বরে?

না। তুমি চুপ কর।

ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলল। বাদল এগিয়ে এসে প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু মুখে কিছু না বলে হাত বাড়িয়ে অনুর হাত থেকে পোঁটলাটা নিয়ে নিল।

ঘটক ওপাশ দিয়ে নেমে বল্লেন, বাদল, বাক্সটাক্সগুলো নীচের ঐ ঘরে নিয়ে যা।

বাদল বুঝল আজ সকালে নীচের যে ঘরখানা সাহেব পরিষ্কার করিয়ে রেখেছেন সেই ঘরখানার কথাই বলছেন।

এস। ঘটক অনুকে ডাকলেন!

সাদা পাথরের তিনটে ধাপ উঠে ওরা সামনের হল ঘরে ঢুকলেন।

খোকা আঁৎকে চিৎকার করে উঠল, না আমি যাব না, ওটা কি ? আমায় খেয়ে ফেল্‌বে !

ঘরের মাঝখানে বৃহদাকার গোল টেবিলে মাউন্ট করা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মাথা। মাথার পেছনে বাঘের চকচকে চামড়াটা টেবিল ক্লথের মত পাতা, বাঘের মুখটা দরজার দিকেই ফেরানো। কাঁচের চোখ দুটো ইলেকট্রিকের আলোয় চকচক করছিল। বাঘের চারখানা পায়ের চামড়া টেবিলের ওপোর থেকে ঝুলে প্রায় মেঝে পর্যন্ত নেমেছে।

ল্যাজটা ঝুলছে পেছন দিকে।

ঘটক বল্লেন, ভয় নেই খোকা। তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও বাঘ জ্যান্ত নয়।

খোকা ভয়ে ভয়ে মায়ের হাত ধরে মায়ের গায়ে গা লাগিয়ে ঘরে ঢুকেই বল্ল, এ কি ? এই বিছানার ওপোর দিয়ে যাব ?

ঘরের মেঝেয় মোটা কার্পেট পাতা ছিল। ঘটক বল্লেন, এসো।

না, ধুলো পায়ে বিছানায় উঠলে মা রাগ করে, খোকা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বাদল এবং ড্রাইভার দু'জনে ওদের ভারী ট্রাঙ্কটা ধরাধরি করে এনে ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে ভেতরের খোলা দরজা দিয়ে ভেতর দিকে চলে গেল।

গাড়ী বারাণ্ডার তলায় মোটর বাইকের শব্দ হোল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘটক দেখলেন, ওঁর ছেলে এসেছে।

টেরিলিনের চোঙা প্যান্ট পরা সুব্রত ঘটক লঘুপদে ঘরে ঢুকেই ওদের দেখে সবিস্ময়ে বাবার দিকে চেয়েছিল।

ঘটক বল্লেন, গাড়ী তুললি নি ?

আর একবার বেরুব।

বলেই সে ততোধিক ক্ষিপ্রতায় ভেতরে চলে গেল। কোন প্রশ্নই করল না।

কোন মতে খোকাকে টান্তে টান্তে ঘটক যে ঘরখানা ওদের জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন সেই ঘরে ওদের নিয়ে গেলেন।

ঘরে ছিল একখানা খাট, একটা আলমারি, একটা টেবিল, খান দুই চেয়ার, সিলিং পাখা এবং দেওয়ালের গায়ে জামা কাপড় রাখার ব্র্যাকেট। বাদল বড় ট্রাঙ্কটা রেখে, আলো জ্বেলে, জানালা খুলে অন্য বাক্স, সেলাই কল এই সব আনতে গেছে।

অনুর দিকে লক্ষ্য করে ঘটক বল্লেন, জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে নাও। তারপর তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব।

ইতিমধ্যে বাদল বাক্সটা ও বৈজু সেলাই কলটা এনে ফেলল।

ঘটক বল্লেন, কলটা টেবিলের ওপোর রাখ্। বাক্সটা বড় বাক্সর পাশে। জেঠাইমাকে কলঘরটা দেখিয়ে দে বাদল, কি দরকার-টরকার হয় করে দে, আমি ওপোরে যাচ্ছি।

গট্গট্ করে ঘটক সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাদল হচ্ছে বড়লোকের বাড়ীর ওস্তাদ খানসামা। বহুদিনের পরিচিতের সুরে সে বল্ল, জেঠাইমা, স্নান করবেন কি? কলঘরে তেল-টেল দেব?

অনু বল্ল, না বাবা, চান আর করব না। শুধু হাত-পা ধোব।

তাহলে চলুন। কলঘরে সাবান তোয়ালে আছে। দাদাবাবু?

বাদল খোকার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল।

ও-ও হাত পা ধোবে। তুমি কলঘরটা দেখিয়ে দাও, আর কিছু করতে হবে না।

বাদলের সঙ্গে সঙ্গে অনু ও খোকা ঘর থেকে বেরুল। খোকা বল্ল, দরজা খোলা রইল যে। শিকলি দিবি না?

দরকার নেই। বাদলই জবাব দিল। অনু লজ্জা পেল।

হাতল চেপে বাথরুমের দরজা খুলে বাদল সুইচটা টিপতেই বাথ-রুমটা ঝলমল করে উঠল। সাদা সিমেন্টের মেঝে, দেওয়ালগুলো

মেঝে থেকে চার ফুট উঁচু পর্য্যন্ত মার্বেলাইট দিয়ে মোড়া, চকচকে সাদা বেসিন, বেসিনের ওপোর তরল সাবানের টিপ্টিং শিশি, তার ওপোর চকচকে বড় আরশি, তার ওপোর গিজার। মাথার ওপোর ছত্রিশ ইঞ্চি সাদা সিলিং ফ্যান, উঁচু জানলার তলায় প্ল্যাস্টিকের ঢাকনা দেওয়া সাদা কমোড, বেসিনের সামনাসামনি লম্বা বাথটব। যে দরজা দিয়ে ওরা বাথরুমে ঢুকেছিল সেই দরজার বাঁ দিকে বাথটবের মাথার দিকের দেওয়ালে আর একটি বন্ধ দরজা। ওরা জানত না, সেই বন্ধ দরজাটা খুললে পাশে আর একখানা ভাল ঘর আছে যেখানা ঘটক গেস্টদের জন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন। কোন গেস্ট এলে এদিকের দরজাটা বন্ধ করে বাথরুমটা সেই ঘরের সঙ্গে এ্যাটাচড্ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অবাক হয়ে অনু ঘরের সাজসজ্জা দেখছিল। মায়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে খোকা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওদের দৌড় যে কতদূর তা বাদল ভালভাবেই বুঝে নিয়েছিল। বেসিনের কলটা খুলে সে বল্ল, এইটায় সাবান আছে। এটাকে এইভাবে ওল্টালেই হাতে গোলা সাবান পড়বে। ঐ তোয়ালেটা নেবেন। কাপড়-চোপড় কাচতে হোলে ঐ বাল্তিটা রয়েছে। ওতে ডুবিয়ে দেবেন। ঝি কেচে শুকুতে দেবে।

বাদল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনুর তখনও বাথরুমটা খুঁটিয়ে দেখা শেষ হয় নি। ভাল করে দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়েছিল। সেই বিভু আজ এই বিভু হয়েছে। সবই বরাত।

সাবানের শিশিতে অনু হাতও দিল না। বেসিনের কলে চেপে চেপে হাত ধুয়ে বল্ল, খোকা, হাত ধুয়ে নাও বাবা।

হাত না ধুয়ে খোকা একবার কলটা বন্ধ করে আবার খোলে। অনু বল্ল, ছিঃ, ওরকম কোরো না।

অনু এগিয়ে গিয়ে নীচের কলটা খুলে পা ধুয়ে নিল। তোয়ালেতে

হাত না দিয়ে নিজের আঁচলে হাত মুছল। কাপড় ছাড়া হোল না, কারণ কাপড় এ ঘরে আনা হয় নি।

মায়ের দেখাদেখি খোকা সেই কলের কাছে গিয়ে ওপোরের কলটা ঘুরিয়ে দিল। হঠাৎ শাওয়ার দিয়ে হুড়হুড় করে জল পড়ে খোকার মাথা ও গা ভিজে গেল। খোকা হাঁউ মাউ করে লাফিয়ে উঠল। অনু চট্ করে কলটা বন্ধ করে দিল। আধুনিক বাথরুমের যাবতীয় আয়োজনের মধ্যে শাওয়ার, প্ল্যাস্টিকের বালতি এ দুটো জিনিস অনুর দেখা ছিল তার মনিব বাড়ীতে,—যেখানে সে রান্না করত। খোকার কাছে এ দুটোও ছিল অজানা।

ভিজে যাবার জন্য খোকাকে জামাটা খুলতে হোল। কাপড়টা অল্প ভিজেছিল। অনু হাত দিয়ে খোকার কাপড় থেকে জল ঝেড়ে কোনমতে ভদ্রস্থ করল।

কলঘর থেকে বাইরে আসার পর বাদল বল্ল, চা জলখাবার খাবেন ত? খাবার ঘরে আসুন।

অনু বল্ল, আমি এখন কিছু খাব না বাবা।

খোকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমি খাব, আমি খাব মা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রাগত স্বরে অনু বল্ল, আচ্ছা, আচ্ছা। তুই থাম্ ত।

ছেলে বল্ল, কেনে? থামব কেনে? আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি?

বাদল মুখ টিপে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন কোন কিছুই শুনতে পায় নি।

বাদলের পেছন পেছন ওরা গেল খাবার ঘরে। লাইট্ বাফ্ প্ল্যাস্টিক পেন্টের দেওয়াল। মাঝখানে ল্যামিনাইট-করা টেবিল। টেবিলের দু'পাশে চারখানা চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে টাটকা ফুল। ফুলদানির দু'পাশের স্ট্যাণ্ডে নুনের শিশি, মরিচ-গুঁড়োর শিশি, মাস্টার্ড। মাথার ওপোর সিলিং পাখাটা এক পয়েন্টে

ঘুরছিল। দেওয়ালের দু'ধারের দুই টিউব লাইটের আলোয় সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করছিল। অমু দেখল, এ ঘরেও দুটি সাদা রঙের প্রমাণ সাইজের লোহার আলমারি, এক রকমের গড়ন, ও পাশের দরজার দু'পাশে দু'টিকে রাখা ছিল।

অমু ও খোকা ঘরে ঢুকে ইতস্তত করছে এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিঃ ঘটক। তখন ওঁর বাড়ীতে পরার সেই পোষাক,—নাইলনের গেঞ্জি, ধোপদস্ত পাজামা, রবারের শ্লীপার। সদ্য চান করে কাঁচা-পাকা চুল ব্যাকব্রাস করে ডাইনিং হলে এসেছেন। বল্লেন, নাও, বসে পড়। সামান্য কিছু খেয়ে নাও, রাত্তিরের খাবার ন'টার মধ্যেই হয়ে যাবে।

টেবিলের ভেতর থেকে একখানা চেয়ার টেনে বার করে নিজে বসে বল্লেন, বসো।

খোকা ওঁর দেখাদেখি একখানা চেয়ার টেনে বসতে গিয়েও না বসে চেয়ারটার একটা দিক একটু উঁচু করে ঠুক্‌ল। চেয়ারের পায়ার তলায় রবারের চাকতি থাকায় কোন শব্দই হোল না। ঘটক বল্লেন, কি হোল খোকা, বোসো।

খোকা বল্ল, কি মজা! এত ঠুকলুম, কোন শব্দই নেই। শব্দ হয় না কেনে মামাবাবু?

ঠাকুর ট্রেতে চায়ের কাপ, কেটলি, দুধের জগ্‌, চিনির কিউব, বিস্কুট এবং জেলি লাগানো স্লাইস রুটির দুটো প্লেট এই সমস্ত এনে হাজির করল। তার সামনে খোকার কথায় ঘটকের চোখমুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মুখে বল্লেন, বোসো। ঐ একটি আদেশেই ঘটকের ক্রোধ ফেটে পড়ছিল।

খোকা বসল এবং অমু দাঁড়িয়েই রইল।

ঘটক নিজেই চা তৈরী সুরু করলেন।

টেবিলে খাওয়াটা অমুর জানা ছিল। ওর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের মনিব-বাড়ীতেও টেবিল ছিল, তবে সে টেবিল নামেই টেবিল।

এখানকার সঙ্গে সেখানকার তুলনাই হয় না। তা হলেও অনু জানত, তারা টেবিলে ভাত, মাছ, মাংস সমস্তই খেত। এই টেবিলেও হয়ত সমস্তই খাওয়া হয়। ভয়ে ভয়ে সমীহ করে অনু বিভূতিকে বল্ল, এই টেবিলে আমার বসা কি চলবে? এটায় মাছ মাংসের ছোঁয়াচ আছে ত?

বিভূতির গাড়ীতে ওঠার পর থেকেই অনু যেন বিভূকে সমীহ না করে পারছে না। এ বাড়ীতে আসার পর সেই সমীহ ভাবটা আরও অনেক বেড়েছে।

হ্যাঁ, তা ত আছে! অপরাধীর মনোভাবে ঘটক বল্লেন, তোমার চলবে না। তুমি, বলেই ডাক দিলেন, ঠাকুর।

ঠাকুর ওদিককার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

ঘটক বল্লেন, তোমার জেঠাইমাকে ফল আর সন্দেশ বার করে দাও। মেঝেটা মুছে মেঝেয় আসন পেতে দিও।

গাড়ীতে আসার সময় এই 'জেঠাইমা' সম্পর্কটা অনেক ভেবেই তিনি স্থির করেছিলেন।

ঠাকুর নীরবে একখানা ফরসা ন্যাতা এনে মেঝে মুছে কার্পেটের আসন পেতে পাথরের থালা ও পাথরের গেলাস এনে ঐ ঘরের মধ্যে যে দুটো সাদা আলমারি ছিল সেই দুটোর একটার দরজা খুলে সেখান থেকে কলা, আপেল, আঙ্গুর ও সন্দেশ বার করে পাথরের প্লেটে সাজিয়ে সেই আলমারির দরজার সঙ্গে আটকানো শেল্‌ফ্‌ থেকে বোতল নিয়ে সেই বোতল থেকে পাথরের গ্লাসে জল ঢেলে দিল।

ঘটক বল্লেন, ঐ ফ্রিজ আমার পরম পবিত্র। ওখানে মাছ মাংসের ছোঁয়াচ নেই, মায়ের দুধ ফল সবই ওটায় থাকে।

অনু বল্ল, ঠাকুর, অতগুলো ফল দিও না। একটা কলা রেখে বাকী সব তুলে নাও।

আমি খাব মা, আমি খাব, ভরা-মুখে খোকা কোন রকমে

বলেছিল। ঘটক আড়-চোখে দেখলেন, ঠাকুর যখন অনুর খাবারের বন্দোবস্ত করছিল ততক্ষণে জেলি দেওয়া রুটির সবগুলোই খোকা শেষ করে একেবারে তিনখানা বিস্কুট এক সঙ্গে হাতে নিয়ে কামড় দেবার উপক্রম করছে।

খোকার কথায় কেউ কোন উত্তর দিল না, অনুকে দেওয়া ফলের কোন অংশ ঠাকুর তুলেও নিল না।

বাইরে মোটর বাইকের শব্দ হোল। ঘটক মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সুব্রত আবার বেরুল। ভাগ্‌গিস এদিকে আসে নি!

ঘটক চায়ের বাটিটা মুখে তুলে এক চুমুক খেতে না খেতেই খোকা প্রচণ্ডভাবে বিসম খেল। তার মুখ থেকে চিবানো বিস্কুট, পাঁউরুটির টুকরো ছিট্‌কে বেরিয়ে গোটা টেবিল, ঘটকের জামা, হাত, চায়ের বাটি সমস্ত নষ্ট হোল। অনু তাড়াতাড়ি উঠেই এক হাত খোকার মাথায় অন্য হাতে তার মুখ ঢাকা দিয়ে কোনমতে সামলাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু নোংরা যা হবার তা হয়েই গেছে। এ অবস্থায় মুখে অন্য সমস্ত বাঙ্গালী মায়ের মত অনু অস্পষ্ট স্বরে ষাট্‌ ষাট্‌ বলেছিল বটে, কিন্তু মনে মনে বিভুর কাছে ঘাট মান্‌ছিল—সেই বিভু, যে একতলার ঘরে আট টাকা ভাড়া দিয়ে থাকত, নিজের হাতে বাসন মাজতো এবং অনুর দেওয়া মাছের তরকারি, আমের আচার, এক খিলি পান পুজ্যি করে খেয়ে বর্তে যেত।

বিভূতি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ঠাকুর বল্ল, আর একবার চায়ের জল চড়াই।

ঠাণ্ডা গলায় বিভু বল্ল, না। দরকার নেই। রাত্রের খাবার তাড়াতাড়ি দিও। বিভূতি ধীর-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যে ন্যাতাখানায় ঠাকুর অনুর জন্য মেঝেটা মুছেছিল সেই ন্যাতাটা নিয়ে অনু টেবিল মুছতে গিয়ে দেখল মাস্টার্ডের শিশির গায়েও নোংরা লেগেছে। কি করবে ভাববার আগেই বাদল এসে ঘরে ঢুকল। বল্ল, সরুন জেঠাই মা, ও সব ব্যবস্থা আমি করছি।

অনুর হাত থেকে বাদল ন্যাতাখানা টেনে নিল। অসহায় অনু পেছন ফিরে দেখল যার জন্য এই অঘটন সেই খোকা অম্লান বদনে অনুর জন্য পাতা আসনে উবু হয়ে বসে দুটো সন্দেশ ইতিমধ্যেই শেষ করে আঙ্গুর চিবুতে সুরু করেছে। ওর দিকে মায়ের নজর পড়েছে বুঝে খোকা বল্ল, এগুলো মিষ্টি নয় মা, টক্ টক্ লাগছে।

এবার কথা বল্ল বাদল। ফল, মিষ্টি সমস্তই বাদল কেনে। আঙ্গুর টক শুনে তার গায়ে লেগেছে। বল্ল, আগে সন্দেশ খেয়ে সেই মুখে আঙ্গুর খাচ্ছেন তাই টক্ লাগছে।

লজ্জায় ক্ষোভে অনুও পাগল হয়ে উঠেছে। বিভুর চাকর পর্যন্ত যা জানে তার ছেলে তাও জানে না। কড়া গলায় অনু বল্ল, চল খোকা, ও ঘরে চল।

কেন ? এগুলো খাব না ? বাকী আঙ্গুরগুলো নিয়ে এক সঙ্গে মুখে পুরল।

আর খেতে হবে না। বেশ হয়েছে, চলো ও ঘরে।

খোকা কিন্তু ওঠবার পাত্র নয়। গোটা আপেলটা তুলে সে কামড় দিল এবং মায়ের কড়া তাগিদে বাঁ হাতে আধ-খাওয়া আপেল ও ডান হাতে কলাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

নিজের ঘরে গিয়ে নোংরা-লাগা গেঞ্জিটা খুলে আর একটা গেঞ্জি হাতে নিয়ে ঘটক ঢুকলেন তাঁর এ্যাটাচড্ বাথে। ছেলেটা যে কাণ্ড করেছে !

ঘরে ফিরে ঘটকের মনটা খুবই খারাপ হোল। ওদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের দিন তেল কেনার পয়সায় টান পড়েছিল। ওদের বাড়ীতে এনেই প্রথম খাওয়া পণ্ড হোল। এসব কিসের লক্ষণ ? সেই অলক্ষ্য বিধাতা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন !

সনাতন হিন্দু ধর্মের ওপোর ঘটকের কোন আস্থা নেই। আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতই ঘটক ধর্মের সঙ্গে প্রচলিত লোকাচারকে মিলিয়ে মিশিয়ে যাবতীয় গ্রাম্য সংস্কার যা তিনি বাবা মা আত্মীয়

স্বজনের মধ্যে দেখেছেন সেগুলোকে একত্র করে সব কিছুর সমাহারকেই তিনি হিন্দুত্ব বলে কল্পনা করে গোটা হিন্দুধর্মের ওপোর বীতস্পৃহ হয়ে নিজের পৈতেটা পর্য্যন্ত ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু এ সব করলেও ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-সন্তানের স্থূল বিশ্বাস ও সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে পরমারাধ্যা দেবী ধনদাত্রী সতত বিরাজিতা। সেই মা-লক্ষ্মীর নির্দেশ অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন বলেই তিনি মনে করেন। হাওার কথা অনুযায়ী তিনি মনে করেন সর্ব্বশক্তিমানের সঙ্গে ইনার ভয়েসের সর্ব্বদাই আদান প্রদান হয়। ইনার ভয়েস পার্থিব যুক্তি তর্কের বহু উর্দ্ধে। ক্ষমতার অতিরিক্ত বড় বড় দায়িত্ব নেবার সময় হাওা সেই ইনার ভয়েসের যুক্তিহীন খেয়ালকে অল্‌মাইটির নির্দেশ ভেবেই অনুসরণ করতেন এবং অতি বড় সঙ্কটের সময়ও প্রাণপণে হাল ধরে আপাতভাবে অনেক কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হয়ে তৃপ্তিসুখে বলতেন, ঘটক বাবু, ইনার ভয়েস কখনও মিথ্যা বলে না। আপনারা সকলেই ভয় পেয়েছিলেন, আমিও ভয় পেয়েছিলুম, কিন্তু দেখলেন ত, কত সুন্দরভাবে শেষ রক্ষা হোল।

ঘটকের মনে হোল সেই ইনার ভয়েস ঘটকের অজান্তে ঘটকের মুখ দিয়ে অনু ও খোকার আজীবনের ভার নিয়ে বসে আছে। কিন্তু প্রথম থেকে এই সব অলক্ষণগুলো কিসের সূচনা করছে ! শেষ রক্ষা হবে ত!

যাক, ছেলেটার ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়ীতে ওঠার পর থেকে খাবার টেবিলে পর্যন্ত যে সমস্ত অনাসৃষ্টি কাণ্ড সে আজ করেছে সেগুলোর একমাত্র কারণ তার এতাবৎ কালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ঘটক ভাবলেন, শুধু অবস্থাই নয়, তার বোকামিও আছে, ইডিওসিটি। এজন্য কোন সাইকো এ্যানালিস্টকে কন্‌সাল্ট করা দরকার। কাল মঙ্গলবার সময় পাব না। বুধবার—না বুধবারও হবে না, বেস্পতিবারে বন্ধু ডাক্তারকে ফোন করে সাইকো এ্যানালিস্টের সন্ধান নিয়ে একটা কিছু করতে হবে। ছেলেটা আর যাই হোক, পর ত নয় !

বাবু, বাদল ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি ?

ঠাকুরমা ডাকছেন।

আত্মবিস্মৃত ঘটক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ যাচ্ছি। তুই এক কাজ কর, জেঠাইমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে আয়। আর দেখিস ঐ লোকটাকে যেন আনিস্ নি। শুধু ঐ ভদ্রমহিলাই আসবেন, বুঝলি ?

সবার অলক্ষ্যে মুখ টিপে হেসে বাদল চলে গেল।

ঘটক গিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলেন।

মা বল্লেন, হ্যাঁরে বিভু, সেই ত কতক্ষণ আগে এসেছিস, তা এখনও কি নাওয়া, জল খাওয়া হোল না ?

এই ত হোল মা।

জল খাওয়ার কথায় ঘটকের ভয় হোল, কি জানি, মায়ের কানে চা-বিভ্রাটের কাহিনী কি পৌঁচেছে, না কি ?

মা বল্লেন, রোজই ত চা খেয়ে আমার কাছে আসিস, তা আজ যখন শুনলুম চা খেয়ে নিজের ঘরে বসে আছিস তখন ভয় হোল, কি জানি শরীর-টরীর খারাপ হোল, না কি হোল—

ঘটক সুযোগ পেয়ে গেলেন। বল্লেন, না, শরীর খারাপ নয়, তবে অফিসের ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত ছিলুম।

কেন ? আপিসে আবার কি হোল, বৃদ্ধা চিন্তিতা হলেন।

এমন কিছু নয়। ও ত আমার লেগেই আছে। সে ব্যাপার তুমি আর কি বুঝবে ? তবে হ্যাঁ, সেই ভদ্রমহিলা আজ এসেছে। তুমি বুঝি এখনও দেখনি তাকে ?

না, দেখিনি, তবে শুনলুম। তার ছেলেও ত এসেছে। তুমিই ত গাড়ী করে এনেছ। বাক্স, প্যাঁটরা, সেলাই কল এই সব নিয়ে—

কার কাছে শুনলে ? হাসিমুখে প্রশ্নটা করলেও ঘটক মনে মনে প্রমাদ গণলেন। এরই মধ্যে সব খবর পৌঁছে গেছে ! মা কি সবটাই শুনেছে না কি ?

বাদল বলছিল। চারুও তাদের দেখেছে, মা জবাব দিলেন।

ওরা কি বল্লে? মাতৃভয়ে ভীত বিভূতি সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন।

বল্লে? ওরা বল্লে, মা ও ছেলে দুটোই আকাট পাড়াগেঁয়ে। ছেলেটা বোধ হয় খেতেও পায় নি। এসেই নাকি হাঁউ হাঁউ করে খেতে বসেছে।

খেতে পেলে তোমার বাড়ীতে কাজ করতে আসবে কেন মা? মুখুজ্জে বামুন, ভদ্র ঘর, নিতান্ত গরীব বলেই-না পরের বাড়ী খাটতে আসছে। ঘটক ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন।

আমিও ত তাই ভাবছি। ওরা বোধ হয় ভালই হবে। সহুরে ঝি চাকরদের মত চালবাজ হয় ত হবে না। তা বিভু, ওর হাতে আমি ভাত খেতে পারব ত?

নিশ্চয়। সেই জন্যই ত ওকে খুঁজে পেতে নিয়ে এলুম। অচেনা লোকের রান্না ত তোমার চলবে না।

দরজার দিকে চেয়ে ঘটক বল্লেন, এই যে, এই ত এসে গেছে। ঘরে এসো মনোরমা। এই আমার মা। তোমাকে এই মায়ের ভার পুরোপুরি নিতে হবে।

অনুপমার মনটা হাহাকার করে উঠল। সেদিনের সেই বিভুর মায়ের কাছে আজ সে নাম ভাঁড়িয়ে ঝি খাটতে আসছে! হায় রে, ঐ পাগল ছেলেটা না থাকলে সে কবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে যাবতীয় অভাব ও অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত।

মনের দুঃখ মনে চেপে অনু ঘরে ঢুকে শয্যাশায়িনীকে হেঁট হয়ে প্রণাম করল। মা বল্লেন, কি নাম তোমার, দেশ কোথায়?

ধীরকণ্ঠে অনু বল্ল, আমার নাম মনোরমা, বাড়ী তারকেশ্বরে।

কে আছে?

একটি ছেলে।

আর কেউ নেই?

আছে সবই, দেওর, ভাশুর-পো, ননদ।

তোমায় দেখে না?

ম্লানমুখে অনু বল্ল, না।

দেশে জমি জায়গা নেই?

ছিল। এখন কিছু নেই।

কেন?

জ্ঞাতিরা সব ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নিয়েছে। আমার কে আছে বলুন যে দেখবে?

তোমার ছেলে?

সে মানুষ নয় মা।

কেন, নেশা ভাঙ্ করে?

ব্যস্ত হয়ে অনু বল্ল, না না, সে সব কিছু নয়। রাতদিন ঠাকুর ঠাকুর করে আর চুপচাপ থাকে।

ঠাকুর-ঠাকুর? বৃদ্ধা কৌতূহলী হলেন, বয়স কত?

ত্রিশ হবে।

ওমা, এই বয়সে এত ঠাকুর ঠাকুর? ভাল ত! ছেলের বিয়ে দাও নি?

হুঁঃ, বিয়ে! অনু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজেরাই খেতে পাই না, আবার বিয়ে!

উচক্কা বয়স, বিয়ে দাও নি, সেই জন্যই ঠাকুর ঠাকুর করে।

না মা, আজ যে ঠাকুর ঠাকুর করছে তা নয়। এ ওর জ্ঞান হয়ে অব্দি।

তাই নাকি? তা ছেলেটি কই?

নীচে রয়েছে মা।

তাকে ডাক না, দেখি। আমার ত ক্ষমতা নেই যে নীচে যাব—

মায়ের এই প্রস্তাবে বাধা দিলেন ঘটক। বল্লেন, ছেলেকে পরে দেখো-অখন মা, তোমার কাজকম্ম কি দরকার সেগুলো আগে ঠিক কর।

কাজ? কাজ আর কি? তুমি ত মুখুজ্জেদের বো, আমারই মত বিধবা। এই ভারী অসুখে পড়ার আগে পর্যন্ত আমি কারুর ছোঁয়া খাই নি, কিন্তু এখন ত আর নিজে রান্না করতে পারব না, তাই বিভু তোমার খোঁজ পেয়ে তোমাকে এনেছে। তুমি এই ওপোরে আমার জন্য ঝোল ভাত রাঁধবে, তুমিও খাবে, আমিও খাব। নীচে খাওয়া তোমারও ত হবে না, সব মাছ মাংস পিঁয়াজের ছোঁয়ালেপা একাকার ব্যাপার। তা তুমি আমার রান্না করবে, ওষুদপত্র ঘড়ি ধরে দেবে, একটু মালিশ-টালিশ করতে হতে পারে, এই সব কাজ। কাপড় কাচা, বাসন মাজা এ সব কিছু করতে হবে না। এ জন্য আছে ঐ চারু। তা ও মেয়েটিও ভাল, কথা-টথা বেশ শোনে। তুমিও মন টিকিয়ে থাকো আমার কাছে। যতদিন আমার কম্মভোগ আছে ততদিন ত থাকতেই হবে, না হলে এখন যেতে পারলেই ভালো।

ম্লান অথচ প্রচ্ছন্ন গর্বের হাসি হেসে বৃদ্ধা বিভূতির দিকে ইঙ্গিত করে বল্লেন, এরা কি আমায় যেতে দেবে? আমি ত চলেই যেতুম। ডাক্তারে ওষুদে ছয়লাপ করে, টানা মটোরে দেশ থেকে কলকাতায় এনে, চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার দেখিয়ে কত যে ফুঁড়েছে তার ঠিক নেই। দুটো নড়া আর মাজাটা আমার এখনও আড়ষ্ট ব্যথা। তারপর ছিল নার্স, তারও এক গাদা খরচ। এই এখন যা দেখছ, এখন ত অনেক ভালো। সেই জন্যই নার্সকে ছাড়িয়ে তোমাকে আনল, তুমি আমার মেয়ের মতো থাকবে, আমাকে দেখাশুনা করবে, এই আর কি? তোমাকে আর কি বোঝাব মা, দেখে শুনে বাড়ীর লোকের মতো সব দিক সামলে চলবে। আমার বাড়ীতে ডাগর মেয়ে ত আর কেউ নেই!

নীরবে ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধার কথায় অনু সায় দিল।

চারু-ঝি ফিডিং কাপে কি যেন নিয়ে এল। বৃদ্ধা মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন, বাবা রে বাবা, এই ত খেলুম, এখনই আবার কি আনছিস্?

চারু বল্ল, খেলেন ত ওষুদ। ওষুদ খাওয়ার পনর মিনিট পরেই হরলিক দেবার কথা যে।

ও, তাই বুঝি এনেছিস্? তা দে। এনেছিস যখন, তখন খেয়েই নি।

ঘাড় কাৎ করে বৃদ্ধা হরলিক্স পান করলেন।

খালি ফিডিং কাপ নিয়ে চারু চলে গেল।

অনু খাটের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। খাটের পাশের চেয়ারে বসে ছিলেন ঘটক। অনুর মনটা হাহাকার করে উঠল। সে দাঁড়িয়ে, বিভু বোসে। রামকান্ত বসু স্ট্রীটে এমন দিন ছিল যখন—থাক্, সে সব কথা ভেবে আর কি হবে?

নিজের মনকে নিজেই প্রবোধ দিয়ে একালের বামুন দি, ছদ্মনামের মনোরমা নিজের চেষ্টায় পরিস্থিতি হাল্কা করার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল, আপনার কি অসুখ মা?

ওর প্রশ্নে ঘটক এবং মা দু'জনেরই মনে হোল, অনু বোধ হয় ভাবছে কোন ছোঁয়াচে খারাপ অসুখ। ঘটক তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, অসুখ কিছু খারাপ নয় মনোরমা, গ্যাস্ট্রিক আল্সার। অর্থাৎ অম্বলের অসুখ। তার ওপোর লো প্রেসার, বাতের ভাবও আছে।

মা বল্লেন, অসুখ আর কি বলি বল! বুড়ো বয়সে একটা কিছু উপলক্ষি করে যেতে ত হবে! এ সেই যাবার অসুখ। ওরা ছাড়বে না, তাই পড়ে আছি। কত যে ফুঁড়ছে আর কত যে ওষুধ দিচ্ছে—

কেন মা? ফোঁড়াফুঁড়ি ত বন্ধ হয়ে গেছে, ঘটক অনুযোগ করল।

সে ডাক্তারের দয়া, মা উত্তর দিলেন, আবার ফুঁড়তে আরম্ভ করলেই হোল!

কথা ঘোরাবার জন্য ঘটক অনুকে বল্লেন, মায়ের যা কিছু হয় এই পাশের ঘরে। ওখানেই হিটারে মায়ের ভাত রান্না করবে। বার্লি,

হরলিক্সের জল সবই ওখানে করবে। বোধ হয় দু'একদিনের মধ্যেই ডাক্তার মাকে ভাত দেবে। পুরানো সরু চাল এনে রেখেছি, প্রেসার কুকারে একেবারে গলিয়ে ফ্যান্ করে দেবে। প্রেসার কুকার ব্যবহার করতে জানো ?

অনু ঘাড় নেড়ে বল্ল, জানি।

তার পুরানো মনিব বাড়ীতে প্রেসার কুকারে মাংস রান্না হোত।

মা বল্লেন, কি আর বলব মা! কালে কালে কতই সব হচ্চে! আমাদের আমলে পেটের গোলমাল হলে আমরা ঘুঁটের জ্বাল দিয়ে পোরে ভাত রান্না করতুম। কাঁচকলা-ভাতে, পটল-ভাতে, উচ্ছে-ভাতে এই সব দিয়ে পোরের ভাত, তেল ঝাল কিছু না দিয়ে পাৎলা ঝোল আর ঘোল। নুন পাতিলেবু দিয়ে সেই পথ্যি খাবে মাত্র এক মুঠো। কবরেজ কাকা বলত, যেন সিকি-পেটা খাওয়া হয়, তার বেশী নয়। পেটের তিন ভাগ খালি থাকা চাই। আর বিকালে নুন লেবু দিয়ে বার্লির জল। তাতে দুধের নাম গন্ধ থাকবে না। বার্লি, ঘোল, ছানার জল আর পোরের ভাত এই ছিল আমাদের সে আমলের রুগীর খোরাক। তখন কোথায় ছিল হর্লিক আর কোথায় ছিল কমলা লেবুর রস! ও সব আমরা জানতুমই না।

অনু সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা ঘটকের মনেও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে, কিন্তু মাইনে-করা রাঁধুনীকে প্রথম দিনেই মায়ের সামনে বাবুর পাশে চেয়ারে বসতে বলার সাহস বিভূতির নেই। মায়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতি বল্ল, তোমরা তা হলে কথাবার্তা বলো মা, আমি উঠি। অফিসের কাগজপত্র অনেক কিছুই দেখতে হবে।

আচ্ছা বাবা, এস এখন। তা আবার কি এই রাত্তিরে বেরুতে হবে ?

না মা, আজ আর বেরুব না। ঘরে বসেই কাজ করব। ঘটক মায়ের কথার উত্তর দিয়ে অনুকে বল্লেন, তুমি এই চেয়ারটায় বসে মায়ের সঙ্গে কথা বল, আমি উঠলুম।

ঘটক বেরিয়ে গেলেন। মা বল্লেন, বোসো মা, বোসো। দাঁড়িয়ে কেন?

ঘটক চলে যেতে অনু যেন কেমন স্বস্তিবোধ করল। তার মনে হোল, ভগবান তাকে এই অবস্থায় ফেলেছেন ত আজ নয়, অনেক দিন। দু'টো মনিব-বাড়ীতে রান্নার কাজও সে করেছে। খাটতে হয়েছে প্রচুর, এখানেও খাটতে হবে, না হলে দু'জনের ভার এরা নেবে কেন? যুক্তি দিয়ে ভেবেছিল, বিভু আমার ভার নিল, ভালই হোল, বেঁচে গেলুম, অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পেলুম, কাল কি হবে, রোগে পড়লে কি করব, ঐ ছেলে কি শেষ পর্যন্ত পথের ভিখারী হবে এই সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে প্রথম যেদিন ঘটকের সঙ্গে অনুপমার দেখা হয়েছিল সেই রাত্রে অনু প্রাণভরে স্বস্তি লাভ করেছিল। এও ভেবেছিল যে ঐ পাগল ছেলেটা যার জিনিস তার হাতে ওটাকে তুলে দিয়ে এখন মরলেও কোন দুঃখু নেই; কিন্তু এখানে আসার পর থেকেই ওর সেই মানসিক স্বস্তি যেন কেমন অস্বস্তিতে পরিণত হচ্চে। শ্যাম-পুকুর স্ট্রীটের বাড়ী থেকে মোটরে চড়বার সময় ভেবেছিল বোধ হয় ভাড়া গাড়ী, ট্যাক্সি। কিন্তু কোন মিটার নেই দেখে ভেবেছিল হয়ত ওখানা বিভুর আপিসের গাড়ী কিম্বা কারুর কাছ থেকে চেয়ে আনা গাড়ী। পরে বাড়ী ও বাড়ীর সাজসজ্জা দেখে প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা চাপা ঈর্ষা ওকে পেয়ে বসেছিল। সেই বিভু আজ এই হয়েছে! এ কি আর আমায় আমল দেবে? এখন এ আমায় ঝি রাঁধুনী ভেবে নেহাতই অবজ্ঞা করবে। একথাও মনে হয়েছিল যে এমনটাই হবে যদি আগে বুঝতে পারতুম তা হলে সে আমলে ওকে আরও একটু বেশী যত্ন করতুম। যেদিন ওর বাবা ওকে লাঞ্ছনার একশেষ করে রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাড়ী থেকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন অনুর মনে দুঃখ হয়ত সামান্যমাত্রই হয়েছিল কিন্তু নিজের সম্বন্ধে প্রবল ভয় ও আশঙ্কা এতই হয়েছিল যে শেষ দেখাটা পর্যন্ত ওপোরের জানলা থেকেও দেখতে পারে নি। ওর স্বামী যে

কিভাবে ওর সঙ্গে ব্যবহার করবে সেই চিন্তাটাই ওকে বিপর্যস্ত করেছিল। ওর স্বামীকে ও এমনও বলেছিল যে আট টাকা দামের ভাড়াটের এত বড় আস্পদ্দা! এমনভাবে অপমান করে চলে যাচ্ছে আর তুমি ওদের ছেড়ে দিচ্ছ! থানা পুলিশ করে মানহানির দাবী দিয়ে বাপ বেটা ছুটোকেই জেলে পোরো। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, জব্দ হয়ে যাক। কিন্তু সেই বৃদ্ধ সেদিন গম্ভীর ও নিরুত্তর ছিলেন। শেষে বলেছিলেন, আপদ বিদেয় হচ্চে, হোক। ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। কিন্তু তার পরেও স্বামী বেশ কয়েকদিন বোবার মত কাটিয়েছিলেন। তখন অনুই চালাকি করে বিনিয়ে বিনিয়ে গল্প তৈরী করেছে। বলেছে, দেখ, আজ ছুপুরে একা একা ঘরে শুয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্পষ্ট মনে হোল, ঠাকুর যেন আমার কাছে এসেছেন—

ঠাকুর? সন্দিগ্ধ স্বামী ওর মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

হ্যাঁ গো, পরমহংসদেব। ঐ কোট জামা-গায়ে ঠাকুরের যে ছবি রয়েছে, ঠিক ঐ চেহারা। তিনি এসে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, বোকা মেয়ে, ছুঃখু করছিস কেনে? চোর দেখলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে কিন্তু কোনো লোককে দেখে কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেই কি সে চোর হয়ে যায়?

বল কি গো, এই কথা বল্লেন? চোখ জোড়া বড় করে বিস্ময়ে বিহ্বল স্বামী অনুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সত্যি বলছ? সত্যি এই কথা তুমি নিজের কানে শুনেছ?

অতিরিক্ত আগ্রহে স্বামীর হাতের ওপোর হাত দিয়ে অনু সেদিন বলেছিল, মাইরি বলছি, তোমার গায়ে হাত দিয়ে মিথ্যে বলব না। কথাগুলো শোনার পর চট্ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথার দিকে চেয়ে দেখি তখনও ঠাকুর ঠিক ঐখানটায় হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তারপর—তারপর? স্বামী চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন দেওয়ালে ঝোলান পরমহংসের ছবির দিকে।

অনু বলেছিল, কি বলব, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল কিন্তু ঠাকুর তেমনি হাসতে লাগলেন। শেষে বলেছিলুম, ঠাকুর, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, আমার এই অপমান অপযশ কেন ঠাকুর?

তিনি বল্লেন, মুখ্‌খু মেয়ে, তাই হয় রে, তাই হয়! লোকেরা বড়োরই নিন্দে করে, ঝি চাকর, ভিখারী নাগারীর নিন্দে কি আর কেউ করে? রাজার মাকে ডাইনী বলে নিন্দুকরা যে সুখ পায়, হরে চাঁড়ালের মাকে ডাইনী বলে কি আর সে সুখ পাওয়া যায়!

তুমি সামনা-সামনি এইভাবে কথা বলেছ? কি বলছ তুমি! এত কি পুণ্য তুমি করেছ যে এইভাবে তাঁর দর্শন পেলে?

কি জানি? লজ্জায় সোহাগে আবেশে নিজের অভিনয়-সাফল্যে বিজয়িনীর গৌরব লুকোবার অতিরিক্ত আগ্রহে সামনে বসে-থাকা স্বামীর কোলের ওপোর নিজের মুখ লুকিয়ে সেদিনের অনু ফুলে ফুলে কেঁদেছিল কিম্বা হেসেছিল সেটা অন্ধ স্বামী বুঝতেই পারেন নি। সাদরে অনুর পিঠে হাত বুলিয়ে ধরা-গলায় বলেছিলেন, তুমি ভাগ্যবতী! কেউ কেউ স্বপ্নদীক্ষা পায় বলে শুনেছি কিন্তু এইভাবে সামনা সামনি কথা বলা!

মনে ভাবছিলেন, কথাগুলো তাঁরই, ছোটবউ এ ভাষা পাবে কোথায়? কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বামী বলেছিলেন, আচ্ছা, তুমি কি তখন জেগে উঠে বিছানায় বসেছিলে?

কোলের মধ্যে মুখ-ঢোকানো অবস্থাতেই ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে সায় দিয়েছিল সেদিনের অনু। স্বামী অনেকক্ষণ সেই অবস্থাতেই নীরব থেকে শেষে বলেছিলেন, ছোট বউ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। করবে না?

অনু উঠে কাপড় দিয়ে চোখ মুছে অবাক হয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে বলেছিল, কেন গো? ও কথা বলছ কেন? ছিঃ, আমি তোমায় ক্ষমা করব কেন? তুমি স্বামী, দেবতা, তুমি ও রকম কথা বল্লে আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না।

স্বামী ওর হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে ধরা-গলায় বলেছিল, না

ছোট বউ, তুমি জান না। আমি যে কত বড় পাপিষ্ঠ তা আমি ছাড়া কেউই জানে না। আমি এই ক'দিন ধরে কি ভাবছিলুম জানো?

কি? ভয়ে ভয়ে অনু প্রশ্ন করেছিল।

নাঃ, সে কথা থাক। তারপর কি হোল বল।

না। আগে তোমায় বলতে হবে তুমি এই ক'দিন ধরে কি ভাবছ।

না না, সে কিছু নয়।

না, আমায় আগে বল, বৃদ্ধস্য তরুণী সেদিন জেদ ধরেছিল।

অনুর মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে স্বামী বলেছিলেন, কে কি ভেবেছে সে সব শুনে তোমার কি হবে! তা ছাড়া ও সব শুনলে তোমার মনে খুব দুঃখু হবে।

না, আমি শুনবই, অনু সুরেন বাবুকে ছাড়ে নি।

স্বামী ধীরে ধীরে বলেছিলেন, কি আর বলব বলো! পাঁচজনের পাঁচ রকম কথা শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অমন যে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র তিনিও পাঁচজনের কথায় সীতাকে সন্দেহ করেছিলেন, তা আমি ত কোন ছার এক সামান্য মানুষ! আমি ভেবেছিলুম এতখানি বদ্‌নামের পর তোমাকে নিয়ে আর ঘর করা যাবে না, তাই আজকের এই কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস, তড়িঘড়ি কিছু একটা করে বসি নি! যাঁর কথা রোজ ভাবি, যাঁর বই পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে, তাঁর কোন আভাসই আমি পাই না, আর তুমি তাঁর সঙ্গে এইভাবে সামনাসামনি জেগে উঠে বসে সজ্ঞানে দিনের বেলায় এত কথা বল্লে এবং শুনলে! তুমি যে কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ, তা তুমি নিজেই জানো না ছোট বউ!

স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে সেদিনের ছোট বউ বলেছিল, জানি গো জানি, আমি যে কত ভাগ্যবতী তা আমি সেদিন থেকেই জানি, যে দিন তোমার সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হয়েছিল। এমন দেবতার মতো স্বামী কি কেউ পায়? এই যে ঠাকুরের দেখা পেলুম, এ ত তোমারই পুণ্যের জোরে, না হলে আমার কি গুণ আছে যে আমি তাঁর দর্শন পাব।

যুবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করার চিন্তায় বৃদ্ধ স্বামী ক'দিন ধরেই মন-মরা হয়েছিলেন। সেদিনের সেই কাহিনীকে বিশ্বাস করে বৃদ্ধ হাতে স্বর্গ পেলেন। অনুও বুঝল, তার অভিনয় সাফল্যে একটা আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

এর পর মাঝে মাঝেই অনুকে সেই অভিনয় চালিয়ে যেতে হয়েছে। কথামৃতের তু'চারটে কথা অনু স্বামীর মুখ থেকে মাঝে মাঝেই শুনেছে অনেক দিন ধরে। এখন সেই শোনা কথায় আর ওর কুলিয়ে ওঠে না। তাই তুপুরে স্বামীর অনুপস্থিতির সময় রামকৃষ্ণ কথামৃতের এক একটা খণ্ড গোপনে নিয়ে লাগসই কতকগুলো বাণী মুখস্থ করে বইখানা যথাস্থানে আবার রেখে দিত। সময়মত তু'চারটে কথা তৈরীও করে নিত। সেই সব বুকনিগুলো নিজের ভাষায় স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে মোহান্ধ স্বামীকে ভক্ত্যন্ধ শিষ্যে পরিণত করেছিল। তারই শেষ ফল ফলেছিল স্বামীর স্বপ্ন দর্শনে। অনু জানে, অনুর তখন সাতমাস, স্বামীকে জানিয়েছিল তিনমাস বলে। বিভুদের চলে যাবার মাস চারেক পরের ঘটনা। স্বচ্ছল ঘরের মোটা-সোটা মহিলা সে, তার দেহ দেখে স্বামীর বোঝবার উপায় ছিল না, কিন্তু অনুর কথায় স্বামী হয়েছিলেন উল্লসিত। এতদিন পরে ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন।

কিন্তু ছেলে হবে, কি মেয়ে, অনু জানে না, তাই বুদ্ধি করে অনু বলেছিল, ওগো শুনছ, আজ ভোর রাত্তিরে কি যে হোল কিছুই বুঝতে পারছি না। এর মানে কি বলে দাও-না গো!

কি? কিসের মানে, স্বামী জিজ্ঞাসা করেন।

আদরে সোহাগে মন গলিয়ে অনু বলেছিল, আজ ভোর রাত্তিরে আমি ত ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ, দেখি, ওঁরা তু'জনে যেন এসেছেন—

কারা?

কারা আবার, ঐ ঠাকুর আর ঠাকরুণ, পরমহংস আর সারদা-মা।

তারপর? তারপর? স্বামী সাগ্রহে প্রশ্ন করেন।

অনু বলেছিল, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না। যেন ওদের আসন পেতে বসতে দিতে যাচ্ছি, ঠাকুর বল্লেন, আসন কেনে রে মা, আসনে বসতে আসি নি, আসন ত সবাই দেয়। আমরা তোর কোলে বসব।

তারপর, স্বামীর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

অনু বল্ল, ঠাকুরের কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলুম। এ আবার কি কথা! ঠাকুরই হোন্ কি যিনিই হোন্, একজন পুরুষ মানুষ, এ সব কি কথা—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুমি এখনও এই কথা ভাবতে পারো? ছিঃ। ঠাকুরের এত কৃপা, আর তাঁরই সম্বন্ধে—! অনুশোচনায় স্বামী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন।

সত্যি, আমার খুব অন্যায় হয়েছে, নয়? অনু তাড়াতাড়ি নিজের নাক ও কানে হাত দিয়ে যেন নাক-কান মলতে সুরু করেছিল। শেষে বল্ল, কি করব বলো, যা মনে হয়েছিল তাই এখন তোমায় বলছি। তবে ওঁদের কিছু বলিনি।

আরে পাগলী, ওঁরা অন্তর্যামি। মুখে না বল্লেই কি ওঁরা টের পান না? তোমার ওপোর ওঁদের এত দয়া আর তুমি ওঁদের এত ছোট মনে করো! ছিঃ, এ তুমি খুব অন্যায় করেছ।

স্বামী কিছুক্ষণ অধোরদনে থেকে উদ্দেশ্যে দুই-হাত জোড় করে তুলে প্রণাম জানিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তারপর কি হোল?

আঁচলে চোখ মুছে অনু বলেছিল, ওঁরা কিন্তু আমার ওপোর কোন রকম রাগ করলেন বলে মনে হোল না। ওঁরা দু'জনেই খুব হাসছিলেন।

তারপর?

তারপর ঠাকুর বল্লেন, বোকা মেয়ে, আজই কি কোলে বসব? আজ নয়, কিন্তু একদিন বসব। মা বল্লেন, তুমি না, আমি বসব। অনু-মা আমার, তোমার নয়।

বা রে! অদ্ভুত ত, স্বামী হাঁ করে অনুর দিকে চেয়েছিলেন।

অনু বল্ল, ঠাকুর মিটিমিটি হেসে বল্লেন, দেখা যাক, কার জোর

বেশী। দু'জনেই হাসছিলেন। তার পরই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এর কি মানে বল-না গো ?

মানে ? স্বামী চিন্তিত মুখে বলেছিলেন, কি জানি কি মানে ? দেবতাদের খেলা, আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝি বলো ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বামী বলেছিলেন, শেষ-রাত্রের স্বপ্ন সফল হয় বলেই শুনেছি। তা থাক, এ কথা আর কাউকে বোলো না।

ক'দিন পরে মাঝ-রাত্তিরে স্বামা অনুকে ঠেলা দিয়ে তুলেছিল: ওগো, ওগো শুনছ ? তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে শাঁখটা বাজাও।

কেন গো ? কি হয়েছে ? হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে অনু ভয় পেয়েছিল।

অসহিষ্ণু স্বামী মাথা নেড়ে বলেছিলেন, কোন কথা নয়, আগে শাঁখ বাজিয়ে এস, তারপর যা বলবার বলছি।

স্বামীর মন রাখার জন্য পরের সন্তান পেটে নিয়ে 'পতিব্রতা'কে বিছানা ছেড়ে ঠাকুরঘরে যেতে হয়েছিল এবং শাঁখও সে বাজিয়েছিল। রাত তখন হয়ত বা দু'টো কি তিনটে। স্থানটা রামকান্ত বসু স্ট্রীট না হয়ে যদি হোত এমন কোন গ্রাম যেখানকার ছেলেরা ভিজিলেন্স পার্টির সদস্য হয়ে পালা করে সারারাত গ্রাম পাহারা দেয় তা হলে মাঝ-রাত্তিরে শাঁখের শব্দে নিশ্চয়ই দল বেঁধে শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে আসত, কিন্তু নেহাৎ সহর কলকাতা বলে কেউ কিছু মনে করে নি। প্রতিবেশী বিনিদ্র কোন বুড়োবুড়ী হয়ত ভেবেছিল পাড়ায় কারুর ছেলে হয়েছে।

তা মুখুজ্জে মশাই সে রাত্তিরে ঐ জন্যই শাঁখ বাজাতে বলেছিলেন। তিনি সেদিন স্পষ্টই স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁর আরাধ্য রামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, তোর ঘরেই আসছি রে। অনেকদিন ধ'রেই তোরা আমাকে ডাকছিস, তাই আর থাকতে পারছি না। তোর মনবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য আবার আমায় আসতে হচ্ছে।

সেদিনের সেই সব কথা অনুপমার স্পষ্ট মনে আছে। ব্যাঙ্কের বুদ্ধিমান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যিনি নানা রকম চোর জালিয়াৎ মিথ্যুকের প্রতারণায় একবারও প্রবঞ্চিত না হয়ে এতগুলো বছর একাদিক্রমে

লাখ লাখ টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ সুচারুরূপে সম্মানের সঙ্গে চালিয়ে এসেছেন তিনি, তাঁরই ঘরে, তাঁরই দ্বিতীয় পক্ষের কাছে কি রকম অসহায়ভাবে প্রবঞ্চিত হলেন এটা মনে করে অনুপমা না হেসে আর পারেনি। এই ঘটনার পর থেকে স্বামীর কাছে অনুর আদর হাজার-গুণ বেড়ে গিয়েছিল। অনুকে স্বামী কখনও দেবকী, কখনও যশোদা, কখনও শচী-মা বলে ভাবতেন, সমীহ করতেন, তার তুষ্টিবিধানের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করতেন আর সেই থেকে অনুও ক্রমে ক্রমে দম্ভে ও গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে সুরু করেছিল। যাবতায় পুরুষকে বোকা, অন্ধ, নির্বোধ ভেবে করুণা করত, তবে একটা বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল টন্‌টনে। সে বুঝেছিল যে সন্তান ছেলে, মেয়ে অথবা যমজ, যাই হোক না কেন, তার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ সে তৈরী করে রেখেছে, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার তারিখের সঙ্গে বিভূদের এ বাড়ী থেকে বদ্‌নাম নিয়ে উঠে যাবার তারিখের হিসাবটা কেউ যদি করে তা হলে হয়ত কারুর মনে কোন রকম সন্দেহ জাগতেও পারে। সেজন্য অনেক ভেবে স্বৈরিণী নতুন এক কাহিনীর অবতারণা করেছিল।

অনুর নিজের হিসেবে যখন আটমাস তখন সে অনেক ভেবে একদিন বল্ল, ওগো, আমার বড় ভয় হচ্ছে।

কেন? কেন? স্বামীর সন্ত্রস্ত মুখখানা অনুর এখনও মনে পড়ে।

ধীরে ধীরে অতি দুঃখে অনু বলেছিল, আজ আমি ঠাকুরের চোখে জল দেখেছি। আমি আর স্থির থাকতে পারছি না।

কেন? কেন? জল কেন? কি করব বল ত?

কি আর করবে? আমাদের করার মতো কি আর আছে?

তাহলে? স্বামী যেন কেঁদে ফেলার জোগাড়।

অনু বলেছিল, কোথায় কে যেন বলছে, আর আমি শুনতে পাচ্ছি যে, গর্ভযন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা রে! আর পাচ্ছি না মা, সইতে আর পাচ্ছি না।

তা ত বটেই, তা ত বটেই, চিন্তিতমুখে স্বামী সায় দিয়ে বলেছিলেন,

ঠাকুরের কি কৃপা! আমাদের জন্য এই নিদারুণ যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় ভোগ করছেন!

তিনি পরমহংসদেবের ফটোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ, ঐ দেখ, ছবির মুখটা কেমন যেন ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে। সত্যিই ত, ঠাকুরের মুখ ত ও রকম ছিল না! দেখছ? বুঝছ?

স্বামীর কথায় অনু প্রথমে চমকে উঠেছিল। তারপর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বলেছিল, ও আর আজ আমায় কি দেখাবে, আমি ক'দিন ধরেই দেখছি। তোমার নজরে বোধ হয় আজই প্রথম পড়ল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজই আমি প্রথম দেখছি। কিন্তু—কিন্তু তুমি ক'দিন ধরেই দেখছ? ধন্য, ধন্য তুমি ছোট-বৌ। একটু থেমে বলেছিলেন, তা হবেই ত। স্বয়ং ভগবান যাকে মা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তার দিব্যদৃষ্টি খুলবে না ত খুলবে কার? আর সেই সঙ্গে আমিও ধন্য। তুমি আজ আমার ঘর আলো করে রয়েছ।

এরও কিছুদিন পরে এক প্রত্যূষে অনেক বুদ্ধি করে অনু বলেছিল একটা কথা শুনবে, কিছু মনে করবে না ত? হাসবে না ত?

বিলক্ষণ! এ সব কথা কি বলছ ছোটবৌ? তোমাকে কি আমি সাধারণ মানুষ বলে মনে করি? কি বলবে বল-না।

বলছি কাল রাত্তিরে আবার তিনি এসেছিলেন, মানে মা। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত। নিয়মকাজ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়।

মা? সারদা মা? স্বামী প্রশ্ন করেছিলেন।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তিনিই।

কি, কি বল্লেন তিনি?

তিনি বল্লেন, উনি পুরো দিন গর্‌ভো কারাগারে বন্দী থাকতে রাজী নন। নরলোকের সব হিসেবের বাইরেই ত উনি! তাই দু'চার দিনের মধ্যেই সাধের নিয়ম-কাজটা করে ফেল। ভয় নেই, সহজভাবেই

তোমার কোলে উনি আসবেন, কিন্তু কারাগারের মেয়াদ উনি অনেক কমিয়ে ফেলবেন।

তোমার ত এই মোটে পাঁচমাস ?

তাই, ছোট্ট কথায় অনু সায় দিয়েছিল।

ন' মাসের কাজটা এখনই করতে হবে ?

তাই ত আদেশ দিয়ে গেলেন। কিন্তু কি বল্লেন জানো ? বল্লেন, খুব গোপনে কাউকে না জানিয়ে নিয়ম-কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ করে নে। উনি খুব তাড়াতাড়ি অবতীর্ন হবেন।

তাই বুঝি ? তা হলে তাই করতে হবে। তা হ্যাঁ গো, ডাক্তার-টাক্তার দেখাবে নাকি ?

না বাপু, ডাক্তারের সামনে আমি যেতে পারব না। পরপুরুষের সামনে—ছিঃ, তা ছাড়া আমার কোন অসুখ ত নেই, কোন কষ্টও নেই।

স্বামী বলেছিলেন, তা বটে। ওঁরা যেখানে নিজেরা কৃপা করছেন সেখানে ঐ ছার ডাক্তার কি করবে। তা ছাড়া ডাক্তাররা জানে সাধারণ মানুষের ব্যাপার, ওঁদের লীলা ডাক্তারে কি বুঝবে।

তবেই দেখ। ডাক্তার বাদ দিয়ে আমি বলি কি, ওঁদের হুকুম মত চলাই ভাল।

এই ভাবেই পাঁচমাসে কাউকে না জানিয়ে সংগোপনে সাধ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল্ল সেদিনের অনুপমা। তখন ওর দেশী হিসাবে পুরো ন'মাস। নিয়মকাজ ঠিকই করেছিল, কেবল পাঁচজন এয়ো কেন, একজনকেও বলা হয়নি। ঝিটা মুখ টিপে হেসেছিল কিন্তু তাতে অনুর ভাল কাপড় এবং সোনার আর্মলেট পেতে অসুবিধা হয় নি। অনু ন' মাসেই সাধ খেয়েছিল, স্বামী বুঝেছিলেন ঠাকুরের নির্দেশে পাঁচ মাসেই সাধ হোল, কারণ ঠাকুর বেশীদিন গর্ভ-কারাগারে বাস করতে চান না।

কাজেই স্বামীর হিসেব মত ছ'মাসে প্রসব-বেদনা যখন হোল তখন পাড়ার ধাই নন্দরানী এসে প্রসব করিয়েছিল। স্বামী বলেছিলেন,

খুব সাবধান। এই মোটে ছ' মাস। দেখিস্ নন্দ, একটু অসাবধান হোলে —

ভূমিষ্ঠ হবার পর নন্দ বলেছিল, হ্যাঁ গো দিদি, কে বলে ছ' মাসের ছেলে ? এ বাপু তোমাদের ভুল হচ্চে। এ পুরো দশ মাস—

অনু বলেছিল, তুই বুঝবি না। এর ভেতর অনেক ব্যাপার আছে। তা যাক্ গে, ভালোয় ভালোয় যখন হয়েছে তখন বাজে কথায় দরকার নেই, আঁতুড় উঠলে আসিস, আমি তোকে একখানা ভালো জরিপাড় কাপড় দেব। এ ব্যাপার বাইরে কোথাও আলোচনা করিস্ নি।

মুখুজ্জেমশাই নন্দকে ভালরকম বখশিস্ দিয়েছিলেন। পাড়ার লোকে, বিশেষ করে একতলার ভাড়াটেরা কানাঘুষো করলেও নন্দ পাওনায় খুশী হয়ে জরিপাড় কাপড়ের আশায় সকলকে থামিয়ে দিয়েছিল। অনুও তার কথা রেখেছিল। ষষ্ঠীপুজোর পর নেয়ে-ধুয়ে ঘরে উঠে নন্দকে জরিপাড় কাপড়ই দিয়েছিল। ঐ রকম কাপড় তখন অনুর ছিলও অনেকগুলি।

এ সেই ত্রিশ বছর আগেকার কথা। সবটাই অনুর মনে আছে। এখন মনে হয় স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে অতগুলো মিথ্যে কথা বলার পাপেই স্বামী ওকে এই অবস্থায় অনাথ রেখে ফেলে গেছেন। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এই রকম চালাকি করার ফল সে হাতে-হাতে ভোগ করছে। আরও মনে হয়, ছেলে যে ওর এই রকম অমানুষ হয়েছে সেও ওরই জন্য। সেই ঠাকুর-পাগল বৃদ্ধ ভদ্রলোক শেষ বয়সে ছেলে এবং ছেলের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে অনুর পার্থিব কলঙ্ক-বিষয়ে যেমন একটুও সন্দেহ করতে পারে নি তেমনি এক অপার্থিব মোহ তাকে এমনই পেয়ে বসেছিল যার ফলে ছেলে আর মানুষ হোল না, বালকভাবেই খোকা থেকে দাড়ি-গোঁফ পাকাতে চল্ল। ফল হোল, সেদিনের দাম্ভিক ও ধূর্ত মিসেস মুখার্জী আজকের নিঃস্ব বামুনদিতে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে।

তিন

ঘটককে সরিয়ে দিয়ে সাইকো-এ্যানালিস্ট ডাঃ ভঞ্জ খোকার সঙ্গে অনেকক্ষণ অনেক রকম গল্প করলেন। শেষে বল্লেন, গদাধর বাবু, আপনার সঙ্গে নানা বিষয় কথা বলে অনেকখানি জ্ঞান হোল আমার। আপনি সত্যিই খুব বুদ্ধিমান লোক। আপনার কাছে নতুন জিনিস অনেক শিখলুম। তা দয়া করে মাঝে মাঝে যদি আসেন তা হলে খুব ভাল হয়। যখনই সময় হবে এখানে আসবেন, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে। কেমন ?

খোকা খুব খুসি। এভাবে কেউ কোনদিন তার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে এত কথা বলে নি। মোটরে উঠেই খোকা বল্ল, মামাবাবু, এই যে ডাক্তারটার কাছে আমাকে বসিয়ে রেখে তুমি চলে গেলে, এই ডাক্তারটা বেশ ভাল লোক। খুব বোঝে শোঝে। যা বল্লুম, মন দিয়ে শুনল, আবার বল্ল, যখনই সময় হবে আসবেন। আমি এর কাছে রোজ আসব, এ্যাঁ ?

হাসি চেপে ঘটক বল্লেন, তাই এসো, কিম্বা একদিন অন্তরও আসতে পারু। ওরা ত কাজের মানুষ, কত কাজ করতে হয়। রোজ রোজ এলে হয়ত বিরক্ত হোতে পারে।

না মামাবাবু, তুমি কিছু বোঝ না। ও বল্ল, ওর যত কাজই থাকুক, আমাকে পেলে ও আর কিছু চায় না।

তাই না কি ? ভাল ত ? তা হলে দেখি, কাল যদি আমার গাড়ী খালি থাকে, না হলে আবার পরশু সকালেই—

গাড়ী নিয়ে কোথায় এত ঘোরো তুমি ? সারা দিনই ত বাইরে বাইরে থাকো। এত ঘুরতেও ভাল লাগে !

গাড়ী বাড়ীর দিকে ফিরছিল। খোকার কথায় ঘটক আর কোন

জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। ড্রাইভার স্টিয়ারিং থেকে একবারও চোখ সরায় নি, যেন কিছুই শুনতে পায় নি।

ডাঃ ভঞ্জ খোকাকে প্রাথমিক পরীক্ষা করে প্রথম তিনমাস একদিন অন্তর সিটিং দেবেন ঠিক করে হাজার টাকা ফি ধার্য করেছিলেন। সিটিং-এর দিন ছিল মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। ঘটক ঠিক করেছিলেন দশটায় অফিস যাবার সময় খোকাকে ডাক্তারের চেম্বারে নামিয়ে দিয়ে যাবেন, তারপর ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে আফিস থেকে এসে খোকাকে বাড়ী পৌছে দেবে।

ঘটক ভাবলেন, দেখা যাক, তিন মাসে কতটা কি উন্নতি হয়। টাকা অবশ্য অনেকগুলো খরচ হবে, তা হোক, নেহাৎ পরের জন্য খরচ ত হচ্ছে না! অন্যে না জানলেও তিনি ত জানেন, তাঁর প্রথম সন্তান যদি কিছু টাকার বিনিময়ে সুস্থ স্বাভাবিক মানবজীবন পায় তা হলে সেটা ভালই। তারপর কিছুটা ইংরাজী শিখিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে পারবেন যাতে তাঁর অবর্ত্তমানেও মা ও ছেলের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব না হয়। ঋণী তিনি থাকবেন না, প্রথম জীবনে যে আনন্দ তিনি পেয়েছেন তার ঋণশোধ তিনি এইভাবেই করতে চান।

দিন কয়েক পরে—

রাজদূত মোটর বাইকে স্টার্ট দিয়ে চেপে বসে সুব্রতর মনে পড়ল পোর্ট ফোলিও ব্যাগটা তার নিজের ঘরের টেবিলে সে ফেলে এসেছে। আবার ওপোরে উঠতেও তার কুড়েমি, অথচ সামনে বাদলকে দেখা যাচ্ছে না। ঐ পাগ্‌লাটা বাঘছাল-মোড়া টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বাঘের কাঁচের চোখ দুটো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বাইকের সিট থেকেই সুব্রত ডাক দিল, খোকা-দা, অ খোকা-দা।

সুব্রত ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। লোকটা যে কি রকম উজবুক তা সে ভেবেই পায় না। তবে হ্যাঁ, বয়সে ওর চেয়ে অনেক বড়। সুব্রতর বাবাই তাকে বলেছেন, খোকাকে খোকাদা বলে ডাকতে। ঐ পাগলের মাকে বাবা বলেছিলেন জেঠাইমা বলে ডাকতে, কিন্তু

অতটা সম্মান দিতে সুব্রতর ইচ্ছে হয় নি। ঠাকুরমাও কেমন যেন নারাজ। তাই সে কিছুই বলে না, কিন্তু খোকাকে খোকাদা-ই বলতে হয়। হাজার হোক বয়সে বড় ত!

প্রথম ডাকটা খোকার কানে গেল না বুঝে সুব্রত পুনরায় হাঁক দিল, খোকাদা, অ খোকাদা।

এ্যাঁ? খোকা চোখ তুলে দেখল।

শোন এদিকে। অবাক্ হয়ে বাঘের চোখে কি দেখছ বলো ত?

ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে খোকা বল্ল, দেখছি? দেখছি ভগবানের দেওয়া চামড়ার চোখ ভালো, না মানুষের দেওয়া কাঁচের চোখ ভালো। কোনটা ভাল তাই বিচের কচ্ছিলুম।

ঠিক আছে, সে বিচের পরে কোরো। এখন চট্ করে ওপোরে গিয়ে আমার ঘরে টেবিলের ওপোর যে পোর্টফোলিও ব্যাগটা রেখে এসেছি সেইটে আন ত?

এখনই?

হ্যাঁ এখনই, দেখছ না আমি এখনই বেরুচ্ছি।

আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আনছি।

লম্বা হাত দু'খানা অস্বাভাবিক দোলাতে দোলাতে খোকা ঘরে ঢুকে ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

দৌড়ে যাও, মোটর বাইকের ওপোর থেকেই সুব্রত নির্দেশ দিল।

কিছুক্ষণ পরে হাঁপাতে হাঁপাতে সুব্রতর ভারী রিভিলেসন ব্যাগটা এনে হাজির করল ত্রিশ বছরের বুড়ো খোকা। দরজার কাছে এসেই বল্ল, শুঃ, কি ভারী এটা, ইট-পাটকেল পুরে রেখেছ নাকি?

তোমার মাথা! স্টার্ট বন্ধ করে সুব্রত বাইক থেকে নেমে খোকার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে বল্ল, এটা কি টেবিলের ওপোর ছিল? এটা পেলে কোথায়?

এ ত ছিল ঐ তাকে! এ ছাড়া আর কোন ব্যাগ ত ও ঘরে নেই!

সুব্রত ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। খোকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোটর বাইক দেখতে লাগল।

এক মিনিটের মধ্যেই সুব্রত লাফাতে লাফাতে নেমে এল। হাতে তার ফোলিও ব্যাগ। খোকার সঙ্গে কোন কথা না বলেই ব্যাগটাকে সে বাইকের পাশে-আঁটা খাঁচার মধ্যে ফেলে স্টার্ট দিতে সুরু করল।

আঙ্গুল তুলে ব্যাগটার দিকে দেখিয়ে খোকা বল্ল, ঐটে? ওমা, ওকে আবার ব্যাগ বলে না কি?

স্টার্ট দিয়ে সুব্রত বল্ল, ব্যাগ বলবে না ত কি বলবে?

কি বলবে? ওটা—ওটা—খোকা চিন্তা করতে লাগল। ইতিমধ্যে সুব্রত গাড়ী-বারাণ্ডার তলা থেকে বেরিয়ে ফোয়ারা ঘুরে গেট পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

খোকাও গাড়ী-বারাণ্ডার তলা থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

রাস্তা দিয়ে একখানা লরী ছুটে চলে গেল। চলে গেল একখানা স্কুটার। তিন-চারটে মেয়ে, বোধ হয় কলেজের ছাত্রীই হবে, পাশাপাশি গল্প করতে করতে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ফুর্তি করে হাঁটছিল। ওদের দিকেও চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল খোকা। তাদের পেছনে ঠেলাগাড়ী। বড় বড় ঝুড়ি-ভরতি তরীতরকারি বোঝাই ঠেলাটা দুজন পশ্চিমা কুলী ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে রিক্সা-সাইকেল, এক জোড়া তরুণ-তরুণী সেই রিক্সা-সাইকেলের আরোহী। সকাল ন'টার লোকবহুল রাজপথ। খোকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে মনে পড়ল ডাক্তারের কথা। গতকাল শনিবারেই ডাক্তার অনেক সব কথা বলেছিলেন। এর আগে পর্যন্ত খোকাই বলত, ডাক্তার শুনতেন। বক্তা হতে খোকার খুব ভালো লাগত। ডাক্তারকে খোকা তার শিষ্য বলে মনে করেছিল, কিন্তু গতকালই খোকার প্রথম সন্দেহ হোল যে ডাক্তারটাও অনেক কিছু জানে, নেহাৎ

বোকা নয়। খোকা বলত ঠাকুর দেবতার কথা, যে সব কথা সে এতদিন ধরে সেকেলে বুড়োবুড়ীদের কাছ থেকে মুখে মুখে শুনতে অভ্যস্ত ছিল। ডাক্তার এই ক'দিনের মিটিং-এ খোকার সমস্ত কথা সাগ্রহে শুনেছিল কিন্তু গতকাল ডাক্তার এমন সব কতকগুলো কথা বলেছে যে খোকা সেই সব কথা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করতে পারেনি, যা কিনা এতদিন অন্যলোকের কথায় সে করে এসেছে। ডাক্তারের কাছে সে গতকালই শুনেছে যে, দেবতা ভাল, কিন্তু দেবতারা অনেক দূরের জিনিস, ধরা ছেঁায়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। মানুষ চেষ্টা করে পয়সা উপায় করবে, সেই পয়সায় বাজার করে নৈবিদ্যি সাজিয়ে দিলে তবে দেবতাদের ভোগ জুটবে, ভক্তরা তবে সেই ভোগ থেকে প্রসাদ পাবে। মন্দির ভাঙ্গলে দেবতা নিজে এসে মন্দির মেরামত করেন না, দেবতার বাসস্থান মেরামতের জন্য চাই মিস্ত্রী। তুলসীপাতা ও গঙ্গাজলে মন্দির মেরামত হয় না, মেরামতের জন্য চাই চুন বালি সিমেন্ট। সেই সবেতেই মানুষের চেষ্টা ও পয়সার দরকার।

খোকার মনে এই রকম অনেক সব নতুন কথা কালই প্রথম উদয় হয়েছে। আজ সুব্রতর মোটর বাইকে স্টার্ট দেওয়া থেকে খোকার মনে হোল শুধুমাত্র জোড়হাত করে নমস্কার করলেই সব কাজ হয় না। পা দিয়ে জোরে জোরে লাথি না মারলে ঐ লোহার যন্ত্রটা কোন সাড়া-শব্দই করে না, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফোয়ারার পাশে অমন যে সাজানো গাছ, ওগুলোকে ওদের খুসিমত বাড়তে দিলে এমন সুন্দর দেখায় না। সকালে বুড়ো মালিটা বৃহদাকার কাঁচি দিয়ে ওগুলোর মাথা এবং চারপাশ ছেঁটে দেয়। মনে হোল সত্যিই ত, মাঝে মাঝে মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নাপিতের কাছে গিয়ে বসলে নাপিতও ওর মাথার চুলগুলো ছেঁটে দেয়। তখন ওর বেশ ভাল লাগে, মাথাটা দিব্যি হাল্কা মনে হয়। তা হলে মানুষগুলো খুব একটা ঘৃণা বা উপেক্ষার পাত্র নয়। মানুষের কাজগুলোও সবই যে বাজে কাজ তাও বোধ হয় নয়।

আচ্ছা, ঐ স্কুলের মেয়েগুলো অত ফুর্তি করে কি সব বলতে বলতে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করতে করতে সারা রাস্তা জুড়ে হৈ হল্লা করে এই মাত্র যে চলে গেল, ওরা কি তিলমাত্র বুঝল যে পাশের বাড়ীর গেটের কাছে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি স্বয়ং ভগবান, পৃথিবীতে দয়া করে অবতীর্ণ হয়েছেন। ওরা ওকে আমলই দিল না। সে একা একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তারই সামনে দিয়ে সাইকেল রিক্সায় যে দুটি মানুষ ও মেয়েমানুষ গল্প করতে করতে চলে গেল ওরা কি অসুখী? বরং-বরং সে-ই একা একা অসহায়ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ সেও ত ওদের মত ফুর্তি করে বেড়াতে পারত।

এর পরই খোকার মনে হোল ছিঃ, কি সব ঘেন্নার কথা। সাধারণ মানুষের মত সে কি-না কামিনী কাঞ্চনের চিন্তা করছে। বাবাকে তার স্পষ্ট মনে আছে, বাবার কথাগুলোও দিব্য মনে পড়ে। বাবাই খোকাকে বলেছিল যে আগের জন্মে খোকা টাকায় হাত দিয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, এবং টাকার জ্বলুনিতে সে ছটফটিয়ে উঠেছিল। বাবার কাছেই খোকা শুনেছিল যে, মা ছাড়া অন্য সব মেয়েমানুষই মানুষের শত্রু, কিন্তু রিক্সায় যে লোকটা যাচ্ছিল তার সঙ্গিনীকে তার মা বলে ত মনে হোল না, অথচ শত্রু বলেও সন্দেহ করা যায় না।

খোকা, খোকা কোথায় গেলি রে—

উঃ, একটু বাইরে দাঁড়াবার জো নেই, মা-টা ডাকছেঁ। বিরক্ত হয়ে খোকা ভেতরে ঢুকে মায়ের কাছে গিয়ে বল্ল, কি? ডাকছিস্ কেনে?

নাওয়া খাওয়া করতে হবে না? বেলা বারোটা যে বাজল!

তোর সব কাজ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। ওপোরের মাকে নাইয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। এখন তুমি আমার নেয়ে খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর।

তুই খেয়েছিস্?

ওমা! ছেলের কথা শোন একবার। তোকে না খাইয়ে আমি খাব?

কেনে? তুই ত আলাদা খাচ্ছিস, তোর হেঁসেলে ত আমি খাই না!

কথামৃত-পড়া বাবার কাছ থেকে শুনে শুনে সেই ছেলেবেলা থেকেই খোকা 'কেন' শব্দটার উচ্চারণ করে 'কেনে'।

মা বল্ল, হেঁসেল আলাদা তা কি হয়েছে? তোকে না খাইয়ে আমি খেতে পারি? চল্, তোকে সাবান তেল গামছা সব গুছিয়ে দিয়ে আসি।

মায়ের পাশে যেতে যেতে খোকা বল্ল, এখানে কিন্তু খুব সুখ, তাই না মা? তুই যখন ও-বাড়ীতে রেঁধে ভাত দিতিস তখন সেই বেলা দেড়টা-দুটোয় ভাত দিতিস, আর তাও শুধু ভাত আর ডাল। এখানে রোজ দু'বেলা মাছ দেয় এরা। খেতে বেশ লাগে কিন্তু!

বাসন মাজা ঠিকে ঝি'টা ওপাশ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। তাকে দেখে সলজ্জভাবে অনু বল্ল, তুই থাম্, বাজে বকিস নি।

ঠোঁট ফুলিয়ে খোকা বল্ল, বাজে আবার কি বকলুম! বাবা রে বাবা, তোর সঙ্গে কথা বলাই দায়। বড় বাড়ীতে এসে তুই যেন কি হয়েছিস্! কোন কথাই শুনতে চাস্ না।

বাথরুমের কলগুলোয় খোকা এখন অভ্যস্ত। প্রথম দিন শাওয়ার খুলে যে কেলেঙ্কারীটা সে করেছিল এখন আর সে রকমটা হয় না। স্নান সেরে খোকা এসে খেতে বসল রান্নাঘরের ওপাশের বারাণ্ডায়। টেবিলে বসা তার সেই প্রথম দিনেই হয়েছিল, আর হয় না। ও খেতে বসার পর অনু চলে গেল স্নান করতে। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী ঘটক অনুকে বলে দিয়েছিলেন, ছেলেকে সব সময় কাছে কাছে রাখবে না। বুড়ো-বুড়ীদের স্নেহের আওতায় ছেলেদের মন বাড়তে পারে না, যেমন-ধারা বড় গাছের তলায় ছোট গাছ বাড়তে না পেরে কুঁকড়ে শুকিয়ে যায়।

রাঁধুনীর দেওয়া ভাত তরকারি একা একা খেতে খোকার প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও এই ক'দিনে সেটায় সে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, কিন্তু রাত্রে একা শুতে খোকার এখনও বেশ ভয় ভয় করে, অসুবিধে

হয়। অনুও খোকাকে একা রাখতে চায় নি, কিন্তু উপায় নেই, অনুকে থাকতে হয় মায়ের ঘরে। মায়ের ঘরের মেঝেয় সে বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে শোয়। বুড়ো মানুষ, অসুস্থ, কখন বাথরুমে যাবে তার ঠিক নেই, অনুকে সে জন্য ঐ ঘরেই থাকতে হয়। ব্যবস্থাটা ঘটকেরই করা।

এতেই কি অনুর কম দুঃখ! সে দিনের সেই বিভু,—এ বাড়ীতে তার মুখের কথাটাই হোল অকাট্য, আর সে দিনের সেই মিসেস্ মুখার্জী, সে এখানে—যাক্ সে কথা।

এতখানি প্রাচুর্যের মধ্যে সকল ঝি-চাকরের তুলনায় অনেক বেশী খাতির পেয়েও অনুর মনটা হাহাকার করে ওঠে। এর চেয়ে শ্যাম-বাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে কুড়ি টাকা মাইনের রাঁধুনী থেকে বা শ্যামপুকুর স্ট্রীটে তিরিশ টাকা মাইনের বামুনদি' হয়ে অবসরমত ঠোঙা তৈরী করে, জামা প্যান্ট বানিয়ে সে যেন অনেক শান্তিতে ছিল। সে গরীব, তার কেউ নেই, সে গতর খাটিয়ে পেটের ভাত উপায় ক'রে পাগল ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে—এই ছিল তার সান্ত্বনা। মনিব বাড়ীর কাজ সেরে নিজের টিনের চালায় এসে হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় সে ছিল স্বাধীনা, কিন্তু এখানে? এত বড় বাড়ীতে এতখানি আরামের মধ্যে সে অহোরাত্র বন্দিনী। কথা বলার মত লোক ঐ শয্যাশায়ী বৃদ্ধা, আর মাঝে মাঝে দেখা পায় বিভুর। কিন্তু বিভু আর সেই বিভু নেই, যার দেখা পাবার জন্য প্রতিদিন বেলা সাড়ে এগারটা থেকে যুবতী অনুপমা বারবার ঘড়ি দেখত, ভালো মাছটি লুকিয়ে সরিয়ে রাখত, মুখে ডাঁট দেখিয়ে দূর-ছাই করলেও মনে মনে সঙ্গোপনে প্রাণের টান অনুভব করত, যে চলে যাবার পর প্রাণটা হু হু করে উঠত, খোকা কোলে আসার পর খোকাকে কোলে নিয়ে প্রায়শঃই অবাধ্য জলে চোখ ভরে উঠত,—যার জিনিস সে দেখতে পেল না এই দুঃখে অনু অনেকদিনই মন-মরা হয়ে ছিল। এখন সেই সুখের দিনের হারানো-বিভুর সঙ্গে এক ছাতের তলায় সে বাস করছে এতদিন, কিন্তু রামকান্ত বসুর

আবহাওয়া সেখানেই হারিয়ে গেছে। উত্তরের হাওয়া দক্ষিণে আসতে পায় নি। বাগবাজারী হাওয়া কি যোধপুর পার্কে আর বইবে না ?

দিনটে ছিল রবিবার, কিন্তু রবিবার হলে কি হয়, ঘটক সেই রবিবার সকাল সাতটায় তাড়াতাড়ি চা খেয়ে গাড়ী নিয়ে কোথায় যে বেরিয়েছেন কে জানে! ঠাকুরকে বলে গেছেন সন্ধ্যের আগে ফিরবেন না, দুপুরের খাবার যেন তাঁর জন্য করা না হয়। এইটুকুই অনু শুনেছিল এবং সেজন্যও তার দুঃখ ছিল। বিভু কোথায় যায়, কি করে, অনু তার কোন খবরই পায় না। এটাই কি কম দুঃখের! নিজের মনকে সে প্রবোধ দেয় এই বলে যে, মাইনে-করা ঝি ছাড়া এখন সে আর কিছুই ত নয়। আর মাইনে-করা ঝি-ও সে নয়, বিনা মাইনের আয়া, বুড়ো মায়ের খিদ্‌মদ খাটে আর দু'বেলা খায়। ছেলে? সে যার জিনিস সে-ই ভার নিয়েছে। অনুর কি ?

ঘটক ফিরলেন সন্ধ্যের পর। মুখখানা দেখে মনে হোল খুব ক্লান্ত। বাইরের ব্যবহার ছিল যথারীতি। স্নানান্তে বাড়ীর পোষাক পরে মায়ের ঘরে কিছুক্ষণ বসে গাড়ীবারাণ্ডার আরাম চেয়ারে অন্ধকারে একা একা শুয়ে রইলেন, তারপর নীচে নেমে নৈশভোজ শেষ করে ও'পারে ওঠার সময় ছেলের ঘর অন্ধকার দেখে বাদলকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুবো কোথায় রে, এখনও ফেরে নি ?

বাদল বল্ল, না। দাদাবাবু সেই এগারটা নাগাদ খেয়ে বেরিয়েছেন, এখনও আসেন নি।

হুঁ, ঘটকের কণ্ঠস্বরে কিছুটা বিরক্তি ও বেশ কিছু হতাশা ফুটে উঠল। তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন।

নিজের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে ঘটক সাহেব ঘরের নীল আলোটি জেলে নিজের হাতে আলমারির চাবি খুলে বার করলেন বিলাতীর বোতল। অত্যন্ত হিসাবী লোক, নিত্য নিয়মিতভাবে পরিমিত পরিমাণ আরক পান করেন, তাও সম্পূর্ণ গোপনে। তাঁর আশঙ্কা, পাছে তাঁর পানাভ্যাস তাঁর একমাত্র ছেলে সুব্রতকে পেয়ে

বসে। সেইজন্যই তাঁর এই গোপনীয়তা। প্রকৃতপক্ষে বাদল ছাড়া আর কেউ জানত না। না না, ড্রাইভারও জানত, তিনি এক একদিন গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের দোকানের সামনে গাড়ী থামিয়ে স্বহস্তে বিলাতী বোতল কিনে গাড়ীতে এসে উঠতেন।

গেলাসের মাপ অনুযায়ী ঢেলে বোতলটি আলমারির পেছন দিকে যথাস্থানে রেখে আলমারি চাবি-বন্ধ করে নিজের চেয়ারে এসে বসে দু'চুমুক খেয়ে সিগারেট ধরালেন। এই সময়টা একান্ত ভাবে তাঁর নিজস্ব। এ সময়ে বাড়ীর কেউ কোন কারণেই তাঁকে ডাকে না, এমনই নির্দেশ ছিল ঘটক সাহেবের। তিনি বলতেন, ঐ সময়ে তিনি নাকি আপন মনে সারাদিনের হিসাব নিকাশ করেন।

তা হিসাব নিকাশ তিনি সত্যই করতেন। টাকা পয়সার হিসাব নয়, তাঁর সারাদিনের কাজের হিসাব ও আগামি দিনের কার্য-তালিকা। এই প্রণালীও তাঁর বাণিজ্যগুরু হাণ্ডার কাছ থেকে শেখা। তবে হাণ্ডা করতেন অপরিমিত পান, ঘটকের ছিল পরিমিত।

পান করতে করতে ঘটকের মনে হোল আজকের সমস্ত চেষ্টা ও আয়োজন তাঁর বৃথাই গেল। এতগুলো টাকা খরচ করে এত চেষ্টায় যে গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন তাঁর মূল লক্ষ্যই পণ্ড হোল। কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিশেষ মন্ত্রীকে নিজস্বভাবে কিছুক্ষণের জন্য কাছে পাবার উদ্দেশ্যে এই পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই মন্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত আসতেই পারলেন না, কিম্বা হয়ত ইচ্ছা করেই এলেন না। অন্য দু'জন ভি আই পি অবশ্য এসেছিলেন কিন্তু তাঁরা ত চুনোপুঁটি, তাঁদের জন্য এই আয়োজন করা হয় নি। দু' দুবার গাড়ী পাঠিয়েও প্রধান ব্যক্তিটিকে পাওয়া গেল না। পেলে, ঘটকের বিশ্বাস, বেশ কয়েক লক্ষ টাকার কাজ বাগানো যেত যার নিট মুনাফা ট্যাক্স বাদ দিয়েও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের কম হোত না।

গেলাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে

সেই আগুনে অপর একটি সিগারেট ধরিয়ে তিনি মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, কিছু কাজ ত এগিয়েছে।

কিন্তু হতাশ মন হু হু করে। নানা রকম ভাবতে ভাবতেই মনে হোল, এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল আমার সেই পুরানো দিনগুলো। আয় ছিল অনেক কম, এখনকার তুলনায় পপার বল্লেও বেশী বলা হয় না, কিন্তু ঝক্কি ঝামেলাও কোন রকম ছিল না। সে আমলে বাড়তি পাঁচটা টাকা উপায় করলেও যে-আনন্দ হোত এখন বাড়তি পাঁচ হাজার পেলেও সে অনুভূতি হয় কই? এই যে মিস্ লটি আজ লাস্যে ও সঙ্গীতে গার্ডেন পার্টির অপরাহ্নকে রঙ্গিন ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল সেই লটির একান্ত সান্নিধ্যও সেই আনন্দ দিতে পারে না, যা ঐ অনু তাকে মাত্র কয়েকমাসের জন্য দিয়েছিল সেই রামকান্ত বসু স্ট্রীটের নির্জন মধ্যাহ্নগুলিতে। সে সময়ের সমস্ত দিন এবং রাতগুলো ঈপ্সিত মধ্যাহ্নের প্রতীক্ষায় উদগ্র হয়ে বিভু ঘটককে কেমন এক অপরূপ উন্মাদনায় ভরিয়ে রাখত। সে উন্মাদনা কই, সেই আনন্দমুখর ব্যাকুলতা কই! সেই শঙ্কাতুর হৃদ্‌কম্পের প্রবল আলোড়নে যে সুখ তিনি পেতেন, আজকের এই নিঃশঙ্ক কর্তৃত্বের দৃঢ় পরিবেশে সেই আনন্দের লেশমাত্রও যে মেলে না! অথচ বিভু সেই বিভুই আছে। ঘটকের মনে হয়, তিনি আদৌ বদলান নি। তাঁর মনোভাব সেদিনেও যা ছিল, আজও তাই আছে। তিনি বুঝতেই পারেন না, অথবা বুঝেও বুঝতে চান না যে মধ্যের ত্রিশটা বছর তাঁর শরীরে ও চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

না, কোন পরিবর্তনই আমার হয় নি, কিন্তু আমার দুনিয়াটা বদলে গিয়ে—

অনু এ বাড়ীতে এসেছে প্রায় তিন সপ্তাহ! মনে মনে হিসেব করে ঘটক দেখলেন, পুরো তিন সপ্তাহ নয়, উনিশ দিন। এই দীর্ঘ উনিশটা দিন সে নিতান্তই 'পর' হয়ে রয়েছে। ওকে কাছে পেলে আজকের এই হতাশায় ও হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারত, যেমন

দিয়েছিল সেই সে আমলে। মাত্র চার বস্তা সিমেণ্টের হিসাব মেলাতে না পেরে সেদিন সকালে হেড অফিসের সুপারভাইজারের কাছে এমনই বেইজ্জতি হয়েছিল সেদিনের গোডাউনকীপার ঘটক বাবু যে, ও ভেবেছিল, ওর অত সাধের চাকরী বুঝি সে দিনই খতম হবে। বড় সাহেব অত্যন্ত কড়া। কাজের ত্রুটী তিনি ক্ষমা করলেও চুরি তিনি কোনমতেই বরদাস্ত করতেন না, আর চুরি ত ওরা করেই ছিল। গঙ্গামাটি ও মেঝেয় পড়ে থাকা বিলাতী মাটি মিশিয়ে দারোয়ানেরা সেদিন তৈরী রেখেছিল আটখানা বস্তা। ভোরবেলা এক চোরা-কণ্ট্রাক্টর এসে বারো বস্তা দাবী করে বসল। নগদ টাকা ফেল্ল। ওরা লোভ সামলাতে না পেরে স্টক থেকে চারখানা বস্তা দিয়ে তাকে বারো বস্তা ডেলিভারী দেবার এক ঘণ্টা পরেই হঠাৎ এল হেড অফিসের সুপার-ভাইজার মার্টিন সাহেব। মার্টিন ছিল এদেশী কালা সাহেব, ট্যাস ফিরিঙ্গী, কিন্তু বড়-সাহেবের প্রিয়পাত্র এবং অন্যের মত ঘুষখোর নয়। সরেজমিন স্টক মিলিয়ে চার বস্তা কম দেখে নোট্ লিখে নিয়ে গেল। এর ফল কি হবে তা ভাবতেও সেদিনের ঘটক শিউরে উঠেছিল। সে দিনের দুপুরে বেচারি ভালো করে খেতেও পারে নি। কিন্তু সেদিনের সেই উৎকট সমস্যার সমাধান করেছিল সেদিনের সেই যুবতী অনুপমা। উঃ, কি অদ্ভুত উপস্থিতবুদ্ধি ছিল তার! সব শুনে সে বলেছিল, কোনো চেনা খদ্দেরকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নাও যে তারা ভুল করে চার বস্তা বেশী নিয়ে গেছে।

কথাটা শুনে ঘটক প্রথমে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, তাও কি হয়? তাতে আমাদের সকলেরই দোষ হবে। বলবে, আমরা ঠিক ভাবে দেখে গুণে দিই না কেন? এটা কোন মীমাংসাই নয়।

কথাগুলো ঘটক মুখে বলেছিলেন বটে কিন্তু সেই কথারই জের টেনে উপযুক্ত সমাধান তিনি পেয়েছিলেন। কোম্পানীর বাঁধা খরিদ্দার এক কণ্ট্রাক্টরের ওভারসিয়রকে টাকা খাইয়ে তাকে দিয়ে কবুল করিয়েছিলেন যে, তারা যে দশ টন সিমেণ্টের ডেলিভারী নিয়েছিল তিন দিন

আগে সেই সিমেণ্টে তাদের ঢালাই কাজ চলতে চলতে সন্ধ্যের পরে আরও চার বস্তার মত দরকার পড়ে। তখন সে এসে বন্ধ গুদাম খুলিয়ে হেড দারোয়ানের সহকারীর কাছ থেকে অনেক খোশামোদ করে চার বস্তা নিয়ে গিয়ে তার কাজ করিয়েছে এবং পরদিন বিকালে তিনটার সময় খবরটা ওঁদের নির্দেশমত লিখিতভাবে গুদামবাবুকে জানায়। সকালে ইন্‌স্‌পেক্‌সনের সময় সেই সহকারী দারোয়ান গুদামে উপস্থিত ছিল না। চুরির দায় থেকে সকলকে বাঁচাবার জন্য সে মিথ্যা কবুল করল যে, তার যে ভাতিজা টালায় থাকে তার বিপজ্জনক অসুখের খবর পেয়ে সে সেই রাত্রেই টালায় চলে গিয়েছিল এবং চার বস্তা সিমেণ্ট এইভাবে দেওয়ার কথাটা সে হেড দারোয়ানকে বলার সময় পায় নি। ঘটকের মনে আছে এইভাবে সেদিনের সেই বিপদ থেকে ওরা কোন ক্রমে মুক্তি পেয়েছিল বটে কিন্তু এই বেআইনী কাজ করার জন্য বড় সাহেবের ধমক ওদের নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। বিভুর মনে আছে অনুর উপদেশই প্রকারান্তরে এইভাবে ওদের সেদিনকার সমূহ বিপদ থেকে কোনক্রমে মুক্তি দিয়েছিল। এর জন্য কণ্ট্রাক্টরের ওভার-সিয়ারকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা এবং নিজের অফিসকে চার বস্তা সিমেণ্টের নগদ দামও দিতে হয়েছিল, কিন্তু তা হোক, মোটের ওপোর শেষ রক্ষেটা হয়েছিল।

সে সব যে কি দিনই গেছে! ঘটক আপন মনেই হাসলেন। কিন্তু আজকের দিনটা বড়ই বিশ্রী লাগছে। আজকের সব আয়োজনই বিফলে গেল!

হঠাৎ তাঁর মনে হোল, অনু কি ভাবছে কে জানে! ওরও ত একটা ইচ্ছা আছে, আছে একটা অনুভূতি। সে দিনের সেই উত্তাপ হয়ত এখন আর নেই কিন্তু সেও আছে, ও-ও আছে। না, এভাবে সেদিনের সেই অতি-আপনকে উপেক্ষা করা অন্যায়। শুধু কি দুটি ডাল-ভাতের জন্যই ওকে আনলুম!

তিনি উঠলেন, সিগারেটের শেষ অংশ ছাইদানে ঢুকিয়ে নিঃশব্দে

ঘরের দরজা খুলে বাইরের দালানে এলেন। দেখলেন, মায়ের ঘরের আলো নিভে গেছে, ছেলের ঘরও অন্ধকার। সেই অন্ধকার ঘরের দরজায় হ্যাণ্ডেল লাগানো দেখে বুঝলেন শ্রীমান এখনও ফেরে নি। কোথায় যায় সে ? দালানের ঘড়িতে দেখলেন দশটা দশ। এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে বাইরে কোথায় ঘোরে ? নাঃ, আজকাল ছেলেদের মর্ম বোঝা দায়! বেটা কি শেষে নকশালীদের দলে জুটল না কি ? কিম্বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলে ? আজকাল ছাত্ররা এইভাবেই নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারে।

মনে মনে ইচ্ছা ছিল অনুকে ডাকে, কিন্তু ঠিক মত সাহস পাচ্ছিলেন না। বিপত্নীক ঘটকের যোষিৎ-ক্ষুধা যে এখনও কিছু পরিমাণে আছে তা বাদল এবং ড্রাইভার দু'জনেই জানে। জানুক গে যাক, ঘটকের একমাত্র ভয় ঐ শয্যাশায়িনী বৃদ্ধাকে, ভয় বা সম্ভ্রম! ওঁর কথা বা কপাল চাপড়ানো কোনটাকে তিনি এড়িয়ে থাকতে চান তা তিনি কোন দিনই বিশ্লেষণ করেন নি, কিন্তু এটা ঠিক, ওঁর অপছন্দের কোন কাজ ঘটক প্রকাশ্যে করতে চান না। অনেক ঘা খেয়ে প্রচণ্ড বিরক্তিতে মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাইদের সঙ্গে সম্বন্ধ তিনি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু নিজের খুশি-খেয়ালের জন্য মায়ের মনে কোনরকম ব্যথা দিতে তিনি চান না। ধর্ম, পুণ্য এই সমস্ত বিষয়ে ঘটকের তেমন কোন বিশ্বাস না থাকলেও ঘটক মনে-প্রাণে মাতৃভক্ত, কারণ সেই শৈশবের শিক্ষা থেকে ঘটকের বিশ্বাস, জীবনে যাঁরা উন্নতি করেছেন তাঁরা সকলেই মাতৃভক্ত। তা ছাড়া এখন আবার তাঁর নিজের ছেলেও বড় হয়েছে, তার সামনে বাড়ীর ভেতর কোন রকম কেলেঙ্কারি নিজের জন্য কোনমতেই হতে দিতে তিনি রাজী নন।

নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ মিঃ ঘটক অন্যমনস্কের মত গাড়ী-বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন। সারা বাড়ীর মধ্যে এই জায়গাটা তাঁর অতীব প্রিয়। ফুল গাছের সাজানো টবে নানা রংয়ের গোলাপ গাছ,— সাদা, টকটকে লাল, গোলাপী, কিছুদিন আগে অনেক দাম দিয়ে সবুজ রংয়ের

গোলাপ ফুলের যে গাছ তিনি আনিয়েছিলেন সেটাতেও কুঁড়ি হয়েছে। এই গাছ খুবই দুর্লভ, এই দুষ্প্রাপ্যকে পাবার জন্য অনেক অর্থব্যয় তাঁকে করতে হয়েছে। মালী বলে, এখানকার কোনো বাড়ীতে এ জিনিস নেই, যেমন নেই গাড়ীবারাণ্ডার দু'পাশের দুই গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। নীচে থেকে দুটি সরু থামের মত উঠে গাড়ী-বারাণ্ডার দু'পাশে ঠিক যেন দুই পরীর মত ফুল নিয়ে ওরা অর্ঘ দিচ্ছে।

ফুলের টব-ঘেরা গাড়ীবারাণ্ডার মাঝখানে একখানিমাত্র ডেক চেয়ার ও কয়েকটা বেতের চেয়ার। এখানে বাড়ীর লোক বড় কেউ আসে না, আর আসবেই বা কে? ছেলে, বাপ ও শয্যাশায়ী ঠাকুরমা এই নিয়ে সংসার। মাঝে মাঝে কখনও যদি মেয়ে-জামাই আসে তা হলে একটু সোরগোল হয়। সেই তখনই গাড়ীবারাণ্ডার ডেক চেয়ারে সন্ধ্যার সময় ঘটককে আর একা থাকতে হয় না। বেতের চেয়ারে মেয়ে-জামাই বসে, ছোটো নাতনীটা লাফালাফি করে, হয়ত দু'-একটা ফুল তুলে নিজের জামায় ও চুলে লাগায়। তা ছাড়া বাকী সময় শুনশান। এতে ঘটকের কোন দুঃখ নেই, বরং এতেই তিনি বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। মেয়ে বাপের বাড়ী এলে নাতনীর হুল্লোড়ে তিনি মনে মনে বিরক্তই হন। নিঃসঙ্গতায় এমনই ভাবে তিনি আত্মস্থ, কিন্তু কেন যে আজ তাঁর মনে একটা অব্যক্ত অভাববোধ দেখা দিয়েছে তা তিনি নিজেও বুঝলেন না। অন্যদিন ধূম ও পানীয় সেবনের পর আলো নিভিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেন, আজ যে কেন দরজা খুলে বাইরে এলেন তা তিনি নিজেও ঠিক জানেন না।

ওখানে কে? অন্ধকারের মধ্যেই চক্ষু বিস্ফারিত করে নজর দিলেন ঘটক। তাঁরই ডেক চেয়ারে রাস্তার দিকে মুখ করে কে যেন শুয়ে আছে।

নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে বুঝলেন তাঁরই পরিত্যক্ত চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে আছে তাঁরই পরিত্যক্তা অনু, অনুপমা মুখার্জী।

এ অবস্থায় কি করবেন তিনি? যেমন গোপনে এসেছেন তেমনই ভাবে গোপনে চলে যাবেন কি?

যাওয়াই উচিত। যে পর্ব শেষ হয়ে গেছে তাকে নতুন করে সুরু হবার সুযোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চৌবাচ্চার মধ্যে যে বালতিটা নাগালের বাইরে চলে গেছে তাকে জলভর্তি করে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে যে ইতিহাস গোপনে রচিত হয়েছিল সেই ইতিহাসের জের টানলে নতুনধারা অনেক অশান্তি ও অতৃপ্তির উদ্ভব হতে পারে। অতএব নাগালের বাইরে যে বালতি চলে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভাল।

কিন্তু ভাল কি আর ইচ্ছেমত হয়? ভবিতব্য নতুন নতুন কাহিনীর অবতারণা করে। হঠাৎ সেই শায়িত মূর্তি ঘাড় ফিরিয়ে ঘটককে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, এখনও শোও নি? শরীর খারাপ লাগছে?

কণ্ঠস্বরে ঘটক চমকে উঠলেন। এই 'তুমি' সম্বোধন,—এ ত মনোরমার কণ্ঠস্বর নয়, এ যে অনুপমা! রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের হারিয়ে-যাওয়া সেকালের আসল অনুপমা মুখার্জী, তাঁর অনু, তাঁর প্রথম সন্তানের, গোপন সন্তানের গর্ভধারিণী।

অনু কাছে এগিয়ে এল। বল্ল, কথা কইছ না যে?

এসো, ঘটক ডাকলেন। ডেকেই পেছন ফিরে নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলেন। অনুও পেছন পেছন চল্ল।

ঘরের দরজায় পা দিয়ে ঘটক জিজ্ঞাসা করেন, মা ঘুমিয়েছে?

অনেকক্ষণ।

চারু?

সন্ধ্যের পরেই নীচে নেমে গেছে।

এখন ওপোরে আসবে না?

না। না ডাকলে আর আসে না।

বোসো।

শুবো আসবে, অনু ধীর কণ্ঠে বলেছিল।

সে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মোটর বাইকের শব্দ পাব।

হ্যাঁ।

গদী আঁটা চেয়ারে ঘটক বসলেন, সামনের চেয়ার দেখিয়ে অনুকে বল্লেন, বোসো। ঘরের দরজা খোলাই রইল। নীল আলোটা আগের মতই জ্বলছিল, পাখা ঘুরছিল এক পয়েন্টে।

আজ যে হঠাৎ মনে পড়ল আমাকে? অনুচ্চকণ্ঠে অনু প্রশ্ন করল।

নীল আলোয় ঘটকের চোখে প্রবীণার পাকা মুখে ত্রিশ বছর আগেকার কাঁচা আভাস ফুটে উঠল, সেই সঙ্গে কেমন একটা অভিমানও। ধীর কণ্ঠে বল্লেন, মনে রোজই পড়ে, কিন্তু উপায় কি! সব দিক সামলে চলতে হবে ত! তা কেমন লাগছে বল, কেমন আছ?

যেমন রেখেছ, অনু ওঁর দিকে উদাসভাবে চেয়ে ছিল।

ঘটকের কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বল্লেন, খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ।

নীচে মোটর বাইকের শব্দ হোল। অনু বল্ল, সুবো এসেছে।

হ্যাঁ। মুক্তি ও হতাশা উভয় ভাবই ঘটকের মুখে যুগপৎ দেখা গেল।

আমি উঠি, অনু উঠে দাঁড়াল।

গ্যারেজের কোলাপসিবেল গেট খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ এল নীচে থেকে।

ঘটক বল্লেন, ঘরের দরজা কি খোলা রাখব? রাতে কি আসবে?

কি হবে?

ঘটক নীরবে অনুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ঘটকের দৃষ্টিতে কোন অনুরোধ কি ফুটে ছিল! ঘটক মনে করেন, তিনি উদাসীনের মতই চেয়ে ছিলেন, কিন্তু অনুর মনে হোল সেই চাউনিতে ছিল ত্রিশ বছর আগেকার ভীরু এক যুবকের প্রার্থনা। সে

আমলের বিজয়িনী রাণীর মত তিনি বিনীত প্রার্থীকে বরদানের ভঙ্গীতে বল্লেন, ভেজিয়ে রেখ, সুবিধেমত আসব।

সুবিধে পেলেই আসব একথা কিন্তু বলে নি।

আচ্ছা, ধরা গলায় ঘটক সায় দিলেন।

অনু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই বয়সেও পায়ে তার লঘুপদের সঞ্চার। এটা এই উনিশ দিনের মধ্যে একবারও তার হয়নি। মাত্র আজই এই লঘুগতি এবং হয়ত নিছকই সাময়িকভাবে।

দেরিতে বাড়ী-ফেরা ছেলের দেরি হবার কৈফিয়ৎ তলব করার যে-ইচ্ছা ঘটকের পিতৃমনে জাগ্রত ছিল সেই ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে পাছে ছেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় সেই ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে নীল আলোটা পর্যন্ত নিভিয়ে দিলেন, কিন্তু বিছানায় গেলেন না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরে, বন্ধ দরজার ঠিক পিছনে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেলেন, সুবোর ঘরের হ্যাণ্ডেল খোলার শব্দ হোল। কিছু পরেই চটিজুতোর ফট্‌ফটানি। সুবো নীচে নেমে গেল খেতে। ঘটক আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে দরজার ছিটকানি ভেতর থেকে খুলে দিয়ে নাইলনের মশারির মধ্যে আশ্রয় নিলেন। ঘরের দরজা বন্ধই রইল, রোজ যেমন বন্ধ থাকে ঠিক সেইভাবেই। রাত্রের অতিথি বাইরে থেকে অল্প চাপ দিলে দরজাটা খুলবে এটা জেনে ঘটক ভাবলেন, কখন? কখন সেই দরজা খোলবার উপযুক্ত সময় হবে? সুবিধামত, না সুবিধা পেলে!

বহু নারীর স্বচ্ছন্দ অবাধ সম্পর্কের তুলনায় আজকের এই ভীরু প্রতীক্ষা প্রবীণ ঘটকের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাতে যেন ঘটক তাঁর জীবনের আদিযুগের আকুতি ও আকাঙ্খার পুরাতন আস্বাদ নতুন ভাবে পেয়েছিলেন। ইদানিং কালে নারী-সম্ভোগটা ঘটকের কাছে ঔষধপানের মতই হয়ে উঠেছিল। মাসের মধ্যে তিন চারটে সন্ধ্যায় তিনি অর্থের বিনিময়ে রমণীপণ্যের ক্রেতা হতেন। এখানেও তাঁর ভোগ ছিল পরিমিত এবং বাঙ্গালীর তুলনায় ফিরিঙ্গী বা জাপানীর

দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। গান বাজনার দিকে কোন ঝোঁকই তাঁর ছিল না। ওসব তিনি বুঝতেনই না। তিনি চাইতেন সুস্থ সুগঠিত দেহ। সত্য কথা বলতে কি, রোমান্টিক টেস্ট্ বা সূক্ষ্ম রুচি-বোধ তাঁর তেমন ছিল না। দরিদ্রের ছেলে অর্থমদে মাতাল হয়ে দুনিয়ার সব কিছুকেই দু'হাতে আঁকড়ে লোভনীয় নামে পরিচিত সব কিছুকেই নিজের কুক্ষিবদ্ধ করার আনন্দে তিনি মশগুল থাকতেন। যে কোন দুষ্প্রাপ্যকে পাবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতেন, দুষ্প্রাপ্যের অধিকারেই ছিল তাঁর আভিজাত্য বোধ। সেই জন্যই সবুজ গোলাপ তাঁর চাই। নীচের বড় ঘরখানা তাঁর লাইব্রেরী, সেখানে ছিল হাজার দুই দামী দামী বই, যে-বইয়ের একখানাও তাঁর কোন দিন পড়া হয় নি। তিনি নিজেই ভালভাবে জানতেন যে সেই সব বই পড়ার বিদ্যে, ধৈর্য এবং সময় কোনটাই তাঁর নেই। ঠিক বেঠিক যে-কোন পথ দিয়ে দু'হাতে উপার্জন এবং অর্জিত অর্থে আরও অধিক দুষ্প্রাপ্যের সংগ্রহ ও আরও অধিক অর্থ উপার্জন এই দুষ্টচক্রেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার দিনগুলি পর্যন্ত তিনি উর্ধ্বশ্বাসে উগ্রবেগে ছুটেছেন। হৃদয়, আবেগ, মননশীলতা এ সবের কোন ধারই তিনি ধারতেন না। ব্যবসায়িক কর্তব্য ও অধিকার, হাণ্ডার কাছে শেখা ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা, বাল্য সংস্কারাগত মাতৃভক্তি, যে ভক্তির জোরে শোনা যায় বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বহু কৃতী পুরুষ উন্নতি করে গেছেন, মা-লক্ষ্মীকে মনে মনে ভয় ও ভক্তি করা এই রকম গোটা কয়েক প্রাথমিক বিশ্বাস নিয়ে ষোল টাকা মাইনের প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার বর্তমান ঋদ্ধির শিখরে উঠে এখনও সেই বিশ্বাস অনুযায়ী চলতে চলতে আজ হঠাৎ মনের মধ্যে প্রাকসমৃদ্ধি-যুগের কৈশোর-সুলভ স্পন্দনে স্পন্দিত হলেন। এটা প্রৌঢ়া অম্বুর প্রভাব, কিংবা ঘটকের নিজস্ব অন্তর্নিহিত কৈশোর স্মৃতি দীর্ঘ ত্রিশ-বছরের মৌনতা ভঙ্গ করে হঠাৎ মূর্তি পরিগ্রহ করল কি না কে জানে! এটাই আজ বিশেষরূপে উত্তেজিত করল মিঃ বি ঘটককে, না হলে

এই ত মাত্র গত সপ্তাহে দোআঁশলা মিস্ লটির ঘরে গিয়ে তিনি গতানুগতিক আনন্দ কিনে এসেছিলেন। সেই সব রুটিনমাফিক, ওজন করা, জান্তব আনন্দ এবং দুপুরে লটির মনোরঞ্জনী প্রগল্ভতা এ সব কোন কিছুই আজকের বিকালে ঘটককে স্পর্শ করতে পারে নি, কারণ আজ তিনি উগ্রভাবে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর অভীপ্সিত প্রধান অতিথির জন্য, যাঁর অনুপস্থিতি এবং শেষ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ রক্ষার অক্ষমতাজ্ঞাপন এই অপরাহ্নটাকে ঘটকের কাছে বিরক্তি ও হতাশায় ভরে দিয়েছিল। ফেরার পথে নিজের গাড়ীতেই লটিকে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন, কিন্তু সারাপথে পাশে বসে-থাকা লটির সঙ্গে কোন কথা বলার ইচ্ছাও তাঁর হয় নি! সে কিন্তু যথাসাধ্য মন রাখার চেষ্টা করেছে, ঘটকের হাতের ভারী থাবাখানা নিজের রক্তাভ ক্ষুদ্র হাতের মধ্যে রেখে দেহ মনের উষ্ণতায় ঘটককে তাতিয়ে তুলতে কসরৎ করেছে, কিন্তু ঘটক ছিলেন নির্বিকার। উগ্র-যৌবনার আকর্ষণে যিনি ছিলেন উদাসীন, তিনিই মাত্র কয়েক ঘণ্টা পার হতে না হতেই বিগতযৌবনার সুবিধামত আশার প্রতীক্ষায় সারা দিনের কায়িক ও মানসিক এত রকম ক্লান্তি সত্ত্বেও বিনিদ্রভাবে নিজের সুখশয্যায় পড়ে রইলেন উচ্চকিত হয়ে।

সত্যিই সে রাত্রে ঘটকের ঘুম ঘটককে ছেড়ে গিয়েছিল। দালানের ঘড়িতে এগারটা বাজল, তিনি শুনলেন। বারোটাও বাজল। এবার তিনি বিরক্ত হলেন। বাড়ী ও পাড়া শুনশান হয়ে গেছে। পথচারী কুকুরের কণ্ঠস্বরে নৈশ গাম্ভীর্য সূচীত হচ্চে। অনেক পরে পরে একখানা লরী বা মোটর সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু যার আসার কথা, সে আসছে কই! তার সুবিধে কি এখনও হয় নি?

শুয়ে শুয়ে এমনই এক প্রতীক্ষার কথা মনে পড়ল। সেই রাম-কান্ত বসু স্ট্রীটের বাড়ীতে। এক শনিবার বাবা দেশে গেলেন কিন্তু বিভূ যায় নি। অন্নুর শিক্ষামত বিভু বাবাকে বলেছিল ভাল এক চাকরীর সন্ধান সে পেয়েছে, সেই চাকরীর তত্ত্বাবধানের জন্য তাকে রবিবার

উমেদারি করতে হবে এক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির বাড়ীতে ধরনা দিয়ে। কথাটা একেবারেই কল্পনা, কিন্তু বাবা সেই কথা বিশ্বাস করে একাই দেশে গিয়েছিলেন। সেই শনিবার মিঃ মুখার্জীর তারকেশ্বরে গিয়ে কি একটা কাজ করার কথা ছিল। কথা ছিল, শনিবার অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে দেশে গিয়ে রাতটা সেখানেই থেকে পরের দিন জরুরী কাজ সেরে সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরবেন, নেহাৎ আটকে পড়লে সোমবার সকালে অবশ্যই ফিরবেন। অনু অনেক করে বৃদ্ধকে বলেছিল সব কাজ চুকিয়ে আসতে, এবং সন্ধ্যা যদি হয়েই যায় তা হলে যেন রবিবার আসার চেষ্টা না করে সোমবার ভোরের গাড়ীতে আসেন। তরুণী ভার্যার জন্য বৃদ্ধ চিন্তিত হওয়ায় অনুই তাকে অনেক করে আশ্বাস দিয়েছিল এবং এই সব কথা মধ্যাহ্নের নিভৃত আলাপনে অনুই ঘটককে জানিয়েছিল। সে আমলে অনু কিন্তু অভিসারিকার ভূমিকা গ্রহণ করে নি। ঝিয়ের ঘরে ঝিকে শুতে পাঠিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরেই এমন একটি পরিচিত সংকেত সে করেছিল যেটার জন্য বিভু ঘটক নিজের ঘরে উৎকর্ণ অপেক্ষায় অধীর হয়ে উঠছিল এবং ঈপ্সিত সংকেতের পরেই সে নিজের ঘরের দরজা চৌকাঠে ন্যাকড়া দিয়ে চেপে বন্ধ করে নিঃশব্দে ওপোরের সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল। নিজের ঘরে তালা ঝোলাতে সাহস পায় নি, কারণ তা হলে পাশের ভাড়াটে হঠাৎ যদি মধ্যরাত্রে উঠে সেই তালা দেখে ফেলে তা হলে বহু রকম কৈফিয়তের ধাক্কা সইতে হ.েব। ন্যাকড়া দিয়ে চেপে বন্ধ করার কারণ ছিল হাওয়া লেগে দরজা না খুলে যায় কারণ দরজা খোলা থাকলেও সেই একই বিপদ। এত রকম ঝক্কি নিয়ে সেই নৈশ অভিসারের প্রাচীন কাহিনী সমস্তই ঘটকের মনে পড়ছিল আজ এই ত্রিশ একত্রিশ বছর পরে।

মনে পড়ল ব পরের সন্ধ্যায় বৃদ্ধের আগমনে ঘটকের নিদারুণ আশা-ভঙ্গের দুঃখ। সেই রাত্রে এমনও মনে হয়েছিল যে ঘরের জিনিস ফেলে রেখে পরের প্রত্যাশায় থাকলে এমনটাই হয়। কিন্তু ঘরের জিনিস—?

অবজ্ঞার হাসি হাসলেন মিঃ ঘটক। ঘরের জিনিস যদি নিজস্বভাবে

থাকত তা হলে ঘটকের এই সব উঞ্ছবৃত্তির দরকারই হোত না। ঘরের জিনিস ত ঘরের নয়, ঘরের জিনিস বাড়ীর। সেখানে মালিকের চেয়েও অন্যের অধিকার অনেক বেশী। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ এমনি কি প্রতিবেশী গিন্নীদের যে চিরাচরিত অধিকার বউয়ের ওপোর আছে, স্বামী নামক লোকটির সেই স্বামীত্ব স্ত্রীর ওপোর নেই। স্ত্রীদেহের স্বভাবধর্ম্মও সামাজিক সংস্কারে অনেকগুলি অতি-আকাঙ্খিত হপ্তান্তিক মিলনকে শূন্যতায় পর্যবসিত করেছে। মা-জননী ফতোয়া দিয়েছেন, তুমি দরজা দিয়ে শোও গে, বউমা আজ আমার কাছে থাকবে। সহজ সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবনের কত শত সনাতন বাধা যে এইভাবে তারুণ্যকে অন্ধকার চোরাগলিতে ঠেলে, ঘটক সে কথাই সখেদে স্মরণ করেন। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, এ ছাড়া ভার্য্যার আর কোন প্রয়োজনীয়তাই যেন নেই! সেই জন্যই কি প্রয়োজন হয় এম্‌টি হাউসের, সেই জন্যই কি প্রত্যেকটি সহরে, গঞ্জে, এমন কি গ্রামেও কতকগুলি কুখ্যাত বাড়ী গজিয়ে ওঠে। বাড়ীতে খাবার জোটে না বলেই হোটেলে ভিড় বাড়ে, পসারিনীদের পসার জমে। ধর্ম্ম ও সংস্কারের অতিরিক্ত চাপে ধর্ম্ম-সংস্কার ধুলোয় লুটায়, অধর্ম্ম ও কুসংস্কার সতেজ ও ব্যাপক হয়।

মশারির ভেতর থেকেই ঘটক দেখলেন ঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে পরক্ষণেই বন্ধ হোল। অতি সন্তর্পণে দরজাটি বন্ধ করে নিঃশব্দচারিণী মশারির পাশে এসে দাঁড়াল।

ঘটকের ইচ্ছা ছিল তিনি ঘুমিয়েই থাকবেন, আগন্তুকা তাঁর ঘুম ভাঙ্গাবে। কিন্তু অতখানি ধৈর্য আর রাখতে পারলেন না। নীরবে যন্ত্রচালিতের মতন একখানি হাত মশারির মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এবং সেই হাতকে অনুসরণ করে মশারির মধ্যে প্রবেশ করল প্রৌঢ়া মনোরমা, যে তখন তরুণী-অনুপমায় রূপান্তরিতা। দালানের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। সেটা সাড়ে বারোটা, কি একটা, কি দেড়টা কে তার খবর রাখে!

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় যার ওপোর বিরক্তি আসে, যার অদর্শনে মনটা হতাশায় ভরে যায়, তারই বাঞ্ছিত উপস্থিতিমাত্রই মনের সমস্ত বিরাগ মুহূর্ত্তেই ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়। সেই প্রতীক্ষা দয়িত-দয়িতার জন্যও হতে পারে, অফিসের জরুরী কোন চিঠির জন্যও হতে পারে, বাস্-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীর পক্ষে তার প্রয়োজনীয় বাস্-এর জন্যও হতে পারে। যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই রাগ, হতাশা, দুঃখ, কিন্তু পাওয়ামাত্রই আনন্দ। দীর্ঘপ্রতীক্ষার সমস্ত বিরাগ মুহূর্ত্তেই ঘটক ভুলে গেলেন। খাটের চার ইঞ্চি পুরু ডান্‌লোপিলোর গদির ওপোর উঠে বসলেন এবং তারই মুখোমুখি বসেছিল সেই পুরাতন অনু,—পুরাতন কিন্তু নতুনত্বের রূপে, রং-এ ও যুগসঞ্চিত আকুতিতে পরিপূর্ণ শ্রীমতী অনুপমা।

ঘরে আলো না জ্বললেও ঘর অন্ধকার ছিল না। খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার আলো ঘরের সিলিং-এ এসে সেই আলোয় ঘরের সব কিছুরই স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু যে দু'জোড়া চোখ ঐ ঘরে মধ্যরাত্রে বিনিদ্র ছিল সেই চারটি প্রাচীন চোখ পরস্পরকে ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। তাঁরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে মুখোমুখি বসেছিল এবং এইভাবে নীরবে থাকতে থাকতেই অনুর ছলছলে চোখ দুটি উপচে অবাধ্য শিশিরবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকে। বিভু ঘটক অনুরই কাপড়ের আঁচল দিয়ে সযত্নে সানুরাগে সেই অশ্রু-বিন্দু মুছিয়ে দিয়েছিলেন।

এই অশ্রু কিসের? দুঃখের, না আনন্দের, অবস্থা পরিবর্ত্তনের, না পুনর্মিলনের, সেই বিশ্লেষণ ওদের দু'জনের কেউই বোধ হয় করে নি।

সেই রাত্রে নতুন করে যে খেলা আবার সুরু হোল সেই খেলা বেশ কিছুদিন ধরেই চলতে লাগল। কেউ জানল না, জানবেও না, এই ছিল ঘটকের বিশ্বাস। ক'দিন পরে সাহস বাড়তে একথাও ভেবেছিলেন, জানুক গে যাক, কার কি? তিনি বিপত্নীক, অনু

বিধবা। আইনতঃ কোন দিক থেকে কোন অভিযোগ কোনক্রমেই আসে না। কারুর কোন ক্ষতি নেই, দু'জনের বয়সও স্থায়ী কোন ক্ষতিসাধনের ক্ষমতার বাইরে, অতএব এর মধ্যে অপরাধটা কোথায়?

জীবনের কর্ত্তব্যকে সব চেয়ে বেশী দাম দেন যে ঘটক, সেই বিচক্ষণ প্রবীণ ব্যবসায়ী এইভাবেই তাঁর নূতন অসামাজিক ব্যবহারকে প্রশ্রয় দিয়ে নিরাশ্রয় বার্ধক্যকে মধুর করার চেষ্টাই বোধ হয় করেছিলেন।

চার

মেজ বউদি, তার কাচ্চা-বাচ্চা এবং নিজের বউকে নিয়ে শম্ভু এসে হাজির হোল দেশ থেকে। বেলা তখন বারোটা।

মা বল্লেন, এসো এসো বউমা, সব ভালো ত? পরেশ কেমন আছে, সে যে বড় এলো না?

শম্ভু বল্ল, দাদা আমি দু'জনে একসঙ্গে এলে বাড়ীতে থাকবে কে? তা ছাড়া এখন সব যা হামলা সুরু হয়েছে! যখন তখন ইন্‌কেলাব বলে পার্টির নামে গুণ্ডার দল এসে লুটপাট করে পালিয়ে যায়।

ওমা সে কি? তাহলে এই দুর্মেলাইয়ের ভেতর তাকে একলা রেখে এলে?

দাদার কোন ভয় নেই, শম্ভু দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করল। দাদার হাতের লোক পার্টিতে অনেক আছে।

তাই নাকি? তা হলে ভাল, বৃদ্ধা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন। বল্লেন, তারপর কি মনে করে? এখন দিন কতক থাকা হবে ত?

দেখি কি হয়? শম্ভু উত্তর দিল।

মেজবৌ বল্ল, আজ আমাদের নিস্তারিণীর ব্রত ছিল মা, তাই ঠিক করলুম, এবার কালীঘাটে মা কালীর কাছে গিয়ে পুজো দেব আর সেই সঙ্গে আপনাকেও দেখে যাব।

বেশ বেশ, মা উত্তর দিলেন, তা হ্যাঁ বউমা, তোমরা মার মন্দিরে কখন যাবে? বেলা যে বারোটা বাজল!

সে কাজ চুকিয়ে এসেছি মা, ছোট বউ-মা উত্তর দিল। হাবড়ার ইস্তিসান থেকে আমরা সোজা গিয়েছিলুম মার মন্দিরে। সেখানে আদি গঙ্গায় চান সেরে মায়ের পুজো দিয়ে নকুলেশ্বরকে জল দিয়ে তারপর এখানে আসছি।

অ। তা ভাল ভাল। মায়ের চন্নমেত্তর আনো নি?

হ্যাঁ মা, এনেছি। কই দিদি, মাকে চন্নমেত্তর দাও, পেসাদি ফুল দাও!

মেজ বৌ বল্ল, হ্যাঁ, দিচ্ছি। কই রে, ঠাকুর পো কোথায় গেল? ঘটিটা ত তারই হাতে ছিল। ঠাকুরপো—অ ঠাকুরপো—

ঠাকুরপোর সন্ধানে মেজ বৌ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখে ঠাকুরপো দালানের চেয়ারে বসে বিড়ি ধরিয়ে চোঁ চোঁ করে টানছে।

মেজবৌ বল্ল, ঠাকুর পো, ঘটিটা কোথায় রাখলে? মাকে চন্নমেত্তর দিতে হবে যে—

ঠাকুরপো একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্ল, ঘটি? ঘটি ঐ ভিজে কাপড় গামছার সঙ্গে নীচে রেখে এসেছি।

সব্বোনাশ? দেখি তা হলে নীচে গিয়ে, ঝি-চাকরের সংসার, কেউ না আবার দয়া করে গঙ্গাজলটুকু নদ্দামায় ঢেলে দেয়!

শম্ভু বসেই রইল, মেজ-বৌ নীচে নেমে গেল এবং ক্ষণপরেই ঘটি-হাতে ওপোরে এসে মায়ের ঘরে ঢুকল।

শয্যাশায়িনী বৃদ্ধা নিজের বিছানায় উঠে বসে ভক্তিভরে গঙ্গাজলের ছিটা নিয়ে প্রথমে শুদ্ধ হলেন, তারপর জিভ বার করে দু' ফোঁটা চরণামৃত গ্রহণ করে মা কালীর স্পর্শপূত জবা ফুলের টুকরো নিজের মাথায় ও বুকে দিয়ে পুণ্যের তৃপ্তিলাভ করলেন।

ছোট বউ ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়েই ছিল। বল্ল, আপনারা মা কলকাতায় রয়েছেন, রোজই ত মা কালীর প্রসাদী ফুল পেতে পারেন—

হায় হায়, বৃদ্ধা ঐ দু'টি শব্দে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বল্লেন, তুমিও যেমন! এ বাড়ী কি আর তেমন বাড়ী আছে রে? এরা ভুলেও কেউ গঙ্গা-চান করে না। মায়ের মন্দিরে এরা যে কতকাল যায় নি তা হয়ত এদের মনেও নেই।

সে কি মা? বড় ভাসুর না হয় পাঁচ কাজে ব্যস্ত থাকে, আপনি ত

সুবোকে বল্লেই পারেন। সে কি আপনাকে মা কালীর ফুল এনে দিতে পারে না ?

হ্যাঃ, সে দেবে ফুল এনে ? বিভু বরং রোজ একবার করে সন্ধ্যের দিকে মা বলে ঘরে এসে খোঁজ নেয়, কিন্তু সুবো ? সুবো কি এদিক মাড়ায় নাকি ? সে তার পড়াশুনো, বন্ধু-বান্ধব আর ফট্‌ফটি গাড়ী নিয়ে সারাদিন মেতে থাকে। ঠাকুরমা মোলো কি বাঁচল সে খবর নেবার সময় কই তার। তা হ্যাঁরে, তোর ছেলেমেয়েরা কোথায় গেল ? তাদের আনিস্ নি ?

এনেছি মা, তবে সাবিকে রেখে এসেছি। সাবি যা হোক একটু ডাগর-ডোগর হয়েছে ত! তাকে আর কালীঘাটে ভিড়ের মধ্যে আনলুম না। তা ছাড়া এখানে যখন আসব বলে বেরিয়েছি তখন ফিরতে দু'চার দিন দেরি হতে পারে ত! এ ক'দিন ওঁর ভাত রান্না করবে কে ? সে জন্যই সাবিকে রেখে এলুম।

মা বল্লেন, ও হ্যাঁ, তাও ত বটে। তা সাবির জন্য পরেশ কোন পাত্তর-টাত্তর ঠিক করছে কি ? সাবি ত ষেটের কোলে ষোল বছরে পড়ল। তাই না ?

না মা, ওর সতেরো পার হয়ে যাচ্ছে। সামনের অঘ্রাণে আঠারোয় পড়বে।

বলো কি মেজ বউমা ? আঠারোয় পড়বে ? হ্যাঁ, তা হতেও পারে, বছর যাচ্ছে না জল যাচ্ছে। তা, তা হলে এবার ওর জন্যে পাত্তর-টাত্তর দেখো।

মেজবৌ হতাশ কণ্ঠে বল্ল, দেখব ত মা, দেখছিও, কিন্তু দেশের যা অবস্থা তা যদি আপনি দেখতেন তাহলে আপনিও অবাক হয়ে যেতেন। এক দানা ধানও এবার ঘরে তুলতে পারি নি।

কেন ? কেন ? বৃদ্ধা উত্তেজিত হলেন।

ঐ যে মা, ঐ সব লাল ঝাণ্ডারা এবার সমস্ত ধান ক্ষেত থেকেই কেটে নিয়ে গেল। তারপর সে কি কাণ্ড! বলে জোদ্দারদের মেয়ে-

কেটে খতম করব। যে চাষ করবে জমি তার। ওদের আস্কারায় ভাগ-চাষীরাও সব পেয়ে বসল। কোনো মালিকের গোলায় এক কণা ধানও এবার ভাগ-চাষীরা দেয় নি। আমাদের উনি বল্লেন, তে-ভাগা করবি ত তাই কর, তিন ভাগের এক ভাগই দে, না হয় সিকি দে, কিন্তু কে কার কথা শোনে। তারপর আমি আর ওঁকে দূরে কোথাও যেতে দিই না। যেদিন থেকে শুনলুম বীরু ঘোষের মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে—

বীরু? বীরুর মাথা কে ফাটাল রে?

ঐ লাল ঝাণ্ডিরা। বলব কি মা, বীরুর সব জমি ওরা কেড়ে নিয়েছে।

বলো কি গো? তার ত অনেক জমি ছিল!

ছিলই ত! যখন ঐ পঁচাত্তর বিঘের বেশী রাখা বেআইনী হয়ে গেল তখনই ত বীরু কিছুটা বিক্রী করে ফেল্ল, আর বাকীটা নিজের নামে, নিজের পরিবারের নামে, ছেলে-মেয়েদের নামে, এমনি করে যা শুনি প্রায় তিনশ' সাড়ে তিনশো বিঘে মোট রেখেছিল। এখন তার কিছু নেই। কতক তার বর্গাদাররা কেড়ে নিয়েছে আর কতক নিয়েছে পার্টির লোকেরা। বীরু, বীরুর দুই ছেলে, ওর সেই মাসতুত ভাই, সেই যেটাকে এনে রেখেছিল, সব ক'টাকে মেরে পাট্ করে দিয়েছিল। ওরা সবাই কোনরকমে সেরে ঘরে ফিরে এসেছে, কিন্তু শুনছি যা, বীরু আর তার ছোট ছেলে এখনও বর্দ্ধমানের হাসপাতালে পড়ে পড়ে শুষছে।

ও মা, সেই বীরু ঘোষের এই হাল? কি সব্বোনাশ! তবে এও বলি মেজ বউমা, ভগবানের বিচার ঠিকই হয়েছে। বীরুর বড় বাড় হয়েছিল। দর্পহারী মধুসূদন কারও দর্প রাখেন না। ঐ পুব পাড়ার সখের ডাঙ্গায় আমার শ্বশুরের আমল থেকে বিঘেটাক জমি আর অক্রুর পাঁজার সেই ভাঙ্গাচুরো ভিটেটা যেটা অক্রুরের হাত-চিঠির দরুণ তোমার শ্বশুর নামজারি করে নিয়েছিলেন সেখানে পাঁচটা ফলন্ত নারকোল গাছ, আটটা মোটা মোটা তালগাছ, শুধু তালের কাঁড়ি বিক্রী করলেই ধর

গিয়ে তোমার এক একটা কাঁড়ির দাম কম করেও চার সাড়ে চার টাকা হোত, সেই ডাঙ্গাটা মায় ভিটেশুদ্ধ কি রকম ফিকির করে নিয়ে নিল। তখন আর বীরুর কত বয়স গো! তখন সে ছেলেমানুষ, ওঁকে ডাকত খুড়ো মশাই বলে। আসতে যেতে পায়ের ধুলো নিত, কিন্তু কি রকম দম দিয়ে জমিটা কেড়ে নিল। সে সব তোমরা কিছুই জানো না। তোমরা তখন কোথায়! আমার ঐ বিভুই তখন আট বছরের ছেলে।

ওরা কিনে নেয় নি মা? প্রশ্ন করল ছোট-বৌ। ওরা যে বলে কিনে নিয়েছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ কেনা মানে ফাঁকি দিয়ে কেনা। ঐ অতটা জমির দাম কি তিরিশ টাকা? গাছগুলো বিক্রী করলেই তিরিশ টাকা হোত। কিন্তু দেখে-শুনে বিক্কিরিটা করবে কে? তাঁর ছিল উদয়াস্ত আপিস, আর আমি তখন ঘরের বউ, বেরুতুম না। ভাসুর, দেওর, সবাই তখন আমার শত্তুর। তোমার শ্বশুর বল্ল, ঐ জমি ওদের হাত থেকে রক্ষে করার ক্ষমতা আমার নেই। ভালোয় ভালোয় যা দেয় তাই নিয়ে কওলা করেই দি। তা এই ভাবে ব্রাহ্মণকে ঠকিয়ে নিলে কি আর থাকে? ওর গেছে বেশ হয়েছে, যাবেই ত। এই থেকেই বোঝো বউমা যে ভগবান আছেন, এখনও চন্দর-সূয্যি উঠছে। বেহ্মস্ব হরণ করা সহজ কথা নয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে অনু এসে এ ঘরের দরজায় দাঁড়াল। মেজ বৌ শাশুড়ীকে প্রশ্ন করল, ইনি? এঁকে ত চিনছি না।

শাশুড়ী বল্লেন, ওকে তুমি চিনবে না মেজবৌ, ও এই মাস দুয়েক হোল এসেছে। ও-ই আমাকে দেখাশুনা করা, ওষুধ খাওয়ানো, মালিশ করা এই সব করে।

রাতদিন থাকে?

হ্যাঁ। রাতদিন থাকবে না ত যাবে কোথায়? ও থাকে, ওর এক ছেলেও থাকে—

তা হ্যাঁ মা, আপনার রান্নাবাড়া কে করে? প্রশ্ন করল ছোট বৌ।

ঐ মনোরমাই করে। আমার আর রান্না কি বলো, এক মুঠো ভাত, আর একটুখানি ঝোল,—ও-ই কোন রকমে ফুটিয়ে-মুটিয়ে দেয়।

অ। তাহলে চেনা জানা ঘর থেকে এনেছেন বলুন। ভালো বামুনের ঘরের, না হোলে ত আপনার রান্না করতে পারবে না।

ঐ যা বলো, তবে আমার ঠিক চেনা নয়, বিভুর যেন কি রকমের চেনা ছিল। বিভুই ওকে এনেছে।

অনু নিঃশব্দপদে দালানে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। এ রকম কথায় সে অভ্যস্ত ছিল আগের দুই মনিব বাড়ীতে, কিন্তু এখানে—এখানেও সেই এক অবস্থা! ছিঃ—

সে রাত্রে ছেলে মেয়ে নিয়ে মেজবো রইল মায়ের ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে, শম্ভু ও ছোট বউয়ের শোবার ব্যবস্থা হোল একতলার গেস্টরুমে, অনুকে যেতে হোল তার ছেলের ঘরে। খোকা মাকে পেয়ে যতটা খুসি হয়েছিল ততটা অসুবিধা হোল বিভু ঘটকের। একটানা এক মাসের ওপোর যে অভ্যাসটা হয়ে গেছে সেটায় ছেদ পড়ল এমনই অপ্রত্যাশিত ভাবে।

বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে শুয়ে বিভূর মনে পড়ল একমাসের ওপোর তিনি বাইরে কোথাও যান নি। গার্ডেন পার্টিরও হপ্তাখানেক আগে সেই যে লটির ঘরের রুটীনমাফিক সন্ধ্যাটা তিনি কাটিয়ে এসেছেন সেই তাঁর এখনও পর্য্যন্ত বহির্বিলাসের শেষ সন্ধ্যা। ভেবেছিলেন,—না না, এমন কিছুই ভাবেন নি,—বাইরে যাবার কথাটা তাঁর মনেও পড়ে নি এই এতগুলো দিন। আজই একলা হতাশ শয্যায় শুয়ে শুয়ে মনে হোল গত পাঁচ সপ্তাহে তাঁর কম করে দু'শো আড়াইশো টাকা বেঁচে গেছে। হপ্তায় গড়ে একদিন হিসেবে তিনি যেতেন তাঁর নর্ম্মবিলাসে, তাঁর সেই দিনের বাজেট ছিল কম বেশী পঞ্চাশ টাকা। গত পাঁচ সপ্তাহে এই অপব্যয়টা তাঁর হয় নি। আজ তাঁর এটাকে অপব্যয় বলেই মনে হচ্ছে, না হলে এতদিন এটাকে অপব্যয় বলে মনেই করেন নি। নিজেকে

ফিট্ রাখতে, কর্ম্মক্ষম রাখতে, মনকে সতেজ রাখতে এই ব্যয়টা তিনি করতেন, কিন্তু তিনি এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন যে, এ বিষয়ে তিনি হাণ্ডার মত বেহিসেবী ছিলেন না। তাঁর বাণিজ্যগুরু মিঃ হাণ্ডা এসব ব্যাপারে ছিলেন রীতিমত উচ্ছৃঙ্খল, যেমন বিলাসে তেমনই মদ্যপানে। ঘটক কোন দিনই তেমনটা নন। আজ তাঁর মনে হোল, বাড়ীতে পুরোপুরী একাদশী না হলে যেটুকু দোষ তাঁর হয়েছে সেটুকুও হোত না। এই গত একমাসের মধ্যে বাইরে যাবার দরকারটা তাঁর যেমন হয় নি তেমনই অভাবনীয় ভাবে পানীয়ের খরচও তাঁর কমেছে। এ জন্যও দায়ী ঐ অনুপমা। নর্ম্মবিলাসে প্রৌঢ়া অনুপমা একত্রিশ বছর আগেকার উষ্ণ-মাধুর্যে আজও যেমন পরিপূর্ণা, ঠিক সেইভাবেই সে তার সে-আমলসুলভ ব্যক্তিত্বে ঘটকের সুরাপানের বিরোধিতা করেছিল। ছিঃ, ও সব কি ভদ্রলোকের কাজ! মুখ দিয়ে কি যাচ্ছে তাই গন্ধ বেরোয়! ঘটক হাসতে হাসতে বলেছিলেন, একটু চেখে দেখ, তখন বুঝবে এর স্বাদ। চোখ পাকিয়ে অনু বলেছিল, বলতে লজ্জা করে না, এত আস্পদ্দা ভাল নয়। ঘটক দমে গিয়েছিলেন; ভয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। অসহায় আশ্রিতার ধমকে আশ্রয়দাতা সসঙ্কোচে পিছিয়ে এসেছিলেন।

আজ একলাটি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘটকের মনে হোল, বাস্তব অবস্থা যতই বদলাক না কেন, অনুর সঙ্গে নিভৃতে একত্র হলেই ঘটক যেন কেমন এক অভিনব উপায়ে রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাড়ীতে একত্রিশ বছর পূর্বেকার পটভূমিতে উপস্থিত হন, যেখানে অনুর হুকুম তামিল করতে, কৃপা ভিক্ষা করতে, বর্ত্তমানের দেহলাবণ্যশূন্যা নিঃস্ব অনুর মন রাখতে প্রবীণ ধনী ব্যবসায়ী, আত্মপ্রতিষ্ঠ বি ঘটকের বিন্দুমাত্র দ্বিধা ত হয়ই না উপরন্তু নিজেকেই অনুর আশ্রিত ভেবে কেমন এক অভাবনীয় আনন্দে মশগুল হন। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, সে কালে অনুর সান্নিধ্য ও তাড়না তাঁকে যত আকর্ষণ করত, এ কালের অনু বোধ হয় যেন সে তুলনায় প্রৌঢ় ঘটককে আরও অনেক বেশী আকর্ষণ করছে।

অনুসাগরে ঘটক যেন সম্পুর্ণভাবে তলিয়ে গিয়ে রত্নাকরের সমস্ত ঐশ্বর্য দু'হাতের অঞ্জলি ভরে আপ্রাণ সংগ্রহ করেন।

ভাবতে ভাবতে মনে হোল, খোকাকে যে ডাক্তার দেখছেন তিনি সেদিন কথায় কথায় যা বলেছিলেন সেটা বোধ হয় ওঁর পক্ষেও প্রযোজ্য। ডাক্তার বলেছিলেন, মানুষের মনের নানা রকম কম্‌প্লেক্সের কথা। একই জিনিস শুনতে শুনতে, ভাবতে ভাবতে মানুষের মস্তিষ্কে স্থায়ী সব কমপ্লেক্স তৈরী হয়। খোকার মনের একমাত্র কম্‌প্লেক্স, সে পরমহংসের অবতার। অন্য কোনরকম চিন্তা, ভাবনা, সঙ্গ এবং আধুনিক শিক্ষা একেবারে না থাকায় সেই কম্‌প্লেক্সই তার স্বাভাবিক বুদ্ধিকে সম্পুর্ণ চাপা দিয়ে এই রকম অর্ধ-বাতুল অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। এর চিকিৎসা হবে নিরবছিন্নভাবে বাস্তব সাজেসন অর্থাৎ অভিভাব দিয়ে মনের ভুল ছাপটা মুছে দেওয়া। ঘটকের মনে হোল, তাঁর নিজের মনেও এককালের গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী অনুপমা মুখার্জী যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই অমোঘ প্রভাব যৌন আকর্ষণের প্রাবল্যে ও দীর্ঘকালের অবচেতন মনে না-পাওয়ার স্মৃতিচারণে অনুরূপ কম্‌প্লেক্স তৈরী করে এমনই কায়েম হয়ে বসেছে যে ত্রিশ বছরের সমস্ত উত্থান পতন নস্যাৎ করে, বর্ত্তমানের প্রকট বাস্তবকে সম্পুর্ণরূপে উপেক্ষা করে অনুর সান্নিধ্য ঘটককে মুহূর্ত্তেই যোধপুর পার্কের প্রাসাদ থেকে, চার ইঞ্চি পুরু ডান্‌লোপিলোর গদি ও নিয়ন লাইট থেকে রামকান্ত বসু স্ট্রীটের একতলা ঘরের মেঝেয় পাতা মাদুর ও হ্যারিকেনের ভুষো-পড়া আলোয় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এতে কিন্তু ঘটকের কোন ক্ষোভ নেই, বরং লোভ আছে, এ যেন তাঁর কাছে সাময়িক বায়ু পরিবর্ত্তন,—বড় মধুর, বড় লোভনীয়, অতি-বড় বাঞ্ছিত এই কতিপয় ঘণ্টার জন্য ফিরে-পাওয়া প্রথম যৌবনের সেই সশঙ্ক মিলন, কিন্তু—কিন্তু আজ সে আসবে না, তার আসার পথ বন্ধ। বাড়ীতে ভাই-ভাদ্দর বৌ-রা এসেছে। কে কখন ঘর থেকে বেরুবে তার ঠিক নেই। সে জন্য এক সময় অনুর সঙ্গে এক মিনিটের সাক্ষাতে ঘটকই তাকে বলেছিলেন, ওরা

যে ক'দিন থাকবে সে কটা দিন বাদ দিতেই হবে। অনু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল, মুখ ফুটে কিছুই বলে নি।

এইভাবেই কেটে গেল একরাত, দু'রাত, তিন রাত। আগন্তুকদের যাবার নাম নেই। ঘটক উস্‌খুস করতে লাগলেন, ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কতদিন, আর কতদিন ঐ দল এইভাবে তাকে বিরক্ত করবে? দেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে, দেশের বিষয়-আশয় সব কিছুতে না-দাবী লিখে ভাইদের নিঃস্বত্বভাবে সব কিছু দিয়ে তিনি চলে এসেও তাঁর নিস্তার নেই। বেশ ত, কলকাতায় এসেছিস, দু'দিন থাকলি, মাকে দেখা শোনা করলি, আর কেন? এবার চলে যা, কিন্তু কই, যাবার নামও ত কেউ করে না! চতুর্থ সন্ধ্যায় ঘটক মায়ের কাছে কথায় কথায় জানতে চাইলেন, ওরা কবে যাচ্ছে?

অমায়িক কণ্ঠে মা বল্লেন, এসেছে, থাক; ছেলে মেয়েগুলো ফুর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে, বউমারা আমাকে যত্ন-আত্তি করছে, এত তাড়া কিসের? তা ছাড়া পরেশেরও কোন অসুবিধে ত নেই! বড় মেয়ে সাবিত্রী তার দেখা শোনা করছে, কোনো দিকে কোন কাজ ত কারুর আটকাচ্ছে না!

ঘটক মনে মনে প্রমাদ গনলেন। তাহলে মা-ই ওদের ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

পরের দিন সকালে ঘটক নীচের ঘরে নামবার পর মালী এসে দরজার কাছে দাঁড়ল।

ঘটক মুখ তুলে চেয়ে বল্লেন, কি রে জগা, কি খবর? কিছু বলবি?

মালী ঘরে ঢুকে ইতস্তত করে বল্ল, বলছিলুম কি বাবু, ঐ ছোট ছোট ছেলেদের একটু বলে দিন, ওরা বড্ড গাছ নষ্ট করছে। একটা ফুল ওরা কোথাও রাখতে দিচ্ছে না। ওপোরের টবের গোলাপগুলো ওরা কুঁড়ি পর্য্যন্ত সব ছিঁড়ে নিচ্চে, কাল এক লাঠির মাথায় কাঠি বেঁধে আঁকশি করে তাই দিয়ে গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার ফুলটা নষ্ট করেছে, আজ সকালে

আমি এসে দেখি, বড় কাঁচিটা বার করে এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে কচি পাতাগুলো সমস্ত কেটে চারদিকে ছড়িয়েছে। বলতে গেলুম, তাতে ছোটবাবু বল্লেন, ছেলেমানুষ করেছে ত কি হবে! মেজ মা বল্লেন, গাছের ফুল তুলেছে ত কি হয়েছে! তুমি যেমন মানুষ তেমন থাক, খচ্‌খচ্‌ কোরো না। তাই বলছিলুম বাবু, কেয়ারি নষ্ট হলে আমাকে দোষ দেবেন না।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও, আমি দেখছি, চারদিনের উপবাসী ঘটক গম্ভীর কণ্ঠে মালীকে বিদায় দিলেন।

বাদল এসে মাথা চুল্‌কে বল্ল, বাবু, বাজারের টাকা আর নেই।

কেন? এই ত পরশু—

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। কিন্তু কি করব, রোজ আড়াই কিলো মাছ আনতে হচ্চে। মাছের দাম এখন সাড়ে সাত টাকা, সেজন্যে—

রোজ আড়াই কিলো মাছ? ঘটক বিস্মিত হলেন। এত কেন?

বাদল বল্ল, এর কমে ঠাকুর সামলাতে পারে না। তা ছাড়া আলুও আড়াই কিলোর কমে হয় না, আগে এক কিলো আলুতেই হয়ে যেত। এর ওপোর আজই আবার ব্ল্যাক থেকে চাল আনতে হবে।

ড্রামে চাল নেই? ঘটক জিজ্ঞাসা করলেন।

না বাবু, ড্রাম শেষ। ওঁরা সবাই দু'বেলা ভাত খান। তারপর ঘি ময়দা সবই আনতে হবে। ময়দাও সেই ব্ল্যাক থেকে—

দু'বেলা ভাত খেলে ঘি ময়দা খরচ হয় কি করে? কি করিস্‌ তোরা?

আমরা কি করব বাবু? রোজ বিকেলে সবাই লুচি খান যে! তাও কম না, পেট ভরে চাই। র‍্যাশনের গম ভাঙিয়ে যে আটা হয় সেই আটার লুচি ওঁরা খান না, ওঁদের জন্য ময়দা চাই-ই চাই। আপনি বাজারের টাকা যা দিয়েছিলেন তাতে আমি কোনদিক সামলাব?

একরাশ বিরক্তিতে মুখখানা কালো করে টেবিলের টানা থেকে মনি

ব্যাগ বার করে ঘটক তিনখানা দশটাকার নোট নিয়ে বাদলের হাতে দিয়ে বল্লেন, হিসেব দিস্।

বাদল ক্ষুণ্ণমনে বিদায় নিল। আজকালকার চাকরদের মত বেইমান সে নয়। বাজারের পয়সা থেকে চুরি সে করে না। ঐ দু'একটা সিগ্রেট সে নিজের জন্য কেনে, কিম্বা কোন কোন দিন আর পাঁচটা অন্য বাড়ীর চাকরকে দেখিয়ে পথের ধারের ভিখারীকে পাচ-নয়া কি দশ-নয়াটা ফেলে দিয়ে নিজের উদার আভিজাত্যের পরিচয় দেয় কিন্তু বেশী চুরি কখনও করে না, এবং ওই যেটুকু নেয় সেটুকুকে সে চুরি বলে মনেও করে না। তার বিশ্বাস, বাবু নিজে বাজারে এলে এর চেয়ে বেশী দান খয়রাৎ করতেন, সিগারেটের খরচ ওর চেয়েও বাবুর বেশী হোত, তার ওপোর বাড়তি পুড়ত তেল। বাবুও বাদলকে বিশ্বাস করতেন। একেবারে এক হপ্তার মতন বাজারের টাকা দিয়ে দিতেন, কোন হিসেবও চাইতেন না। সেই বাবুই আজ কি না তিরিশটে মাত্র টাকা দিয়ে তার আবার হিসেব চাইছেন, অথচ সে জানে তার কোন অপরাধই নেই।

তা বাদলের সেই উষ্মাটা গিয়ে পড়ল ঠাকুরের ওপোর। বাজার যাবার আগে সে ঠাকুরকে বল্ল, ঠাকুর ভাই, এবার তোমায় কম করে ফর্দ দিতে হবে, বাবু সব হিসেব চেয়েছেন।

ঠাকুর বল্ল, ঠিক আছে। আমি কিন্তু পরিবেষণ করতে পারব না। ঐ যে মেজবৌদি এসে দাঁড়িয়ে বলবেন, ওকে বেশী করে মাছ দাও, ওকে আর এক বাটি বাড়তি তরকারি দাও, এ সব আমি কোথা থেকে পাব? তুমি যে এত করে বাজার আনছ তাতেও বুঝে দেখ, আমাদের জন্য কতটুকু থাকে। কাল পরশু দু'দিনই আমাদের ভাগে কি রকম টানাটানি গেছে জানো ত?

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘটক অফিসে যান বেলা দশটায়। পৌনে দশটায় ওপোরে ওঠেন, দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় নিখুঁত সাহেব সেজে নীচে নেমে আসেন। গাড়ী তৈরী থাকে। তিনি গিয়ে

গাড়ীতে ওঠেন। এ বিষয়ে তিনি পুরাতন প্রথাই বজায় রেখেছেন। দুপুরে লাঞ্চ খাবার অভ্যাস করেন নি। ড্রাইভার কাটা ফলের ফ্লাস্ক এবং ঘোলের সরবতের ফ্লাস্ক গাড়ীতে আগেই রেখে দেয়, সাহেবের দুপুরের টিফিন। আজ খোকার ডাক্তারের চেম্বারে যাবার দিন। সেও তৈরী হয়ে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘটক ওপোরে উঠতে উঠতে দেখেন, সুবোর ঘরের হ্যাণ্ডেলে তালা ঝুলছে। দেখেই ঘটক থম্‌কে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, বাদল—বাদল।

বাদল দৌড়ে এল।

এঘরে তালা কেন রে? সুবো কোথায় গেল?

বাদল বল্ল, দাদাবাবু গ্যারেজে গাড়ী খুলে কি যেন করছেন।

রাগতঃস্বরে ঘটক বল্লেন, যায়নি কোথাও? বাড়ীতেই আছে?

আজ্ঞে।

তা হলে ঘরে তালা কেন? ডাক্ তাকে।

ঘটক ঘরে ঢুকে গেলেন।

বাড়ীর এ-ঘরে ও-ঘরে তালা দেওয়াটা ঘটক আদৌ পছন্দ করেন না। এই তালা মানেই বাড়ীর লোককে সন্দেহ করা! এ কি মেস্ বাড়ী, না হোটেল! ছি ছি, সুবোটা দিন দিন কি হচ্ছে! নীচে গ্যারেজে গেছিস, ওপারে তালা দিয়ে –

আপন মনেই গজরাতে গজরাতে মোজা পরা শেষ করে প্যান্ট পরলেন।

মোটর-বাইকের তেল কালি দু'হাতে মেখে সুব্রত বাবার ঘরের দরজার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে ধীর কণ্ঠে ডাকল, বাবা?

ভেতরে আয়, রুক্ষ ভাবেই ঘটক ছেলেকে ডাকলেন।

সুব্রত ঘরে ঢুকল।

তুই ঘরে তালা দিয়েছিস্ কেন? যত সব বদ্ অভ্যেস। ড্রেসিং আলমারি থেকে জামা বার করে গায়ে পরতে পরতে ঘটক ভ্রুকুটী করলেন।

সুবো বল্ল, না দিয়ে উপায় নেই বাবা। ওরা যখন তখন আমার ঘরে ঢুকে এটা ওটা টানাটানি করে। তুমি জানো, রেডিওগ্রামের ভলুম কণ্ট্রোলের চাবিটা ভেঙ্গেছে, সুচিত্রা মিত্রের একটা রেকর্ড ফাটিয়েছে—

কে? কে এ সব করছে? সুবোর মুখের দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন ঘটক। জামার বোতাম লাগাতে ভুলে গেলেন।

তেল-কালি-লাগা হাতখানা ঘুরিয়ে সুবো বল্ল, কে করেছে কে জানে? ছোট কাকাকে বলতে ছোট কাকা খেঁকিয়ে উঠল।

কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে ঘটক বল্লেন, আচ্ছা তুই যা।

সুবো পেছন ফিরেই আবার ঘুরে দাঁড়াল। বল্ল, কথা যখন উঠল তখন আরও বলি বাবা, কাকীমারা পান খেয়ে আঙ্গুলের চুন দেওয়ালে দু'চার জায়গায় মুচেছে, দরজাতেও মুচেছে, ছোট কাকা গাড়ীবারাণ্ডার কোনে নিয়মমত পানের পিচ্ ফেলে। এ সব বিষয় কিছু বল্লে ওঁরা রাগ করেন, তাই আমি কিছু বলি না, কিন্তু—

আচ্ছা তুই যা, আমি দেখব'খন।

সুবো চলে গেল। ঘটক পোষাক পরা শেষ করে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নামলেন না। দালানে বেরিয়ে রেডিওগ্রামের ভলুম কণ্ট্রোলের দিকে চেয়ে দেখলেন, ঐ চাবিটা নেই, শুধু কাঠিটা বেরিয়ে আছে, আর —আর রেডিওগ্রামের গায়েও চুনের দাগ, ডিস্টেমপার করা দেওয়ালেও কে চুন মুচেছে, চুন মুচেছে পালিশ করা চকচকে দরজাতেও।

চোখ মুখ লাল করে ঘটক গাড়ী বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন। গোলাপ গাছের একটাতেও একটা কুঁড়ি পর্য্যন্ত নেই। নীচে থেকে উঠে এসেছে যে ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা তাতেও ফুল নেই। তার মাথাটা ছেড়া-খোঁড়া গোছের। ঐ যে মালী বলেছিল, আঁকশি তৈরী করে তাই দিয়ে গাছের মাথাটা টানাটানি করা হয়েছে সেই কথাই ঠিক। দিনের বেলায় তিনি বড় একটা গাড়ী বারাণ্ডায় আসেন না, রাতে আসেন তাই দেখতে পান নি। এখন এই দশটার সময় এসে দেখলেন তাঁরই চেয়ারে বসে বসে কেউ পানের পিক্ ফেলে ছাতের

মেঝে এবং কয়েকটা ফুল গাছের রং-লাগানো টব পানের পিকের লাল দাগে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে।

ভূত, জানোয়ার, মনে মনে গর্জ্জন করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ড্রাইভার দেখল এবং খোকাও যেন বুঝল, ঘটকের মুখে আজ প্রশান্তি নেই।

সত্যই ঘটক সেদিন মনে মনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। পল্লীবাসী দরিদ্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বি ঘটক দারিদ্র্যকে ভালভাবেই চেনেন। কৃপণ এবং অভাবী পিতার কঠোর কৃচ্ছ্র নির্দেশে সস্তার তক্তপোষটিও না কিনে একতলার ভিজে মেজেয় মাদুরে শুয়ে বহু রাত্রি পিতাপুত্রে অতিবাহিত করেছেন। সে সব কথা আজও ভোলেন নি। বর্ত্তমানে বাজারের সেরা সেরা আসবাব কিনে বাড়ী তিনি সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু সাজালেও বাড়ী ও আসবাবকে অন্য ধনীর মত ভোগ যে করেন তা বোধ হয় ঠিক নয়। দামী দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করা এবং সেইগুলিকে যথাযথভাবে নূতন রাখাই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় ভোগ। ডানলোপিলোর দামী মাথার বালিশে দিনের বেলায় সিল্ক-ফিনিস্ তোয়ালে চাপা দেওয়া থাকে, রাতে কিন্তু সাধারণ একটা আধ-ময়লা তোয়ালে চাপা দিয়ে মাথা রাখেন। নিজের দামী বিছানায় রাতে শোবার আগে একখানা পুরাতন লুঙ্গি চাদরের ওপোর পেতে তার ওপোর শয়ন করেন পাছে দামী চাদর তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায়। ওঁর দামী ধোপদস্ত পোষাকের ভেতর যে গেঞ্জি এবং অন্তর্বাস থাকে সেগুলো কিন্তু দরিদ্রসুলভ। সব কিছুকে অটুটভাবে রক্ষা করাই যাঁর আনন্দ তিনি আজ মর্মাহত হলেন চুনের দাগে, পানের পিকে, ভলুম কণ্ট্রোলের চাবির অপঘাতে। সমস্ত মনটা তিক্ত বিষাক্ত হোল। সারাদিনের নানা রকম কাজেও তিনি নিজের বাড়ীর ওপোর লক্ষ্মীছাড়া আনাড়ীদের যে অত্যাচার হয়েছে তা কোনও ক্রমে ভুলতে পারলেন না।

সন্ধ্যায় যথারীতি মায়ের ঘরে গিয়ে বসে তিনি দু'একটা কথা বলেই বেরিয়ে এসে খোঁজ করলেন, শম্ভু কোথায় ?

দালানে দাঁড়িয়ে ছিল অনু। সে বল্ল, ওরা আজ কেউ নেই। সবাই মিলে বায়োস্কোপে গেছে।

খবরটা পেয়ে তিনি আবার মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, বল্লেন, শম্ভুরা সব সিনেমায় গেছে ?

হ্যাঁ, মা উত্তর দিলেন।

সবাই মিলে ?

হ্যাঁ।

কে পয়সা দিল ? তুমি দিয়েছ বোধ হয়।

তা দেব না ? বৃদ্ধা উত্তর দিলেন। কলকাতায় এসেছে, একটু আমোদ করবে না ?

এই ত সেদিন আমার গাড়ী নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল !

তা যাবে না ? ওরা সব তোমারই ভাই ভাই-পো ত ? আর ত কেউ নয় !

তা বুঝলুম, কিন্তু ওরা আর ক'দিন থাকবে ? রেডিও ভেঙ্গে, গাছ ছিঁড়ে, দেওয়াল নষ্ট করে কি যে কাণ্ড করেছে তা তুমি জানো ? দৈনিক বাজার খরচ চারগুন বেড়ে গেছে।

ঝি চাকরের হাতে সব কিছু ছেড়ে রাখলে ঐ রকমই হয়, বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, পরের হাতে সংসার ফেলে রাখলে সুসার তুমি পাবে কোথায় ?

ও রকম কথা বলো না মা। আমার সংসার বহুদিন ধরেই ঝি-চাকরের হাতে, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত অবস্থা ওরা আসার আগে ত হয় নি !

লোক এলেই খরচ বাড়ে। ঐ যে তোমার মনোরমাকে রেখেছ ওর জন্যে খরচ হয় না ? ওর ছেলের জন্য ? হ্যাঁরে, ওকে রোজ রোজ মটরে নিয়ে কোথায় যাস্ ? আবার শুনি, ও একা গাড়ীতে ফিরে আসে দুপুর নাগাত।

ওকে একটা কাজে লাগিয়েছি। সেই কাজেই ওকে নিয়ে যাই।

কাজ ? বৃদ্ধা বিভুর মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে বল্লেন, তবে যে শুনলুম ওকে কোন্ ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দিয়ে যাস্।

যাই-ই ত। দৃঢ়ভাবে ঘটক বল্লেন, ডাক্তারের কাছেই ওর কাজ।

কি কাজ করে ও? কি জানে ও যে ডাক্তারের কাছে কাজ করবে? কত পায়?

সে তুমি বুঝবে না মা। ও এখন কাজ শিখছে, চেষ্টাকৃত সহজ সুরে ঘটক উত্তর দিলেন।

নিঃশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে শুয়ে বৃদ্ধা বল্লেন, সেই জন্মই বলেছিলুম, বাইরের লোক রেখে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ নেই। এখনও বলছি, তুই এখনও ভেবে দেখ, ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে শম্ভু আর ছোট বউমাকে এইখানে রেখে দে। দুটো বাইরের লোককে না পুষে নিজের ভাই ভাদ্দর বৌকে রাখলে সব দিকেই সাশ্রয় হবে। সেই সঙ্গে শম্ভুটার কোন কাজ যদি জোটাতে পারিস তা হলে ওটারও একটা হিল্লে হবে। ছোট বৌমাও বলছিল—

কে কি বলছে তাতে আমার দরকার নেই মা। আমার এখানে আমি যা ভাল বুঝব তাই করব। ঐ যে নীচের ঘরটা ওরা দখল করে রেখেছে, আমি জানি না, ঐ ঘরের কি হাল ওরা করেছে। খুব শিগ্‌গিরই আমার কারবারের ব্যাপারে একজন দিল্লী থেকে আসবে। সে ঐ ঘরে হয়ত দিন দুই থাকতে পারে। ওরা ঐ ঘরে চেপে বসে থাকলে ত চলবে না!

বৃদ্ধা ওঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে বল্লেন, হ্যাঁরে বিভু, এমন কথা তুই বলতে পারলি? আমার সামনে এ কথা বলতে তোর মুখে আটকালো না? ভাই ভাদ্দর-বৌ একতলার একখানা ঘরে দু'দিন আছে তাতেই তুই হাঁপিয়ে উঠলি! দিল্লী থেকে কে আসবে সে হোল ভাইয়ের চেয়েও আপন? তা ছাড়া এত বড় বাড়ীতে দু'একজন বাড়তি লোক এলে যদি আতান্তরে পড়তে হয় তা হলে এত বড় বাড়ী রেখে কি লাভ? আমাদের ওখানে ওঁরা সব ভেন্ন হবার পর আমাদের

ভাগে ছিল মোট দু'খানা পাকা ঘর আর এক চিল্‌তে দালান। সেখানে সেবার লড়াইয়ের সময় বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে আটজন লোক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ে ক'মাস ধরে যে ছিল সেটাও কি ভুলে গেছিস্? কথায় বলে, যদি হয় সুজন—

মায়ের কথায় বাধা দিয়ে ঘটক বল্লেন, সে আমলের কথা ছেড়ে দাও মা। কবে কি হয়েছে তাতে আমার দরকার নেই। দেশের সব ছেড়ে দিয়ে আমি একলা এসে এখানে আস্তানা গাড়লুম, এখানেও যদি ওরা এসে কায়েম হয়ে বসে আমার জিনিসপত্র নষ্ট করে—

নিজের কপালে চাপড় মেরে বৃদ্ধা বল্লেন, হা আমার কপাল! তুই আমায় এত করে সারিয়ে তুল্লি কেন বাবা? আমি না থাকলে ত ওরা আসত না! তুমি তোমার পছন্দর লোক নিয়ে আরামে থাকতে! বলে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো, তোর হয়েছে তাই। বাইরের লোককে রাখতে খাওয়াতে তোর গায়ে লাগে না, যত লাগে নিজের ভাই ভাইপো-দের জন্য। তবু আমি এখনও মরি নি! এখনই এই?

রাগত ভাবে ঘটক বল্লেন, বেশ, তা হলে ত বুঝেছ, আমি কি। আর কিছু বলার দরকার নেই। এবার ওদের ভালোয় ভালোয় বিদেয় দাও।

একটু থেমে বল্লেন, কিছু মনে কোরো না, ওদের আমি কালই চলে যেতে বলব।

সেই সঙ্গে আমারও যাবার ব্যবস্থা করে দিও, অন্য দিকে চেয়ে মা উত্তর দিলেন।

ঘটক বল্লেন, তুমি এই শরীর নিয়ে কোথায় যাবে? যে লোক ঘর থেকে বেরুতে পারে না, সে যাবে সেই দেশ-পাড়াগাঁয়ে!

কি করব? যেতে আমায় হবেই। মরি বাঁচি ভাবলে ত চলবে না!

কেন? তোমার কি এখানে অযত্ন হচ্ছে? ওখানে গেলে কি তুমি এখানকার চাইতেও বেশী আরামে থাকবে?

বৃদ্ধা সখেদে বল্লেন, তুমি এত বড় জ্ঞানবান ছেলে হয়ে যদি এরকম অবুঝের মতো কথা বল তাহলে তোমাকে বোঝাবার ক্ষমতা কি আমার আছে? তোমার ঐ মনোরমা আমার করে কি? ঐ অচ্ছেদ্দার ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না। সে জায়গায় দুই বৌ এই ক'দিন ধরে আমার যা করছে, তাতে আমার আদ্ধেক রোগ ওদের সেবাযত্নেই সেরে গেছে।

কেন, মনোরমা তোমার কিছু করে না? ডেকে জিগেস করি ওকে? ও গেল কোথায়?

না বাবা, থাক। হাত তুলে বৃদ্ধা বিভুকে ক্ষান্ত করলেন।

ঘটক উত্তেজিত ভাবে বল্লেন, না না, যা শুনলুম, তা ত চাপা দিয়ে রাখা যায় না! এখনই এর ফয়েস্‌লা হওয়া চাই।

খোলা দরজা দিয়ে মনোরমা ঘরে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বোধ হয় সে বাইরে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছে।

বৃদ্ধা বল্লেন, তুমি এখন যাও মা, আমি একটু ছেলের সঙ্গে কথা বলছি।

বিভু বল্লেন, তুমি মায়ের যত্ন-আত্তি কর না?

বরাবরই করছি, মেঝের দিকে চোখ রেখে মনোরমা উত্তর দিল, আমার মা বেঁচে থাকলে তাঁকেও আমি এর চেয়ে বেশী যত্ন করতে পারতুম না।

হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, তুমি যত্ন কর, তোমার যথাসাধ্যি কর, আমি কি 'না' বলছি। তবে এইটুকু বল্‌ছি যে, বউদেরও ত শাশুড়ীকে সেবা-যত্ন করতে ইচ্ছে হয়। এই আর কি? তুমিও কর, তারাও করে। বৃদ্ধা মনোরমাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু মা, তারা ত ক'দিনই শুনছি বাইরে বাইরে বেড়িয়ে বেড়ায়। পরশু সারাদিন চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল, তার আগের দিনেও কোথায় যেন কোন কুটুম্ব বাড়ী গিয়েছিল—

ঘটকের কথায় বাধা দিয়ে বৃদ্ধা বল্লেন, তা যাবে না? তারা ত

তোমার মত সকলের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে এখনও পারেনি, তাই এখনও যাওয়া-আসা করে—

বেশ, তা করুক, আমি বারণ করছি না, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে—

তোমার কথা আমি খুব বুঝেছি বাবা, খুব বুঝেছি! যে ক'টা দিন আমি থাকি সে ক'টা দিন আর অশান্তি কোরো না। দয়া করে ওরা যতদিন থাকতে চায়, থাকতে দাও। তারপর ত পষ্টই বুঝতে পারছি তুমি ওদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখবে না।

ধীর স্পষ্ট কণ্ঠে মনোরমা বল্ল, এক কাজ করুন মা, আমার সেবা-যত্ন যখন আপনার পছন্দ হচ্ছে না তখন আপনি ওদেরই রেখে দিন, দিয়ে আমাকে ছুটি দিন। আমি আমার পুরাণো জায়গায় ফিরে যাই।

তুমি থামো, ধমকের সুরে ঘটক মনোরমাকে থামাতে গেল—

মা বল্লেন, তুমি আসার আগে বিভুকে আমি সেই কথাই বলেছিলুম মা, তা ও কি শুনল? ভাই ভাদ্দরবৌ যে ওর বিষ! ওর পয়সা হয়েছে, তারা গরীব, এই তাদের অপরাধ, আর ত কিছু নয়!

অসহায় ঘটক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে ঘটক ডাকলেন শম্ভুকে। বল্লেন, কলকাতার কাজ তোদের মিটল?

শম্ভু বল্ল, কাজ? কাজ আর কি এমন আছে এখানে?

তবে? তবে আর এখানে আছিস কেন?

হাই তুলে হাতে তুড়ি দিয়ে শম্ভু ধীরে সুস্থে বলল, থাকলেও হয়, গেলেও হয়। এ জন্য ব্যস্ত হবার কি আছে?

তোদের ঐ ঘরখানা আমার কারবারের লোকজন যারা দু'চার দিনের জন্য কলকাতায় আসে তাদের জন্যই আলাদা করে রেখেছি। দু'এক-দিনের মধ্যেই দিল্লী থেকে একজন আসবে, তার জন্য ঘরটা আমার চাই। কথাগুলো ঘটক ধীরে ধীরে বল্লেন।

ঘরটা? তা বেশ ত, ঘরটা তুমি নিয়ে নাও। এক কাজ কর-না, মনোরমা যে ঘরটায় থাকে সেটা আমাদের দিয়ে দাও, আমাদের অসুবিধে হবে না, ওটাতেই আমরা থাকতে পারব।

ওরা? ওরা কোথায় যাবে?

ওদের ত,—কাল শুনছিলুম মা না কি বলেছে ওকে ছাড়িয়ে দেবে? ঘটককে নীরব দেখে শম্ভু বল্ল, তা ছাড়াও ওদের যদি রাখতে চাও তা হলে ঐ বাদল, ঠাকুর, ড্রাইভাররা পেছনের যে ঘরগুলোয় থাকে, ঐ সব ঘরের যে কোন একটায়—

ওখানে আর ঘর কোথায়? ভ্রূকুটী করে ঘটক প্রশ্ন করলেন।

কেন, চারু ত একখানা ঘরে একা থাকে। ঐ ঘরে মনোরমা থাকবে, আর ওর ছেলেটা ঐ ঘরে থাকায় যদি চারুর অসুবিধা হয় তা হলে ও বাদলদের ঘরে থাকতে পারে। এতে ওদের আপত্তি হওয়া উচিত নয়!

তোমরা তা হলে এখানেই এখন থাকবে? কি বল?

মায়ের ত সেই রকমই ইচ্ছে। আর মায়ের এই অবস্থায় ওঁর মনে কোন রকম কষ্ট দেওয়া কি উচিত? তুমিই বলো।

ঘটক দমে গেলেন। একটু ভেবে বল্লেন, আমি বলব? আচ্ছা বেশ, আমার কথা যদি শোন, তাহলে আমি বলি এই যে তোমরা এখন দেশে ফিরে যাও। আবার যখন দরকার বুঝব তখন খবর দিলে আসবে। এমন ত দূর নয়।

দূর অবশ্য নয় কিন্তু তা হলেও খরচ ত আছে। এই ধর না কেন, একবার সবাই মিলে আসতে কম করেও প্রায় ষোল টাকার মত খরচ পড়ে গেল। মিছিমিছি বারবার যাতায়াত করতে গেলে—। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

শম্ভু বল্ল, তা ছাড়া এখন আমার হাতে ফিরে যাবার ভাড়াও নেই, এবং এবার তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, ধান একটাও ঘরে তুলতে পারি নি। সহরের মত সমস্তটি কিনে খেতে হয়। দুটো গরু রয়েছে, তাদের খড়

পর্যন্ত কিনতে হচ্ছে। মেজদা তবু যা হোক কিছু উপায় করে, কিন্তু আমি ত একদম বসা।

পরেশ এখন করছে কি ?

মেজদা ঐ কাছারিতে যাতায়াত করে। পার্টির মামলা মোকদ্দমা তদ্বির ক'রে যা হোক ছু'পয়সা আনে, কিন্তু আমি ত—

পরেশ মুহুরীর কাজ করে ?

না, ঠিক মুহুরী নয়, কোন উকীলের নিজস্ব হয়ে কিছু করে না, তবে আমাদের গ্রামের এবং পাশাপাশি আর পাঁচখানা গ্রামের লোকজনের মামলা মকোদ্দমায় সাহায্য করে, উকীল-টুকিল ঠিক করে দেয়। এই ভাবে টুক্‌টাক কাজ ক'রে তার চলে, কিন্তু আমার ত ওখানে কিছু হোল না, তুমি যদি এখানে আমার কোন কাজ-টাজ দেখে দিতে পারো—। আজকাল ব্যাকিং ছাড়া কোথাও কিচ্ছুটি হবার জো নেই। তোমার ত এখানে নানা জায়গায় চেনা শোনা,—শম্ভু দ্বিতীয়বার হাই তোলে, দ্বিতীয়বার হাতে তুড়ি দিতে থাকে।

আমি তোমার কোন কাজ যোগাড় করতে পারব না, রাগতস্বরে ঘটক উত্তর দিলেন, তুমি আন্‌এম্‌প্লয়েড নও, তুমি আন্‌এম্‌প্লয়েব্‌ল্‌ !

শম্ভু ঘাড় হেট করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে ঘটক বল্লেন, কাজ কেউ কারুর জোগাড় করে দিতে পারে না। ওটা নিজেকে করে নিতে হয়। আমার কাজ কে আমাকে জুটিয়ে দিয়েছিল ?

কেন, বাবা ? তিনি তোমাকে পড়িয়ে পাশও করিয়েছিলেন, কলকাতায় এনে তাঁর নিজের সাহেব বাড়ীতে কাজও পাইয়ে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু সে কাজ আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি। এই যা কিছু করেছি সমস্তই নিজের চেষ্টায়।

শম্ভু চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিজের হাতের নখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

ঘটক বল্লেন, শোনো, মাকে কিছু বলতে যেয়ো না! আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। গোটা কুড়িক টাকা আমি দিচ্চি, তাই নিয়ে রাহাখরচ করে দেশে যাও। এর পর আমি না ডাকলে তুমি আসবে না। বুঝেছ?

কুড়ি টাকায় কি করে হবে?

কেন? এই ত বল্লি, আসার সময় ষোল টাকা খরচ হয়েছে।

সে ত গাড়ী ভাড়া! যাবার সময় কয়েকটা জামা কাপড় কিনে নিয়ে না গেলে খুব অসুবিধে হবে। আমার এবং তোমার বউমায়ের পরনের কাপড় সমস্ত ছিঁড়ে গেছে—

আচ্ছা আচ্ছা, আর বলতে হবে না। টাকা চল্লিশ দিচ্ছি, তাই নিয়ে যা হয় কর।

পঞ্চাশ দাও, তা নইলে—

ঠিক আছে, পঞ্চাশই দেব। তা হলে ঐ কথাই ঠিক রইল ত? আজ দুপুরে চলে যাবি, কিন্তু দয়া করে মায়ের কাছে সাতখানা করে লাগাস্ নি যেন। বুড়োমানুষ, মনে কষ্ট পাবে।

মাকে ত বলতেই হবে, ধীরে ধীরে শম্ভু বলেছিল।

হ্যাঁ, তা বলবি। বলবি যে অনেকদিন হোল এসেছি, এবার দেশে যাব। মা ত আর তোদের আসতে বলে নি, তোরা একদিনের জন্যে কালীঘাটে এসেছিলি। কালীঘাট হোল, আত্মীয়দের বাড়ীতে ঘোরা হোল, মাকে দেখাশুনা করলি, এবার দেশে যাবি, এতে আর মায়ের বলার কি আছে?

আচ্ছা, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শম্ভু সায় দিল।

তা হলে যা, এবার আমি আমার কাজ করি, ঘটক টেবিলের ওপোর থেকে একটা ফাইল টেনে নিলেন।

টাকাটা? হাত বাড়াল শম্ভু।

বেরোবার সময় দিয়ে যাব।

ধীরপদে শম্ভুচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ন'টা বাজল। জরুরী কাজ সেরে ঘটক ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করছেন, সুব্রত মুখ লাল করে ঘরে এসে ঢুকল। বাবা—

কি? কি হয়েছে?

তুমি এসে দেখ, ঐ নিতাইটা কি কাণ্ড করেছে। এখন না দেখলে পরে তুমি সকলকে বাকাবকি করবে।

কি হয়েছে কি? বলবি ত?

বাইরের ঘরের টেবিলে পাতা বাঘছাল থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ লোম কাঁচি দিয়ে কেটেছে।

বলিস কি রে? মরিসন্ এণ্ড কটল্ থেকে ট্যান করা অমন সুন্দর জিনিসটা—

দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে সেণ্টার হল্-এর টেবিলের ধারে এসে ঘটক মাথায় হাত দিলেন। ডগা-ভাঙ্গা ছোট একটা কাঁচি পড়ে আছে। সুব্রত বল্ল, দেখ, এই কাঁচিটা দিয়ে এই কাণ্ড করছিল, তাড়া দিতে পালিয়েছে।

ইস্, এমন সুন্দর কানটাও যে কেটে দিয়েছে। কোথায় গেল হতভাগা, ডাক্। ইচ্ছে করে ছোঁড়াটাকে আছড়ে মারি।

মেঝেয় পড়ে থাকা বাঘের কানের টুকরোটা তুলে নিয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে সুবোও ঘাবড়ে গেল। বাবার এই মূর্তি সে কখনও দেখেছে বলে স্মরণ করতে পারে না।

কিন্তু নিতাইকে ডাকাও হোল না, আছাড় দেওয়াও হোল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বি ঘটক বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

চোখের জল মুছতে মুছতে মেজ বৌমা শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বল্ল, মা আপনি আমাদের থাকতে বল্লেন—।

সে আর বলতে পারল না, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেল্ল।

কি, কি হয়েছে মেজ বৌমা, অমন করছ কেন? কি হয়েছে বলো—বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর জপের মালাটা হাত থেকে পড়ে গেল।

কান্না-জড়ানো কণ্ঠে বৌমা বল্ল, ভাসুরঠাকুর নিতাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বলছেন, মর, মর, মরুক সব। সক্কালবেলা কি রকম সব শাপমন্যি দিচ্ছেন—। বলছেন সামনে পেলে আছ্‌ড়ে মারব।

মেজ বৌমা আবার কাঁদতে লাগল।

কেন? কেন? কি অপরাধ হোল নিতাইয়ের! খামোকা এ রকম কথা সে বলবে কেন? তা হলে নিশ্চয়ই কেউ কিছু লাগিয়েছে ওর কানে।

ছোট কাঁচের গেলাসে এক গ্লাস হরলিক্স নিয়ে মনোরমা পাশের ঘর থেকে বৃদ্ধার ঘরে এসে ঢুকল।

বৃদ্ধা কড়াভাবে ডাকলেন, মনোরমা, বিভুর কাছে নিতাইয়ের নামে কি লাগিয়েছ?

সবিস্ময়ে মনোরমা বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বল্ল, লাগিয়েছি? কি লাগিয়েছি? আমার সঙ্গে ওঁর আজ দেখাই হয় নি।

তা হলে কে আর কি লাগাবে? খামোকা বিভু আমার নিতাইকে গালমন্দ করছে কেন? দুধের ছেলে, ওর এমন কি অপরাধ হোতে পারে—

অপরাধীর ন্যায় মনোরমা বল্ল, আমি বরং বাদলকে ডেকে দিই মা, আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন। সে নিশ্চয়ই জানে কি হয়েছে। তার আগে আপনি এই হরলিক্সটা খেয়ে নিন—

রেখে দাও তোমার হর্লিক। ও সব আমায় খেতে আর বোলো না। এই অশান্তির বাড়ীতে আমি আর এক মিনিটও থাকতে চাই না, বৃদ্ধা কেঁদে ফেল্লেন।

মনোরমা ইতস্তত করে গেলাসটা মেজবৌয়ের দিকে এগিয়ে ধরে বল্ল, এটা ধরুন মেজদি, মাকে গরম গরম দিন, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি বাদলকে ডাকি।

মেজবৌ গেলাসটা নিতেই মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে বাদলকে ডাকতে লাগল।

বাদল হাঁটে না, দৌড়য়। নীচে থেকে তিন লাফে সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে এসেই বল্ল, ডাকছেন কেন জেঠাইমা, কি হয়েছে ?

মা ডাকছেন।

বাদল ঘরে এসে ঘরের থম্থমে আবহাওয়াটা লক্ষ্য করেও যেন কিছুই হয় নি এমনই ভাবে বল্ল, ডাকছেন ঠাকুরমা ?

হ্যাঁ, কড়াভাবে জবাব দিলেন বৃদ্ধা, নিতাই কি করেছে যে তোমাদের বাবু তাকে গাল-মন্দ করছে ?

তা ত জানি না, বাদলের সপ্রতিভ উত্তর। তারপর সন্দিগ্ধভাবে বল্ল, বাবু বকাবকি করছেন ? বাবু ত কাউকে কখনও বকেন না।

বকেন কি না মেজবৌমাকে জিজ্ঞাসা কর। যার বাড়া নেই মরার গাল দিয়ে ঐ এক রত্তি দুধের ছেলেকে যা নয় তাই করছে। ব্যাপার কি খোঁজ কর। বিভুকে ডাকো।

বাদল ঘর থেকে এক লাফে বেরিয়ে গেল।

মেজবৌ দুধের গেলাসটা এগিয়ে ধরতেই বৃদ্ধা বল্লেন, ও তুমি ফেলে দাও, ওসব আমার মুখে আর ছোঁয়াব না। আজ আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করবো তবে ছাড়ব। তোর বাড়ীতে দুদিনের জন্য এসেছে বলে এত হেনস্তা! তুই না জেঠা, বাপেরও বড়, ছি ছি!

বৃদ্ধা হাঁপাতে লাগলেন।

আপনি শুয়ে পড়ুন মা, আপনি শুয়ে পড়ুন। অসুস্থ দুর্বল শরীরে—

মনোরমার হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধা বল্লেন থামো থামো, আর আত্তি দেখাতে হবে না। এ বাড়ী আমার কার? এখানে আমার কে আছে ? এক গাদা বাইরের লোক পুষে—

বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে শুয়েই পড়লেন। আপন মনেই বলতে লাগলেন, আর কেন ? আর কেন এই পড়ারি ভোগ! ঠাকুর, এবার আমায় নিয়ে নাও! ঢের সুখ ভোগ হয়েছে আমার, এবার আমায় এখান থেকে বিদেয় দাও! বড়মানষির মুখে ঝাঁটা মারি। এর চেয়ে আমার সেই গরীবানি সংসার ঢের ভাল ছিল, ঢের শান্তিতে বাস করতুম।

বাথরুম থেকে বেরোবার পর বাদল বল্ল, ঠাকুরমা আপনাকে ডাকছিলেন—

কেন রে? ঘটক প্রশ্ন করলেন।

কি জানি?

কি জন্য ডাকছেন জানিস না? ঘটক পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

জানি না বাবু, তবে খুব রাগ করছেন। গলা নীচু করে বল্ল, আপনি বুঝি নিতাইকে কি বলেছেন সেই ব্যাপারে—

ও,—রাসকেল, জানোয়ার কোথাকার! তুই দেখিস্ নি, ঐ চামড়াখানা কিভাবে নষ্ট করেছে?

দেখেছি বাবু।

খিচিয়ে উঠে ঘটক বল্লেন, দেখেছিস ত বলিস নি কেন?

বাদল বল্ল, আপনি দেখার পর আমি দেখেছি।

কোথায় থাকিস, সকালে গিস্‌লি কোথায়?

ছোট কাকাবাবুর কাজে গিয়েছিলুম। তিনি পাঠিয়েছিলেন।

কোথায়?

তিনি—তিনি—সে আমি বলতে পারব না।

ঘটক কথা বলতে বলতে চিরুণীটা হাতে নিয়েছিলেন। বাদলের উত্তরে তীরবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লেন, তার মানে? বলতে পারব না মানে কি? তুই আমার লোক, না তার লোক?

ঘাড় হেঁট করে বাদল বল্ল, তিনি পাঠিয়েছিলেন সেই মোড়ের দোকান থেকে বিড়ি আনতে।

মোড়ের দোকান থেকে বিড়ি? কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে ঘটক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন। কেন, সামনের দোকান বাবুর পছন্দ হয় না বুঝি?

ঘটক আরশির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে লাগলেন। বাদল আর একবার মনে করিয়ে দিল, ঠাকুরমা ডাকছিলেন আপনাকে।

শুনেছি, ঘটক নিজের মনেই চিরুণী চালাতে লাগলেন।

সেদিন সকালে ইচ্ছে করেই ঘটক মায়ের ঘরে গেলেন না। আহারাদি শেষ করে পোশাক পরে বেরোবার সময় দেখেন শম্ভু দাঁড়িয়ে আছে। ঘটক ওর দিকে চেয়ে দেখতেই সে বল্ল, টাকাটা কি এখন দেবার স্থবিধে হবে ?

হ্যাঁ, নিয়ে নাও। গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলে কোটের ভেতরের পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে গুনে গুনে পাঁচখানা নোট নিয়ে শম্ভুকে দিয়ে বল্লেন, কোন ট্রেনে যাচ্ছ ?

দেখি, কোনটায় স্থবিধে হয়। বিকেলে অনেক গাড়ী আছে।

শম্ভু দেখল, বড়দার ব্যাগে বেশ কয়েকটা একশ' টাকার নোটও আছে। লোলুপ হয়ে সেই দিকে চেয়ে ছিল।

আজও খোকার ডাক্তারবাড়ী যাবার দিন। সে গাড়ীর কাছে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খোকার পাগলামিটা অনেকখানি কমে সে এখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। গাড়ী স্টার্ট দেবার পর সে বল্ল, ডাক্তারবাবু সেদিন বলছিলেন আমাকে বিকেলের দিকে একা একা বেড়াতে। আজ যাব মামাবাবু ?

হ্যাঁ, যাবে বইকি। এ ক'দিন যাওনি ?

না।

কেন ?

ডাক্তারবাবুর কথা মাকে বলেছিলুম। মা বল্লে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার কথামত কাজ করতে।

জিজ্ঞাসা করো নি কেন ?

আপনি ব্যস্ত থাকেন তাই আর আপনাকে বিরক্ত করিনি। ভেবেছিলুম, গাড়ীতে আবার যখন দেখা হবে তখনই জিজ্ঞাসা করবো।

খোকার ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তায় ঘটক খুসি হলেন। বল্লেন, হ্যাঁ, আজ থেকে বিকালে একা একা বেরিও, তবে গাড়ী ঘোড়া দেখে খুব সাবধানে যাবে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে খোকা বল্ল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব মামাবাবু?

বলো-না, কি বলবে বলো, সস্নেহে ঘটক অভয়বাণী দিলেন।

আমাকে নাকি এবার থেকে বাদলদার ঘরে থাকতে হবে?

ঘটক চমকে উঠলেন। মুখে বল্লেন, কে, কে তোমাকে এ কথা বল্ল?

ড্রাইভার একবার মাত্র মুখ ঘুরিয়ে আবার রাস্তার দিকে নজর দিল।

মায়ের কাছে শুনলুম? মেজ কাকীমা নাকি মাকে বলেছেন।

ঘটক কোন উত্তর দেবার আগেই খোকা বল্ল, তাহলে আমার বড় কষ্ট হবে মামাবাবু। মায়েরও কষ্ট হবে। মা দুঃখু করছিল।

না না, কোন ভয় নেই। ও সব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। তোমরা যেমন আছ তেমনি থাকবে।

আনন্দে খোকা দুল্‌তে লাগল। বল্ল, মাকে তা হলে তাই বলব।

তারপর খোকা আপন মনেই বলতে লাগল, মা যেন কি! কোথায় কি শোনে আর লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে!

কাঁদে না কি?

হুঁ। মাঝে মাঝেই মা কাঁদে। এই আজই আমি যখন আপনার সঙ্গে বেরুব বলে জামা পরছিলুম তখনও ত মা কাঁদছিল।

কেন রে?

তা জানি না। তবে মা বল্ল, ক'দিন আর গাড়ী চড়বি, ক'দিন আর ডাক্তার বাড়ী যাবি?

এ কথার মানে? ঘটক চাপা গলায় বোধ হয় যেন ড্রাইভারকে না শুনিয়ে প্রশ্ন করলেন।

কি জানি? মা কি ভাবে মা-ই জানে!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে খোকা বল্ল, আচ্ছা মামাবাবু, ডাক্তার বাবু যখন আমাকে হেঁটে বেড়াতে বলেছেন, আপনিও বল্‌ছেন, তা হলে আমি কেন ডাক্তার বাবুর বাড়ী থেকে ফেরবার সময় হেঁটেই বাড়ী ফিরি-না? তা হলে গাড়ীর জন্যে আর আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না।

ব্যাপারটা ঘটক বুঝলেন। পরশু এবং তারও কয়েকদিন আগে জরুরী কাজের চাপে গাড়ী ছাড়তে ঘটকের দেরি হয়েছিল। ডাক্তারের সিটিং শেষ হয়ে যাবার পর খোকাকে ডাক্তারের বাইরের ঘরে বসে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আজও গাড়ীর জরুরী কাজ আছে। খোকার প্রস্তাবে ঘটক উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, একলা বাড়ী ফিরতে পারবে? রাস্তা হারাবে না ত?

কি যে বলেন? বিজ্ঞের হাসি হেসে খোকা বল্ল, এতদিন যাতায়াত করছি আর রাস্তা চিনতে পারব না? খুব পারব।

বেশ, তাহলে আজ আর গাড়ী পাঠাব না! ডাক্তারের সঙ্গে গল্প-গাছা হয়ে গেলে একা একাই বাড়ী যেও, কেমন! খুব সাবধানে যেও কিন্তু।

হুঁ, খোকা হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

ডাক্তারের বাড়ীর ফুটপাথের সামনে গাড়ীখানা দাঁড়াতেই খোকা গাড়ীর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে দরজা বন্ধ করে বল্ল, যাই মামাবাবু?

এসো। তা হলে আজ আর গাড়ী আসবে না?

না, আমি হেঁটে বাড়ী ফিরব।

সকাল থেকেই ঘটকের মনটা বিগড়ে ছিল। খোকার ব্যবহারে ঘটক আজ এই প্রথম আনন্দ পেলেন।

ঘটক আনন্দ পেলেন, কিন্তু বেলা বারোটার পর খোকা যখন এক-গা ঘেমে বাড়ী ফিরল তখন অনুপমা বল্ল, এত ঘামছিস্ কেন রে? চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে!

সোৎসাহে খোকা বল্ল, জানিস্ মা, না না, জানো মা, আজ আমি ডাক্তারের বাড়ী থেকে হেঁটে ফিরলুম।

মাকে তুই বলতে নেই এই শিক্ষা খোকা কয়েকদিন আগেই পেয়েছে। অতিরিক্ত উৎসাহে মাঝে মাঝে ভুলে যায়, আবার মনে পড়লে শুধরে নেয়।

মা বল্ল, আজ গাড়ী যায় নি?

না মা, আমি আজ মামাবাবুকে বল্লুম হেঁটে বেড়াবার কথা। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তাই ডাক্তারের বাড়ীতে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন, আজ আর গাড়ী আসবে না। আমিও বল্লুম, ঠিক আছে। জানো মা, আমি আজ রাস্তা দেখতে দেখতে দিব্যি চলে এলুম। একটুও ভুল হয় নি।

অনুপমা কোন উত্তর দেয় নি। তার চোখ দুটো ছল্‌ছলিয়ে এল। মনে হোল, সবাই এক, সবাই পর, এবং যে পর সে পরই থাকে, কিন্তু বিভুও কি ভুলে গেল! রক্তের সম্বন্ধ কি এতই সহজে ভোলা যায়!

আবার ভাবল, ভিখারী, পরের আশ্রিত, তার জন্য যা করেছে তাই ঢের, কিন্তু তবু একটা হাহাকার ভেতর থেকে গুমরে গুমরে ওঠে।

অনুপমা নিজের আঁচলে চোখ মুছল।

সেদিন ঘটক সকাল-সকাল বাড়ী ফিরলেন। অবাঞ্ছিতকে পকেট থেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা গাঁটগচ্ছা দিয়ে বিদায় করতে পেরেছেন, সেই রকম একটা মুক্তির আনন্দ হয়ত তাঁর অবচেতন মনে ছিল, তা ছাড়া আজই বিকেলে দিল্লীর ট্রাঙ্ক কল পেয়েছেন। ট্রাঙ্ক কলে শ্রীবাস্তব কয়েকটা কথা জেনে নিয়ে জানিয়েছে, কাল শনিবার বিকালের ফ্লাইটে সে কলকাতায় আসছে। দমদম এয়ারপোর্টে সন্ধ্যে সাড়ে আটটায় পোঁছবে। শ্রীবাস্তব এমনই একটা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর যে-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঘটকের অনেক কিছু লাভের আশা। ব্যবসায়ী মিঃ ঘটক এই সংবাদের প্রতীক্ষায় ক'দিন ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। পরম সমাদরে ফোনেই শ্রীবাস্তবকে নিমন্ত্রণ করলেন নিজের বাড়ীতে থাকার জন্য এবং সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় দমদম এয়ার পোর্টে নিজে গাড়ী নিয়ে রিসিভ করতে যাবেন সে কথাও জানালেন। শ্রীবাস্তব ওঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সহাস্যে জানিয়েছিল, এ ত নতুন কিছু নয়, ঘটক সাহেবের বাড়ীতে এর আগেও সে অতিথি হয়ে তিন রাত্রি বাস করে গেছে। সত্যি শ্রীবাস্তব লোকটি ভাল। এর আগে ঘটক

শ্রীবাস্তবের কাছ থেকে দফায় দফায় এত কাজ পেয়েছে যার মোট মুনাফা ষাট হাজার টাকার কম নয়।

সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে মিঃ ঘটক দু'টো ট্যানার্স-এর দোকানে গিয়ে খোঁজ করলেন, বাঘছালটার কোনো হিল্লে হয় কি না। দু'জনেই জানাল, যে সব লোম কাঁচি দিয়ে কাটা হয়ে গেছে সেগুলোর কিছু হবে না, কিন্তু যে কানটা কাঁচি দিয়ে কাটা হয়েছে সেই কানটা রিফু করা চলতে পারে যদি ঐ কাটা টুকরোটা থাকে। ঘটকের মনে হলো, কাটা টুকরোটা তিনি সুবোর হাতে দেখেছিলেন। সে ওটা হাতে করে কুড়িয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তারপর সেটাকে সে রাখ্‌ল কিম্বা ফেলে দিল, ঘটকের তা খেয়াল নেই। ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে ঘটক বাদলকে সামনে পেয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, সুবো কোথায় রে? সে কি বেরিয়েছে?

বাদল বল্ল হ্যাঁ।

বাঘের কাটা কানের কথা জিজ্ঞাসা করতে বাদল বল্ল, দাদাবাবুর হাতে দেখেছিলুম। তিনি কোথায় রেখেছেন জানি না।

অতএব মীমাংসা হোল না।

ঘটক বল্লেন, বাদল, গেস্ট্‌রুমটা রেডি করে রাখবে, কাল রাতে এক সাহেব আসবে। সাহেব ভেজিটেরিয়ান।

কথাটা বলতে বলতেই ঘটক সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠতে লাগলেন। বাদল কি বল্ল তা আর তিনি কান দিয়ে শুনলেনই না। ও আর শোনার আছেই বা কি! ঘর সাফ করার জিনিসপত্র, মেঝে পালিশ, ব্রাসো, ভীম পাউডার, জানলা দরজার ধোপদস্ত পরদা, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সমস্তই বাদলের জিম্মায়। এ সব ব্যাপারে ওকে কিছুই বলতে হয় না। খাবার বন্দোবস্ত ও-ই ঠাকুরকে দিয়ে সব করিয়ে রাখবে, শুধু আমিষ কি নিরামিষ সেইটুকু বলাই যথেষ্ট। পরম স্বস্তিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘটক নিজের ঘরে ঢুকলেন অফিসের পোষাক ছাড়তে। ড্রাইভার গাড়ী থেকে খাতাপত্র নিয়ে পেছন পেছন এসে

একতলার অফিস ঘরের টেবিলে সেগুলো নামিয়ে দিয়ে গ্যারেজে গাড়ী তুলতে চলে গেল।

ওপোর থেকে মনোরমা ডাক দিল, বাদল!

যাই জেঠাইমা।

মা ডাকছেন, মনোরমা আহ্বানের কারণটা বাদলকে জানিয়ে দিল।

বাদল ওপোরে যেতেই বৃদ্ধা বল্লেন, গাড়ী ফিরল রে? বাবু ফিরেছে ত?

হ্যাঁ ঠাকুরমা।

তা হলে ঐ গাড়োয়ানকে বল্, ও যেন গাড়ী না তোলে। আজ এরা কোথায় যেন থিয়েটারে গেছে। থিয়েটার ভাঙ্‌বে দশটার সময়, ওদের আনতে যেতে হবে, নইলে রাত্তিরে ছেলেপিলে নিয়ে কষ্ট পাবে।

মাথা চুলকে বাদল বল্ল, কোন্ থিয়েটারে ঠাকুরমা?

কে জানে বাবা, আমার নামটা মনে নেই, ঐ মনোকে জিগেস করে নে বাবা, ওকে বলে গেছে। এ কি আর আমাদের আমোল আছে যে মনে থাকবে। আমাদের সময়ে আমরা—

জেঠাইমা, কোন থিয়েটার? বাদল মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করল।

মনো বল্ল, বালিগঞ্জে কোথায় মুক্তাঙ্গন আছে, সেই মুক্তাঙ্গনে। ভাঙ্‌বে বল্ল রাত দশটায়। সাড়ে ন'টার পরে যেন গাড়ী যায় এ কথা তাঁরা বলে গেছেন।

বাদল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধা বল্লেন, যা বলছিলুম মনোরমা, শোনো। আমার ঐ বিভু তখন তিন বছরের, পরেশ পেটে, সেই সময় ঠাকুরজামাই ধরে বসল কলকাতায় থিয়েটার দেখতে যেতে হবে। যাব না যাব না করেও ওদের সঙ্গে যেতে হোল। সেই গিয়েছিলুম এস্টার থিয়েটারে। বিল্বমঙ্গল হয়েছিল। তোমায় কি বলব মনোরমা, এত সুন্দর হয়েছিল, এখনও যেন চোখ বুঝলে দেখতে পাই। বিল্বমঙ্গল, জনা, আর একটা কি যেন হাসির বই হয়েছিল, সে ছাই

খালি মদ খাওয়া আর মাতলামি,—কি যেন নামটা, আহা মনে পড়েও পড়ছে না, ঐ যে কি একাদশী, সে একটা বিচ্ছিরি নাম—

সধবার একাদশী বুঝি, মনোরমা উত্তর দিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, সধবার একাদশী। তুমিও দেখেছ বুঝি? কি বিচ্ছিরি নাম বলো ত! সধবাতে আবার একাদশী করে? সে বইটা একেবারে যাচ্ছেতাই। জনাটাও সুবিধের নয়, মেয়েমানুষের অত দাপাদাপি আমাদের কারুরই ভাল লাগেনি, কিন্তু বিল্বমঙ্গল চমৎকার! সেই 'কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কোথায় আমার প্রাণসখা'।

ওটা কি বিল্বমঙ্গলের গান মা? মনোরমা প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি জানো না? না জানলে আর কি বলব বল! কিন্তু সে যা শুনেছিলুম মা, এখনও যেন কানে বাজছে।

বৃদ্ধা ক্ষণকাল নীরব থেকে কয়েকবার হাতে মালা ঘুরিয়ে হাসির শব্দ করে বল্লেন, হুঁ, সে সব কি দিনই গেছে! উনি একদিন আপিস থেকে এসে বল্লেন, ওগো, মিনারভা থিয়েটারে এক গাড়ীর পাস পেয়েছি। তুমি দুলালকে সঙ্গে করে বড় বৌদিদের নিয়ে কাল শনিবার বিকালের রেলে কলকাতায় যাবে। তাঁর চেনা এক লোহার কড়া চাটুর দোকান ছিল বড়বাজারে; ঐ হাবড়ার পুল থেকে নেমে টেরাম রাস্তায় পড়েই বাঁ হাতে সেই ছোট্ট দোকান। তিনি বল্লেন আমি ঐ দোকানে অপেক্ষা করব, দুলাল সে দোকান জানে। তোমরা গেলে তোমাদের নিয়ে থিয়েটারে যাব, তারপর সারা রাত থিয়েটার দেখে সকালে কালীঘাটে আদি-গঙ্গায় চান করে মাকালী দর্শন করে জ্যান্ত জানোয়ার, মরা সুসাইট, পরেশনাথের বাগান এই সব দেখে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরব। তখন ভাসুর দেওর নিয়ে আমরা এক সংসারেই ছিলুম। আমার ছোট দেওর দুলালের তখনও বিয়ে হয় নি। তা বলব কি মনোরমা, কথাটা শোনার পর সারারাত একটুও ঘুমুই নি। তিনি বল্লেন, চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়, কাল সারারাত জাগ্‌তে হবে, কিন্তু বলব কি মনো-মা, একটুও ঘুম হোল না। তারপর উনি ত সকালেই আপিসে

চলে গেলেন, কোথায় কখন যেতে হবে সমস্তই ত বুঝিয়ে বলে গেলেন দেওরকে, এমন সময় দুপুরে এসে পড়ল আমার ননদ। আমরা যাব শুনে সেও নেচে উঠল, সে যাবে। দুলালকে বলতে সে বল্ল, চলুক-না, দাদা ত এক গাড়ীর পাস এনেছে। তা আমি কি তখন ছাই জানি, গাড়ী-পাস কাকে বলে? সেই তখনই শুনলুম, একখানা ঘোড়-গাড়ীতে যত লোক ধরে সেই ততজনের পাস্‌কে গাড়ী-পাস্ বলে। এখন ত শম্ভু বল্ল, ওসব আর পাওয়া টাওয়া যায় না—

বৃদ্ধার প্রাচীন কথা শুনতে শুনতেই মনোরমা বুঝল ঘটক সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন। তা হলে হাত মুখ ধুয়ে নীচে চা খেতে যাচ্ছে, এইবার মায়ের ঘরে এসে ঢুকবে। সকালের কথাটা যদি মায়ের মনে পড়ে তা হলেই বিপদ। সেই নিতাই-এর কথা উঠলেই আবার বকাবকি, অশান্তি হবে। নাঃ, আর পারা যায় না। ছেলেমেয়েগুলো যত পাজী, তত অসভ্য! কি নোংরামিতে যে ওগুলোকে পেয়ে আছে,—তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টাই ক্ষিদে! হরলিক্সের বোতল, চিনির জার লুকিয়ে লুকিয়ে মনোরমা এই ক'দিনেই নাজেহাল হয়েছে।

যতটা সময় সান্ধ্য জলযোগের জন্য লাগে তার চেয়েও বেশী সময় পার হয়ে গেল, ঘটক ওপোরে এলেন না। বৃদ্ধার এক ঘেয়ে সেকেলে কাহিনী কান দিয়ে ঢুকছিল বটে কিন্তু কিছুই শুনছিল না মনোরমা, উৎকর্ণ হয়ে পরিচিত চটির এ-ঘরমুখী আওয়াজ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে শেষে বিরক্ত হয়ে বল্ল, দেখি মা, গাড়ী গেল কি না? শেষে আবার—

হ্যাঁ মা হ্যাঁ, তুমি একবার দেখ। শেষে দেরি-টেরি হয়ে গেলে তাদের অসুবিধে হবে।

বৃদ্ধার নির্দেশে মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে লঘু-পদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে ঘটকের কণ্ঠস্বরে চুপ করে দাঁড়াল। ঘটক ড্রাইভারকে বলছেন, এখনই গাড়ী গ্যারেজে তোল্।

বাদল কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় যেন বাদলকে লক্ষ্য করে বল্লেন, আমি ওপোরে যাচ্ছি। ওরা এলে যত রাত্তিরই হোক আমাকে ডাকবি। আমি ঘুমুলে ঘরের দরজায় ঘা দিবি। এতে যেন ভুল না হয়, এটা মনে রাখিস্।

ঘটক সিঁড়ির দিকে এগুলেন।

মনোরমা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে দ্রুতপদে ওপোরে পালিয়ে বাঁচল।

ঘরে যেতেই বৃদ্ধা বল্লেন, গাড়ী গেছে?

ততক্ষণে একতলায় গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হোল। মনো বল্ল, ঐ বোধ হয় যাচ্ছে। শব্দ পাচ্ছেন না?

হ্যাঁ মা পাচ্ছি। তারপর তুমি বোসো। হ্যাঁ, তারপর আমি যেন কি বলছিলুম। ও,—সেই থিয়েটারে যাবার কথা! সেদিন মা সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে নিয়ে—

মনোরমা শুনল, ঘটক নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। অন্য দিন প্রায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়, আজ দরজার শব্দটা কিছু বেশীই যেন হোল। মনোরমার ভয় হোল, আজ কি বিভু তাহলে রাত্রে উপবাসীই থাকবে? এ সময়ে, এই চা পানের পরে দরজা ও বন্ধ করে না। এই সময় মায়ের ঘরে আসে, তারপর কিছুক্ষণ গাড়ী বারাণ্ডার চেয়ারে শুয়ে থাকে। তারপর রাত্রের আহারাদি শেষ করে ঘরে ঢোকে। আগে ঐ সময় বোতল খুলত। অনেক চেষ্টায়, অনেক ধমক-ধামক করে সেই অভ্যাসটা সে ছাড়িয়েছিল, তা হলে কি সেই পুরানো রোগেই তাকে আবার পেয়ে বসল।

কই গো, শুনছ, না ঘুমিয়ে পড়লে? ভাল মেয়ে বাবা, বৃদ্ধা অভিযোগ করলেন। অনু বল্ল, না মা, এই যে শুনছি। তারপর, তারপর কি হোল?

বৃদ্ধা জানে না, তার সামনে তখন মনোরমা আর নেই, যে আছে সে অনুপমা।

নীচে মোটর বাইকের শব্দ হোল। অনু বুঝল, সুবো এসেছে। বৃদ্ধাও টের পেলেন, বল্লেন, সুবো ফিরল বুঝি?

হ্যাঁ মা।

কোথায় যে ঘোরে ছেলেটা এত রাত্তির অব্দি, বৃদ্ধা আপন মনেই গজ্‌গজ্‌ করলেন। বল্লেন, মনোরমা, বিভু আজ কোথায় গেল? এ ঘরে এল না?

কি জানি মা?

তার কি শরীর-টরীর খারাপ হোল? একবার দেখ-না, সে কোথায়? হ্যাঁ মা, চারি কোথায় গেছে? তাকে ত সেই বিকেল থেকে দেখছি না।

তাকে ত সেই কাকীমাদের সঙ্গে পাঠালেন মা, মনোরমা উত্তর দিল।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মেজ বৌমা বল্লে বাচ্ছাটাকে নিয়ে ওর কষ্ট হয় তাই সে চারিকে নিয়ে গেল। বটে বটে, তা ওদের আসার সময় এখনও হোল না?

কি জানি?

ঘরে বসেই মনোরমা বুঝল, বাদল বাবুর ঘরের দরজায় ঘা দিচ্ছে। তা হলে কি ওরা এল না কি?

মনোরমা মনে মনে শিউরে উঠল,—আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ দেখে নিরাশ্রয় পথিক যে ভাবে শিউরে ওঠে।

পরে বুঝল, না, তা নয়। বাদল বাবুকে ডাকছে খাবার জন্য।

বিভু বোধ হয় খেতে গেল না। অনুপমার দুঃখ হোল। পরের ওপোর রাগ করে নিজে রাত উপোসী থেকে নিজের শরীর খারাপ করলে কার ক্ষতি!

মনে পড়ল, সে রাত্রেও বিভু খায় নি। সেই রবিবারের রাত্রে, যে রাত্রে অনুপমা স্বামীকে তারকেশ্বর থেকে না আসার জন্য অনুরোধ করেছিল। দু'জনের মত রান্নাই সে করেছিল। নিজে না খেয়ে অনুপমা

অপেক্ষা করছিল। ভেবেছিল ঝিকে তার ঘরে শুতে পাঠিয়ে বাইরে থেকে সেই ঘরে শেকল তুলে সংকেতে বিভুকে ডাকবে। বিভু ওপোরে গেলে হু'জনে এক সঙ্গে বসে খাবে, এমন সময় স্বামী এসে গিয়েছিল। স্বামীকে খেতে বসিয়ে খাবারটা বিভুকে দেবার কথা সে ভেবেছিল কিন্তু কিছুতেই ফুরসৎ পায়নি। মাঝরাতে ক্লান্ত স্বামী যখন অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন অনু বার বার সংকেত করেও বিভুর সাড়াশব্দ না পেয়ে পা টিপে টিপে নীচে নেমে এসেছিল। কিন্তু বিভুকে ডাকতে পারেনি। ও ঘরের ভাড়াটেদের কে যেন কলতলায় নড়ছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়ে আবার ওপোরে উঠে গিয়েছিল। সে রাত্রে বিভু উপোসী ছিল, কারণ অনুই তাকে রান্না করতে বারণ করেছিল। অনুও খায় নি। ভাত, মাছ, তরকারি একজনের মত খাবার সে রাত্রে সমস্তই ঢাকা দেওয়া পড়েছিল। শেষে এইটুকু সান্ত্বনা সে নিয়েছিল যে ওরা হু'জনেই উপবাসী রইল। দেহে, মনে এবং পেটে সর্বাঙ্গীনভাবে উপবাসী। আজও কি বিভু উপবাসীই থাকবে!

বাবা, বাবা—

স্নুবো তার বাবাকে ডাকছে। অনু বুঝল, বাদল দরজা খোলাতে না পেরে নিশ্চয়ই স্নুবোকে ডাকতে বলেছে।

অনু আর থাকতে পারল না। কোন কিছু না ভেবেই ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে বিভুর ঘরের কাছাকাছি গিয়ে বাদলকে বল্ল, কি হয়েছে বাদল?

বাদল স্নুবোর পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

স্নুবো বল্ল, দেখুন ত আপনি, বাবার খাওয়া হয় নি অথচ এরই মধ্যে দরজা বন্ধ করলেন। শরীর-টরীর খারাপ হোল না কি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একটু ডাকুন ত!

সকলের সামনে এ ঘরের দরজায় ঘা দিয়ে ডাকতে কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করে, অথচ অনুর স্থির বিশ্বাস, সে ডাকলে বিভু দরজা না

খুলে পারবে না। তুরু তুরু বুকে তুই কপাটের জোড়ের কাছে মুখ দিয়ে অনু ডাকল, দাদা, দাদা কি ঘুমিয়েছেন?

এর আগে সকলের সামনে দু'একবার দাদা সে বলেছে বৈ কি!

এতক্ষণে দরজা খুল্ল। ভর ভর করে চুরুটের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘটক বল্লেন, কি হয়েছে? ডাকছ কেন?

খাবেন না? রাত হয়ে গেছে, কথাগুলো মনোরমাই বলেছিল।

সে কথার উত্তর না দিয়ে ঘটক গলা বাড়িয়ে বাদলকে দেখে বল্লেন, ওরা এখনও আসে নি?

বিভুর মুখ থেকে অনু একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পেলে। ঘাড় হেঁট করে বাদল বল্ল, না।

ওরা এলে আমাকে ডাকিস।

আপনি খেয়ে নেবেন চলুন। মিছিমিছি খাবারগুলো ঠাণ্ডা করে লাভ কি? সাহসে ভর করে কথাগুলো মনোরমাই বলে ফেল্ল।

আজ আমি খাব না, ঠাকুরকে বলে এসেছি, ঘটক উত্তর দিলেন।

পরের ওপোর রাগ করে এ রকম কোরো না—করবেন না, অনু জিভ্ কাটল। পাশে সুবোর দিকে চোরা চাউনিতে অনু একবার বোধ হয় দেখেও ছিল।

ঘটক মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, বোধ হয় এক মিনিটও নয়। মনে মনে অনুপমাকে কি যেন বলেই প্রকাশ্যে বল্লেন, চলো। দরজার পাশের সুইচে হাত বাড়িয়ে আলো পাখা দুটোই নিভিয়ে দালানে বেরিয়ে সুবোকে বল্লেন, তুই খেয়েছিস্?

না।

চল্, খাবি চল্।

আমি তা হলে মায়ের ঘরে যাই, মনোরমা ঘটককে লক্ষ্য করে কথাটা বলেছিল।

যাও।

কিছুটা খাবার পর ঘটকের মনে পড়ল বাঘের কাটা কানের কথা।

সুবোকে বলতে সে বল্ল, টুকরোটা—টুকরোটা বোধ হয় ঐখানেই রেখেছিলুম। তারপর কিছুটা থেমে বল্ল, হ্যাঁ ঐখানেই রেখেছিলুম ত! নিশ্চয়ই আছে, দেখে আসব?

ঘটক বল্লেন, খেয়ে উঠে দেখিস। ওটা পেলে রিফু করা সম্ভব হবে।

খেয়ে উঠে চারিদিক খুঁজেও সেই টুকরোটুকু কোথাও পাওয়া গেল না। বাঘের কাটা কান উধাও হয়ে গেছে। শেষে সুবো বল্ল, এটা নিশ্চয়ই নিতাই কোথাও সরিয়েছে। ওরা আসুক, ওদের জিজ্ঞাসা করতে হবে।

আহারাদি শেষ করে ঘটক বল্লেন, বাদল, আজ আর আমায় ডাকাডাকি করিস নি। এখনও যখন ফিরল না, তখন আজ আর কিছু হবে না, কাল সকালে শম্ভুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

এটা বোধ হয় ভরা-পেটের গুণ, কিম্বা অনুর সেই চোরা চাউনি, সেই 'কোরো না' বলে 'করবেন না' বলার চেষ্টা। না হলে বাঘের কাটা কান নিতাই সরিয়েছে এমন ধারা অনুমান সত্ত্বেও বি ঘটক নির্বিবাদে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন এবং রাত্রে ডাকাডাকি করতেও বাদলকে নিষেধ করলেন।

ওদিকে মেজবৌ পড়ল বিপদে। মুক্ত-অঙ্গন থিয়েটারে গিয়ে আলাপ হয়েছিল এক রিফিউজী বউয়ের সঙ্গে। মাত্র পাঁচ মিনিটের আলাপেই মেজ বৌ শুনে নিয়েছে যোধপুর পার্কে কোন এক জবরদখল কলোনীতে সে বাস করে। মেজ বৌ ঠোঁট উল্টে বলেছিল, তাদের বাড়ী বড় রাস্তার ওপোরে, ঐ যে-বাড়ীর সামনে ফোয়ারা আছে, ফোয়ারার পর গাড়ী-বারাণ্ডা। সেই বউকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার-দুই চারু ঝিকে এটা ওটা ফরমাস করে শেষে বলেছিল, ছেলেটা ভাই বড় দুরন্ত, রাখতে পারি না, তাই চারুকে না হলে আমার এক মিনিটও চলে না। কালীঘাটে মা-র মন্দিরেই বলো আর চিড়িয়াখানা কিম্বা থিয়েটারেই বলো ওকে না নিয়ে গেলে আমার হাড়ীর হাল। রিফিউজী-বউ

মেজবৌয়ের কথাগুলো তারিফ করে শুনেছিল। আশ-পাশের অন্যান্য মেয়ে ও বউরা মেজবৌয়ের বড়মানুষিতে মনে হয়ত ঈর্ষা করতেও পারে; কিন্তু মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল। মেজবৌ তাদের দিকে দৃক্‌পাত না করে রিফিউজী বউকে বলেছিল, যাবার সময় আমাদের সঙ্গে যেও, তোমাকে তোমাদের কলোনীর কাছে নামিয়ে দিয়ে যাব। সেই বউটি বলেছিল, আপনারা ত দেখছি সবশুদ্ধ পাঁচ ছ'জন, গাড়ীতে জায়গা হবে? মেজবৌ বলেছিল, হয়ে যাবে, বড় গাড়ী, একলা তুমি, কোন রকমে কুলিয়ে যাবে।

কিন্তু থিয়েটার ভাঙ্গার পর সেই বড় গাড়ী কোথায়? মেজবৌ বল্ল, ঠাকুরপো, একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখ ত। গাড়ী নিশ্চয়ই এসেছে। হয়ত সেও আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ঠাকুরপো এদিক ওদিক ঘুরে বল্লে, কই, কোথাও পেলুম না। সে বেটা হয়ত মনে করেছে থিয়েটার ভাঙ্গার দেরি আছে তাই কোথাও আড্ডা দিতে গেছে।

মেজবৌ রেগে উঠে বল্ল, বাঃ, বল্লুম দশটায় থিয়েটার ভাঙবে, সাড়ে নটা থেকে সে যেন এখানে হাজির থাকে। তার হাতে ঘড়ি রয়েছে—

গাড়ীতেও ত ঘড়ি আছে মা, নিতাই পাশ থেকে বলে উঠল।

হ্যাঁ, গাড়ীতেও ঘড়ি! জানো ভাই, ঘড়ির দুঃখু নেই। তবে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে—

ইতিমধ্যে দর্শকের দল যে যার গাড়ীতে, ট্যাক্সিতে, পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছে। জায়গাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল।

সদ্য-চেনা ধনী সহদর্শিনীর মোটরে বাস্ ভাড়া বাঁচিয়ে বাড়ী ফেরার লোভে রিফিউজী বউটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে শেষে বল্ল, আমি তা হলে এগিয়ে পড়ি দিদি, গাড়ী আসতে হয়ত অনেক দেরি হবে—

আহা না-না, তা কি হয়, আমরাও ত যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে, মেজবৌ তাকে আশ্বাস দিয়ে দেওরকে বল্ল, ঠাকুরপো,

এখনও কি তার আশায় থাকবে, না একটা ট্যাক্সিই করবে? কি করবে বলো?

ট্যাক্সিই করি, শম্ভু দেখল একখানা ট্যাক্সি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেই ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দরজায় হাত দিতেই বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার ওদের দলটার দিকে চেয়ে চেয়ে বল্ল, কেৎনা আদ্‌মি?

শম্ভু বল্ল, এই যা দেখছ। ডাগর লোক চারজন। না না পাঁচ আর বাচ্ছা এই তিনটে।

এক ট্যাক্সিমে নেহি হোগা, পাঞ্জাবী গ্যাঁট হয়ে বসে রইল।

হয়ে যাবে হে, হয়ে যাবে, আমরা গুছিয়ে ঠিক করে নেব, শম্ভু ট্যাক্সিওয়ালাকে আশ্বাস দিয়ে গাড়ীর হাতল ঘোরাতেই সে কড়াভাবে বল্ল, নেহি; পুলিশ হ্যায়, নম্বর লেগা।

তবে? এত বড় গাড়ীতে ক'জন যায়? পাঁচজন যায় না? সরোষে শম্ভু প্রশ্ন করল।

ট্যাক্সিওয়ালা বল্ল, যায়, কিন্তু তিন বাচ্ছা আছে যে। স্রিফ পাঁচ আদমি অথবা চার আদমি আউর দো বাচ্ছা, এই যেতে পারে। তোমার এক আদমিকে বাদ দাও, হাম চার আদমি আউর তিন বাচ্ছা লে যাউঙ্গা, এক বাচ্ছা যাস্তি লে সেক্তা, বাস্‌, আউর নেহি।

তাই চলো বউদি, আর দেরি করতে পারি না। ট্যাক্সিওয়ালাকে শম্ভু বল্ল, তাই চল, তাই যাবো।

ট্যাক্সিওয়ালা মিটার নামালো। গাড়ীর দরজা খুলতেই ছেলে তিনটে পিল্‌পিলিয়ে ভেতরে ঢুকেই নিতাই তেড়ে বেরিয়ে এল, বল্ল, না, আমি সামনে বসব।

মেজবৌ বল্ল, চারু, তুমি বাস-এ আসতে পারবে না?

শম্ভু ধম্‌কে উঠল, বল্ল, তা কি হয় না কি? যত সব বাড়াবাড়ি।

রিফিউজী বউটি শম্ভুর মুখের দিকে চেয়ে একাই পথের দিকে পা বাড়াবার উপক্রম করল।

মেজবৌ বল্ল, এখনও যদি হতভাগা গাড়ীটা নিয়ে আসে—

ঘাড় ঘুরিয়ে রিফিউজী বউটি বল্ল, সে আর ইহ-জীবনে আসবে না দিদি, ও সব বুঝি—

বউটি গন্‌গন্ করে একাই এগিয়ে পড়ল।

দেখলে, দেখলে, একবার আস্পদ্দা দেখলে, ছোটলোক মাগীটার কথা শুনলে—

শম্ভু বল্ল, যেমন ভাব করতে যাও! চেনা নেই, জানা নেই, আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করতে যাও কেন? ভুলে যেও না, এটা সহর, এখানকার কোন লোকই সুবিধের নয়।

ছোট বউ বেচারী ফোড়ন দেবার জন্য ছটফট করছিল, কিন্তু পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী মেজদি ও স্বামীর সামনে কোন কথা সে কইতে পারে না। এ বিষয়ে মেজবৌ শাশুড়ীর চাইতেও অনেক বেশী কড়া। কেউ কিছু বল্লেই মেজবৌ বলে, খবর্দার, একবার রাশ ছাড়লে আর কখন বাগ্ মানাতে পারব না। বৌ বৌয়ের মতন থাকবে। আমরা থাকি না?

বৃদ্ধার কানে খবরটা উঠতেই বৃদ্ধা ডাকলেন, মনোরমা, এটা কি শুনছি? তুমি যে বল্লে গাড়ী গেছে। গাড়ী যায় নি কেন?

কি জানি মা, আমি ত বুঝতে পারছি না।

তা পারবে কেন? ওদের কষ্ট হোলে তোমার কি? ডাকো ঐ গাড়োয়ানকে, আমি জানতে চাই, সে কেন যায় নি? তুমি তাকে কি বলেছ তাও শুনতে চাই।

বৈজুকে ডাকা হোল। বৈজু বল্ল, আমি কি করব ঠাকুরমা, আমি ত গাড়ী গ্যারেজে তুলি নি, যাবার জন্যই গাড়ী বাইরে রেখেছিলুম। বাবু বল্লেন, গাড়ী এখনও তুলিস নি কেন? আমি তখন বলেছিলুম, সাড়ে ন'টার সময় থিয়েটারে যেতে হবে। এই শুনে তিনি ভয়ানক রেগে গেলেন। শেষে বল্লেন, গাড়ী কোথাও যাবে না, গ্যারেজে তোল্। ঠাকুরমা, আপনি বাদলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, সেও সে সময়ে ওখানে ছিল। সে সব জানে, সব শুনেছে।

ঠাকুরমা গুম্ হয়ে গেলেন। শেষে বল্লেন, বিভু কি করছে? তাকে ডাক্—

মনোরমা কোন উত্তর দেয় নি। বৈজুই বল্ল, বাবু দরজা দিয়ে শুয়েছেন।

হুঁ, বৃদ্ধা হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, কাল সকালে এর ব্যবস্থা হবে। আমার কথার ওপোর কথা!

হটাৎ নিজের কপালে করাঘাত করে ও-পাশ ফিরে শুলেন।

পরের দিন সকালে বৃদ্ধা ছেলেকে ডাকার আগেই বাদল শম্ভুকে ডাকল, বল্ল, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

শম্ভু জানত। এ রকম আশঙ্কাই সে করছিল, মনে মনে সেজন্য প্রস্তুতও ছিল, নানা রকম কৈফিয়ৎও তার তৈরী ছিল। তবুও বাদলের কথায় কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে বল্ল, কেন রে? এই সকালে—

কি জানি? ধূর্ত্ত বাদল ভালমানুষ সেজে উত্তর দিল।

রাগ-রাগ দেখলি? শম্ভুর প্রশ্ন।

না কাকাবাবু, এমন ত কিছু দেখলুম না, বাদল সজ্ঞানে মিথ্যাটা উচ্চারণ করল।

বাদল মনে মনে দারুণ খুশি। আজ বাবু এদের নিশ্চয়ই তাড়াবে। এই আপদগুলো বিদেয় হোলেই ওরা বাঁচে। বাদল, চারু, ঠাকুর, ড্রাইভার, মালী, সকলেই চায় ঐ পাড়াগেঁয়ে আপদগুলো বিদেয় হোক। যত সব ঝুট-ঝামেলা। একটা পয়সার নাম নেই, খালি হুকুম আর হুকুম। এদের তুলনায় বাবুর কাছে গেষ্ট হয়ে যত সব ভিন্‌দেশী সাহেবেরা আসে তারা অনেক ভালো। দু'একদিন থাকে, উঠতে বসতে বখশিশ দেয়। তাদের কাজ করে, ফরমাস্ খেটে সুখ আছে।

চলুন কাকাবাবু, বাদল শম্ভুকে তাড়া দেয়।

চলো।

শম্ভু ধীরে ধীরে আসামীর মত কাঠগড়ার দিকে চলল।

একতলার অফিস ঘরে বর্মা চুরুট ধরিয়ে ঘটক নিজের চেয়ারটিতে

বসে ছিলেন। শম্ভুকে দরজায় পরদার ওপাশে দেখেই ভেতর থেকে ডাকলেন।

শম্ভু ঘরে ঢুকতেই গম্ভীর মুখখানা তুলে বল্লেন, কি রে, কাল গেলি না?

শম্ভু টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথা চুলকে বল্ল, না মানে—। সে থেমে গেল।

কি, কি হোল? মানেটা কি?

মানে টাকা কম পড়ে গেল।

সে কি? পঞ্চাশ টাকাতেও কম পড়ল? ব্যাপার কি?

দাদার সামনে দাঁড়িয়ে শম্ভু সাহস সঞ্চয় করছিল। শেষে বল্ল, তোমার বউমা কাপড় কেনার কথায় বল্লে যে, কোথাও যেতে আসতে একখানাও ভাল কাপড় নেই, তাই একটা অন্ততঃ ভাল কাপড় কিনে আর একখানা সাদামাটা যা হয় কিনো। তা ঐ কাপড়-টাপড় কিনে হাতে আর কিছুই রইল না, তাই ভাবলুম তোমাকে বুঝিয়ে বলব ব্যাপারটা, কিন্তু কাল ত আর তোমার দেখা পেলুম না—

চুরুটে টান দিতেও ঘটক ভুলে গেলেন। গম্ভীরভাবে বল্লেন, ঠিক আছে, এখনই তৈরী হয়ে নাও, বাদল তোমাদের টিকিট কিনে ট্রেণে বসিয়ে দিয়ে আসবে। বাদল—

বাদল ছিল ঘরের বাইরে। পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই ঘটক বল্লেন, তুই বাজার যাবি কখন?

সাতটার পরেই যাব।

না, আগেই যা, গিয়ে চট্‌পট্ বাজার সেরে আয়। এসেই কাকাবাবুদের নিয়ে হাওড়ায় যাবি। গাড়ী নিয়ে যাবি। ওদের ট্রেনে বসিয়ে ট্রেন ছাড়লে ফিরে আসবি। দশটার মধ্যেই আমার গাড়ী চাই, আর দুপুরে ঐ ঘরখানা ঠিকঠাক করে রাখবি। রাত্তির ন'টা নাগাদ শ্রীবাস্তব আসবে।

বাদল ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শম্ভুকে ঘটক বল্লেন, নাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। সাড়ে সাতটায় বেরোবার জন্য তৈরী হবে। ওরই মধ্যে বাদল এসে যাবে। বুঝেছ ?

শম্ভু দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

আচ্ছা, আর দেরি কোরো না। ঘটক শম্ভুকে দেখিয়ে টেবিলে রাখা একটা ফাইল টেনে নিলেন। এটাই ওঁর রীতি। কাউকে বিদায় করতে হোলে তাকে দেখিয়ে ব্যস্তভাবে ফাইল টানাটানি করেন। অফিসের সকলেই ঘটকের এই ইঙ্গিতটা বোঝে।

কিন্তু শম্ভু বুঝল না। দাঁড়িয়েই রইল।

বিরক্তভাবে মুখ তুলে ঘটক বল্লেন, কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি যে—

শম্ভু বল্ল, দাঁড়িয়ে রইলুম, মানে একটা কথা ছিল—

কি ? কি কথা আবার ? আর কোন কথা-টথা শুনতে পারব না বাপু।

কিন্তু তুমি না শুনলে কে শুনবে ! কিছু টাকা না হলে আমাদের খুব বিপদ হবে যে, চোখ কান বুজে শম্ভু কথাগুলো বলে ফেল্ল।

কিসের টাকা ? টাকা কি জন্য ? ঘটক গর্জে উঠলেন, এই ত সব কাপড় চোপড় কিনলি—

কাপড় ত কিনলুম, কিন্তু খাবো কি ? দেশে এবার একটা ধানও ঘরে তুলতে পারি নি।

তা আমি কি করব ? আমি কিছু দিতে-টিতে পারব না। তুই যা। যা বল্লুম সেই মতো তৈরী হয়ে নে।

শম্ভু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ও চলে যাবার পর ঘটক চুরুটটা দাঁতে কামড়ে রেখেই আপন মনে বল্লেন, যত্তো সব ! পাকা কলা পেয়েছে !

কিছু পরেই চারু-ঝি এসে পরদার ওপাশ থেকে ভয়ে ভয়ে ডাকল, বাবু, বাবু—

কে রে ? ঘটক বিস্মিত হলেন। এভাবে চারু ওঁকে কোন দিন ডাকে না।

ঠাকুরমা আপনাকে ডাকছেন, বাইরে থেকেই চারু বল্ল।

কেন ?

জানি না। বল্লেন বড্ড দরকার।

ঘটক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং মায়ের ঘরে গিয়ে বুঝলেন যা তিনি অনুমান করেছিলেন সেটাই ঠিক। শম্ভু ওর মায়ের কাছে গিয়ে দাদার নামে নালিশ জানিয়েছে। কাল রাতে গাড়ী না পাঠানোয় বৃদ্ধা একেই ক্ষেপে ছিলেন, আবার আজই সকালে এই ব্যাপার! খাস্ চাকর বাদল বাজারে গিয়েছিল, তাকে না পেয়ে বৃদ্ধা চারুকে বল্লেন, বিভুকে ডেকে নিয়ে আয়। সে বলেছিল, জেঠাইমা যান। বুড়ী ধমক দিয়ে বলেছিলেন, না, ও যাবে না। কাল ওকে গাড়ী পাঠাবার কথা বলেছিলুম, ও গাড়ীর ব্যাপারটা গুলিয়ে দিয়েছিল, আজ ও কখনই যাবে না, তুই যা।

মনোরমা পাশের ঘরে হীটারে জল গরম করতে করতে সবটাই শুনেছিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও তার পড়েছিল।

চারুঝি দৌড়ে গিয়ে খবর দিল। বৃদ্ধা বল্লেন, কি বল্ল সে ?

চারু বল্ল, আসছেন।

বৃদ্ধা নিজের বিছানায় বসেছিলেন। মেজ বৌমা, ছোট বৌমা তু'জনেই ঘরে ছিল।

নিজের কপালে হাত দিয়ে বৃদ্ধা বল্লেন, সবই বরাত বৌমা, অমন ছেলে আমার কি হয়ে গেছে! ও কি আর মানুষ আছে! বাইরের পাঁচজনে ওকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে!

বৌরা কোন উত্তর দেয় নি।

বাইরে চটির শব্দ হোল। বৌ তুটো তাড়াতাড়ি ওধারের দরজা দিয়ে মনোরমা যে ঘরে জল গরম করছিল সেই ঘরে পালিয়ে গেল। ঘটক মায়ের ঘরে ঢুকলেন। বল্লেন, কেমন আছ মা ? ডাকছ কেন ?

আমার আর থাকাথাকি! ঘটককে দেখিয়ে দেখিয়ে বৃদ্ধা নিঃশ্বাস

ফেললেন। বল্লেন, তুমি আজ সকালবেলা শম্ভুকে কি বলেছ তাই ও আমার কাছে এসে—

এমন ত কিছুই বলিনি! ও কাল দেশে যাবে বলে আমার কাছ থেকে টাকা নিল। যায় নি কেন তাই জিগেস করে বল্লুম-আজই সকালে চলে যাও। বাদল ওদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

টাকা নিল? কত টাকা?

পঞ্চাশ। বল্লে ছোট বউমার কাপড় কিনতে হবে, ট্রেন ভাড়া লাগবে, এই সব। এ কথা তোমায় বলে নি?

না ত! তা থাক, দিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু ওদের তাড়াবার জন্য তুমি এত উঠে পড়ে লেগেছ কেন? ওরা তোমার ভাই ভাদ্দরবৌ, না অন্য কিছু?

ভাই ভাদ্দরবৌ বলেই ত ওদের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছি মা। দেশের সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় এলুম একলা নিরিবিলি থাকব বোলে। এখানেও যদি দিনের পর দিন—

ঘটক থেমে গেলেন।

দিনের পর দিন কি? ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে? আর তুমি ওদের কি সুখে রেখেছ? ঐ দুধের ছেলে নিতাইকে তুমি কাল মিছামিছি অত গালমন্দ কেন করলে? ও তোমার কি করেছে যে—

ও আমার যা করেছে তা আমার ইহজীবনে পূরণ হবে না। হল্-ঘরের বাঘের চামড়াটা কাঁচি দিয়ে কেটে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

ছেলেমানুষ না জেনে যদি কিছু করেই থাকে তা বলে ঐ রকম গালমন্দ করতে হবে? ভাইপোর চেয়ে বাঘের চামড়াটা তোমার বেশী হোল?

হ্যাঁ হোলো। ঘটক এবার রীতিমত চটেছেন। বল্লেন, ওদের শিক্ষা দীক্ষা, চাল-চলন আমাদের থেকে পুরো আলাদা। এবাড়ীতে ওদের থাকা হতে পারে না।

তা হলে আমারও হতে পারে না। ওদের সঙ্গে আমাকেও বিদেয়

দিয়ে তুমি তোমার মনের মত লোক নিয়ে এই মেলেচ্ছপুরীতে বাস কর।

ঘটক নিরুত্তর। বৃদ্ধার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে সুব্রত এ ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছেলেকে সায়েস্তা করছি এই ভেবে বৃদ্ধা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। হঠাৎ চিৎকার করে নিজের বুকে চাপড় মেরে কেঁদে উঠলেন, বল্লেন, কেন, কেন, আর কেন, আমার বেঁচে থেকে এই পড়ারী ভোগ কেন!

সুবো তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই ঠাকুরমার হাত ধরল। ধমক দিয়ে বল্ল, কি হচ্ছে কি সব, লজ্জাও করে না? সবাই দেখে কি ভাববে বলো ত?

ভাবুক, দেখুক, আমার উপযুক্ত ছেলে আমায় কত সুখে রেখেছে সবাই জানুক—

জানিয়ে তোমার কি হবে? কে তোমার কি করবে? বাবা না দেখলে তোমাকে দেখবার আছেটা কে?

সুবোর হাত ধরে বুড়ী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বল্ল, আমায় কারুর দেখতে হবে না, আমি আজই ওদের সঙ্গে দেশে চলে যাব।

তাই দাও না বাবা পাঠিয়ে, সুব্রত বাবাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বল্ল।

ঘটক বল্লেন, তারপর? দেশে গিয়ে কি হবে?

তুমি আমায় যা হয় কিছু মাসোহারা দিও, তাইতেই আমি আধ-পেটা খেয়ে যে ক'দিন থাকি কোন রকমে কাটিয়ে দেব।

সেখানে আর বাঁচতে হবে না, সবই আমার জানা আছে, ঘটক সুবোকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন। দু'দিন পরেই খবর আসবে দারুণ অসুখ, তখন এই আমাকেই ছুটোছুটি করতে হবে।

খবর দিতে বারণ করব রে, বারণ করব, বুড়ী কেঁদে কেঁদে বল্লেন। মরার খবর পেলে ইচ্ছে হয় ছেরাদ্দ করিস, না হয় করিস নি। বাস্, হোল ত!

ঘটক শান্ত কণ্ঠে বল্লেন, দেখ মা, তুমি বুড়ো হয়েছ। তোমার সেই যুগ এখন আর নেই। দেশ, কাল, মানুষ সমস্ত বদলে গেছে। কিসে কি হয় তা তুমি বোঝো না। যা বলি তাই শোনো। ওরা আজ সকালে চলে যাক, তুমি যেমন আছ তেমনই থাকো। ওদের সঙ্গে গেলে ওদের নিজেদেরই অভাব, ওরা তোমাকে নিয়ে কি করবে বলো ত! ওদের ঘাড়ে তুমি পড়তে যাচ্ছ কি সাহসে?

তুমি তোমার যা দয়া হয় তাই দিও। তাই দিয়েই কোনমতে আমার খরচ চালাব। ওদের ঘাড়ে থাকব কেন? বৃদ্ধাও শান্তভাবে উত্তর দিলেন।

সে হয় না মা। তাও দিয়ে দেখেছি। সব টাকাই ওরা গাপ্ করে বসে।

অমন কথা বোলো না বাবা। ছি ছি, মা-র পেটের ভাইকে সন্দেহ?

এবার সুব্রত কথা বল্ল। বল্ল, ঠাকুরমা, সে সব আমাদের জানা আছে। নতুন করে বলতে হবে না। তারপর আর একটা কথা বুঝছ না কেন? থাকবে কাকাদের কাছে, বাবা টাকা পাঠাবে, এতে কাকাদের অপমান হবে না?

কথাটা ঠাকুরমার কানে নতুন ঠেকল। অবাক হয়ে বল্লেন, এতে আবার মান অপমান কি রে? উপযুক্ত ছেলে, মাকে খোরাকী দেবে, এতে অপমান? তোরা সব কি হয়েছিস বল্ ত?

এতক্ষণে ঘটকের মনে হোল, এ সমস্তই শম্ভুদের কারসাজি। কোনমতে মাকে টেনেটুনে দেশে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই মোটা একটা মাসোহারা পাওয়া যাবে। সেইজন্যই এত মাতৃভক্তি। সে পথ বন্ধ করার জন্য ঘটক বল্লেন, যাই বল মা, স্পষ্ট জেনে রেখো, এবার যদি দেশে যাও তাহলে আমি এক পয়সাও দিতে পারব না। আমি যাবও না, দেখবও না। এতেও যদি যেতে ইচ্ছে হয় তবে যাও।

তুই আমার জন্য আর খরচ করতে চাস্ না, এই ত? রাগ ও অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠে বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন।

কেন চাইব না! তুমি এখানে যতদিন থাকবে ততদিন তোমার জন্য যা কিছু খরচ হবে, যত কিছু দরকার হবে সমস্তই করব, কিন্তু তুমি থাকবে অন্যত্র, ওষুধ-পথ্য কিছুই পাবে না, আর আমি নিয়ম মত টাকা ঘুষ পাঠাব, তার মধ্যে আমি নেই।

বুড়ী চুপ করে গেল। ঘটক বল্লেন, সুবো, বাদল বাজার থেকে ফিরলেই তুই তোর কাকা কাকীমাদের বাদলের সঙ্গে রওনা করিয়ে দিবি। আমার অফিসের মেলা কাজ জমে আছে, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। এই ভারটা তোকে দিলুম।

ঘটক মায়ের ঘরের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে দালানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মা ডাকলেন, বিভু।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘটক বল্লেন, কি?

আমার একটা কথা রাখ্, আমায় শ' দুই টাকা দিয়ে যা।

দু'শো টাকা? কি করবে?

আমার দরকার। এই সামান্য টাকাও কি তোর কাছে পেতে পারি না?

পাবে না কেন, নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু কি দরকার তাই জিগেস করছি।

রাগতঃ স্বরে মা বল্লেন, কি দরকার তা বলতে পারব না, তোর খুসি হয় দে, না হয় ত দিস্‌নি। তুই দিলে আমি খুসি হব।

আচ্ছা দিচ্ছি।

ঘর থেকে বেরিয়েই ঘটক দেখলেন, বাদল দালানে এসে দাঁড়িয়েছে। কি রে, বাজার হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠিক আছে। এবার তা হলে ওদের নিয়ে হাওড়ায় যা। আর আমার সঙ্গে একবার আয় ত!

ঘটক বাদলকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন। ক্ষণপরেই বাদল লাফাতে লাফাতে ওপরে ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে দু'খানা একশ টাকার

নোট ঠাকুরমার দিকে এগিয়ে ধরে বল্ল, বাবু আপনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুরমা।

বুড়ীর খাটের দুপাশে দুই বউ তখন দাঁড়িয়েছিল। মেজ বৌ তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বাদলের কাছ থেকে নোট দুটো নিয়ে নিল। টাকা দিয়েই বাদল ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। মেজ বৌ নোট দু'খানা নিজের আঁচলে বাঁধতে গেল।

টাকাটা মাকে দাও মেজদি, ছোট বৌ ব্যস্ত হয়ে বলে ফেলল।

কেন? মেজ বৌ শান্তকণ্ঠে বল্ল, এ ত মা আমাকে দেবার জন্যই বড়্ঠাকুরের কাছ থেকে আনালেন।

সব তুমি নেবে কেন? ওর একখানা ত আমার। না মা? ছোট বৌ যথাসম্ভব এগিয়ে এল।

বা রে, গাছেরও খাবে, তলারও কুড়ুবে! কি আদর! তোর কর্ত্তা যে কাল তলে তলে বড়্ঠাকুরের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে তা কি তুই ঘুণাক্ষরেও বলেছিলি?

সে আমি জানি না দিদি, ও আমাকে একটা কথাও বলে নি?

বলে নি মানে? তোর কাপড় চোপড় কত কি সব এসেছে—

কিছু আসে নি দিদি, কিচ্ছুটি আসে নি। মাইরি বলছি দিদি, তুমি আমাব তোরঙ্গ দেখবে চল, নতুন কিছু এলে ত আর খেয়ে ফেলব না, ওখানেই থাকবে।

সে আমি জানি না। আজ আসে নি, কাল আসবে। এ টাকা মা আমার জন্যে আনিয়েছেন।

স্মিত হাস্যে মা বল্লেন, না বউমা, দু'শো টাকা আনালুম তোমাদের দুজনের জন্য। একখানা নোট ছোট বউমাকে দিয়ে দাও।

কেন মা? ছোট্কিরা ত কাল পঞ্চাশ টাকা বড়্ঠাকুরের কাছ থেকে আদায় করেছে।

তা করুক। ওর কত অভাব তা কি বোঝো না? মা কালীর

দয়ায় মেজো তবু যা হয়-কিছু উপায় করে, কিন্তু শম্ভুর আমার কি আছে ? একখানা নোট ওকে দিয়ে দাও।

কণ্ঠস্বরে আবদার ঢেলে মেজবৌ বল্ল, না মা, ও সব বলবেন না। এবার যে আমাদের কি অবস্থা যাচ্ছে তা কি বলব ! ওর কি ? ঝাড়া হাত-পা ! আমার চারটি কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে—। এ থেকে আমি কিছু দিতে পারব না।

দেখলেন মা, দেখলেন ত দিদির কাণ্ডটা ! বেশ, ঐ নিয়ে তুমি বাড়ী যাও, আমি কিন্তু এখান থেকে নড়ছি না।

তোরা ঝগ্ড়া করে মরছিস্ কেন বল্ ত ? স্মিতহাস্যে স্নেহের ভর্ৎসনা করলেন বৃদ্ধা। সামান্য টাকা নিয়ে ওরকম করছিস্ কেন ?

মুখ ভার করে মেজবৌ বল্ল, আপনাদের কাছে এ টাকা সামান্য হতে পারে মা, আমার কাছে সামান্য নয়। আপনি মুখের কথা খসালেই বড়্ঠাকুর শয়ে শয়ে টাকা দেন, কিন্তু আমার ? মাথা কুটে মরে গেলেও একটা নয়া পয়সা কোথাও পাই না।

যা পারিস কর্গে যা, বৃদ্ধা হাল ছেড়ে দিলেন।

না মা, ও কথা বল্লে চলবে না। আপনি কি আমাকে ভাসিয়ে দেবেন ? ছোট বউ রাগ-রাগ মুখে শাশুড়ীকে বল্ল।

এদিকে হর্লিক্স ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, অথচ মায়ের ঘরে যে কাণ্ড চলছে সেই টানাটানি কামড়া-কামড়ির মধ্যে হর্লিক্সের গ্লাস নিয়ে ঢুকতে মনোরমার কিছুতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। ঐ পাপগুলো কখন যে বিদেয় হবে কে জানে !

মেজ কাকীমা, ছোট কাকীমা, ছোট কাকাবাবু আপনাদের ডাকছেন, নীচে আসুন, দরজার কাছে এসে বাদল শমন জারী করল।

আয় লো ছুট্কী, কৃত্রিম স্নেহ ও দরদভরা কণ্ঠে মেজবৌ ছোট বউকে ডাকল।

আমি যাব না, জেদী ছেলের মতো জবাব দিল ছোটবৌ।

তবে যা, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মেজবৌ ফুলতে লাগল।

হঠাৎ কি ভেবে ছোট বৌ প্রায় যেন দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিক ওদিকে নজর দিয়ে মেজবৌ-ও ওর পেছন পেছন সবেগে চলে গেল।

মনোরমা এল হর্লিক্সের গেলাস নিয়ে।

বৃদ্ধা হর্লিক্সটুকু পান করে মনোরমার হাতে গ্লাসটা ফেরৎ দিতে না দিতেই ঘরে এসে ঢুকল শম্ভু, মা—

কি রে?

কি শুন্‌ছি?

কি শুনছিস্?

দাদা দুই বউয়ের জন্য দু'শো টাকা দিয়েছে, অথচ মেজ বৌদি একাই টাকা মেরে দিয়েছে।

তুমিও ত বাবা দাদার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে একা একা মেরে দিয়েছ, মা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন।

আঃ, সে তুমি বুঝছ না মা। সে টাকা দাদা আমাকে দিয়েছে, তা বলে দাদার দেওয়া টাকা দুই বৌ সমানে পাবে না কেন? এটা তোমার কি বিচার হোল?

মা বল্লেন, আমি তার কি করব বল্। বাদল টাকা নিয়ে এল, মেজ সেই টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধল। আমি কি ওর সঙ্গে মারামারি করতে যাব?

তা হলে তুমি এর ব্যবস্থা করো।

কি ব্যবস্থা করব? আমার কাছে আর ত কিছুই নেই যে দেব। আজ থিয়েটার, কাল বায়োস্কোপ এই ভাবে দফায় দফায় তুই আমার কাছ থেকে কত নিয়েছিস্ বল ত? আমার কাছে কি টাকার গাছ আছে রে?

আছেই ত। দাদাই তোমার গাছ। তুমি ইচ্ছে করলেই দিতে পারো।

আর আমি ইচ্ছে করতে পারব না। এইমাত্র সকালে হু'শো নিলুম, আবার চেয়ে পাঠালে কোত্থেকে দেবে সে?

দেবে। দাদার অনেক আছে।

থাকলেও আমি চাইতে পারব না, বৃদ্ধা কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

আচ্ছাঃ, আর আমায় ইহ জীবনে দেখতে পাবে না, দুম্ দুম্ করে পা ফেলে শম্ভু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

শম্ভু, অ শম্ভু, বৃদ্ধা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন।

কি? যাবার সময় পিছু ডাকছ কেন? বিরক্তভাবে শম্ভু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

শোন্, এদিকে আয়।

কেন?

শোন, কাউকে কিছু বলিস্ নি, আমার এই হার ছড়াটা লুকিয়ে দিচ্চি, নিয়ে যা। রাগ করিস্ নি। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।

বৃদ্ধা কম্পিত হস্তে নিজের গলা থেকে বিছে হারটা খোলার চেষ্ট করতে লাগলেন।

শম্ভু স্থির হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

বৃদ্ধা বল্লেন, তুই খুলে নে বাবা, আমি পারছি না।

আমি নেব? কেমন যেন কুণ্ঠিতকণ্ঠে ছেলে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি নে, কে আবার কোথা থেকে এসে পড়বে। এ কথা যেন কাউকে বলিস্ নি।

শম্ভু হারটা খুলতে খুলতে মাকে আশ্বস্ত করে বল্ল, না না, কাউকে বলব না।

বাদল ঘরে ঢুকেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল।

কি রে? সচকিত ভাবে প্রশ্ন করল শম্ভু। ততক্ষণে হারের ছিট্‌কানিটা খোলা হয়ে গেছে।

বাদল বল্ল, দাদাবাবু তাড়া দিচ্ছেন।

ততক্ষণে হারটা শম্ভুর পকেটে চালান হয়ে গেছে।

বৃদ্ধা বল্লেন, কে সুবো? কেন, তার কি তাড়া?

শম্ভু বল্ল, চল্ চল্। আমার হয়ে গেছে। যাবার আগে মায়ের সঙ্গে তুটো কথা বলারও সময় দিবি না তোরা—

শম্ভু মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। দরজার বাইরে তুই বউ এসে দাঁড়াল।

মেজবৌ ঘরে ঢুকতেই মা তাড়াতাড়ি কাপড় টেনে নিজের গলায় ঢাকা দিলেন। মেজবৌ সেটা লক্ষ্য করে বল্ল, শীত করছে না কি মা, শরীর খারাপ লাগছে?

না এমনি।

পাখা বন্ধ করে দেব?

দাও।

মায়ের অবস্থা বুঝে শম্ভু বউদিকে তাড়া লাগাল। বল্ল, নাও নাও বউদি, তাড়াতাড়ি নমস্কার সেরে নাও। বাদল তাগিদ দিচ্চে। আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গাড়ী ফিরলে তবে দাদা অফিসে বেরুবে।

শম্ভুর উদার ভঙ্গীতে বউদির কেমন সন্দেহ হোল। হঠাৎ যেন ঠাকুরপো বদলে গেছে।

কিন্তু বাদল ঘরের মধ্যেই রয়েছে। সন্দেহটা মনের মধ্যে চেপে রেখে শাশুড়ীকে প্রণাম করল। বউমার চিবুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে সেই আঙ্গুল নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে শাশুড়ী বল্লেন, ছোট বউ মা কোথায়? সে এল না?

ঐ যে আসছে।

বলতে বলতেই ছোট বউমা ঘরে ঢুকে ঘোম্‌টা দেওয়া অবস্থাতেই মাকে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ করল। পায়ে ধূলো অবশ্য আদৌ ছিল না। বাথরুমে যাওয়া ছাড়া বৃদ্ধা অন্য কোন সময়েই মেঝেয় নামেন না।

পাছে মেজবৌ কোন রকম গোল বাঁধায় এই আশঙ্কায় শম্ভু ঘরের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় সেই কারণেই বাদলও ঘর থেকে বেরোয় নি।

এটা ওদের পক্ষে অস্বাভাবিক, কিন্তু মা ভাবলেন আজ চলে যাচ্ছে বলেই এই ব্যতিক্রম। পাশের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মনোরমা নীরবে সমস্তই দেখল। বেচারী হাসবে কি কাঁদবে কিছুই ঠিক পায় না।

ঠাকুরমা বল্লেন, আমার দাদা দিদিরা কোথায় রে? দেশে যাবার ফুর্তিতে তারা বুঝি ঠাকুরমাকে ভুলেই গেল।

ওরা আগ বাড়িয়ে গাড়ীতে উঠে বসে আছে। আচ্ছা মা, আমি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। আয় আয় ছোট বৌ আয়, মেজবৌ ছোট-বউয়ের হাত ধরে টানতে টানতে বল্লে, চলো ঠাকুরপো, ঠিক করে সব গুছিয়ে নেবে চলো।

ঠাকুরপোও কোন দ্বিরুক্তি না করে বল্ল, তা হলে চলি মা। কখন কেমন থাকো ওদের নিয়মিত চিঠি দিতে বোলো, আর দরকার বুঝলেই খবর দিও, যেখানে যে অবস্থায় থাকি দৌড়ে চলে আসব।

আয় বাবা আয়, দুর্গা দুর্গা, দুর্গাশ্রীহরি—

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই তিনটে নাতি-নাতনী এসে গেল।

নিতাই বল্ল, ঠাকুরমা, আমরা যাচ্ছি।

এসো দাদা এসো।

নিতাই টুক্ করে ঠাকুরমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই পরের দু'টো দাদার দেখাদেখি বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

হয়েছে, হয়েছে, ঠাকুরমা ওদের দাড়িতে হাত দিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকালেন।

ওরা পেছন ফিরে দৌড় দেবার উপক্রম করতেই ঠাকুরমা বল্লেন, দাঁড়ারে, দাঁড়া, দাঁড়া। তারপর নিজের মাথার বালিশের তলা থেকে

কাপড়ের থলিটা টেনে বার করে তিনখানা এক টাকার নোট তিনজনকে দিতেই ওরা ফুর্তি করে নোট তিনটে নিয়ে নিল।

নিতাই বল্ল, আসি ঠাকুরমা।

এসো দাদা।

দরজার বাইরে বেরিয়েই নিতাই বল্ল, এই, তোরা টাকা হারিয়ে ফেলবি। আমায় দে, রেখে দি।

ছোট বোন বল্ল, আমি মাকে দেব।

মাকে দিলে আর পাবি না। মা খরচ করে ফেলবে, তার চেয়ে আমার কাছে জমা রাখ্।

না—ছোট খুকী মুঠোর মধ্যে নোটখানা চেপে রাখল।

ওর মাথায় এক চাঁটি মেরে নিতাই নোটটা কেড়ে নিল। সে কেঁদে উঠল। বৃদ্ধা বল্লেন, ও মনোরমা, দেখ ত দেখ ত, যাবার সময় ওরা আবার কান্নাকাটি করে কেন?

ওরা যখন ওদের পোটলা-পুটলি গাড়ীতে তুলছে, বাদল তখন সেই ফাঁকে বাবুর ঘরে ঢুকল।

কি রে বাদল, ঘটক প্রশ্ন করলেন।

বাদল বল্ল, সাড়ে আটটা প্রায় বাজে। আমি তাহলে হাওড়ায় পৌঁছেই গাড়ী ছেড়ে দেব। ড্রাইভার এসেই খেয়ে নিয়ে আপনার সঙ্গে বেরুবে।

ঠিক আছে, ঘটক সায় দিলেন।

তা হলে রাত্তিরের আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, তাই বলছিলুম—

কি?

যিনি আসবেন, তিনি কি ও ঘরে থাকতে পারবেন?

কেন? ও ঘরে কি হয়েছে?

দেওয়ালে দাগ-টাগ, নোংরা-ভোংরা—আপনি একবার দেখুন, তারপর যা বলবেন তাই করব।

চিন্তিতমুখে চেয়ার ছেড়ে ঘটক উঠে সোজা গিয়ে ঢুকলেন সেই

গেস্ট্রুমে, যে ঘরে ওরা এতদিন ছিল। বাদলও সঙ্গে সঙ্গে গেল। বাদল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কিন্তু দেখাবার কোন দরকার ছিল না। ঘটক দেখলেন, দেওয়ালে যে প্লাস্টিক পেন্ট ছিল সেই রঙের ওপোর বোধ হয় সেই বাঘের কান-কাটা ভাঙ্গা কাঁচি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বেগুন, ছাগল এই সব আঁকা হয়েছে, জ্যামিতির ফিগারও বাদ যায়নি। স্কুলে নিতাইয়ের যতটা বিদ্যে হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় সে এই দেওয়ালে খোদাই করে গেছে।

ঘটক গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চকচকে খাটের ওপোর ডানলোপিলোর গদি, তার ওপোর চাদরখানা মুচড়ানো, দলা পাকানো, ছোপ্ ছোপ্ দাগ এবং বিশ্রী তেলা ও ময়লা ; মশারিটা অর্ধেক তোলা, অর্ধেক ঝুলছে, ঘরের মেঝেয় বিশ-পঁচিশটা বিড়ির পোড়া টুক্‌রো, দেশলাইয়ের কাঠি, দেওয়ালের কোণে পানের পিচ। ওপোরে চেয়ে দেখলেন সর্ব্বনাশ, দেওয়ালের প্লাস্টিক-পেন্টে ঠুকে ঠুকে পেরেক পোতবার চেষ্টায় কয়েক জায়গায় গর্ত্ত করে শেষে সেই পেরেকই বসানো হয়েছিল এবং তাইতে দড়ি বেঁধে সেই দড়ির অপর প্রান্ত খাটের ছত্রিতে লাগিয়ে আনলা করা হয়েছিল বোধ হয় কাপড় রাখার জন্য। ড্রেসিং টেবিলের আরশিখানা অবিশ্যি ভাঙ্গে নি কিন্তু ভাঙ্গা কাঁচির খোঁচায় টেবিলের দুটো দিক ক্ষতবিক্ষত। ওয়ার্ডরোব স্টীল আলমারিতে চুন মোছার দাগ, কাঁচির খোঁচা সেও কিছু পেয়েছে।

ঘটকের চোখ ফেটে জল আসে। বল্লেন, এ ঘরে ত শম্ভুরা থাকত, ঐ ছোঁড়াগুলোও কি এখানে থাকত ?

সুবো এর জবাব দিল। বল্লে, এমনটা যে করতে পারে তা কি আমি জানতুম ? দিনের বেলায় ওপোরে উৎপাত করত বলে আমিই ওদের তাড়া দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিতুম। ছিঃ ছিঃ।

ঘটক বল্লেন, ঠিক আছে, আমার গেষ্টের জন্য এ ঘরে ব্যবস্থা করতে হবে না। আজ দুপুরেই অন্য বন্দোবস্ত করব। বাদলকে বল্লেন, তুই রফিক মিস্ত্রীকে আজই খবর দিবি।

সুবো বল্ল, খোকাদা'রা যে ঘরটায় থাকে—

ওটায় হবে না, নট্ সুটেবল্।

ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ীর কাছে এসে বল্লেন, তুই গাড়ীতে ওঠ বাদল, আর শম্ভু শোন্, তোরা এ বাড়ীতে আর কখনও আসিস নি। ঘরটার যে হাল করেছিস সেটা কোন মানুষে করতে পারে না, হরিবল্।

আমি কি করব, ছোট বাচ্চারা—

শম্ভুকে থামিয়ে দিয়ে বাদল, ড্রাইভার, পাশে দাঁড়ানো মালী সকলকে শুনিয়ে ঘটক বললেন, যদি এরা, কি আমার মেজ ভাই পরেশ কোনদিন এ বাড়ীতে আসে তাহলে তাকে গেটের ভেতরে ঢুকতে দিবি না, এই আমার শেষ কথা বলা রইল, সকলে মনে রাখবি। জোর করে ঢুকতে চাইলে মেরে তাড়িয়ে দিবি, তারপর যা হয় আমি বুঝে নেব।

সুবো থেকে সুরু করে সকলেই ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল।

মা গোঃ, আমার মরণটা হয় না রে—

গাড়ী-বারাণ্ডার বাইরে যারা ছিল তারা মুখ তুলে দেখল এক হাত রেলিং-এ ও এক হাতে মনোরমার হাত ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন এ বাড়ীর ঠাকুরমা। দুর্ব্বল অসুস্থ বৃদ্ধা কোনদিনই দোতলার গাড়ী-বারাণ্ডায় আসেন না, কিন্তু আজ বোধ হয় ছোট ছেলে ও নাতি-নাতনীদের ওপোর থেকে এগিয়ে দিতে এতটা হেঁটে ঐখানেই এসেছিলেন।

এসে কি দেখলেন, কি শুনলেন?

না এলেই কি ভাল হোত না! সব সময় সব কিছু দেখার চেষ্টা কি লাভজনক?

পাঁচ

সুরেলা মিহি কণ্ঠে ঠোঁটের হাসি, মনের উপচে-পড়া আনন্দ গোপন করার চেষ্টা-করেও করতে-পারছে-না এম্‌নি একখানা রোমান্টিক ভাব সারা দেহে ফুটিয়ে কুমারী ভারতী সেন সুন্দর হাত হু'খানা জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বল্ল, আসুন মিঃ ঘটক, আপনার কথাই ভাবছিলুম। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন কামস্‌কাট্‌কার দক্ষিণে যে অন্তরীপটা আছে তার নাম কি ?

প্রায় পনের দিন ধরে যার কথা সর্বদাই মনে পড়ছে সেই ভারতীর সঙ্গে দীর্ঘ হু'সপ্তাহ পরে দেখা হওয়ামাত্রই এই অদ্ভুত প্রশ্নে বেচারী সুব্রত ঘাবড়ে গেল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে মোটর বাইকের রিং-শুদ্ধ চাবিটা আঙ্গুলে ঘোরানো বন্ধ করে ভারতীর মুখের দিকে চেয়ে বল্ল, কি রকম ? হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে কামস্‌কাট্‌কাকে টানাটানির কারণ ? সেখানে কি নতুন কোন পেন্‌-ফ্রেণ্ড জুটেছে ?

ও বাবা, পেন্‌ফ্রেণ্ড আমি করি না। সে সব করবেন আপনারা, যাদের ফ্রেণ্ডসিপের ship মালের ভারে ডুবুডুবু, কিছুটা পত্রের দ্বারা jettison না করলে ভরাডুবির আশঙ্কা। তা যাক, এতদিন ছিলেন কোথায় ? কেপ লোপাট্‌কায়।

বা রে! আমি ত যথাস্থানেই ছিলুম, প্রশ্নটা বরং আমিই আপনাকে করতে পারি, যিনি এক যুগ ধরে লোপাট্‌কায় লোপাট হয়েছেন।

আমি লোপাটকায় ? মাই গড্‌, আপনি তা হলে আমার ওপোর সি আই ডি-গিরি করেন বলুন! যাক, শুনেও সুখী হলুম যে আমার পেছনে একজন সি আই ডি আছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে আছেন মশাই ? গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে, না দেহরক্ষী হিসেবে ?

তার মানে ?

মানে অতি সহজ। সি আই ডি-রা আসামীদের পেছনে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে ঘোরে, আর ভি আই পি-দের সঙ্গে দেহরক্ষী হিসেবে থাকে। তা আপনার কাছে আমি আসামী, না ভি আই পি? কোন্ চোখে আপনি আমাকে দেখেন সেটাই আমার প্রশ্ন।

সুনন্দা চ্যাটার্জী ব্যাড্‌মিণ্টন র‍্যাকেট-হাতে রবারের জুতো-পায়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসেই থম্‌কে গেল। পেয়েছেন? পেয়েছেন ত?

কথাগুলো সুব্রতকে লক্ষ্য করে বলেই ভারতীকে বল্ল, জানিস্ ভারতী, এই ক'দিনে অন্ততঃ হাজারবার উনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন তুই কোথায় আছিস, কলকাতায় আছিস কি না, থাকলে আসিস্ না কেন, শরীর খারাপ হোল কি না, এইসব—

রিয়েলি? সুনন্দার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ভারতী বল্ল, তা হলে ভাই আমার কাছ থেকে ওঁর ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে বল্।

নিশ্চয়ই, হাজার বার। তা তুই ভাই গুনে গুনে হাজারবার ধন্যবাদ দে, আমি সেই ফুরসতে এক হাত খেলে আসি।

সুনন্দা র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল।

কি ব্যাপার বলুন ত? কোথায় গিস্‌লেন? সুব্রত প্রশ্ন করল।

মামার বাড়ী, উত্তর দিল ভারতী, দিদিমার ভারী অসুখ হয়েছিল। দাদু মাকে ডেকেছিলেন। মা বল্লেন, তোর ত কলেজ বন্ধ রয়েছে, আমার সঙ্গে চ', তাই যেতে হয়েছিল। ট্রাঙ্ক কল পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরুতে হোল, তাই আর কাউকেই জানাতে পারি নি।

দিদিমা আছেন কেমন?

ভাল। হার্ট এ্যাটাক ত! যখন হয় তখন খুব বাড়াবাড়ি, আবার একদিন পরেই বেশ সুস্থবোধ করেন। ভয় কি জানেন, এটা ওঁর সেকেণ্ড এ্যাটাক।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। সকলেই ভয় পাচ্ছে, হার্টের ব্যাপারে থার্ড এ্যাটাক না কি খুবই বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। ওঁর বয়স কত হোল?

চোখ পাকিয়ে ভারতী বল্ল, মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই এই সাধারণ ভদ্রতাটুকুও আপনার জানা নেই?

এতক্ষণে সুব্রত তার সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। হাসতে হাসতে বল্ল, সে সব আপনাদের মত আন্‌ম্যারেডদের জন্য। দিদিমা নিশ্চয়ই অ্যান্‌ম্যারেড নন।

গম্ভীরভাবে ভারতী বল্ল, বলা যায় না। দিদিমার বিয়েয় ত আমি নেমন্তন্ন খাই নি, কাজেই বলতে পাচ্ছি না ওঁর বিয়ে হয়েছিল কি না।

সবিস্ময়ে সুব্রত বল্ল, এ্যাঁ, এইভাবে উনি আপনাকে ফাঁকি দিয়েছিলেন? বিয়েয় বলেন নি পর্যন্ত। কিন্তু আমায় ত বলেছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমি শুনেছি। আপনি দাদুর সঙ্গে নিতবর হয়ে গিয়েছিলেন। তা ভাই নিতবর, এখানে এই চলনপথে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি! চলুন, ভিতরে গিয়ে বসা যাক।

চলিয়ে জী, চলিয়ে, সুব্রত ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

বালিগঞ্জের সান্ধ্য ক্লাবে সুব্রত ঘটক মাসখানেক হোল সভ্য হয়েছে। সুব্রতর কলেজের সহপাঠী অরুণ রায় ওকে এখানে এনেছে। অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েরাই এর সদস্য হোতে পারে, কারণ মাসিক চাঁদা পঁচিশ টাকা। তার ওপোর প্রায়ই বাড়তি খরচ করতে হয়। ক্লাবের সদস্যরা অধিকাংশই স্কুটারে, মোটর বাইকে আসে, গাড়ীও আছে অনেকের। পদাতিক সদস্য নেই বল্লেই হয়। ফোন, ফ্যান, বাড়ী, গাড়ী এবং সেই সঙ্গে সাড়ীর বাহার। প্রলিতারিয়েত ছোক্‌রারা চোখ টেরিয়ে দেখে, বিরুদ্ধ সমালোচনাও করে; এরা সে সব গ্রাহ্যও করে না।

একটা সোফার ওপোর বসে সুব্রত প্রথমেই বল্ল, বসার আগে এক হাত ব্যাড্‌মিণ্টন হোলে কেমন হোত?

ভারতী পায়ের ওপোর পা তুলে আরাম করে বসে শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য সহকারে বল্ল, এই যে আপনারা সব ব্যাড্‌মিণ্টন-ব্যাডমিণ্টন

বলেন এ আপনাদের ভারী অন্যায়। হোয়াই ব্যাড্, বলুন গুড্-মিণ্টন।

তথাস্তু। গুড্মিণ্টনই বলব। তা হবে না কি এক হাত?

না ভাই, আজ শরীরটা ভাল লাগছে না। সেই বারোটার সময় গাড়ীতে বসেছি আর বাড়ী পৌঁচেছি সাড়ে তিনটের পর। মাঝে মাঝে রাস্তা এত খারাপ যে মনে হয়েছে এ্যাক্সেল ভাঙ্গবে, কিম্বা টায়ার ফাটবে। তারপর এক এক জায়গায় লেভেল ক্রসিং-এ ঝাড়া পনের মিনিট দাঁড়িয়ে। বাড়ী ফিরে আর নড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু বিনা নোটীশে এতদিন ডুব মেরেছি তাই মনটা ছট্ফট্ করছিল, না এসে পারলুম না। তা তোমাদের খবর কি? বলেই ভারতী জিভ্ কেটে থেমে গেল।

কি হোল? হঠাৎ স্টপ ডেড্ কেন? প্রোসীড্, এখানে কোন লেভেল-ক্রসিং নেই।

ভাবছি কিছু মনে করলেন না কি? গম্ভীর কণ্ঠে ভারতী উত্তর দিল।

আগে করি নি, এখন করছি, রহস্যভরে উত্তর দিল সুব্রত।

অপরাধ?

একবার 'তুমি' পরক্ষণেই 'আপনি', এরকম বহুরূপী সাজবার ক্ষমতা আমার নেই। তাই বলছি ঐ বাড়তি সম্মানটা দাদুদের জন্যে তুলে রেখে আটপৌরে 'তুমি'টাতেই আমাকে ভাল মানাবে।

হাসি হাসি মুখে ভারতী বল্ল, 'আমাকে মানাবে' না বোলে 'আমাদের মানাবে' বলাই উচিত। তাই না?

যথা ইচ্ছা, তাই চলুক।

But why ভাববাচ্য? আপনি, তুমি, যা হয় একটা কিছু বলো।

সুব্রত পকেট থেকে সুন্দর এক সিগারেট-কেস বার করে একটা সিগারেট নিয়ে কেসের সংলগ্ন লাইটার দিয়ে ধরাল। হাসি হাসি মুখে সে নীরবেই ছিল এবং অপাঙ্গে এক একবার ভারতীর দিকে দেখছিল।

ও, এ জিনিস পাওয়া গেছে? হাত বাড়িয়ে কেস্‌টা ভারতী নিয়ে নিল। মেড্‌ ইন্‌ চায়না ত? না এদেশী নকল?

আজ্ঞে না মশাই, মোটেই নকল নয়। আমার এক বন্ধু নেপালে গিয়েছিল। ফেরার পথে এই জিনিস মাত্র দু'টো আনতে পেরেছে। একটা নিজের জন্য রেখে এটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছে! জিনিসটা খুব লাভ্‌লি, তাই না?

সত্যি, লাইটারটা একবার জ্বেলে আবার নিভিয়ে দিল ভারতী।

হোক-না একটা। দাদুর বাড়ী থেকে ফিরে চীনা মালের সদ্ব্যবহার।

মেম্‌গিরির ঐটুকুই বাকী বুঝি? চোখ পাকিয়ে ভারতী বল্ল, আমাকে কি মনে করেন মশাই?

মনে করি? মনে করি, আমি একটি সেকেলে মেয়ের সঙ্গে কথা কইছি, দাদুর এক বুড়ী ঠান্‌দি।

বিগলিত ভারতী খুকীসুলভ হাবভাবে বল্ল, সত্যি, একটা মজার কথা শুনবে? দিদিমা আমাকে মাঝে মাঝেই আদর করে সতীন বলে ডাকে। এবারে বলে কি জানো, বলে—

ভারতী থেমে গেল।

কি বলে?

না কিছু বলে না।

না না, কি বল্লেন বলতে হবে।

যাঃ। বুড়ো হোলে মানুষ এত অসভ্য হয়! যা তা কথা যেন মুখে লেগেই থাকে। যত ফিল্‌দি ইয়ার্কি?

এই যে মিস্‌ সেন, কেমন আছেন? এদ্দিন দেখি নি কেন?

আসুন মিঃ কাপুর। আজ এত দেরি করে এলেন যে, ভারতীর পাল্টা প্রশ্ন।

ডান হাত উঁচু করে ঘড়ি দেখে পি এন্‌ কাপুর বল্ল, হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল। অফিস থেকে বেরোবার মুখেই এক ভদ্রলোক এলেন—

কাপুর সাহেব কি গল্পই করবে, না সেট্-এ যাবে, পেছন থেকে অভিজিৎ ঘোষ কাপুরের পিঠে হাত দিয়ে বল্ল, মিস্ সেন এসে গেছেন দেখছি! এতদিন ছিলেন কোথায়? অসুস্থ না কি? কেমন যেন—

ভারতী উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল, না অসুস্থ ঠিক নই তবে সারাদিন মোটরিং করে টায়ার্ড ফীল করছি।

কোথায় গিসলেন?

যাই নি কোথাও। ফিরলুম কেষ্টনগর থেকে।

হঠাৎ কেষ্টনগর?

মামার বাড়ী। একটু থেমেই ভারতী বল্ল, আপনারাই খেলুন, আমি আর লন্-এ নামছি না।

দ্যাট্স্ রাইট, রেষ্ট নিন, সুব্রতর দিকে চেয়ে অভিজিৎ বল্ল, ভাল ত?

সো, সো, সুব্রত জবাব দিল।

ওরা চলে যেতেই সুব্রত বল্ল, চলুন, পেছনের পোর্টিকোয় নিরি-বিলিতে বসা যাক্।

সেই ভাল, ভারতী সায় দিল, এখানে ভদ্রতার ভিড় ঠেলতে প্রাণান্ত।

বড় ঘরের পেছনের বারাণ্ডায় বড় কেউ যায় না। ক'খানা হাতল দেওয়া বেঞ্চি ওখানে পড়ে আছে আর আছে পার্টিসান দেওয়া ছোট একটা ঘর,—কফি ক্যান্টিন। ওরা সেই বারাণ্ডার বেঞ্চে গিয়ে বসল, আধুনিকদের ভাষায় ওটারই নাম পোর্টিকো।

সুব্রত বল্ল, একটু কফি হোক?

হোক্।

বয়, সুব্রত ডাক দিল।

ক্যান্টিন থেকে এ্যাপ্রণ পরা বয় বেরিয়ে এল

দু'টো কফি, আর—

জিজ্ঞাসুনেত্রে সুব্রত ভারতীর দিকে চাইল।

আর কিছু নয়। এইমাত্র বাড়ীতে ভরপেট খেয়েছি।

বয়ের দিকে চেয়ে সুব্রত বল্ল, দু'টো কফি।

বয় চলে গেল।

তারপর? সুব্রত নড়ে চড়ে ভারতীর দিকে সরে এল। বল্ল, মজা করে দু'সপ্তাহের আউটিং কেমন লাগল?

ও সব ঐ একদিন দু'দিনই ভালো লাগে, তারপর বড্ড এক ঘেয়ে, বোরিং।

কেন? ও বাড়ীতে কোন সুইট কম্পানী নেই বুঝি?

সুইট্? হ্যাঁ আছে বই কি। সুইট দাদু, আর সুইটি দিদিমা।

মামা মামী এণ্ড এট্সেট্রা কেউ নেই?

কেউ নয়। মামা আমার দু'জন, বড় থাকে গ্লাসগোতে। দশ বছর আগে বিলেত গিয়েছিল ডাক্তারী পড়তে। এফ আর সি এস হয়ে গ্লাসগো-তেই স্থায়ী হয়েছে। বড় মামী মেড্ ইন গ্লাসগো। তাদের দু'টো ছেলে মেয়েও হয়েছে। তারা এখন কেবলই ছবি, 'শুধু পটে লিখা'। ফটো পাঠায়। দাদু দিদিমা সেই ফটোতেই বড় ছেলের সংসার সুখ ভোগ করে।

ছোট?

ছোট থাকে আইয়েনডভেনে। ফিলিপ্সের কারখানায় টেলিভিসন্ ইঞ্জিনীয়ার। বিরাট মাইনে। ওখানেই বাড়ী কিনেছে। মাঝে মাঝে বাবা মাকে নিয়ে যাবার জন্য চিঠি লেখে। দাদুর যাবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু দিদিমা রাজী নন, বলেন ওখানে যাবার চেয়ে কাশী যাওয়া ঢের ভালো।

ছোট মামার বিয়ে হয় নি?

বোধ হয় না। গত বছর পর্যন্ত হয় নি এটা আমরা জানি। এখন কি হয়েছে বলা যায় না।

কি রকম?

গত বছর বড় মামা সস্ত্রীক ছোট. মামার নতুন বাড়ীতে এক হপ্তার ছুটি ভোগ করে গ্লাসগোয় ফিরে দাদুকে চিঠি দিয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত ছোট মামা বিয়ে করে নি এটাই বড় মামা লিখেছিল। তার পরের খবর সঠিক বলা যায় না।

দাদুর মেয়ে নেই আর ?

না। নেই ! মা-ই হচ্ছেন দাদুর একমাত্র মেয়ে।

তাহলে দাদু এখন একলা পড়ে গেছেন ?

হ্যাঁ, বাড়ীতে উনি একলাই। ঠাকুর চাকর আর বুড়ী বউ নিয়ে অখণ্ড হনিমুন করছেন।

ভারতী হাসতে থাকে। বলে, আমরা মাঝে মাঝে যখন যাই, তখনই একটু গুলতান হয়। হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বল্ল, আরে শোনো, তুমি যাবে ? দোসরা অক্টোবর দাদুর বাড়ী গান্ধী-জয়ন্তী হবে শুনে এলুম। তখন তোমার কলেজেও ছুটি হবে। যাবে ?

যেতে পারি।

উঃ, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভারী মজা হবে।

কি রকম ?

পরক্ষণেই ম্লান হয়ে সভীতকণ্ঠে ভারতী বল্ল, না বাবা, তোমাকে নিয়ে যেতে-টেতে পারব না, বলেই ভারতী নিজের আঙ্গুল কামড়াতে লাগল।

কেন, আমি কি গান্ধী জয়ন্তীর উপযুক্ত নই ?

আরে না না, সে কথা হচ্ছে না। দাদুর মুখের রাখ-ঢাক নেই। হয় ত সব যা তা বলতে স্মুরু করবেন।

রাগ করবেন ?

না না, রাগ-টাগ কিছু নয়। এমন সব সেকেলে ঠাট্টার ফোয়ারা ছোটাবেন যে পালাতে পথ পাবে না। পয়সা থাকলে কি হয়, দাদু বড্ড রাষ্টিক।

দিদিমা ?

দিদিমা ভাল। নিতান্ত নিরীহ, গুড়ি-গুড়ি গোছের। দাতু খুব বাড়াবাড়ী করলে দিদিমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন।

দাতু কি বলেন তখন ?

দাতু ? দিদিমার ধমক খেয়ে দাতু বলেন, গনেশ, আমার গুড়-গুড়িটা বাইরের ঘরে নিয়ে আয়, বলেই কাছা কোঁচা সামলাতে সামলাতে বাইরের ঘরে চলে যান।

খুব তামাক খান বুঝি ?

খুব। সারাদিন। যতক্ষণ জেগে থাকেন। তামাকের ধোঁয়ায় দাতুর দাড়ী-গোঁফ সাদা হয়েও সাদা হতে পারে নি, লাল্‌চে হয়ে আছে। কিন্তু সে তামাক খুব সুগন্ধী। এই সব সিগারেটের চেয়েও সেই তামাকের গন্ধটা অনেক ভালো লাগে।

ছ'এক টান টেনে দেখেছ না কি ?

গা তুলিয়ে হেসে উঠল ভারতী। বল্ল, দাতুর সঙ্গে তুমি পাল্লা দিতে পারবে ?

কি রকম ?

এই আজই সকালে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে দাতুর কাছে কাগজটা যখন নিয়ে গেলুম তখন দাতু বল্লেন, বোস্। বসলুম। গণেশ কল্কেটা ধরিয়ে গড়গড়ায় বসিয়ে দিল। থিয়েটারী ঢং-এ দাতু নলটা আমার দিকে এগিয়ে ধরেই বল্লেন, পিজিয়ে বেগম সাহেবা। আমিও তেমনি। আমি বল্লুম, ঠারিয়ে জী, বেগম সাহেবাকে ঠাকুর ঘর থেকে ডেকে আনি।

তারপর ? হাসতে হাসতে সুব্রত সামনের টিপয়ে কফির খালি পেয়ালা নামিয়ে রাখল।

ভারতী বল্ল, তারপর দাতু চোখ বড় করে বল্লেন, সর্বনাশ ! আমার বেগম সাহেবা একথা শুনলে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবেন। খবরদার খবরদার, 'ও পথে যেও না দিদি হুতুমথুমোর ভয়'।

আরে, আপনারা এখানে ? আমরা যে আপনাদের খোঁজ করছি, হল্‌ঘরের দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে সুদর্শন ওদের ডাকল।

কি ব্যাপার স্নুদর্শন দা ? ভারতী অন্তরঙ্গভাবে প্রশ্ন করল।

মিঃ ঘটকের কাছে শোনেন নি, আমাদের একটা নতুন প্রস্তাব হচ্ছে ? বলেন নি মিঃ ঘটক ?

ও, সেই সাহিত্য সভার কথা, সুব্রত উত্তর দিল।

হ্যাঁ। আমাকে সেক্রেটারী বানিয়ে আপনারা গা' আড়াল দিলে চলবে কেন ?

না না, গা' আড়াল দেব কেন ? আপনি যা হুকুম দেবেন তাই করব।

ব্যাপার কি ? এই ক'দিন মাত্র আসিনি, তাতেই দেখছি খুব বাক্ ডেটেড হয়ে গেছি, ভারতী বিস্ময় প্রকাশ করল।

সুদর্শনদা বল্লেন, ভয় নেই, ব্যাক্ ডেট্ থেকে পোস্ট-ডেট্ হয়ে যাবেন। মানে গত কমিটি মিটিং-এ স্থির হয়েছে আমাদের মাসে এক-দিন করে সাহিত্য সভা হবে। সেই সাহিত্য সভার ভার দেওয়া হয়েছে আমার ওপোর।

কি হবে সেই সভায় ? ভারতী প্রশ্ন করল।

গান, নাচ, স্বরচিত কবিতা, গল্প এই সব পাঠ, মধ্যে মধ্যে একাঙ্কিকা নাটক অভিনয়,—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই আর কি। প্রতি মিটিং-এ একজন দু'জন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে সভাপতি, প্রধান অতিথি হিসেবে আনা হবে, আর আমাদের মেম্বারদের ভাল ভাল রচনা একত্র কোরে একটা পূজা সংখ্যা, একটা নববর্ষ সংখ্যা এইরকম ভাবে সময় সময় পত্রিকা প্রকাশও করা হবে।

মাসিক পত্রিকা নয় ? ভারতী প্রশ্ন করল।

হতে পারে। পরে সুবিধা হোলে এবং ভাল লেখা-টেখা পেলে মাসিক পত্রিকাও হতে পারে। প্রথমে একটা পূজা সংখ্যা ত বেরুক।

তা এখন কি করতে হবে ?

ভেতরে আসুন। আমরা ক'জনে বসে ঠিক করি আমাদের প্রথম সভায় কাকে আনা হবে।

চলুন। ভারতী সোৎসাহে এগিয়ে পড়ল। সুব্রত ভারতীকে অনুসরণ করে।

ওদের ক'জনের বৈঠকে স্থির হোল তারাশঙ্কর, বনফুল, প্রেমেন মিত্তির, জরাসন্ধ, প্রমথ বিশী এঁদের সঙ্গে দেখা করে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং তারপর চিঠি ছাপিয়ে—

কিন্তু সামনের রবিবারে মিটিং করতে হোলে সময় আর বেশী নেই। এর মধ্যে চিঠি ছাপানো—

ছাপানোর অসুবিধে কি আছে? মিঃ কাপুরের নিজস্ব ছাপাখানা রয়েছে। কি বলেন মিঃ কাপুর?

হ্যাঁ হ্যাঁ, চিঠি একদিনেই হয়ে যাবে। পি এন্ কাপুর নামেই কাপুর, কথাবার্ত্তায় একদম্ বাঙ্গালী হয়ে গেছেন।

একজন বল্লেন চিঠির কি দরকার? সাহিত্য সভা ত আমাদের মেম্বারদের নিয়েই হবে।

তা হলেও, সুদর্শনদা বল্লেন, তা হোলেও চিঠির একটা আলাদা ওয়েট্ আছে। তা ছাড়া মেম্বাররা যদি তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করতে চান—

হ্যাঁ হ্যাঁ, চিঠি করতে হবে বৈকি।

ঠিক হোল, সুদর্শনবাবুই সম্পাদকরূপে ঐ সব সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থির করবেন, কারা কারা আসবেন। একজন সভাপতি, একজন উদ্বোধক, একজন প্রধান অতিথি, একজন মূল বক্তা—

হ্যাঁ হাঁ, প্রথম অধিবেশনে যত জনকে পাওয়া যায়, কিন্তু ওঁরা আসবেন কি?

গাড়ী পাঠালে সব্বাই আসবে। ভুলে যেওনা, বক্তৃতা দেবার জন্য ওদেরও গলা কুট্‌কুট্ করে। তাচ্ছিল্যের সুরে সুদর্শনদা কথাগুলো বলেছিলেন। মোটামুটি ব্যবস্থা করে রাত্রি আটটা নাগাদ সকলেই উঠে পড়লেন।

ওঠবার সময় সকলের অগোচরে ভারতী সুব্রতকে বল্ল, ঠিক কোন্ সময় বাড়ীর টেলিফোনে তোমাকে নিরিবিলি পাব বল ত ?

কেন ?

দরকার আছে।

কবে ?

কাল।

বেলা এগারটায়।

ঠিক আছে।

শুভরাত্রি জানিয়ে ভারতী নিজের ফিয়াটে উঠে চলে গেল। ওর সঙ্গে গেল সুনন্দা চ্যাটার্জী। সুনন্দার নিজের গাড়ী নেই।

সুব্রতও নিজের মোটর বাইকে স্টার্ট দিল।

গাড়ী ছুটছে। সুব্রত মনে মনে অরুণ রায়কে ধন্যবাদ দিচ্চে। সে ওকে এখানে না আনলে অমন ভারতীকে সে কোথায় পেত। প্রথম দিনেই ভারতীর সঙ্গে সুব্রতর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অরুণ। সেই থেকেই ওর ওপোর ভারতীর পক্ষপাতিত্ব অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হচ্চে। আজ এই দু'সপ্তাহের অদর্শনের পর সেই ঘনিষ্ঠতাই কেমন যেন সহসা জমাট হয়ে উঠল। মেয়েটা বেশ! অন্যদের মত কোন রকম ন্যাকামি নেই। বি কম্ পার্ট ওয়ান পড়ার সময় সুব্রত চারুচন্দ্র কলেজে পড়ত। তখন সেখানকার কয়েকজন সহপাঠিনীর সঙ্গে ওর কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল, কিন্তু সেইসব গীতা, শোভা, মানসী তাদের তুলনায় ভারতী একেবারে অন্য রকম। একে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

বাড়ী ফিরে গ্যারেজে মোটর বাইক তুলে নৈশ আহার শেষ করে সুবো ভাবল এই ত মোটে সাড়ে নটা, কাল বেলা এগারটায় ফোন করবে,—উঃ, এখনও সাড়ে তেরো ঘণ্টা, কিন্তু কি বলবে ? আজই কি বলতে পারত না ?

এ্যাকাউন্টেন্সি—না, আজ আর ওটা ভাল লাগবে না। আজ সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস্ নিয়ে বসি। না, ওটাও সুবিধে হবে না।

কমার্শিয়াল জিওগ্রাফি, হ্যাঁ জাপানটা পড়া যাক। কামস্‌কাটকার কথা দিয়ে আজকের আলাপ সুরু হয়েছিল।

টেবল্‌ ল্যাম্পের সামনে ভূগোলের বই খুলে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বি. কম্‌ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সুব্রত ঘটক সে রাত্রে পড়তে বসেছিল বটে কিন্তু পড়তে কি সে আদৌ পেরেছিল! টোকিও ইয়োকোহামা, কোবে বন্দর থেকে তার মন চলে গেল কামস্‌কাটকায় এবং সেখান থেকে তেরো ঘণ্টার পোস্ট ডেট্‌ নিয়ে হাজির হোল বাবার নিরিবিলি অফিস ঘরে টেলিফোনের টেবিলে। মুখে না বলে টেলিফোনে বলার মত কথা ওর কি থাকতে পারে?

কল্পনার মালা গাঁথতে গাঁথতে সুব্রত এক সময় বই বন্ধ করে আলো নিভিয়ে সে রাত্রে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ঘুমোয় নি। ঘুম আসে নি।

ফুলশয্যার কল্পিত আভাসে সুখশয্যার অন্তিম কি এইভাবেই সূচিত হয়!

বেলা দশটায় বাবা অফিসে চলে গেলেন। আজকের রুটীনে সেণ্ট জেভিয়ার্সে সুবোর ক্লাস বারোটা পনের থেকে। পৌনে বারোটায় বাড়ী থেকে বেরুলে মোটর বাইকে আধ ঘণ্টায় কলেজে যাওয়া যায়। ঢের সময়! এগারটা থেকে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলা যাবে। বেলা এগারটায় ফোন ঠিক করবে ত? আহা, ওর নম্বরটা জানা থাকলে সুবোই ডাকতে পারত। কিন্তু নম্বর তো জানা নেই, ফোন যে কার নামে আছে সেটাও জিজ্ঞাসা করা হয় নি। বাড়ীর ঠিকানা অথবা ওর বাবার নাম দু'টোর একটাও যদি জানা থাকত!

দশটার পরেই সুবো খেয়ে নিল। তারপর বিনা কারণেই নীচে ঘুর ঘুর করতে লাগল। খোকা আজ বাড়ীতেই আছে। আজ তার ডাক্তার বাড়ী যাবার দিন নয়। একবার দু'বার সুবোর কাছাকাছি এসে খোকা উস্‌খুস্‌ করল। বোধ হয় যেন আলাপ জমাবার ইচ্ছা। সুবো আমল দিল না। ঐ বুড়ো খোকাকে সুবোর ভাল লাগে না।

অবশ্য আজকাল খোকার যেন কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সেই প্রথম যখন এসেছিল তখন যেমন পাগলামি সে করত তেমনটা আর নেই, কিন্তু তা হলেও ওর সঙ্গে বলার মতো কথা কিছু নেই। সুবো অন্যদিকে ঘুরে গেল। খোকাও বাইরে বেরিয়ে গেল।

পৌনে এগার, -এগারটা বাজতে দশ,—পাঁচ,—তিন,—তারপর,— তারপর হল্ ঘরে গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকে মধুর শব্দে এগারটা বাজল।

নাঃ, মেয়েটা বাজে বাজে নাচিয়েছে! ওর নানা ভঙ্গীর নানারূপ ঠাট্টার এও বোধ হয় একটা বিশেষ রূপ!

এগারটা পাঁচ। যাঃ, বৃথা আশা, বৃথাই অপেক্ষা, দুত্তোরি। যাই ওপোরেই যাই!

ফোন বাজল। দৌড়ে অফিস ঘরে ঢুকল সুব্রত। হ্যালো—

ওধার থেকে সুরেলা কণ্ঠে শব্দ এল, কে, মিঃ ঘটক?

হ্যাঁ। ধারে কাছে কেউ না থাকা সত্ত্বেও গলা নামিয়ে সুবো বল্ল, মিস্ সেন ত?

কি মনে হয়! আর কতগুলি মিস্ এইভাবে ঘটক মহাশয়কে ফোন করেন?

ঘটকের কাছে ফোন ত মিস্‌রাই করবে। যে সব মিস্‌দের মিসেস্ হবার সাধ, অথচ নিজেরা যোগাড় করতে পারে না, তারাই ঘটকের দ্বারস্থ হয়।

ও মা, আপনি বুঝি সেই ঘটক! আমি ত জানতুম না।

ঘরের দরজায় খোকা এসে দাঁড়াল। তার পা দু'টো পরদার তলা দিয়ে দেখা যেতেই সুবো তার লঘু পরিহাসের ভঙ্গী ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বল্ল, তারপর আর কি খবর বলুন?

খবর? সব চেয়ে জরুরী খবর হচ্ছে এই যে কোন খবর নেই।

না না, কি ব্যাপার শুনি না? কাল থেকে ফোনের জন্য টাইম-এন্‌গেজ কোরে—

ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। কাল যখন আপনাদের মতো সুধী

ব্যক্তিরা একত্র হয়ে সাহিত্য-মাতার সেবায় একাগ্রভাবে কোন্ কোন্ সাহিত্যিককে সামনের রবিবারে বধ করা হবে সেই বিষয় চিন্তা করছিলেন তখন আমার মনে একটা কথা এসেছিল, সেইটেই নিরালায় বলার জন্য মহাশয়ের ফোনের শুভলগ্নটা জানতে চেয়েছিলুম—

কি সেই মহামূল্য বার্ত্তা ? বলে ফেলুন দেবি।

দরজার বাইরে খোকার পা দু'টো সরে যাওয়া সত্বেও কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামিয়ে সুবো এই অনবদ্য রসিকতাটি করেছিল।

বলব ? এবার খিল্‌খিলে হাসি থামিয়ে ফোনের ওধার থেকে ভারতী বল্ল, আচ্ছা, আচ্ছা বলছি। বলুন ত আপনার ও আমার নামের আদ্য অক্ষর দু'টি নিয়ে যে শব্দটা হয় সেটা কি ?

সেটা,—সেটা সুভা, 'ভাসু'ও হতে পারে।

না মশাই আপনার ও আমার বলেছি, আমার ও আপনার বলিনি। সুভাই ঠিক, ভাসু নয়। ভাসুর ভাদ্দরবউ নয়।

অথবা সংস্কৃত পাঠ্যের ভাসুরক সিংহও নয়।

ভাসুরক হতে পারে। আপনি ভাসুরক সিংহ, আর আমি ক্ষুদ্র শশক।

ঠিক তাই। শশকেন নিপাতিতঃ।

ব্যস্ত স্বর ওদিক থেকে ভেসে এল। ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলবেন না। বিংশ শতাব্দীর শশক ভাসুরকেন ব্যাপাদিতঃ।

এই ব্যাপার ? আর কিছু নয় ? কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। আমার নামের আদ্যাক্ষর এবং অপরের নামের শেষ দুটো অক্ষর একসঙ্গে করলে কি হয় ?

ও তরফ বোধ হয় একটু চিন্তা করল। তারপরেই ফোনে ভেসে এল একটা ঝঙ্কার। ছি ছি, ভারী অসভ্য ত ? ছিঃ।

দাদুর চেয়েও ? সুব্রত হাসতে লাগল।

হ্যাঁ। দাদুর বয়সে কি যে হবে তা ভেবেই পাচ্ছি না।

তা হলে আর ভেবো না।

এর পরেই অন্তরঙ্গ সুর, এই, শোন—

কি ?

আজ আর ক্লাবে যাব না, তুমিও যেও না।

ভাল কথা। তারপর ?

চল। আজ একটু বেড়িয়ে আসি। তুমি আর আমি। যাবে ?

যাব।

কোথায় যাব জানতে চাইলে না ?

কি দরকার ? একসঙ্গে যাব এটাই কি যথেষ্ট নয় ? কিন্তু দেখা হবে কোথায় ?

দেখা হবে—দেখা হবে—এই ধর, লাইট হাউসের গাড়ী বারাণ্ডায়।

কখন ?

বিকেল পাঁচটায়।

মোস্ট গ্ল্যাড্‌লি।

শোন, আমি তা হলে গাড়ী নিয়ে যাব না। তোমার মোটর বাইকে বেড়াব, কেমন ?

মোস্ট মোস্ট গ্ল্যাডলি।

মাত্র ছু'বার, মোস্ট টু দি পাওয়ার এন্‌ নয় ?

ফোনের মধ্যে কট্‌ কট্‌ করে শব্দ হতে সুরু হোল।

নাঃ, আর কথা কইতে দেবে না; অন্য কেউ রিং করছে ; সুব্রত বল্ল।

করুক গে।

অবাঙ্গালীর মোটা গলা হিন্দি বাংলা মিশ্রিত ভাষায় বল্ল, লাইন ছোড়ীয়ে জী, কোতো গল্পো কোরবেন।

উই আর অন্‌ দি লাইন, সুব্রত কড়া গলায় উত্তর দিল।

বহুৎ জরুরী বাৎ আছে, মেহেরবানি করকে লাইন ছোড়িয়ে, এবারের অনুরোধটা হুকুমগন্ধী।

ভারতী বল্ল, জীবে দয়া কর, বিকেল পাঁচটায় মীট করছি। ভারতী লাইন ছেড়ে দিল।

এরপর সুব্রত কলেজে গিয়েছিল, ক্লাসও করেছিল, কিন্তু কোন্ প্রফেসর কি পড়ালেন তা তার কিছুই শোনা হয় নি। কোন মতে ঘড়ির কাঁটাগুলো ঘুরিয়ে বাড়ী ফিরে বিকেলের খাবারটা চোখ বুজে গলাধঃকরণ করে পাঁচটার বেশ কিছু আগেই রাজদূতের পেট্রল ট্যাঙ্কে পুরো তেল ভরে একেবারে লাইটহাউসের তলায়।

ওকে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরঘুর করতে দেখে এক ছোক্‌রা এসে কানে কানে বল্ল, ক'খানা টিকিট চাই?

তার দিকে চেয়ে দেখে সুবো বল্ল, এখন নয়, পরে বলব।

ঠিক পাঁচটাতেই সুঠাম দেহলতার দর্শন মিলল। মার্কেটের দিক থেকে আসছে। মনটা উল্লাসে নেচে উঠল।

কাছে এসেই ভারতী বল্ল, কতক্ষণ?

এই ত কিছু আগেই এসেছি। তুমি যে ওদিক থেকে?

মার্কেটে যাবার নাম করে ওধারেই গাড়ী থেকে নামলুম। তারপর বল্লুম, আমার দেরি হবে, তুমি গাড়ী নিয়ে বাড়ী যাও।

কে ছিল গাড়ীতে?

কে আবার, ড্রাইভার। তাকে বল্লুম, ফেরার সময় ট্যাক্সিতে যাব। সে চলে গেল।

বাড়ীতে কিছু বলবে না?

কি জানি? আমি ত যাই না কোথাও, তাই কেউ সন্দেহ করে না। তার পরই বল্ল, চল, যাবে না?

সেই ছোকরা এসে বল্ল, দু'খানা টিকিট দেব? ভাল সীট আছে।

জিজ্ঞাসুনেত্রে সুব্রত ভারতীর দিকে চাইল। ভারতী বল্ল, না।

সুব্রত গাড়ীতে স্টার্ট দিল। ভারতী পিছনের সীটে সাবলীল ভঙ্গীতে উঠে বসল। বসতে বসতে বল্ল, স্কুটারের পেনিয়ন সীটগুলো ভাল, স্টেপ্‌নিটা ব্যাক রেস্ট হিসেবে পাওয়া যায়।

কথাটায় সুব্রত কেমন যেন দমে গেল। মুখে বল্ল, হ্যাঁ।

গাড়ী ততক্ষণে ধীরে ধীরে চৌরঙ্গীর কাছে এসে পড়েছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ভারতী বল্ল, কোথায় যাবে?

বলো, কোথায় যাব, উত্তরে না দক্ষিণে?

দক্ষিণেশ্বর যাবে?

যাব।

মোটর বাইক দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দক্ষিণেশ্বরের গেটে প্রবেশ করল।

গঙ্গার ধারের চাতালে বসে যে সব কথা ওরা বলছিল সেই সব কথা ওদের আগে, ওদের সময়ে, ওদের পরেও লক্ষ লক্ষ যুগল তাদের মিলনের আদিপর্বে অনুরূপভাবেই বলেছে, বল্‌ছে ও বলবে। রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী চীনা-বাদাম ওরা খেয়েছিল, বাদাম শেষ করে ছেলেটি সিগারেট ধরিয়েছিল, মেয়েটি সিগারেট কেসটা হাতে নিয়ে আবল তাবল বকেছিল, গঙ্গার ভাসমান নৌকো থেকে বালি ব্রিজের চলমান মালগাড়ী ও যাত্রীবাহী ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ ওরা দেখেছিল, আশে পাশের লোকরাও ওদের দিকে নজর দিয়েছিল, আরও অনেক-গুলি যুগল নিজেদের মশগুল অবস্থা সত্বেও মধ্যে মধ্যে ওদের দিকে নজর দিয়েছিল, এবং এইভাবেই সেদিনের রাত্রি আটটা উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এক সময় হঠাৎ সুব্রত আবিষ্কার করল যে ওদের কথাবার্ত্তা প্রচলিত পথ ছেড়ে পলিটিক্সের অভীমুখীন হয়েছে। ভারতী বল্ল, তোমার আমার মতো মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের কথা বাদ দিলে বাকী যারা থাকে তাদের ভবিষ্যৎ কি বলো ত? যে দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে কাজের অভাবে দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছে সে দেশে অশান্তি হবেই হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সুব্রত বল্ল, অশান্তি না হয় হোল, কিন্তু বোমা মেরে, ট্রাম পুড়িয়ে, ঘেরাও করে, ক্ষেত-খামারে লাল ঝাণ্ডা গেড়ে বেকার সমস্যার সমাধান কি হবে? এর ফলে দুঃখ, অভাব, বেকারী আরও বাড়বে। কারখানার

মালিকরা প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে বেকাররা কাজ পাবে কোথায়? যারা কাজ করছে তারাও বেকার হবে।

চিয়াং কাইশেকের চেলারাও ঠিক ঐরকম কথাই বলেছিল মশাই, কিন্তু এখনকার নয়া চীনকে দেখ। তোমরা এখানকার তরুণরা যে এই-ভাবে ভাবতে পার কি করে, সেইটেতেই আশ্চর্য্য হতে হয়। তা ছাড়া দেখ, ওর মধ্যে সত্য যদি কিছু না-ই থাকে তা হলে লক্ষ লক্ষ লোক কি বাজে ধাপ্পায় ভুলে আছে? বুর্জোয়ারাই বা অত ঘাবড়াচ্ছে কেন?

তুমি বুঝি সি পি এম-এর মেম্বার, না তুমি নক্‌শাল? কি গো, তুমি কি?

আমি? আমি হচ্ছি শ্রীমতী ভারতী সেন, আমি আর কিচ্ছু নই। আমার বাবার বাড়ী, মামার বাড়া, আমার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সব্বাই কট্টর বুর্জোয়া, আমিও তাই।

তবে?

তবে আর কি? কলেজের ছাত্রী হিসাবে সবই আমার কানে আসে এবং আমি সাধারণ ভাবে ভালমন্দ সবটাই চোখ কান খোলা রেখে দেখি, অনুভব করি, কোন কিছু না বুঝে হুট করে উড়িয়ে দিই না। তা হ্যাঁগো, তুমি বুঝি কংগ্রেস? আদি, না নব, তুমি কোনটায়?

আমি কোনটাতেই নই।

তোমার বাবা?

বাবা ব্যবসাদার, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সব পার্টিকেই চাঁদা দেন, ঐ ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনও বাদ যায় না, আবার ভোটের সময় সব পার্টিকেই তোয়াজ করেন। এই তো পরশু দিন কোন্ একটা পার্টি এসে বাবার কাছ থেকে একশ' টাকা চাঁদা নিয়ে গেল।

আমাদের বাড়ী থেকেও নেয়। রিফিউজীদের জন্যও আমার বাবা চাঁদা দেন। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? আমি ভাবি এই ভাবে এর কোন মীমাংসা হবে না। ওপারের কতকগুলো ধনী লোক

গরীবদের তাড়াবে, আর এপারের আর একদল ধনী লোক সেই গরীবদের খিচুড়ী খাইয়ে দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে বনবাস দেবে, এতে কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই হবে না। এ যেন গরীবদের নিয়ে দু'পারের দু'দল ধনী খেলোয়াড়ের ভলিবল খেলা।

তবে এর সমাধান কোথায়?

ভারতী বল্ল, সমাধান? আমার কাছে সমাধান চাইছ? আমি যদি এর সমাধান দিতে পারতুম তা হলে আমি প্রধান মন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির গদিতে গিয়ে বসতুম।

তা হলে যাক, ও সব কথা এখন ছাড়ো। প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হবার পর ও সব চিন্তা কোরো।

অন্ধকারে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল ঐ ছেলে মেয়ে দু'টো। ভারতীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসল সুব্রত, ভারতী আপত্তির পরিবর্তে প্রশ্রয়ই দিয়েছিল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, সামনে গঙ্গার জল ছল্‌ছল্‌ করছে। বালি ব্রিজের ওপোর দিয়ে ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে বৃহদাকার মালগাড়ী যাচ্ছিল। সুব্রত বল্ল, এই, ক্ষিদে পাচ্ছে।

এতগুলো বাদাম গিলেও ক্ষিদে পাচ্ছে? রাক্ষস না কি?

আঃ, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, সে ক্ষিদে নয়, সুব্রত ভারতীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

চোপ, খালি দুষ্টুমি! চোখ পাকিয়ে ভারতী সরে বসার ভান করল।

বুড়ী ভারতীর উচিত ছিল একশ' বছর আগে জন্মানো, সুব্রত টিপ্পনী কাটল।

নাও গো, অনেক রাত হয়ে গেল, উঠে পড়ো। ভারতী উঠবার তাগিদ দিল, কিন্তু তাগিদটা মৌখিক, উঠবার উপক্রম করল না।

রাগ হোল?

হবে না? গল্প করছ করো, অসভ্যতা কেন? চাপা গলায় ভারতী ধমক দিল।

আচ্ছা, আচ্ছা। কি গল্প করবো বলো। এক দেশে এক রাজা ছিল—

আচ্ছা হ্যাঁ গো, রাজা যখন আর থাকবে না তখন কার গল্প করবে ?

তখন ? তখন বলব এক দেশে এক রাষ্ট্রপতি ছিল।

ভারতী হেসে উঠল।

তবেই দেখ, রাজা কি রাষ্ট্রপতি ছাড়া গল্প হয় না। বুর্জোয়া বলে যতই ঘেন্না কর, বুর্জোয়া ছাড়া গল্প জমে না।

কেন, রিফিউজী নিয়েও গল্প হয়। একটি সুন্দরী রিফিউজী মেয়ে—

সেও বুর্জোয়া।

কি রকম ?

ঐ যে বল্লে সুন্দরী মেয়ে, সেও ত ঐ বুর্জোয়া।

মেয়ে হলেই বুর্জোয়া ?

সব মেয়ে বুর্জোয়া নয়। সুন্দরী মেয়ে বুর্জোয়া। বুর্জোয়া মানে কি ? অন্যের তুলনায় যার সম্পদ বেশী, সেই বুর্জোয়া। যে মেয়ের শারীরিক সম্পদ আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের চাইতে বেশী সে-ই বুর্জোয়া। গল্প বানাতে গেলে সেই সুন্দরী বুর্জোয়াকেই চাই। ধোপার বৌ, বুড়ী ঝি এদের নিয়ে কি গল্প হয় ?

হয় না ? কি বল ? চণ্ডীদাসের রামী ধোপানী, শরৎবাবুর সাবিত্রী ঝি এরা কি ?

এরাও বুর্জোয়া। এদের দৈহিক ও মানসিক সম্পদ এদের সমশ্রেণীয় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী।

খানিকটা দূরে দূরে যেসব যুগল-মূর্তি বসে ছিল তারা ক্রমে ক্রমে উঠে গেল। ধারে কাছে কেউই আর রইল না। সুব্রত চট্ করে ভারতীর কোমরটা জড়িয়ে ধরল, কোমরের সেই অনাবৃত নো-ম্যান্স্ ল্যাণ্ড যেখানে ব্লাউজ নামে নি, সাড়ীও ওঠে নি।

ভারতী ধমক দিয়ে সরে বসল, এই, কি হচ্ছে ?

কিচ্ছু না, সুব্রত উদার ভাবে উত্তর দিল।

ছেলেগুলো বড্ড হ্যাংলা, ভারতী মন্তব্য করে।

মেয়েগুলো বড্ড লোভ দেখায়, এজেন্ট প্রোভোকেটর, সুব্রতর স্বগত উত্তর।

তার মানে? সরে বসে ভারতী চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করে।

মানে তোমরা নিজেরাই ভাল বোঝো। আধখানা গা খুলে দুনিয়ার পুরুষকে নেমন্তন্ন কর কেন?

বেশ করি, আমাদের গা আমরা খুলি, ঢাকি, তাতে তোমাদের কি?

আমার হাতে আমি জড়াই, চিম্‌টি কাটি, যা খুশি করি তাতে তোমাদের কি?

সুব্রতর হাঁটুতে ঠেলা দিয়ে ভারতী বল্ল, এবার উঠুন মশাই, সাড়ে আটটা বাজে। বসে বসে আর ঝগড়া করতে হবে না।

বোসো-না, অত ব্যস্ত কেন?

বাড়ী ফিরতে হবে না?

ফিরব এবং তাড়াতাড়িই ফিরব সেই রাত্রে, যে দিন দু'জনে দু'টো বাড়ীতে ঢুকব না, একটা বাড়ীতেই ঢুকব।

ওঃ, আদর, ভারতী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

তা বলতে পারো। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের নাতনী, রাজ-বাড়ীর বৌ হবে, গরীব দোকানীর বাড়ী যাবে কেন? সুব্রতর কণ্ঠে কপট হতাশা।

সত্যিই ত। তা ঘটক মশাই, একটা সুন্দর দেখে রাজপুত্তুর জোগাড় করে দিন। ভাল ঘটক-বিদেয় দেব।

রাজপুত্তুর? দাঁড়াও দেখি খুঁজে। কিন্তু একটা যে বড় মুস্কিল হয়ে গেছে। সোস্যালিষ্টিক দেশে রাজা বলে কিছু ত আর নেই, তা হলে রাজপুত্তুর পাবো কোথায়?

বাড়ীতে আরশি আছে? গম্ভীর কণ্ঠে ভারতী প্রশ্ন করল।

তা হয় ত এক-আধখানা আছে। কিন্তু কেন? আরশি কি হবে?

দরকার আছে। সেই আরশির সামনে দাঁড়িয়ে দেখো, তারই ভেতর আমার রাজপুত্তুরের দর্শন মিলবে।

সত্যি? সুব্রত বসা অবস্থায় লাফিয়ে ভারতীর গায়ের ওপোর এসে পড়েই তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে মুখ এগিয়ে দিল।

মাথাটা যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে জোর করে ভারতী উঠে দাঁড়ালো।

কি হোল? এতেই এত রাগ?

দাঁড়িয়ে উঠে ভারতী বল্ল,

গাছে আছে কাঁচা ধান, কাঁচা হাঁড়ী কুমোরের বাড়ী
পাত পাড়িও না তাড়াতাড়ি।

বুঝলে গো খোকাবাবু—? পাতা পাতলেই হয় না।

এটাই বুঝি ক্লাবের সাহিত্যসভায় পড়বে?

মোটর বাইকটা যে দিকে ছিল সেই দিকে এগুতে এগুতে ভারতী বল্ল, সাড়ে আটটা হোল, সে খেয়াল আছে?

তাই নাকি? তা হলে ঘড়িটা বন্ধ করে দিই।

দিতে পারো, কিন্তু তুনিয়ায় ঘড়ি ঐ একটাই নেই, আরও অনেক ঘড়ি আছে।

মোটর বাইকের কাছে এসে সুব্রত বল্ল, তোমরা হচ্ছ ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের স্কাইলার্ক, সব সময় true to hearth and home.

তবে কি শেলী হয়ে ডুবে মরব? নাও, আর তর্ক করতে হবে না, দয়া করে লক্ষ্মী ছেলের মতো স্টার্ট দাও ত!

তেল ফুরিয়ে গেছে, গাড়ী স্টার্ট নেবে না।

যাঃ, মিথ্যে কথা।

সত্যি বলছি, গাড়ীকে তেল দিতে হবে।

গম্ভীর কণ্ঠে, যেন কিছুটা রাগতঃস্বরে ভারতী বল্ল, গাড়ীকে, না গাড়োয়ানকে?

হাসিমুখে সুব্রত বল্ল, ঠিক ধরেছ। তোমার ত খুব বুদ্ধি।

গাড়ীর হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে ভারতী বল্ল, ঠিক আছে মশাই, ওটা গাড়োয়ানের পাওনা রইল ; এখন এটাকে চালু কর ত।

রইল পাওনা ? হ্যাণ্ডনোট দিচ্ছ ? কিন্তু লিখে রেখো, সুদ শুদ্ধ উশুল দিতে হবে।

দেব। ডিউ ডেটে, আজ নয়।

তবে লিখে দাও, হ্যাণ্ড নোট লেখ।

মুখ টিপে হেসে ভারতী বল্ল, লিখেছি ত।

কোথায় ?

ঐ যেখানে ঘাসের ওপোর বসেছিলুম ঐ ঘাসের তলায় যে মাটি আছে সেই মাটির মধ্যে ঘড়া-ভরর্তি হ্যাণ্ডনোটের গুপ্তধন পুঁতে রেখে এসেছি।

তাই নাকি ? তা হলে চলো, সেই গুপ্তধন দেখে আসি।

আজ থাক, আর একদিন এসে দেখা যাবে। সত্যি, কি করছ বলো ত, সাড়ে আটটা বাজল যে !

বাজুক গে—

ও কথা বলার দিন এখনও আসে নি গো। যেদিন আসবে সেদিন সারা রাত বাইরে বাইরে ঘুরো।

ঠিক ?

ঠিক।

পকেট থেকে চাবি বার করে গাড়ীটা খুলতে খুলতে সুব্রত বল্ল, সে দিন আর বাইরে ঘুরবই না।

ভারী অসভ্য, চাপা গলায় ভারতী মন্তব্য করে।

এরপর পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তা লোহার ঘোড়ায় চেপে দক্ষিণেশ্বরের গেট পার হয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিন ওরা দক্ষিণেশ্বরে এতক্ষণ ছিল কিন্তু মন্দিরের দিকে যে একবারও গেল না সে কথা ওদের মনেই পড়ল না। ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আধুনিক তরুণ তরুণী, সর্বোদয় সমাজের একনিষ্ঠ উদীয়মান প্রজা।

কিছুটা এগিয়ে রাস্তার গর্তে পড়ে গাড়ীটা লাফিয়ে উঠল। ভারতী সুব্রতর পেটটা জড়িয়ে ধরল, মুখে বল্ল, কি হচ্ছে? ফেলবে না কি?

গাড়ী সামলে সুব্রত বল্ল, ভগবান করুন, রাস্তায় যেন অনেক বেশী গর্ত থাকে।

সুব্রতকে ছেড়ে পাশের আংটা ও তারের বাক্স ধরে ভারতী বল্ল, খুব মজা, না? ও রকম করলে আমি কিন্তু এখানেই নেমে যাব।

যাও, যদি পারো। গাড়ী তখন নতুন রাস্তায় পঞ্চাশ কিলো-মিটারে চলেছে।

এই, আস্তে, আমার ভয় করে। ভারতী পেছন থেকে বল্ল।

আমার করে না, সুব্রতর বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর।

দূর থেকে একটা গাড়ী আসছে। ভারতী বল্ল, কি হচ্ছে কি? পড়ে হাত পা ভাঙলে কি কৈফিয়ৎ দেব?

সুব্রত স্পীড কমালো। লরীটা পাশ দিয়ে চলে গেল।

বি টি রোড ডানলপ ব্রিজের কাছ বরাবর আসতেই ভারতী বল্ল, এই, একটা কথা শুনবে?

কি?

বি টি রোড কাশী দত্তের মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিও, লক্ষ্মীটি।

কেন?

ছোট কাকার বাড়ীটা ঘুরে যাব।

কে ছোট কাকা?

ছোট কাকা গো, বাবার খুড়তুতো ভাই। কাকীমা আমাকে দারুণ ভালবাসে।

আমিও যাব ত?

সর্ব্বনাশ! ও বাড়ী ভয়ানক কড়া। তুমি পরে গিয়ে আদর খাবে, কিন্তু আজ আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না।

তা হলে? আমি থাকব কোথায়?

ইচ্ছে করেই ভারতী সুব্রতর গালের কাছে মুখ এনে কানে ঠোঁট

ঠেকিয়ে কথা বলছিল। গাড়ীর গতিবেগও কম ছিল, পঁচিশ কিলোমিটারের মতো।

তোমায় থাকতে হবে না, তুমি চলে যেও।

তুমি ফিরবে কি করে?

ছোট কাকা পৌঁছে দেবে।

এত রাত্তিরে কাকাকে জ্বালাতন করবে?

মোটেই জ্বালাতন নয়। কাকা পুলিস অফিসার। সরকারী গাড়ী, তেল, ড্রাইভার। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীর দরজায় জীপ থাকে। হুকুম করলেই গাড়ী ছোটে। আমাকে ঐখানে নামিয়ে দিও।

সুব্রতকে নীরব দেখে ভারতী বল্ল, কাল সকাল এগারটায় আবার ফোন করব, কেমন?

তোমার ফোন নম্বরটা কি গো?

আমার ফোন? না না, সে আমি দেব না। শেষকালে—

শেষকালে কি?

পাশ দিয়ে একখানা মোটর ওভারটেক করে চলে গেল। ওদের গায়ে সেই গাড়ীর হাওয়া লাগল।

ইস্, আর একটু হলে—

হয় নি ত, সগর্ব্বে সুব্রত ভারতীর কথাটা শেষ করে দিল।

তুমি এই গাড়ী কিন্তু আর চড়বে না,—সুব্রতর মনে হোল ভারতী রীতিমত ভয় পেয়েছে। রহস্য করে বল্ল, হ্যাঁ, এ গাড়ী আমি ছাড়ব, সেই সঙ্গে সিগারেটও ছাড়ব। ছেড়ে তোমার দাদুর মত সোনালী পাকা দাড়ি নিয়ে গড়গড়ায় তামাক খাব আর নাতনীর সঙ্গে রসিকতা করব। কিন্তু আগে ত নাতনী হোক, তারপরে এইসব হবে।

এই, সামনের মোড়টাই কাশী দত্তর মোড় নয়?

হ্যাঁ।

তা হলে একটু নামি, কি বল?

আজ না গেলেই নয়?

না গো, আজই যাই। সেই কেষ্টনগর যাবার আগে এসেছিলুম, তারপর দু'দিন ধরে কাকীমা ফোন করেছেন, একদিন গিয়েও ছিলেন, তখনও আমরা দাদামশায়ের ওখান থেকে ফিরি নি, সেই জন্যে দেখা হয় নি।

গাড়ীখানা বাঁ দিক ঘেঁসে আস্তে আস্তে থেমে গেল। ভারতী মাটিতে পা দিয়ে বলল, ধন্যবাদ। কাল এগারটায় ফোন করব।

শিওর।

টা, টা, ভারতী নাচতে নাচতে এগিয়ে পড়ল। ক্ষুন্নমনে সুব্রত গাড়ীতে গিয়ার দিল।

কয়েক পা গিয়েই ভারতী থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখল, সুব্রতর গাড়ীর পেছনের লাল আলোটা অনেক দূরে এগিয়ে পড়েছে।

কেমন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক খালি করে বেরিয়ে গেল। ছেলেটা সত্যিই ভাল, ভদ্র, আধুনিক, ওর সঙ্গে এ রকম করাটা—

কিন্তু সে দাঁড়াল না। ধীর পায়ে এগিয়ে চল্ল। যেতে হয় তাই যাচ্ছে, পূর্ব্বের মত সাগ্রহে সে যাচ্ছে না। উপায় নেই, অতএব যেতে হবে—না হোলে—

ছয়

অনেক দিন আগে একটা গান শুনেছিলুম, সেটাই আজ মনে পড়ছে।

কি গান? অনুপমা প্রশ্ন করল।

বিভু ঘটক অনুর হাতে মাথা দিয়ে শুয়েছিল, বল্ল, 'আজ তোমারে পেলেম কি গো এতদিনের ডাকের পরে'। শুনেছ এ গান?

কোথায় শুনেছিলে বল ত?

কোনো মহিলার ঘরে।

ঠিক তাই। কিন্তু সামনে বসে শুনেছিলে কি? ঘরের ভেতরে বসে?

বিভু হেসে উঠল। বল্ল, তোমার মনে আছে তা হলে—

থাকবে না? সেবার পূজোর সময় তিন চার দিন ছুটির পরে যখন ফিরে এলে, তখন তোমরা নীচে এসেছ টের পেয়েই আমি ওপোরে ঐ রেকর্ডখানা চড়িয়ে ছিলুম। ওঃ, সে সব কি দিনই গেছে!

সেই দিনই আবার ফিরে এসেছে গো। এবার আর কোন বাধা নেই, কোন ভয় নেই। এবার—

ওঠো, ওঠো,—চট্ করে অনু মশারি ঠেলে খাট থেকে নামল।

কি? কি হোল?

চুপ।

অনু অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘরের ছিট্‌কিনি খুলে দালানে বেরিয়ে ততোধিক নিঃশব্দে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। পেছন পেছন ঘটক দরজা পর্যন্ত এসে দরজায় কান লাগিয়ে রইল।

অনু বলছে, উঠলেন কেন মা?

তুমি কোথায় মনোরমা, তোমায় ডেকে ডেকে পাই না কেন?

আমি বাথরুমে গিয়েছিলুম মা।

বৃদ্ধা বল্লেন, বাথরুমে, তা এদিকে কেন? বাথরুম ত ও পাশে?

অনু বল্ল, বাথরুম থেকে কেমন একটা শব্দ পেলুম এধারে। তাই দেখতে এলুম কি ব্যাপার? এত রাত্তিরে কোন চোর-টোর উঠল না কি?

সে কি গো? কোথায় কি শব্দ হোল?

কি জানি? মনে হোল যেন সিঁড়ির দরজায় কে শব্দ করল।

সুব্রতর ঘরের দরজা খুলে গেল। কি হয়েছে ঠাকুরমা?

জানি না। মনোরমা বলছে সিঁড়ির দরজায় কি শব্দ হচ্চে।

সে কি? ওধারের জানালা দিয়ে বাদলদের ডাকব? রাত কত? ঘড়ির দিকে চোখ দিয়ে সুবো নিজেই বল্ল, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এত রাত্রে,—বলতে বলতে সিঁড়ির দরজা খুলে আলো জ্বেলে সুবো কয়েক ধাপ নেমে গেল।

নিজের ঘরের বন্ধ দরজার পেছনে ইতস্তত করেও বিভু ঘটক দরজা খুলে বেরুতে সাহস পেলেন না। নীরবে দরজা বন্ধ রেখেই অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুবো সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠে এসে বল্ল, না, ও কিছু নয়, বেড়াল-টেড়াল হবে হয় ত।

সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

মনোরমা বৃদ্ধাকে ধরে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর নিজের ভূমিশয্যার মশারি সরিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করল। তার বুকখানা তখনো ঢিপ্ ঢিপ করছিল। ভাগ্যিস্, আর একটু হলেই!

সব যখন স্থির হয়ে গেল তখন ঘটক নিজের দরজায় নিঃশব্দে ছিট্‌কানি লাগিয়ে বিছানায় শুতে গেলেন। কিন্তু শুয়েও স্থির হতে পারলেন না। উঠে বসলেন। মশারি থেকে বেরিয়ে চেয়ারে এসে আলো না জ্বেলেই লাইটারে চুরুট ধরালেন। কয়েকটা টান দিয়ে বিরক্ত হয়ে চুরুটটা ছাইদানে নামিয়ে নীল আলোটা জ্বেলে আলমারি

খুললেন। বোতল বার করে দেখলেন, সামান্যই আছে। বিরক্ত হয়ে সেটুকু গ্লাসে ঢালতে ঢালতে ভাবলেন, কালই আর এক বোতল আনতে হবে। এই আমার আসল বন্ধু, এই আমার নিজস্ব, আর আমার আপনার বলতে কেউ নেই, কিছুই নেই।

গেলাসটা শেষ করতে করতে অস্পষ্টভাবে নিজেকেই সম্বোধন করে বল্লেন, ভেবেছিলুম পাপ বিদেয় হোল, এখন আর এই সব ছাইপাঁশ কিনতে হবে না, ওকে পাব। কিন্তু নাঃ,—জীবনটা আমার এইভাবেই কাটবে। আগে ত এ রকম ছিলুম না—

ঠিক সেই সময় বৃদ্ধা তার বিছানায় শুয়ে মনোরমাকে বলছিলেন, বিভু আমার এ রকম ছিল না, জান মনোরমা। প্রথম চাকরি পাবার পর ও আর তিনি যখন কলকাতায় বাসা নিলেন বাগবাজারের দিকে, তখন এক রাক্ষুসী ডাইনী মাগী ছিল সেই বাড়ীর বাড়ীওয়ালী। না, না, সে বাড়ীওয়ালী ছিল না, সেও ছিল ভাড়াটে। সেই ভাড়াটেই একখানা ঘর ওঁদের ভাড়া দিয়েছিল। সে মাগী তার সোয়ামীকে ছেড়ে আমার ঐ ছেলের মাথাটা এমন করে চিবিয়ে খেয়েছিল যে সে কি কেলেঙ্কারি! টের পাওয়া মাত্তরই উনি ছেলের ঘাড় ধরে সে-বাড়ী থেকে বার করে আনলেন, কিন্তু সেই থেকেই ছেলে আমার 'পর' হয়ে গেল। না হলে ওর ছিল অকলঙ্ক চরিত্র, ওর বিয়ের পরেও আমি ওকে ধরে মেরেছি, একটা কথা পর্যন্ত বলে নি, বাপের মুখের দিকে চেয়ে কোনদিন কথা বলতে সাহস পায় নি, কিন্তু সেই ব্যাপারের পর থেকেই ছেলে আমার 'পর' হয়ে গেছে। তারপর এখন ত দেখছ ওর হাল! আপন ভাই, ভাইপোদের সঙ্গে কী ব্যবহারটা ও করল তা ত নিজের চোখেই দেখলে। ছি ছি, আমার পেটে এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল! তিনি গেছেন, বেঁচেছেন। এখন আমি ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচি।

বৃদ্ধা আপন মনেই বলে চল্লেন, মনোরমা কাঠ হয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ও ঘরে বিভু ঘটক খালি বোতলটা নাড়াচাড়া করে

ভাবছিলেন, ছিঃ, জীবনে ঘেন্না হয়ে গেল। এখন যেতে পারলেই বাঁচি।

সুবোরও ঘুম হয় নি। ভারতী সেনরা কি জাত কে জানে। সেন বৈদ্যও হতে পারে, কায়স্থও হতে পারে, আবার শুনেছি সোনার বেনেও নাকি হয়। এতখানি এগোবার পর ঠাকুরমা কি মূর্তি নেবে ঠাকুরমাই জানে। বাবা হয়ত নিজে থেকে আপত্তি করবে না, কিন্তু ঠাকুরমা আপত্তি তুল্লেই বাবা বেঁকে বসবে। ঠাকুরমার কথা বাবা কিছুতেই ফেলবে না।

বাদলেরও দুঃখ আজ কম নয়। বাবুর বন্ধু শ্রীবাস্তব, সেই দিল্লী থেকে এসে এ বাড়ীতে ওঠবার কথা ছিল যাঁর, তিনি বাবুর গাড়ীতে চড়েই বৈজু ড্রাইভারকে নগদ পাঁচ টাকা বখশিস দিয়েছেন। এ বাড়ীতে শ্রীবাস্তব সাহেব উঠলে বাদলেরও দু'পয়সা হোত, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে ভূতগুলো ঘরটার এমনই হাল করে গেছে যে বাবু তাঁকে বাধ্য হয়ে তুললেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। ঐ ভূতগুলোর জন্য বাদলের মবলগ্ লোকসান। ছি-ছি, যেমন বরাৎ।

ঠিক এই সময়েই খোকা ভাবছিল, কাকীমারা যতদিন ছিল ততদিন ভালই ছিল। মা এই ঘরেই রাত্রে থাকত। ওরা গেল কেন? গেল বলেই ত মা আজ ওপোরে গেছে। ও বেচারী একা একা পড়ে রয়েছে। এতদিন মায়ের সঙ্গে থেকে আজ ওর একা থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

সে রাত্রে বিভুরও কষ্ট কম নয়। বহুক্ষণ চেয়ারে কাৎ হয়ে কাটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত মশার অত্যাচারে বিছানাতেই যেতে হোল, কিন্তু শূন্য শয্যায় ঘুম কি আসে? এতদিন পরে—। যাকগে।

ভোরে ঘুম ভেঙ্গে ঘটক ভাবলেন, এভাবে দিন আমার কাটবে না, শরীর ভেঙ্গে পড়বে। আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। মা মায়ের মত থাকবে, আমি আমার মত। তাদের যা দরকার সমস্তই দেব, আমার কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করিনি, এখনও করব না, কিন্তু আমার যা দরকার তা আমার চাই। এটা বেআইনী নয়, তবে কি না

এও সেই সনাতন ধর্ম্মের চিরাচরিত অত্যাচার। অনেক সয়েছি, আর না।

ভাবলেন, বিধবা বিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত, এদেশেও চালু হয়েছে। তাহলে বাধা কোথায়? মায়ের মনে দুঃখু হবে? এরকম দুঃখু তিনি করবেন কেন? তাঁর কথা চিরজীবন মুখ বুজে শুনেছি, এখন আর পারব না। আমার সংসার তাঁর জন্য নষ্ট হয়েছে। সেই একজন শাশুড়ীর অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে নীরবে মারা গেছে। মরে শান্তি পেয়েছে। তার মত নীরবে মরতে আমি পারব না, কখনই না।

সুবোরও ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। একরাশ অবসাদ নিয়ে সে ভাবল, আজ বেলা এগারটায় ভারতী ফোন করলে টেলিফোনেই পাকা কথা বলে পরে এক সময় বাবাকে সব বলব। এখন ত এরকম কতই হয়। ওর পক্ষে কোন বাধা নিশ্চয়ই নেই; ও ত খোলাখুলি বলেই দিয়েছে। এর বেশী আর কি বলবে? বাবা যদি ঠাকুরমার কথায় আপত্তি করে তা হলে বাড়ী ছেড়ে চলেই যাব, কিম্বা—কিম্বা আর সাতটা মাস অপেক্ষা করে বি. কম্ ফাইন্যালটা দিয়েই বাড়ী ছাড়ব। এ ভাবে বুড়োবুড়ীদের হাতের পুতুল হয়ে জীবনটা নষ্ট করতে পারব না।

অর্থাভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ উৎকট কষ্ট ভোগ ক'রে কোন মতে বেঁচে থাকে, অর্থের প্রাচুর্যে ধনীরাও অন্য রকম অভাবের তাড়নায় গরীবদের তুলনায় কম কষ্ট ভোগ করে না। বোধ হয় যেন কষ্টের এমনই একটা অপূর্ব্ব মোহ আছে যে মানুষ কষ্টকে ছেড়ে থাকতেই পারে না, —তা সে দরিদ্রই হোক, আর ধনীই হোক। প্রতিটি মানুষই নতুন নতুন কষ্ট টেনে টেনে নিয়ে আসে, বিপথ থেকে স্বপথে কষ্টের আমদানী করে।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে নিজের নিরিবিলি বিছানায় শুয়ে মানুষ আপন মনে যে সব বৈপ্লবিক সংকল্প আঁটে, দিনের আলোয় সেই মনগড়া সংকল্প রীতি ও সংস্কারের চাপে কুঁকড়ে ছোট হয়ে শেষে মনের মধ্যে একটা চাপা

বিরক্তি, অবসাদ ও হতাশার সৃষ্টি করে, আর কিছুই করতে পারে না। ভারতী সেনেরও সেদিনের সকালে সেই অবস্থাই হয়েছিল। সব কিছু অভিনয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সত্যি কথা স্পষ্টভাবে সুব্রতর কাছে স্বীকার করে তার কাছে আত্মসমর্পন করার সুস্থির নৈশ সংকল্প অজিতের সামনে সকালের আলোয় আর টিক্‌ল না। একবছর আগে পর্যন্ত ভারতীর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল কোন মতে বি. কম্‌টা পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার। সে জন্য সে করেনি এমন কাজই নেই, কিন্তু মাস আস্টেক আগে এই অজিত বাবু, যিনি স্বেচ্ছায়, বিনা পয়সায় তাকে পড়াবার ভার নিয়েছিলেন, তিনি যখন তাঁর গূঢ় অভিসন্ধি ওর কাছে প্রকাশ ক'রে ওর প্রচণ্ড অভাবের দিনে একরাশ কারেন্সী নোটের টোপ্ ফেললেন তখন ঐ উনিশ বছরের উঠ্‌তি যৌবন পরিচিত বাঁধা পথ ছেড়ে জংলী রাস্তায় প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে এমন অবস্থাই হয়েছিল যে এখন ও স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছে যে চেষ্টা ক'রে কলেজে হাজিরা দিলেও পড়াশুনা ওর বোধ হয় কিছুই হবে না। অজিতদা'দের হাতের পুতুল হয়েই ওর জীবন শেষ হবে, অথচ জীবিত অবস্থায় এই জীবন থেকে ওর পরিত্রাণ নেই। অশক্ত বৃদ্ধ পিতা, অসহায় মা ও কয়েকটা অপোগণ্ড ভাই বোন দৈনন্দিন খরচের জন্য ওর দিকেই চেয়ে থাকে। অজিতের সাহায্য ছাড়া ওর একটা দিনও চলবে না। এদিকে অজিত যতই বোঝাক না কেন, অজিতের দলের সকলে যতই ওর মগজ ধোলাই করুক না কেন, ও নিজের মন থেকে কিছুতেই ওদের কার্যক্রমে সায় দিতে পারে না, যদিও ওদের হুকুমমত অনেক অপকার্য সে চোখ-কান বুজে এই আট ন'মাস ধরে করেই চলেছে। গতকাল দক্ষিণেশ্বর থেকে ফেরার সময় ভারতীর বার বার মনে হয়েছে দূর হোক পার্টি, দূর হোক এই সাজানো অভিনয়, সব কথা খোলাখুলি সুবোর কাছে জানিয়ে হাল্কা হয়ে পড়ুক সে। কাশী দত্তর মোড়ে সুব্রতকে ছাড়ার সময় ওর বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু উপায় নেই, সে বন্দিনী, অসহায় বন্দিনী, সজ্ঞানে প্রত্যহের হলাহল

দু'হাতের অঞ্জলি ভরে পান তাকে করতেই হবে, ভালবাসার লোককে সরল বিশ্বাসে অভিভূত করিয়ে সেই বিষ তাকেও পান করাতেই হবে, সুব্রতর সুখের সংসারে ভবিষ্যতের সামগ্রিক প্রলোভনে পরের হুকুমমত স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আগুন তাকে ধরাতেই হবে।

অজিতদা' প্রশ্ন করলেন; কতদূর হোল? কি রকম বুঝছিস্?

ছোট্ট করে ভারতী উত্তর দিল, ভাল। যেমন যেমন বলেছেন তেমন তেমনই চলছে।

তারপর জোর করে মুখের ওপোর হাসি ফুটিয়ে ভারতী বল্ল, কাল ফেরার সময় আপনার কথামত পৌনে ন'টাতেই গিয়েছিলুম, কিন্তু—

শুনেছি। অন্য একটা কাজে আটকে গিয়ে ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল, তাই ভাবলুম আজ সকালে খবরটা নিয়ে যাই। তোদের চা-টা হোল?

এই যে আনছি। ভারতী উঠে গেল।

ভারতীর মা এসে ঘরে ঢুকল। এই যে বাবা অজিত, ভাল ত?

ভাল মাসিমা, আপনি কেমন?

অমনি চলছে এক রকম। তা বলছিলুম কি, ভারতীর পড়াশুনা কেমন হচ্ছে? পাস করতে পারবে ত?

নিশ্চয়। পাস ওকে করতেই হবে।

দেখ বাবা! তোমার ওপোরেই ত ভরসা। তা ভারতী কিছু বলেছে?

কি ব্যাপারে?

মানে বাড়ীওয়ালা ক'দিন ধরে বড্ড তাগাদা করছে। কাল বিকেলে—

ক' মাস?

তিন মাস হয়ে গিয়ে চার মাস চলছে।

তিন মাস? সেবার যেন বাড়ী ভাড়া বাবদ—

হ্যাঁ বাবা, সেই চল্লিশটে টাকা ওঁর অসুখে খরচ হয়ে গেল। ভারতী বলে নি?

কি জানি? মনে ত পড়ে না।

তা হলে বোধ হয় লজ্জায় বলতে পারে নি। যে রকম মুখচোরা লাজুক মেয়ে।

তিন মাসের ভাড়া এখনই ব্যবস্থা করতে পারব না মাসিমা। দু'মাসের আশী টাকা কাল ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এই দু'মাসের রসিদটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

আচ্ছা বাবা। তারপর বলছিলুম কি,—র‍্যাশনের টাকাটা—

সে সব আজই বিকেলে অফিস থেকে দেওয়া হবে। ওকে বলে যাচ্ছি, গিয়ে নিয়ে আসবে কিম্বা ও যদি যেতে না পারে তা হলে পাঠিয়েই দেবো।

চা ও বিস্কুট নিয়ে ভারতী এসে ঘরে ঢুকল।

তোমরা বসে চা খাও বাবা, আমি যাই, ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে।

বৃদ্ধা চলে গেল।

আধ বাটী চা শেষ করে অজিত বল্ল, বারোটার পর আজ বাড়ী থেকে বেরিও না। গলির দিকে নজর রাখবে। একজন কিম্বা দু'জন আসতে পারে। এই ঘরেই থাকবে। ওরা এসে বাসুদেবের খোঁজ করবে। ওদের ডাকবে সুদেবদা' বলে।

আচ্ছা। তা ওরা কদিন থাকবে? ধীরে ধীরে ভারতী প্রশ্ন করল।

ঠিক নেই।

চাপা গলায় ভারতী বল্ল, ঠিক আছে।

ওরা এলে ওদের বন্দোবস্ত করে আমাদের বেলেঘাটায় খবর দিও। ওদের ঘরে তালা দিয়ে রেখে যেও। মা বাবাকে বোলো ওদের খবর যেন কেউ না পায়। ওঁরাও ওদের খবর না জানলেই ভাল হয়।

আচ্ছা।

বাকী চা'টা শেষ করে কলেজের ছোকরা প্রফেসার অজিত বোস বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

ভারতী পড়ল ভাবনায়। কে আসবে? কি রকম লোক তারা? তাদের জন্য কি বন্দোবস্ত রাখতে হবে? এই সব ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল সকাল এগারটায় সুব্রতকে ফোন করতে হবে। কিন্তু ফোন ক'রে বলব কি? আজ বারোটার পরে ত বেরুতেই পারব না। কলেজটাও কামাই করতে হবে। এরকম কামাই যে কতই করছি! সুনন্দা হয়ত প্রক্সিটা চালিয়ে দেবে। আবার সুনন্দাকেও কোন রকম ডিউটি দেওয়া হয়েছে কি না কে জানে? সে-ও ত পার্টির মেয়ে। সে-ই ওকে এদের মধ্যে এনেছে, এই বিপজ্জনক দলের মধ্যে। ভারতীর চোখ ফেটে জল আসে। ওদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ওদের হাত দিয়ে কি সব অন্যায় কাজই না করানো হয়! অথচ সুনন্দা বলেছে, এবং ও-ও জানে, এই দলের মধ্যে একবার ঢুকলে বেরোবার পথ আর নেই। এক দিকে জীবন সংশয়, অন্যদিকে বাবা-মা ও ছোট ভাইবোন-গুলোর অনাহারে অপঘাত মৃত্যু। যতই ভাবে, ভেবে কোন কুল-কিনারা পায় না। এই বয়সে ভারতীর দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

সমান দুশ্চিন্তা সুব্রতর। বেলা দশটায় বাবা নিয়মিত ভাবে অফিসে যান। আজ গেলেন না। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল সাড়ে ন'টায়। সুবো জানে না, গাড়ী কোথায় গেল। প্রথমে ভাবল, গাড়ী বোধ হয় তেল আনতে গেল, কিন্তু তেলের জন্য গেলে পনর মিনিটের মধ্যেই ফেরে। ফিরল না। বাবাও অফিসের পোষাক পরলেন না। যথারীতি আহারাদি সেরে বাড়ীর পোষাকে নিজের অফিস ঘরে বসে রইলেন। ঐ ঘরেই ফোন। কি ব্যাপার! সাড়ে দশটাও বাজল। সে আর থাকতে পারল না। পর্দার বাইরে থেকে ডাকল, বাবা!

কে রে, সুবো? আয়।

সুবো ঘরে ঢুকল। বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, কি রে?

তুমি আজ বেরুলে না, তাই ভাবছি, তোমার শরীর খারাপ হোল না কি ?

প্রসন্ন হাস্যে বাবা বল্লেন, না রে না, শরীর ঠিকই আছে। গাড়ী পাঠিয়েছি আমার সেই গেস্ট্‌কে আনতে। কয়েকটা কাজ সেরে সে আমার কাছে এলে তাকে নিয়ে এক সঙ্গে বেরুব, তাই অপেক্ষা করছি।

ওপোরে গিয়ে বিশ্রাম করলে পারতে।

না রে, ফোন আসতে পারে। একটা জরুরী ব্যাপার আছে, সেজন্য অপেক্ষা করছি।

তা তুমি শুয়ে পড় গে না, আমি না হয় ফোনের কাছে অপেক্ষা করি। ফোন এলেই ডেকে দেব।

তোর কলেজ নেই ?

আছে, দেরিতে। সাড়ে বারোটায় বেরুব।

ও, আচ্ছা। বাবা অন্যমমস্ক হয়ে পড়লেন।

ওপোরে যাবে না ? সুব্রতর প্রশ্ন।

নাঃ, আর ওপোরে যেতে পারি না। তা ছাড়া পনর মিনিট আধঘণ্টার জন্য আর কি শোব ? এখানেই থাকি।

ক্ষুণ্ণমনে সুব্রত বেরিয়ে গেল। ওর দিকে প্রসন্নচিত্তে চেয়ে রইলেন ওর বাবা। মনে করলেন, এই ছেলেই আমার দুঃখু বোঝে, এই আমার জন্য চিন্তা করে। আজকালকার ছেলেরা কে আর বাবাকে নিয়ে এত মাথা ঘামায়! বি কম্‌টা হলেই ওকে আমার অফিসে নিয়ে বসাব।

বাইরে বেরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সুবো মনে মনেই গর্জাতে লাগল। আজকে এই সময়টা ছাড়া আর তোমার জরুরী ফোন আসার সময় হোল না! বুড়ো হলে মানুষ এমনই বে-আক্কেলী হয়! আবার ভাবল, ভালই হয়েছে। আজ বাদে কাল যে-কথাটা খোলাখুলি বলতে হোত, সেটার সূচনা যদি এভাবেই টেলিফোনে হয়ে যায় তা হলে মন্দ কি ? ভগবান যা করেন ভালর জন্যই।

বাইরে থেকেই সুবো শুনল, ফোন বাজছে। বি. ঘটক ভারী গলায় বল্লেন, হ্যালো?

একটু পরেই বল্লেন, রং নাম্বার।

সুবো ঘড়ি দেখল। ঠিক এগারটা বেজে দু'মিনিট। এটা তা হলে ভারতী নয়, রং নাম্বার, ভালই হয়েছে।

ওধার থেকে ভারতীও ভাবল, ভালই হয়েছে। কথামত ফোনও করা হোল, এবং সুব্রতর পরিচিত কণ্ঠস্বর না পেয়ে রং নাম্বারের অজুহাতে আজকের দিনটা পালানো গেল। দেখা হলে জোর করে বলা যাবে, সময় মত ফোনের কাছে থাকো না কেন, আমি কি করবো।

আরো কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করেছিল হতাশ প্রেমিক সুব্রত ঘটক। তারপর আবার ফোন বাজতেই সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল, বাবা সাগ্রহে ইংরাজীতে কারবারের কি সব কথা কইতে সুরু করলেন। সুব্রত হতাশমনে নিজের ঘরে চলে গেল।

ওদিকে ভারতীও ততক্ষণে ফোন-বুথ ছেড়ে নিজের বাড়ীতে পৌঁছে গেছে।

বারোটার পর থেকেই ভারতী নিজেদের সরু গলিটায় হান্টান করতে লাগল। বাসুদেবের খোঁজ ক'রে যাদের আসার কথা তারা কখন আসবে কে জানে?

এই গলিটা বস্তির হলেও এটা যেন এক রকম ভারতীদের নিজস্বই। গলির এক পাশে একটা বৃহৎ তেলের কল। ইলেক্ট্রিক ঘানিতে সারা দিন তেল তৈরী হয়। তাদের সদর বড় রাস্তায়, গলির দিকে ইটের টানা বাউণ্ডারী দেওয়াল। এই দেওয়ালে বালির কাজও করা নেই, বালির কাজের দরকারও নেই। গোটা দেওয়ালটায় ঘুঁটে দেওয়া। কাঁচা, আধ-কাঁচা ও প্রায় শুকনো ঘুঁটেয় অত বড় দেওয়ালটা প্রায় ভর্তি। গলির অপর পাশে লম্বা টিনের চালা। এই চালার সামনের অংশে তেলকলের অফিস, পেছনের ঘরগুলোয় পাঁচিশ ত্রিশ জন পশ্চিমা কুলী বাস করে, তেল কলের পশ্চিমা মিস্ত্রীরাও এই অংশে থাকে। এদের

সবগুলো ঘরেরই দরজা এই গলির ওপোর। কিন্তু হলে কি হয়, সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা কাজে বেরোয়, আবার সন্ধ্যেয় ফেরে। ফিরে কেউ বা অনুগতদের দিয়ে গা টেপায়, কেউ রসুই করে। কেউ 'রামাহো'র চিৎকারে পাড়া মাথায় করে। গলির শেষ অংশে ঐ বৃহৎ টিনের চালার শেষ প্রান্তে ভারতীরা বাস করে। ঐ অংশে আর কোন ভাড়াটে নেই। গলিটা কানা গলি। ভারতীদের বাড়ী ও তেল-কলের পরেই এক প্রকাণ্ড পাচিল-ঘেরা বাগান। বর্ত্তমানে সেই 'ভাগের' বাগানের যত্ন কেউ নেয় না। বৃদ্ধ আম, লিচু, বেল ও জামরুল গাছে, অন্য দিকে প্রকাণ্ড কলা গাছের ঝোপে এবং তার সঙ্গে কিছু অযত্নবর্ধিত অন্যান্য ছোট বড় গাছে জায়গাটা জটিল ও অন্ধকার। সেই বাড়ীর প্রবেশ-পথ ওদিকের বড় রাস্তায়। হু'শো বছরের পুরানো বনিয়াদী জমীদার-বাড়ীর মালিকানা নিয়ে নানারূপ গোলোযোগ না থাকলে কবে ঐ বাগান খণ্ডে খণ্ডে বিক্রী হয়ে দশ বিশখানা ছোট বড় ফ্ল্যাটবাড়ী তৈরী হয়ে যেত। কিন্তু আইনের প্যাঁচে সে সব কিছুই হতে পারে নি। দুই শতাব্দীর শান্ত অন্ধকারে হালসীবাগানের এমনই এক নিভৃত অন্তরালে ভারতীদের এই দরিদ্র বাসাখানা মাস ছয়েক আগে অজিতরাই আবিষ্কার ক'রে নিজেরাই টাকা দিয়ে ভারতীর বাবার নামে ভাড়া করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই সারাদিন ধরে অত বড় লম্বা এবং চার ফুট চওড়া মেটে গলিখানা পুরোপুরি ভারতীদেরই দখলে থাকে। ছুটির দিনে ভারতীর তিনটে ভাই বোন এই গলিতে খেলা করে। তাদের চিৎকার ও হৈ চৈ কেউই শুনতে পায় না, কারণ গলির এক পাশ নীরব থাকলেও অন্য পাশে সারাটা দিন এক সঙ্গে শ'দুয়েক লোহার ঘানি তেল পেষাই করে। সেই শব্দে ভারতীর বাবা প্রথম প্রথম অতিষ্ঠ হলেও এই ছ'মাসে তিনি এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে এখন এই শব্দে তাঁর দিবানিদ্রারও কোন ব্যাঘাত হয় না।

ভারতী এই গলির ওপোর নিজেদের দরজার সামনে টুল পেতে বই-হাতে একাকী বসে রইল। ভাইবোন সকলেই স্কুলে, বাবা বিছানায়, মা

বাড়ীর মধ্যে যাই করুক না কেন, যে মেয়ের উপার্জনে সংসার চলছে সেই মেয়ে কোথায় কি করছে সে খবর নেবার সাহস তাঁর নেই। তাঁর দরকার বেঁচে থাকার উপযুক্ত আর্থিক সংস্থান। ঐ মেয়েটি না থাকলে বা ওর উপার্জন, সেটা যে পথেই আসুক না কেন, সেই উপার্জনটা না থাকলে এই দুর্দিনে কি যে হোত সেটা ভাবতেই সেই প্রবীণা শিউরে ওঠেন। এক এক সময় তাঁর ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। চিরটা জীবনই তাঁর দুঃখে দুঃখে কাটল। বিয়ের পরেই স্বামী গেলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৈনিক হয়ে। কটা বছর একটানা দুশ্চিন্তার মধ্যে কেটেছে। তারপর স্বামী ফিরলেন, কিন্তু একটি চোখ তাঁর যুদ্ধে নষ্ট হয়ে গেছে। দেশে ফিরে জমিজমা গুছিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান হয়ে গেল। ভারতীকে পেটে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে পোটলা-পুঁটলি মাথায় করে ভদ্র-মহিলা কলকাতায় এলেন। শ্যামবাজারে এক স্কুলে স্বামী ড্রিল মাস্টারের চাকরি পেলেন। সেই কাজে থাকতে থাকতেই ভারতীর মায়ের আরও চারটি ছেলে মেয়ে হোল। তারপর মেজো মেয়েটি মারা গেল। বড় মেয়ে ভারতী পাড়ার মেয়ে স্কুলে প্রতি ক্লাসে প্রথম হয়ে প্রমোশন পেত। সে জন্য ফ্রিতে পড়ত। সেখান থেকেই হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিল। সে বছর ওদের স্কুল থেকে একমাত্র ভারতীই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এর পর ওর বাবার হোল আরথ্রাইটিস্। সামান্য সঞ্চয় সমস্ত শেষ হোল। চাকরি গেল। ভারতী বেরুল টিউশানী করতে। কোনমতে মেয়ে পড়িয়ে সংসার চালিয়ে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে অর্থাভাবে পড়া ছেড়ে চার পাঁচটা টিউশানী নিয়ে এক বেলার আহার জোটাত। এমন সময় অজিতদার সঙ্গে পরিচয়। সেই অজিতদাই ওকে আবার পার্ট টু-তে ভর্তি করিয়ে সেই পুরানো বাসা থেকে এইখানে এই নতুন বাসায় এনে তুলেছে ; প্রায় পঙ্গু আরথ্রাইটিস্ রোগীকে পুরানো স্কুলের ড্রিল মাস্টারীতে বহাল করিয়ে সংসারের সমস্ত খরচ এবং বাসাভাড়া যোগাচ্ছে। সবই ভারতীর কল্যাণে, না হলে ওঁর যে চাকরি সেও লোক-দেখানো ব্যাপার। স্কুলের খাতায় একশ'

টাকা মাইনে বরাদ্দ আছে, হাতে দেয় মাত্র কুড়ি টাকা। তা তাদেরই বা দোষ কি? স্কুলের কাজে উনি মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিন হয় ত যান,—ঐ যে ক'দিন বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন। নেহাৎ অজিত বাবু সেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী তাই স্কুলের তহবিল থেকে কুড়িটে টাকা ওঁর হাতে আসে, না হলে এই রকম শয্যাশায়ীকে কেউ মাইনে দিয়ে রাখে! ভারতীর মা এই সব কথা ভাবেন আর মেয়ের দিকে মুখ বুজে চেয়ে থাকেন। অপর পক্ষে ভারতীর মনে হয়, সে কলম্বাস। কলম্বাস যখন অথৈ সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে ভেসেছিল তখন খাদ্যাভাবে তাদের নিজেদের মধ্যের এক এক জনকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে হোত। সেই মৃতের মাংস খেয়ে বাকীরা ভাবী জীবনের আশায় ঝড় ও তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ করে অগ্রসর হোত। ভারতী ভাবত, সে তার নিজের মাংস খাইয়ে এতগুলো প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখছে। এরা কি পাঁচশ' বছর আগেকার সেই নাবিকের মতো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না? তারা যেমন বুভুক্ষু মৃতপ্রায় অবস্থায় দীর্ঘদিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে নতুন ঋদ্ধিময় জগতের সন্ধান পেয়েছিল, ভারতীও কি সেই ভাবে আজকের জীবন্মৃত অবস্থার ভয়াবহ সমুদ্র লঙ্ঘন করে মহাজীবনের প্রাচুর্যতীরে অবতরণ করতে পারবে না?

টুলের ওপর বই-হাতে বসে বসে মনে হোল, হয়ত পারবে, কিংবা পারবে না। এই পার্টি টু'তে ভর্তি হওয়া, এই বাইরের বিলাস, বালিগঞ্জের ক্লাবের সদস্য হওয়া এ সবই ত লোক দেখানো মিথ্যা অভিনয়! ঐ যে এক ফিয়াট গাড়ী এবং তার আনুসঙ্গিক গল্প এ সবই বিশেষ বিশেষ ধনী সন্তানকে মুগ্ধ ক'রে পার্টির দিকে আকর্ষণ করার ব্যবস্থা। সুনন্দাটা এ ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। তার সংসারের অভাবও ওর মত অত তীব্র নয়। তবুও এই কাজে সে বেশ আনন্দই পায়, কিন্তু বেচারী ভারতী পার্টির কাজে মন থেকে সায় দিতে পারে না, বাধ্য হয়ে কোন ক্রমে দায় সারে। দু'জনকে সে এ পর্যন্ত দলে টেনেছে। একজন এখন লীডার

হয়ে গেছে। দলের নির্দেশে সুব্রত ওর তৃতীয় শিকার। কিন্তু আর এ সব ভালো লাগে না। আগের দু'জনের তুলনায় সুব্রত অনেক বেশী ভদ্র, অনেক বেশী লোভনীয়। ভারতীর বার বার মনে হচ্ছে, আর চাতুরী নয়। ঘৃণ্য ছলনায় ধনী-যুবককে এ পথে টানার পৈশাচিক খেলা শেষ করে শান্ত, সুন্দর, সুখী জীবন এবং ব্যক্তিগত উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভারতীর মনটা বারম্বার আকৃষ্ট হচ্চে। এই যে দুটি তরুণকে সে বিপ্লবের বিপথে আলেয়ার মত টেনে এনে ফেলল, এতে কার কি মঙ্গল হয়েছে? একজন দলের অন্যতম লীডার হয়ে গত চার মাস নিরুদ্দেশ! পার্টির ভাষায় একেই বলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড। কোথায় কোন বন জঙ্গলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থায় অর্ধাহারে অনাহারে ঘুরে মরছে সে, তা কে জানে? অন্যজন আহত রুগ্ন দেহ নিয়ে সরকারী কারাগারে। ওদের কথা মনে হতেই ভারতী শিউরে উঠল। আজকের এই সুখী সুব্রত ওর ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে কাল যে কি অবস্থায় পড়বে তা ভাবতেও ভারতী ভীত হয়। আচ্ছা, এত সব বেকার বখাটে ছেলে ত পথে ঘাটে ঘুরে মরছে, তাদের দিয়ে কি পার্টির কাজ হয় না? সুখী সংসারকে দুঃখের আগুনে আহুতি দিয়ে নেতাদের এ কি পৈশাচিক খেলা! ব্যাপক অমঙ্গলের দ্বারা স্থায়ী কোন মঙ্গল কি সম্ভব?

গলির মোড়ে বড় রাস্তার দিকে ভারতী আনমনে উদাস হোয়ে চেয়ে থাকে।

বড় রাস্তা থেকে দু'টি ছেলে গলির মধ্যে ঢুকল। নেহাতই তরুণ! একজনের ছিমছাম আধুনিক পোষাক, অভিজাত ঘরের বলেই মনে হয়। তার হাতে এক ব্রিফ্ কেস্, দ্বিতীয়টির কাঁধে ঝোলানো সাইড ব্যাগ। সুপরিচিতের মতো স্থির পদক্ষেপে সমস্ত গলিটা ধীরে সুস্থে অতিক্রম করে ভারতীর কাছাকাছি এসে প্রথম ছোকরাটি বল্ল, বাসুদেব কোথায়? ভারতীও সেইরকম সপ্রতিভভাবে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল, আসুন সুদেব দা, উনি ভিতরেই আছেন। ওরা তিনজনেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। ভারতী টুলখানা হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকে ভেতর থেকে

দরজা বন্ধ করল। তারপর সামনের ঘরখানা ছেড়ে পেছনের যে ঘরে ভারতী নিজে থাকে সেই ঘরে ওদের দু'জনকে নিয়ে গেল। সুটকেস ও সাইড ব্যাগ নামিয়ে রেখে ওরা দুজনে ভারতীর তক্তপোষে বসল। ঐ দু'জন আগন্তুক সম্বন্ধে বাইরের অথবা বাড়ীর কেউই টের পেল না।

তক্তপোষের ওপোর বসে পা'দুটো লম্বা করে সুদেব অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি বল্ল, দু'গেলাস জল আনো দেখি, বেজায় তেষ্টা পেয়েছে।

চা করি? ভারতী প্রশ্ন করল।

সে পরে, আগে জল।

ভারতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুদেব তার সঙ্গীর দিকে ইসারা করে কি যেন জানাল। মুখ ফুটে বল্ল, জায়গাটা ভালো। কি বলিস, খুব নিরবিলি।

সঙ্গী বল্ল, হ্যাঁ।

সুদেব উঠে পাশের বন্ধ জানালাটা খুলে প্রথমেই দেখতে পেল, একটুখানি পোড়ো জায়গা, তার পরেই জমিদার বাড়ীর বাগানের টানা পাঁচিল।

ভারতী দু'হাতে দুটি কাঁচের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। বল্ল, কি দেখছেন সুদেব দা?

জানলাটা খুলছি। ঘরটায় গরম লাগছে না?

সুদেবের সঙ্গী ভারতীর হাত থেকে গেলাস দু'টো নিয়ে একটা সুদেবের দিকে এগিয়ে ধরল। ভারতী হাত-পাখাটা তুলে নিয়ে বাতাস করতে গেল।

থাক থাক, অত সুখ আমাদের সহ্য হয় না, বলেছিল সুদেব।

দু'জনেই গ্লাস দু'টি শেষ করে গেলাস রেখে জানলার কাছে গিয়ে পুরানো জানলার মরচে ধরা লোহার গরাদে পরীক্ষা করতে লাগল। হাসিমুখে চাপা গলায় ভারতী বল্ল, মাঝেরটা।

ওরা মাঝখানের গরাদেটা পরীক্ষা ক'রে সেটাকে টানতেই তলার

ফাটা চৌকাঠ থেকে গরাদেটা খুলে এল। তার ফলে মধ্যে যে ফাঁকটা হোল সেই ফাঁকে মাথা গলিয়ে সুদেব বল্ল, O. K.। গরাদেটা যথাস্থানে বসিয়ে ভারতীকে বল্ল, ন্যাকড়া দিয়ে ওটাকে আলতোভাবে মুছে দাও আর একটু ছেঁড়াখোঁড়া কাগজ ঐ জানলার তলায় ফেলে রেখে জানলাটা বন্ধ কর।

ভারতী নীরবে নির্দেশমত কাজ করল। বুঝল যে এই ঘর, জানলা, জানলার গরাদে এবং পেছনের বাগান সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করিয়ে ঐ দুই ব্যক্তিকে এখানে পাঠানো হয়েছে। ওদের দু'জনের দুই ব্যাগে কি ছিল তা জানার জন্য ভারতীর মনটা ছট্‌ফট্ করছিল, কিন্তু সে জানত, অযথা-কৌতূহল পার্টির সদস্যদের অমার্জনীয় অপরাধ। এর জন্য চরম শাস্তিও হতে পারে।

পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বার করে একটা সুদেবকে দিয়ে অপরটা নিজে নিয়ে লাইটার দিয়ে দ্বিতীয় ছেলেটি ধরিয়ে ফেল্ল। ভারতী মনে মনে ওর নাম দিল 'দেব'। ভারতী নিজে আজ বাসুদেব, আগন্তুকদের নেতা সুদেব, সহকারী নিশ্চয়ই শুধু দেব। ওঃ, একেবারে দেবলোক! ভারতীর মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল।

সিগারেটে কয়েকটা সুখ-টান দিয়ে সুদেব বল্ল, দাঁড়িয়ে কেন বাসুদেব? বোসো। ওরা দু'জনে সরে সরে ভারতীর বসবার জায়গা ক'রে দিল।

ভারতী বল্ল, এখন বসে কি হবে? চা করতে হবে না?

চা? আচ্ছা করো।

আর কিছু? ভারতী প্রশ্ন করে, সকালে কিছু খাওয়া হয়েছে?

হয়েছে। তবে বাড়ীতে কি আছে কিছু?

আছে। রুটি আর তরকারি। বিকালের জন্য রুটি সকালেই করা হয়। ভারতী উত্তর দিল।

নিয়ে এস। দু'খানা দু'খানা চারখানা রুটি এনো, বেশী নয়।

ভারতী চলে গেল।

ওরা কোথায় কি করছে কে জানে? চাপা গলায় 'দেব' স্বগতোক্তি করে।

চুপ, সুদেবের চারমিনারের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার।

ক'টা আছে এখনও? আছে ত? সুদেব প্রশ্ন করল বিছানার ধারে পড়ে থাকা সাইড ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে।

আছে। তিনটে। 'দেব' উত্তর দিল।

হ্যাঁ, ওখানে তিনটেই খরচ হয়েছে বটে। শেষেরটাতেই নেপালীটা সাবাড়!

নাঃ; কড়া জান; এত সহজে সাবাড় হয় না।

কিন্তু ঐটেতেই কাজ হোল। আর কেউ এগুলো না।

এ ব্যাপারে কেউ কখনও এগোয় না। নেপালীটা নেহাৎই হোঁৎকা বলে—

ওরা দু'জনেই মুখ টিপে হেসেছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। ভারতী এল একটা থালায় রুটি ও অন্য থালায় চায়ের দু'টো বাটি নিয়ে। বিছানার মাঝখানে খবরের কাগজ পেতে তার ওপোর থালা দু'টো রাখল। হাসি মুখে বল্ল, এবার দেবতাদের ভোগ হোক।

দু'বাটি চা দেখে সুদেব বল্ল, দেবীর ভোগ কই?

ভারতীও সেই সুরে উত্তর দিয়ে বল্ল, দেবীর ভোগ যথা সময়ে হয়ে গেছে।

তা হলেও চা-সেবা ত হবে? এক যাত্রার পৃথক ফল কি ভাল!

দেব বল্ল, না না, সে হবে না। দু'জন খাবে আর একজন খাবে না, তা হলে নজর লাগবে যে!

তা হলে কচি খোকাদের থালায় একটু করে নুন ছিটিয়ে দি, ভারতীর সহাস্য প্রস্তাব।

দিতেই যদি হয় তা হলে খোকাদের থালায় নুন ছিটিয়ে না দিয়ে

খুকির মুখে চা দেওয়াটাই অধিক সহজ, তাই নয় কি? সুদেব হাতটা ঝেড়ে নিল।

হাত ধোবার জল চাই? ভারতী প্রশ্ন করে।

হোলে ভাল হোত।

ভারতী ঘটি-ভর্তি জল এনে ঘরের নর্দামার ধারে ওদের জল দিল।

এর পর ঘটিটা রেখে ভারতী ভেতরে গিয়ে আধ কাপ চা এনে ওদের সামনের টুলে বসল। সেই টুল, যেটায় ব'সে সে গলিতে অপেক্ষা করছিল।

যে ভাবে রুটি দু'টি ওরা শেষ করল তাতে মনে হোল ওরা ক্ষুধার্ত। ভারতী বল্ল, আর কিছু রুটি আনি?

সুদেব বল্ল, নাঃ।

কিন্তু 'না' বলার ধরণে ভারতী উঠে ভেতর থেকে আরও কিছু রুটি ও তরকারি এনে দিতে বেশ বুঝা গেল ওরা সত্যই ক্ষুধার্ত।

আহারাদি শেষ করে আরও দু'টো চারমিনার ধরিয়ে সুদেব বল্ল, অজিতদার-সঙ্গে দেখা হয়েছিল? বিশেষ কিছু বলে গেছেন কি?

ভারতী বল্ল, না, এমন কিছু বলেন নি। আপনাদের ব্যবস্থা করে বেলেঘাটার অফিসে খবর দিতে বলেছেন।

সুদেব বল্ল, ওখানে যেতে হবে না। তিনি কিম্বা তাঁর কোন লোক এখানেই আসবেন।

ভারতী ওর চোখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি দিয়ে বল্ল, তাই বুঝি?

একটু থেমে বল্ল, এখন তা হলে বিশ্রাম করুন। কোন কিছু হলেই আমি দু'বার কাস্‌ব,—বিষম লাগলে যে রকম কাসি হয় সেই ভাবে। কথাগুলো বলতে বলতে ভারতী থালা ও চায়ের বাটিগুলো তুলে নিল।

'দেব' বল্ল, আমাদের এই ব্যাগটা এখানেই থাকবে কিন্তু, এটার ব্যবস্থা কর।

ভারতী বল্ল, আসছি।

থালাবাটি নিয়ে ভারতী ভেতরে চলে গেল। ক্ষণপরেই ফিরে

এসে ব্রিফ-কেস ব্যাগটা নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই 'দেব' বল্ল, গোটা দুই বালিশ চাই যে আরও।

ভারতী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলেছিল, একটা ত আছে, আর একটা আনছি।

উঁহু, আরও দুটো চাই। তিন বাটি চায়ের পর তিনটে বালিশ না হলে হয়?

অসভ্য! চোখ পাকিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করে ভারতী ব্যাগ নিয়ে পুনরায় ভেতরে গেল এবং ফিরে এল দুটো বালিশ নিয়েই। বল্ল, আপনারা বিশ্রাম করুন, আমাকে পাহারা দিতে হবে।

একজনের পাহারায় আমরা বিশ্বাস করি না, তিন জনে এক সঙ্গে পাহারা দেব, সুদেব উত্তর দিল।

এর পর ওদের ঘরের একমাত্র দরজা বন্ধ করে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে ওরা তিনজনে মিলে একসঙ্গে ছোট বিছানাটায় সজাগ হয়েই ছিল, বিশেষ করে ভারতীর দুটো কানই বাইরের দরজার দিকে উৎকর্ণ। অজিতদার দেওয়া দায়িত্ব যে কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে তা অভিজ্ঞ ভারতী আজ সকালেই কিছুটা অনুমান করেছে। হয়ত সেই জন্যই ছেলে দু'টো বিপদ্‌সঙ্কুল জীবনের ক্ষুদ্র অবকাশে কিভাবে তাদের দুর্লভ মুহূর্ত্তকে ভোগ দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করছে সেদিকে ভারতীর আগ্রহ বা আপত্তি কিছুই ছিল না। এ ত হবেই, এটাই স্বাভাবিক। প্রায় এক বছর হতে চলল, ভারতী এই শিক্ষাই পেয়েছে, এতেই সে অভ্যস্ত। দেহ বিষয়ক পুরানো সংস্কার থেকে সে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, কিন্তু অভিনয়টা করতে হয় যেখানে যেমন দরকার।

বাইরের দরজায় আওয়াজ পেয়ে সে ওদের ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে সিগারেটের ছাই ও পোড়া শেষাংশ-পূর্ণ মাটির ভাঁড়টা হাতে তুলে নিতেই 'দেব' বল্ল, কে? চেনা কেউ মনে হচ্ছে?

না। সংক্ষেপে উত্তর দিয়েই ভারতী মাটির ভাঁড়টা হাতে নিয়ে

ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল। ছেলে ছু'টো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুহূর্তের মধ্যেই উঠে জুতোয় পা গলিয়ে খুলে-রাখা জামা ছু'টো গায়ে পরে নিল। 'দেব' ছেলেটা তার সাইড ব্যাগটা নিজের কাঁধে তুলে শিক-ভাঙ্গা জানালার কাছে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। ওরা ছু'জনেই কান খাড়া করে রইল কোন কাসির শব্দ শোনা যায় কি না সেই অপেক্ষায়।

ঘরের দরজাটা আস্তে খুলে গেল। ঢুকল ভারতী, পেছনে অজিত। ছেলে ছু'টো বিছানায় বসে বল্ল, আসুন অজিতদা।

অজিত বিছানায় বসতেই সুদেব বল্ল, বাসুদেব এমনই ভয় দেখিয়েছিলেন!

কি রকম? অজিত প্রশ্ন করে।

উনি বল্লেন, চেনা লোকের দরজা নাড়া নয়।

ঠিকই বলেছেন। অন্য দিনের মতো করে আজ দরজা নাড়ি নি। দেখছিলুম, তোমরা রেডি আছ কি না।

ভারতী বল্ল, সত্যিই তাই। না হলে অজিতদা'র দরজা নাড়া আমি জানি।

আমরাও রেডি, সুদেব উত্তর দিল।

রেডিই যদি, তাহলে তুমি বাড়ী যাও। ও দিকে অল্ ক্লিয়ার। কিন্তু তুমি আজ যাবে না—'দেব'এর হাতে একটা কাগজের প্যাকেট দিয়ে অজিত বল্ল, কাল সকালে মেস-এ ফিরবে। এখান থেকে সোজা সুবর্ণার ঘরে গিয়ে সেখানে রাত কাটিয়ে সকালে রঙিন অবস্থায় ফিরে যেও। সুবর্ণার কাছে দিন-রাতের এ্যালিবাই রেখো। সব চেয়ে ভাল এ্যালিবাই সুবর্ণার সঙ্গে মার-পিটের অভিনয়ে বস্তির সকলকে কিছুক্ষণের মতো জড়ো করা। সুবর্ণাকে জানিয়ে কোরো।

হাসি মুখে সায় দিয়ে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে 'দেব' প্রশ্ন করে এতে কি আছে?

পায়জামা, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী ও শ্লীপার। তোমার জামাজুতো খুলে

ঐ প্যাকেটেই ভরে দাও, আমি নিয়ে যাব। এদিকে এসো ভারতী, অজিত ভারতীকে ডেকে নিয়ে ঘরের বাইরে এল।

'দেব' পোষাক বদলে নিল। ভারতীকে অজিত বল্ল, গেট্ রেডি, ক্লাবে যাবে চল। ঘরে ঢুকে অজিত বল্ল, সে সব কোথায়?

এই ত আমার সাইড ব্যাগে, তিনটে মাত্র আছে। আর ওটা আছে বাসুদেবের কাছে।

একটু ভেবে নিয়ে অজিত বল্ল, এখনই বেরিয়ে পড়। সাইড ব্যাগ রেখে যাও। সোজা সুবর্ণার কাছে চলে যাবে। টাকা আছে?

দশ বারো টাকা আছে।

আরও দশ রাখো। অজিত ওকে টাকা দিল।

ভারতী এসে ঘরে ঢুকল।

একটু,—পাঁচ মিনিট পরে। অজিত ভারতীকে বল্ল।

জামা কাপড়টা নিয়ে যাই, বলেই ভারতী তোরঙ্গ খুলে কি সব বার করে নিয়ে চলে গেল।

অজিত বল্ল, সুদেবের ব্যাগটা দিয়ে যাও।

ভারতী ব্যাগ দিতেই অজিত বল্ল, চাবিটা?

সুদেব চাবি দেবার পূর্বেই ভারতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এটাই ওদের ডিসিপ্লিন। অজিত ব্যাগ খুলে বল্ল, কতো? দেখেছ?

না।

চকচকে নতুন তাড়াবাঁধা নোট, গাদাগাদা, ব্যাগ ভর্তি—একশ' টাকা, দশ টাকা, পাঁচ টাকা। এক টাকার বাণ্ডিলও কয়েকটা ছিল।

হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে ব্যাগটা বন্ধ করে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে পকেট থেকে শ'খানেক টাকার ময়লা নোট বার করে সুদেবের হাতে দিয়ে অজিত বল্ল, যাবার সময় সাইড ব্যাগটা কাশিম আলির দোকানে দিয়ে যেও। ওকে বোলো, ও যেন কাল বিকেল তিনটের পার্ক সার্কাসের গুদামে যায়।

এই ব্যাগটা নিয়ে গুদামে যাবে?

সে কিছু বল্‌তে হবে না। ও জানে। আচ্ছা তুমি বেরিয়ে যাও, অজিত 'দেব'কে নির্দেশ দিল।

আধ ময়লা পাজামা পাঞ্জাবী পরে শ্লিপার টানতে টানতে ফতো কাপ্তেন সেজে 'দেব' ছোকরা চলে গেল।

ভারতী এসে ঘরে ঢুকল। অজিত বল্ল, হয়েছে ? চলো।

সুদেব বল্ল, আমি কখন যাব ?

একসঙ্গেই বেরুব। আমরা মোটরে উঠে যাব, তুমি পায়ে হেঁটে কাসেম আলির দোকানে যাবে। আমরা আগে যাব, তুমি পেছন পেছন বেরুবে।

ভারতী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতেই অজিত কয়েকটা নোট ভারতীর হাতে দিয়ে বল্ল, মাকে দিয়ে এসো।

কিসের ?

দিলেই বুঝবেন। উনি জানেন।

ওরা দু'জনে গলির মোড়ের কাছে যাবার সময় যা আলোচনা করছিল তা হচ্ছে উত্তমকুমারের অভিনয় নৈপুণ্য। অজিত জোর দিয়ে বল্ল, একথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি গিরীশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী এবং উত্তমকুমার এরা যদি সমসাময়িক হতেন, তা হলেও উত্তমকুমার উত্তমই থাকতেন, মধ্যম হতেন না।

হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতেই অজিত কথাগুলো বলছিল। ভারতীর হাতে ছিল 'দেব'এর পোষাকের পুঁটলি।

গাড়ীর কাছে এসে অজিত ব্যাগটা ভারতীর হাতে দিয়ে বল্ল, ধর ত এটা। বলেই এদিক ওদিক দেখে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ব্যাগটা নিয়ে পেছনের সীটে ফেলে দিয়ে নিজে স্টিয়ারিং-এ বসে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু স্টার্ট যেন হয় না। ইতিমধ্যে সুদেব সাইড ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ অচেনার মত আপন মনে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চল্ল।

ভারতীও তার পুঁটলিটা পেছনের সীটে ফেলে পাশের সীটে বসে বল্ল, কি হোল, বিগ্‌ড়েছে ?

কি জানি, ঠিক বুঝছি না।

ততক্ষণে সুদেব বেশ খানিকটা এগিয়েছে।

তারপর গাড়ী স্টার্ট নিল। সুদেব যেদিকে গেছে গাড়ীও সেই দিকেই গেল। সুদেবকে ছাড়িয়ে অল্প একটু এগিয়েই বাঁ দিকে গাড়ী থামিয়ে অজিত গেল পানের দোকানে। ধীরে সুস্থে পান সাজিয়ে এক খিলি পান গাড়ীতে ভারতীকে দিয়ে, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে বার করল এক দশ টাকার নোট এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই নোটের চেঞ্জ গুণতে গুণতে দেখল, সুদেব অনেক এগিয়েছে। তারপর ফিরে এসে পুনরায় গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই গাড়ী ঘড় ঘড় করে থেমে গেল। অজিত গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর বনেট খুলে এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতেই সুদেব সার্কুলার রোড ছেড়ে বাঁয়ে গ্রে স্ট্রীটে ঢুকল এবং এগিয়ে পড়ল। এর পর অজিতের গাড়ীও ঠিক হয়ে গেল। অজিতও গ্রে স্ট্রীটে ঢুকল।

একটু এগিয়েই কাসিম আলির বিড়ির দোকান। সুদেব দোকানের পাশের গলি দিয়ে ভেতরে গেল। কাসিম আলি ফুটপাথে পাতা খাটিয়া থেকে উঠে সুদেবের পেছন পেছন গলির ভেতর ঢুকলো। এর পর অজিতের গাড়ী আর খারাপ হয়নি। বিধান সরণী পার হয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এ প'ড়ে অজিতের গাড়ী ছুটল দক্ষিণ মুখে।

ভারতী বল্ল, ওকে অত পাহারা দেবার দরকার হোল কেন ?

ছোকরা নতুন, আজই হাতে খড়ি।

সেই জন্যেই ওকে বুঝি লীডার করা হয়েছে ? ভারতীর প্রশ্নে অজিত নীরবে ওর দিকে চেয়েছিল। এ ছাড়া সারাটা রাস্তায় গাড়ীতে আর কোন কথা ওদের হয় নি।

ল্যান্সডাউন রোডের একটা মোড়ের কাছে এসে অজিতের গাড়ী

থামল। ভারতী নীরবেই দরজা খুলে নেমে গেল। অজিতের গাড়ী গেল সোজা দক্ষিণ মুখে।

ভারতী আপন মনেই হাঁটতে হাঁটতে চলছিল। কিছুটা যাবার পরেই একখানা মোটর এসে ওর কাছাকাছি প্রায় যেন থেমে পড়ল। সেই গাড়ীর একমাত্র আরোহিণী ডাক দিল, ভারতী, এই ভারতী।

ভারতী যেন এজন্য প্রস্তুত ছিল না। চমকে চেয়ে দেখে বল্ল, কি রে, সুনন্দা?

হ্যাঁ, ক্লাবে যাবি না? উঠে আয়।

সুনন্দা ও ভারতী দু'জনে ক্লাবে এল।

এই সব অভিনয়গুলো ভারতীদের বয়সে বোধ হয় ভালই লাগে। সুনন্দা এইখানে এসে এই ভাবে ভারতীকে ওর গাড়ীতে তুলবে এটা ওদের সকলেরই জানা কিন্তু তবুও ভারতীকে চমকে ওঠার অভিনয়টা করতে হয়।

সুনন্দার গাড়ীতে যে দুটো ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট ছিল সেই দুটো দু'জনে নিয়ে নাচতে নাচতে গাড়ী থেকে নামল। এক লহমায় ভারতী দেখে নিল সুব্রতর চেনা সেই মোটর বাইক গেটের অপর পাশে গাড়ী রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ফিয়াট গাড়ীটাকে ড্রাইভার ওখানেই পার্ক করিয়ে রাখল।

আসুন আসুন, আজ অনুসূয়া প্রিয়ম্বদা এক সঙ্গে যে, কাপুর সাহেব সহাস্যে অভিনন্দন জানাল।

আপনার শকুন্তলাটি এখনও আসে নি বুঝি? ভারতী উত্তর দিল।

শকুন্তলা হারিয়ে গেছে, কাপুর সাহেবের উত্তর।

চুক্ চুক্ করে মুখে শব্দ করে সুনন্দা বল্ল, আহা রে, মরে যাই, মরে যাই। তা মহারাজ' দুষ্মন্ত এখন কি করছেন? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, দেবি শকুন্তলা, তুমি কোথায় আছ—

ভারতী বল্ল, হোল না, ছাপতে হবে, হলে শউন্তলে—

ওরা তিনজনে একই সঙ্গে ক্লাবের হল ঘরে গিয়ে ঢুকল। টেব্‌ল টেনিস্‌ খেলতে খেলতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সুব্রত। তার দিকে স্মিত দৃষ্টি দিয়ে তিন মূর্তি একখানা কোচে গিয়ে বসল। কাপুর তার সোনার কেস্‌ খুলে ভারতীর দিকে এগিয়ে ধরতেই ভারতী বল্ল, ফের দুষ্টুমি ?

লেডিজ্‌ ফার্স্ট, অম্লান বদনে কাপুর উত্তর দিল।

সুনন্দা একটা সিগারেট নিয়ে বল্ল, থ্যাঙ্কিউ।

কি রে, তুই ধরেছিস না কি ? ভারতীর প্রশ্ন।

তুই থাম্‌, ভারতীকে ধমক দিয়ে সুনন্দা বল্ল, এই ছাইপাঁশ কেউ খায়! তবে আমি ঠিক করেছি, উনি অফার করলেই নিয়ে নেব। তুইও নিস। তাহলে ওঁর অফার করার বদ অভ্যাসটা ঘুচবে।

কেন ? আমি কি এতই কৃপণ ? কাপুর সহাস্যে বলেছিল।

কৃপণ নয় গো মশাই, কৃপণ নয়। নেশাখোর লোকের নেশার জিনিস নষ্ট হচ্চে দেখলে তবে তার চৈতন্য হয়। এ না হলে অফার করার বদ অভ্যাস বন্ধ হবে না।

কেন, অফার করা কি খারাপ ? এটাই ত ভদ্রতা।

নো স্যার, অফার করলে অন্যে কি ভাববে বলুন ত ? ভাববে বোধ হয় খায়, তাই দিচ্ছে।

খেলেই বা।

ভদ্র ঘরের মেয়েরা কেউ এ সব খায় না, এই সামান্য জ্ঞানও কি বাবু সাহেবের নেই ?

সত্যি, রাগ করলে আপনাকে খুব সুন্দর দেখায়, কাপুর সুনন্দার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

বলে দেবো, আপনার শকুন্তলাকে বলে দেবো, ভারতী হাসতে লাগল।

সুব্রত ওদের সামনে এসে বল্ল, কি ব্যাপার, যেন কিছু একটা মজা হয়েছে মনে হচ্ছে।

মজাই ত! আপনি হেরে গেছেন তাই ভারতী হাসছে, সুনন্দা সুব্রতকে বল্ল।

সত্যি। বেশ চলছিল, হঠাৎ এই শেষের দিকে উপরে উপরি ক'টা পয়েন্ট খেয়ে গেলুম।

তা ত খাবেনই। যারাই আমাদের মুখ দেখে তারাই পয়েন্ট খায়।

কাপুর বল্ল, Bad in games, good at—

সুব্রত বল্ল, হবে না কি এক হাত, ঐ আপনি যা বলেন,—গুডমিণ্টন?

ভাল্ লাগছে না। আজ কলেজে সারাটা দিন—ভারতী তার কথা আর শেষ করল না।

সারা দিন কি? স্ট্রাইক করেছেন? সুব্রত প্রশ্ন করে।

না গো মশাই, মেয়েরা কলেজে অত স্ট্রাইক করে না। ও সব আপনাদেরই একচেটিয়া ব্যাপার।

সুনন্দা উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল, আসুন কাপুর সাহেব, ঐ কুঁড়েগুলোর গজালিতে বিকেলটা নষ্ট করবেন না।

লাফাতে লাফাতে সুনন্দা চলে গেল। ভারতীর তরফ থেকে কোন ইঙ্গিত না পেয়ে কাপুরও সুনন্দার পেছনে গুটি গুটি অগ্রসর হোল।

ব্রুট, ভারতী আপন মনে উচ্চারণ করেছিল।

কে, কে ব্রুট? কৌচে ভারতীর পাশে বসে চাপা গলায় সুব্রত প্রশ্ন করল।

প্রায় ফিস্ ফিস্ করে ভারতী বল্ল, ঐ তোমাদের কাপুর। ফের যদি আমার কাছে ঐ রকম ছলাকলা করতে আসে তা হলে আমি ওকে কষে ধম্‌কে দেব।

কেন গো, তোমার প্রেমে পড়েছে না কি?

যাঃ, যতো সব—

ভারতীর ব্যবহারে সুব্রত কি জানি কেন মনে মনে খুসি হোল। বল্ল, উঠবে নাকি?

কেন ?

চলো, বাইরে কোথাও যাই। এখানে এই ভীড়ের মধ্যে—

ছ্যাঃ, কে কি ভাববে! বরং চলো, পেছনের বারাণ্ডায় গিয়ে বসি।

পেছনে যেতে যেতেই ভারতী বল্ল, এগারটার সময় ফোনে কে ছিল ?

করেছিলে ?

করবো না ?

তারপর ?

বোধ হয় তোমার বাবা ছিলেন। কোন রকমে রং নাম্বারের অছিলায় ফোন ফেলে হাঁফ্ ছাড়ি।

ওঃ, তা হলে আজ ত খুব জব্দ হয়েছ ?

ভারী ফুর্তি! তাই না ? আর আমি কখনও তোমাকে ডাকব না আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।

এই,—বাইরে চলো। কালকের মতো একটু ঘুরে আসি।

না, আজ না। ড্রাইভার কি ভাববে বলো ত ?

তবে ?

এক কাজ করো। কাল আমি ক্লাবে এসেই গাড়ী ছেড়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে ঘুরতে যাব। সন্ধ্যের পর তুমি আমাকে আমাদের পাড়ায় ছেড়ে দিও, কেমন ?

ঠিক আছে।

এখন চল, সুদর্শনদার সঙ্গে দেখা করি।

কেন, ঐ পাগ্‌লাকে আবার কেন ?

আহা, পাগল বলেই ওকে আমার ভালো লাগে। কাজ-পাগল, যেটা যখন হাতে নেয়—

সুদর্শনের সঙ্গে দেখা করতেই সে বল্ল, কালই আমার চিঠি ছেপে আসছে। কার ক'খানা বাড়তি কার্ড চাই জানিয়ে দেবেন।

সভাপতি করলেন কাকে ? প্রশ্ন করল সুব্রত।

হ্যাঁ, তাই ত বলছিলুম, নাম-করা বড় কাউকে পাওয়া গেল না। ঐ সব সাহিত্যিকগুলোর ভয়ানক তেল হয়েছে। তা যাক্ গে, মরুক গে, ওদের কাউকেই চাই না, এক কাগজের সম্পাদক রাজী হয়েছে। সে হবে সভাপতি, আর আমাদের শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী বল্লেন, ওদের এক প্রফেসারকে প্রধান অতিথি করতে। সেই তাকেই প্রধান অতিথি করেছি। প্রফেসার ভাল আলোচনা করবে, আর সম্পাদক-সভাপতির জোরে ভাল পাবলিসিটি পাব। কেমন, ঠিক করি নি? সুদর্শন উত্তর দেওয়ার ছলে প্রশ্ন করল।

ভালই ত, ভারতী সায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, সুনন্দার পছন্দসই প্রফেসারটি কে?

উনি, উনি হচ্ছেন প্রফেসার অজিত বোস।

ভারতী চমকে উঠে পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলেছিল, অ।

আপনি চেনেন? সুব্রত ভারতীকে জিজ্ঞাসা করল।

চিনি, মুখ চিনি, শুষ্ক কণ্ঠে ভারতী উত্তর দিয়েই প্রশ্ন করল, আপনি চেনেন?

না। তবে নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। শেষের কথাটা সুব্রতর পুরো মিথ্যে। অজিত বোসের নাম সে কোন দিনও শোনে নি, কিন্তু প্রধান অতিথি হবার মতো লোককে একেবারে না জানার হীনতা সুব্রত অন্তত পক্ষে ভারতীর সামনে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে রাজী নয়।

খেলাধূলা, আড্ডা এই সব শেষ করে ওঠবার আগে ক্লাবের সদস্যরা অনেকেই রেডিওর খবর শুনে ক্লাব থেকে বেরোয়। আজ রেডিওয় চমকপ্রদ খবর, ব্যাঙ্ক ডাকাতি। দেড় লক্ষ টাকা লুট। দিন দুপুরে পৌনে বারোটার সময় এ বি সি ব্যাঙ্ক যখন ভল্ট থেকে টাকা বার করছিল তখন হঠাৎ চারটি তরুণবয়স্ক ভদ্রসন্তান ব্যাঙ্কের ভেতর বোমা ফাটিয়ে, পিস্তলের গুলিতে সকলকে বিভ্রান্ত ক'রে, ক্যাসিয়ারের মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত ক'রে নোটের সমস্ত বাণ্ডিল একটি থলেয় ভরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক কালো এ্যামবাসাডার গাড়ীতে উঠে

পালিয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের নেপালী দারোয়ান ওদের তাড়া করায় ওরা বোমা ফাটিয়েছিল। দারোয়ান বিপজ্জনকভাবে আহত হয়েছে। তাকে আর. জি. কর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তার অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। এ বিষয়ে পুলিশ কয়েক জায়গায় তল্লাসী করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। সংবাদ সমীক্ষায় সমীক্ষক বলেছেন, এই নিয়ে গত ছ'মাসে তিন জায়গায় একই প্রণালীতে তিনবার ডাকাতি হোল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনটি ডাকাতির কোন কিনারাই হোল না। মনে হয় এর পেছনে সুপরিকল্পিত ভাবে কোন বিশেষ দল কাজ করে চলেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সদস্যরা প্রথমে সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কেউ কেউ পুলিশের অক্ষমতার নিন্দা করল, কেউ ভীতি প্রকাশ করল। সুব্রত বল্ল, সাংঘাতিক ব্যাপার, কলকাতায় আর থাকা যাবে না। ভারতী বল্ল, অদ্ভুত। সুনন্দা বল্ল, কারা করছে? নিশ্চয়ই বাঙ্গালী নয়। কেউ বল্ল, কাল সকালের কাগজে আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। ভারতী বল্ল, কাপুর সাহেবের কালো এ্যাম্‌বাসাডারকে সাবধান। কাপুর হেসে উঠল।

ঐ কথারই আলোচনা করতে করতে সদস্যরা যে যার গাড়ীতে গিয়ে উঠল। সুনন্দা ভারতী গেল ফিয়াটে, সুব্রত রাজদূতে স্টার্ট দিল।

সাত

আমার একটা কথা রাখবেন অজিতদা ?

কি ?

দু'দিন ধরে অনেক ভেবেছি এবং ভেবে অন্য কোন উপায় না পেয়ে আপনার কাছে বলতে বাধ্য হচ্ছি—

কি বলবে বলেই ফেলো, বাজে ভূমিকায় সময় নষ্ট করছ কেন ?

ঘাড় হেঁট করে ভারতী বল্ল, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সহাস্যে মধুর কণ্ঠে অধ্যাপক অজিত বোস বল্লেন, কেন ? কি হোল ?

তেমনি ঘাড় হেঁট-করা অবস্থাতেই ভারতী বল্ল, এই সব চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম এ সব সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই।

তেমনি হেসেই অজিত বল্ল, তোমার ক্ষমতা যে কতখানি আছে তা তুমি নিজেই জানো না, কিন্তু আমি জানি।

না, অজিতদা, এ কাজ মেয়েদের নয়। আমি অনেক ভেবেছি—

দেবী চৌধুরানী পড়েছ ত ? দেবী রানীর কথাগুলো মনে আছে ?

সে ত গল্প। গল্পে অনেক কিছুই হয়। দু'দিন ধরে আমার গায়ের ভেতর কাঁপছে। দিনে রাতে কোথাও কোন শব্দ হোলে বুকের ভেতর ঢিপ্ ঢিপ্ করে।

তোমায় ত বলেই দিয়েছি, কোন্ সময় কি করতে হবে। তারপর এখন আর তোমায় পায় কে। দু'দিন পার হয়ে গেছে। ওরা যে এসেছিল ওদের কোন চিহ্নই ত তোমার এখানে নেই। তবে যে আমি এখানে আসি, সে ত তোমাকে পড়াতে আসি।

ধরা পড়লে কোনো কৈফিয়ৎ নেই অজিতদা। আমি গরীবের মেয়ে, বাবার আয় মাত্র মাসে কুড়ি টাকা—

বাধা দিয়ে অজিত বল্ল, না, একশ'। স্কুলের খাতায় একশ'ই আছে।

আচ্ছা বেশ, তাই না হয় হোল। একশ' টাকা আয় যার বাবার সেই মেয়ে গাড়ী চড়ে ক্লাবে যায়। মাসিক চাঁদা দেয় পঁচিশ টাকা, এ সব পুলিশের জেরার মুখে পড়লে কি হবে বলুন ত!

কিচ্ছু নয়। একটু জোর করে বলতে হবে তোমার সঙ্গে দু'চারটি ধনী ছোক্‌রার যোগ আছে। সেই যোগ বাড়াবার জন্য তুমি ক্লাবের মেম্বার হয়েছ। এ সব বলতে কি তোমার অপমান বোধ হবে?

তা একটু হবে না?

ঐটে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। অজিত জোর দিয়ে কথাটা বলেছিল।

কিন্তু প্রমাণ? যদি বলে, কে কে আসে, তা হলে?

অজিত হেসে উঠল, এবার তুমি হাসালে ভারতী, এবার তুমি হাসালে। বলি, রাতের অন্ধকারে যে সব খরিদ্দার আসে, তারা কি নাম-ঠিকানা দিয়ে সওদা করে যায়, না এই সব বেচা-কেনার রসিদ-ভাউচার থাকে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ তুমি নিজে, তোমার দেহ। দরকার হোলে সোজা বলতে পারবে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন; আমি অবিবাহিত কিন্তু কুমারী কিনা তা ডাক্তারেই বলুক। আর এতে কোন লজ্জা নেই, কলকাতার সহরে এ রকম হাজার হাজার পাওয়া যায়।

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে ভারতী বল্ল, তা না হয় হোল, কিন্তু এই সব চুরি ডাকাতির দরকার কি? দু'মাসে তিনটে—

তিনটে নয়, আমাদের সেক্টরে একটাই। সে যাক, তুমি ভুলে যেও না, যে মহান্ কাজে আমরা নেমেছি, সেই কাজে টাকা চাই প্রচুর, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী এবং সেই টাকা সংগ্রহ করার একটাই পথ। তারপর দেখ, টাকা আমরা কোন গরীবকে মেরে নিচ্ছি না, আমরা নিচ্ছি ব্যাঙ্ক থেকে, ট্রেজারী থেকে। এই ভাবে দেশের টাকা হাতে নিয়ে দেশের কাজই করব। পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত বিপ্লবীরাই এই ভাবে

বিপ্লবকে রসদ জুগিয়েছেন। রুশ, চীন সকলেরই এক ইতিহাস। আমাদের ইংরেজ আমলে এ রকম মোটর ডাকাতি কত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। একটা গোটা দেশ কি সহজে মুক্তিলাভ করে? সে যুগের বিপ্লবীরা বিদেশের হাত থেকে, বিদেশীর শোষণ থেকে মুক্তি চেয়েছিল, এ যুগে আমরা মুক্তি চাইছি মুষ্টিমেয় ধনীর হাত থেকে, কয়েকজন দেশীয় শোষকের শোষণ থেকে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যে সব বিপ্লবীদের নাম করতেও সাধারণ মানুষ ভয় পেত, আজ চারিদিকে তাদেরই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেই মূর্তিতে মালা দিয়ে পূজো করা হচ্চে। আবার এমন দিন শিগ্‌গিরই আসবে যেদিন তুমি, আমি, আমরা সকলেই সেই দিনের দেশবাসীর কাছে এক একজন হীরো হয়ে উঠব। এই যে তোমার ঘরে যেটা ঘটে গেল এটা নিয়ে ইতিহাস রচনা হবে, নাটক তৈরী হবে, নাটক তৈরী করে থিয়েটারে অভিনয় হবে, হয়ত ঐ ঘরখানাই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে। তখন, তখন তুমি চিরস্মরণীয়া হবে, জোয়ান অফ আর্ক, মাতাহরির সঙ্গে একসঙ্গে তোমার নাম থাকবে ইতিহাসে।

ভারতী চুপ হয়ে গেল, কিন্তু মনে তার শান্তি এল না, সান্ত্বনাও সে পেল না।

অজিত বল্ল, মাসিমা কোথায়? একবার ডাকো ত!

কেন?

দরকার আছে। .

ভারতী মাকে ডেকে আনল। মাথার ওপোর কাপড় তুলে ভারতীর মা এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

অজিত বল্ল, মাসিমা, ভারতী আমাদের একটা পরীক্ষায় ভাল ভাবে পাস করে নগদ একশ টাকা পুরস্কার পেয়েছে। সেটাই দিতে এলুম, রাখুন।

খুশিমনে বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বল্ল, কি পরীক্ষা বাবা, বি. কম? এটা কি জলপানির টাকা?

অজিত বল্ল, না না, বি. কম পরীক্ষার এখনও দেরি আছে। এটা, এটা একটা আমাদের ঘরোয়া পরীক্ষা। এই সব ছোট ছোট পরীক্ষায় পাস করলে এই ভাবে এককালীন টাকা দেয়। কিন্তু দেখবেন, এ যেন কাউকে বলে বেড়াবেন না।

কেন বাবা? পুরস্কার পেয়েছে, এ কথা বলব না?

না। এর ভেতর অনেক সব দলাদলি আছে ত! ওর মতো আরও অনেকে এই টাকার দাবীদার ছিল। আমি এটা ওর নামে আনিয়েছি। ঘুণাক্ষরেও এটা যদি প্রকাশ পায় তা হলে ভবিষ্যতে আর আমি কিছু করতে পারব না।

অ, বুড়ী যেন ব্যাপারটা বুঝল। বল্ল, বেশ, তা হলে এই আমরা তিন জন ছাড়া এ বাড়ীতে আর কেউই জানবে না। ওঁকেও বলব না। কি বল?

হ্যাঁ, সেই ভাল, অজিত সায় দিল।

মা বল্ল, আয় মা মণ্টা, চা-খাবারটা নিয়ে আসবি আয়।

চা আনার পর অজিত বল্ল, মণ্টাটি কে ভারতী?

সলজ্জ ভারতী বল্ল, মিণ্টু, মিণ্টি, মণ্টা, মণ্টু এই সব যা-তা নামে আমার দিদিমা আমাকে ডাকতেন।

দিদিমা?

হ্যাঁ। ওঁরা যখন পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন তখন আমার দিদিমাও ওঁদের সঙ্গে এসেছিলেন। তখনও আমি জন্মাই নি। পরে আমি শুনেছি, সেই দিদিমাই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তাঁকে অবশ্য আমার আদৌ মনে পড়ে না, কিন্তু শুনেছি তিনিই ঐ সব অদ্ভুত নাম আমার দিয়েছিলেন।

ভারতীর ঘোলাটে মনকে অনেকখানি ফর্সা করে অজিত চলে গেল। সেই দিনেই সন্ধ্যায় ক্লাব থেকে মোটর-বাইকে সুব্রতর সঙ্গে পালিয়ে ভারতী যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে নিরিবিলিতে বসে আবল-তাবল বকেছিল তখন সুব্রত বলেছিল, তোমার নাম ভারতী

না হয়ে সুপ্রিয়া হলে ভাল হোত। আমি তোমায় সকলের আড়ালে সুপ্রিয়া বলে ডাকব।

বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, ভারতী সুব্রতকে অবারিত অধিকার দিয়ে বসল।

কিন্তু কেন এই নাম বদলাচ্ছি তা জানতে চাইছ না?

কেন বলো ত।

বলব? তা হলে শোন। ভারতী নামটা বড় গুরুগম্ভীর। ওটা, ওটা মা সরস্বতীকেই মানায় ভাল। আমার কাছে তুমি সরস্বতী নও, তুমি প্রিয়া। শুধু প্রিয়া নও, সুপ্রিয়া।

ভারতী হেসে উঠল।

হাসলে কেন?

হাসলুম এই ভেবে যে কৃষ্ণের যেমন একশ'আট নাম ছিল, আমারও তেমনি অনেক নাম।

কি রকম? তোমার নামগুলো সব বলো ত শুনি।

শুনবে? হাল্কা মনে ভারতী বল্ল, আমার নাম মণ্টু, মণ্টা, তি, বাসুদেব কত কি!

বলেই ভারতী চম্‌কে উঠল।

সে কি গো? তুমি মহিলা না পুরুষ, সুব্রত কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল।

কেন?

মণ্টু, বাসুদেব এ সব ত মেয়েদের নাম নয়। এ সব নাম কে দিল?

হাসিমুখে ভারতী বল্ল, মণ্টু নামটা আমার এক দিদিমার দেওয়া, আর বাসুদেব নামটা দিয়েছেন আমার—মানে আমার বাবার এক বন্ধু।

দিদিমা মানে ঐ যিনি কেষ্টনগরে থাকেন?

না না, উনি কেন? উনি ত আমার আপন দিদিমা। মণ্টু নাম যে দিয়েছিল সেই আমাকে আঁতুড় থেকে মানুষ করেছিল। মা তাকে

যাঃ, যত সব আজ বাজে কথা। তারপর ঐ পুলিসের ব্যবহারটা বড্ড অপমানজনক। আর বসে না।

আরে দূর, ও ছেড়ে দাও, আরও কিছুক্ষণ বসি।

না গো, দিনকাল ভাল নয়। তোমার হাতে ঘড়ি আংটি, আমারও যা হোক কিছু রয়েছে, তারপর যদি কেউ ছোরা-ফোরা দেখিয়ে তোমার মোটর সাইকেলটা নিয়ে যায় তাহলে? কলকাতা আর সে কলকাতা নেই যে যত রাত খুশি মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াব।

ভারতী উঠে দাঁড়াল। অগত্যা সুব্রতকেও উঠতে হোল। সাদার্ন এভিনিউ-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের মোড়ে ভারতী ওর বাইক থেকে নেমে পড়ল। সুব্রত জানতো ভারতীর বাড়ী সাদার্ন এভিনিউর ওপোর। ভারতী সেই রকমই বলেছিল এবং কিছুতেই ওর বাইকের পেছনে বসে সাদার্ন এভিনিউ-এ ঢুকতে রাজী হোল না। সুব্রত ভাবল, ঠিকই ত, পাড়ার কেউ দেখলে কি হবে। থাক্, পরে যখন পাবই—

ভারতী দাঁড়িয়ে দেখল, সুব্রতর মোটর বাইক টালীগঞ্জের দিকে যেতে যেতে শেষে মিলিয়ে গেল। তারপর ভারতী দ্রুতপদে রাস্তা পার হয়ে উত্তরমুখী বাস্-এর অপেক্ষা করতে লাগল। মনে ভাবল, এখন আটটা কুড়ি, হালসী বাগান পৌঁছাতে যার নাম সাড়ে নটা হবে। কিন্তু বাস কই?

ভারতী এখনই বাস্ না পেলেও দু'চার মিনিটের মধ্যেই সে পাবে, কিন্তু বিভু ঘটক অনুপমাকে আর বোধ হয় কোন দিনও পাবে না, —অন্ততঃ এটাই মনোরমার আশঙ্কা। সেই কথাই এক ফাঁকে মনোরমা জানিয়েছিল ঘটককে। বল্ল, মায়ের আজকাল মোটেই ভাল ঘুম হয় না। রাত্তিরের মধ্যে পাঁচ সাতবার ওঠেন; কখনও তাকে ডাকেন, কখনও বা না ডেকেই নিজ হাতে আলো জ্বেলে নজর করেন সে তার বিছানায় আছে কি না? দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে একা একাই এ-ঘর ও-ঘর করেন। এই যে এখন তোমার সঙ্গে কথা

কইছি এটা দেখলেই চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করবেন কি কথা বলছিলুম ? মনটা ওঁর এতই খারাপ, এত অবিশ্বাসী—

ঘটক বল্লেন, ঠিক আছে, এর ব্যবস্থা আমি করব।

না না, কিছু করতে যেও না, ফের কোন কেলেঙ্কারি হোলে—

সে তোমায় ভাবতে হবে না, বিভু ঘটক উত্তর দিল।

আমি যাই, বুঝলে, রাগ করো না, লক্ষ্মীটি—

অনুপমা চলে গেল।

বিভু ঘটক সেই দিকে চেয়ে রইলেন।

দিনে রাতে ঘটকের মনে শান্তি নেই। হাতে পেয়েও পাব না এমনই পরাধীন আমি ? এমনই পরিবেশে আমার বাস ? দীর্ঘ বিশ-পঁচিশ বছর ধরে যখন যেখানে যা কিছু পেতে চেয়েছি তাই পেয়েছি,—আর এ একটা কি ? এ কি হয়, একি সহ্য করা যায় ?

আবার ভাবেন, বুড়ীটার আছে কি ? অনুপমা এতই বুড়ী যে, ওর জন্যে কারুর কিছু মনে হওয়া উচিত নয়। এই সব ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই নিজে হিসাব করেন। হিসাব করে নিজেই বুড়ো হয়ে যান, বার্দ্ধক্যের উপলব্ধি আসে। নিজের বয়সের জমা-খরচ করে অনুপমার বয়সটা আর একবার স্মরণ করেন। কিন্তু সব রকম হিসাব সত্ত্বেও পুরাতন স্মৃতি ভুলতে পারেন না। সেই রামকান্ত বসু স্ট্রীটের পুরনো বাড়ী, সেই দরিদ্র পরিবেশ, সেই অভাব, সেই অতৃপ্তি, সেই আকাঙ্ক্ষা, এখনকার এতখানি স্বাধীনতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেও, বিভু ঘটক সেই বিগত দিনের জন্য লালায়িত হন। সে দিন যাকে পাই নি. আজও তাকে পাব না! এই অপ্রাপ্তি বিভুর অহমিকার ওপোর বারম্বার আঘাত করে। অবাধে পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা থাকলে হয় ত তাঁর পাওয়ার আকাঙ্খা ধীরে ধীরে কমে আসত, কিন্তু সেদিনেও যাকে খুশিমত পান নি, আজও যাকে হাতের মুঠোয় এনেও পাচ্ছেন না, তার জন্য কেমন একটা প্রচণ্ড জিদ তাঁর মনে উগ্র হয়ে উঠছিল। ক্রমাগতই তিনি এর উপযুক্ত বিহিত চিন্তা করতে লাগলেন।

যতই ভাবেন ততই ভাবেন, কোন কূল-কিনারা পান না। লোকে কি বলবে, ছেলে কি বলবে, সর্ব্বোপরি রুগ্না বৃদ্ধা মা তাঁর মতো উপযুক্ত ছেলের জন্য বুক চাপড়াবেন, এগুলোর কোনটাই ঘটক হতে দিতে রাজী নন। অনুকে বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে আপত্তি তাঁর কিছুই নেই কিন্তু তিনি বোঝেন এই রকম বিয়ের পরিণতি এদেশে ভাল হয় না। লোকে হাসে। সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা ছিল শম্ভুরা আসার আগে পর্যন্ত। সেই রকমটা থাকলেই সবচেয়ে ভাল হোতো। হয়ত ওরাই মায়ের মনে এতখানি সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে গেছে? কে জানে? যাবার আগে এমনই শক্রতা করে গেল!

আবার ভাবেন, মাকে যদি দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যায়! উনি ত সেখানেই থাকতে চান। ঘটক জানেন, মাকে দেশে যাবার কথা বল্লেই মা রাজী হয়ে যাবেন, তারপর তিনি মাসে মাসে ভাল রকম মাসোহারা পাঠাবেন, কিন্তু সেখানে উনি ক'দিন বাঁচবেন, ক'দিন সুস্থ থাকবেন! ওরা ওঁকে ভাল ভাবে খেতেও দেবে না। তারপর মাকে দেশে পাঠালে অনুকে এখানে রাখার কৈফিয়ৎ কি থাকবে। সেই বদনামই ঘুরে ফিরে আসবে। যদি চারু ঝি'কে মায়ের দেখাশোনা করার জন্য মায়ের সঙ্গে পাঠানো যায় তা হলে অবশ্য দেশে মায়ের তদ্বির কিছুটা হবে, কিন্তু তবুও অনুকে এখানে রাখার মতো উপযুক্ত কারণ তৈরী করা যায় না। বাপ ও ছেলের সংসারে অনুপমার মতো সম্পর্কশূন্যা এক মহিলার প্রয়োজন কোথায়? অন্যের সংসারে এ রকমটা দেখলে তিনিই বা নিজে কি রকমটা মনে করতেন! তেমনই ত—

যদি অনুপমার শোবার বন্দোবস্ত নীচের ঘরে করা যায়! মা সেরে উঠেছেন এই অজুহাতে অনুকে যদি বলা যায় নীচের ঘরে শোও। তারপর সে এক সময় ওঁর ঘরে আসবে। কিন্তু তাতেও অনেক অসুবিধা। সিঁড়ির দরজা এতকাল রাত্রে ওপোর থেকেই বন্ধ থাকে। সেই দরজা এতদিন পরে খুলে রাখার কারণ কি হবে! তবে—

তবে এক কাজ করা যায়। এখন তিনি অনুকে নীচে পাঠিয়ে

তারপর একদিন নিজে নীচের গেষ্টরুমে চলে যাবেন। বলবেন, ডাক্তার বলেছে, তাঁর হার্ট দুর্বল, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা বন্ধ করতে হবে। এমন ত অনেকেরই হয়। অমন যে সাজোয়ান, মধ্যবয়সী ব্যবসাদার মিঃ কৃষ্ণান, উনি সারাদিন অফিস করেন, বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা আদৌ করেন না। লিফ্‌ট ছাড়া অফিসে ওঠেন না, অথচ দেখলে বেশ সুস্থ বলেই মনে হয়। সেইভাবে উনিও নীচে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর তা না হোলে যে কাজ করতে হয় সে বড় নোংরা। অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করে ওদের মা ও ছেলেকে রাখতে হয়। সেটা অনুর পক্ষে খুবই অপমানজনক। তাতে সে রাজী হবে কিনা তারও ঠিক নেই। তা ছাড়া—তা ছাড়া সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, সে অবস্থায় অনুকে সাময়িক ভাবে পাওয়া যাবে. কিন্তু সারা রাত্রির সঙ্গিনী রূপে পাওয়া যাবে না। পেতে হোলে বাড়ীর বাইরে রাত্রিবাস করতে হবে। তার ফলে ছেলের সামনে এমনই একটা বদ্ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হবে যে ওদের ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হবে, উপযুক্ত ছেলের কাছে বাপ হবে অশ্রদ্ধার পাত্র। সাবধানী মায়ের অতিরিক্ত সজাগ দৃষ্টি এবং প্রবীণ ছেলের অতিরিক্ত মাতৃভক্তি ও সেই সঙ্গে প্রৌঢ় বয়সের দৈহিক ক্ষুধা সমস্ত একত্র হয়ে এমনই এক জটীল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে সব দিক সামলে উপযুক্ত সমাধান কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ঘটক স্থির করলেন, অনুকে দিয়ে দাবী জানাবেন যে সে তার ছেলের কাছে নীচের ঘরে থাকতে চায়। প্রস্তাবটা শুনেই অনু আপত্তি তুলেছিল, বলেছিল আমি না হয় নীচে গেলুম কিন্তু দু'দিন পরে তুমি নীচে গেলেই নানা কথা হবে। তুমি জান না, মা সব এমন ধারা কথা চারুর সামনে বলেন, এমন সব কথা তোমার ভাদ্দর বৌদের সঙ্গে হোত যে, শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

কি রকম? কি কথা শুনি?

না, সে তোমার শোনার দরকার নেই। তোমার কথা উঠলেই মা তোমার নিন্দে ছাড়া ভাল কথা একটাও বলেন না।

প্রকৃতিস্থ হয়ে ঘটক বল্লেন, সে আমি জানি। বোধ হয় সব মায়েরাই ও রকম করে। যে ছেলে উন্নতি করে, তার ওপোর বাপ্-মায়ের হিংসে হয়।

অনু বল্লে, আগে আমি এ রকম কথা শুনলে বিশ্বাসই করতুম না কিন্তু এখন ত তাই দেখছি। তা এ রকমটা কেন হয় বল ত। ছেলের উন্নতিতে বাপ মায়ের আনন্দ হয় না কেন?

বাপ্ মা মনে করেন, ছেলে তাঁদের হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এই হচ্ছে মূল কারণ। আমাদের হিন্দু পরিবারের বুড়োবুড়ীরা চায় সংসার তাদের মুঠোর মধ্যে থাকবে। যখন তাঁরা দেখেন সংসার তাঁদের চেয়েও বড় হয়ে যাচ্ছে তখন তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। সেই পারেন না বলেই অধিকাংশ সংসার হয় বড় হতে পারে না, এবং হলেও ফেটে চৌচির হয়। আমার মা যদি যথা সময়ে আমার হাতে সমস্ত ভার ছেড়ে নিজে সংসারের কর্তৃত্ব থেকে রিটায়ার করতেন তা হলে আমার ভাই ভাদ্দর-বৌরা 'পর' হয়ে যেতো না, আমিও তাদের ছেঁটে ফেলে দিতে পারতুম না। আমার স্ত্রীও সারাটা জীবন দাসী বাঁদী হয়ে মুখ বুজে দেহপাত করতো না। সংসারের গতি স্বাভাবিক থাকত, অস্বাভাবিক হোত না।

সময় থাকতে তুমি এর প্রতিকার কর নি কেন? মাকে বোঝাও নি কেন? অনু প্রশ্ন করে।

ওঁকে বোঝানো যায় না। উনি বুঝবেন না। যে ডাক্তার তোমার ছেলের চিকিৎসা করছেন, তিনি বলেন এগুলোর নাম কম্-প্লেক্স। এগুলি হচ্ছে যুক্তিহীন মানুষের বহুদিনের ধারাবাহিক অন্ধ চিন্তার ফল, মনের মধ্যে পুষে-রাখা সংস্কারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

অনুকে নীরব দেখে ঘটক বল্লেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? না হবারই কথা। আমিও এসব কথা জানতুম না। এ ঐ তোমার ছেলের ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে শুনেছি। তিনি বলেন, কম্প্লেক্স অশিক্ষিত কূপমণ্ডূকদের মধ্যেই বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষিত

জ্ঞানী গুণীদের মধ্যেও কম নয়। শিক্ষিত পণ্ডিতরাও অনেক সময় অনেক বে-আক্কেলী কাজ করে বসেন। কেন জানো? হঠাৎ তাঁরা যে কথাটা একবার বিশ্বাস করে বসেন সেটাকেই ধ্রুব সত্য প্রমাণ করার জন্য তাঁদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করে অন্যের সহজ বুদ্ধিকে পর্যন্ত ঘুলিয়ে দিয়ে এমনই একটানা পাগলামি চালিয়ে যান যে নিজেরাও বিপন্ন হন, যারা তাঁদের ওপোর নির্ভর করে তাদেরও বিপদে ফেলেন। এর ফলে বড় বড় শিল্প, বাণিজ্য, নাম করা প্রতিষ্ঠান, এমন কি রাজার রাজ্যপাটও বানচাল হয়। ইতিহাসে এর নজির আছে অনেক। আমাদের বর্তমান স্বাধীন ভারতের অনেক দুঃখু এই রকম কম্‌প্লেক্সওয়ালা কতকগুলো অতি-পণ্ডিত নেতার জন্য। আমাদের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হচ্চে কয়েকজনের কম্‌প্লেক্সের গুঁতোয়, সারা পৃথিবীতে আমাদের আজ বন্ধু নেই এদেরই জন্যে। এঁরা বড়োকে বড়ো বলে মানতে চান না, শত্রুকে শত্রু বলে ভাবতে চান না, বন্ধুকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেন না।

অনু অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল। ঘটককে এ ভাবে কথা বলতে কোন দিনই কেউ শোনে নি। ঘটকও এভাবে কোন দিনই কাউকে লেকচার দেন না, কিন্তু ক'দিন ধরে যে সমীক্ষা তিনি মনে মনে গোপনে চালাচ্ছিলেন সেই আত্মসমীক্ষার নীট্ উপলব্ধিটা তিনি যেন কারুর কাছে প্রকাশ না করে থাকতে পারছিলেন না।

তবে এতগুলো কথা বলার পর হঠাৎ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে ঘটক প্রচ্ছন্ন লজ্জায় ক্ষণকাল নীরবে থেকে শেষে বল্লেন, শোনো, আমি যখন মায়ের ঘরে থাকব তখন তুমি তোমার নীচের ঘরে রাত্রে শোবার কথাটা তুলো। তারপর যা ব্যবস্থা করার আমি করবো।

অনু বল্ল, আচ্ছা।

ব্যবস্থাটা করতে আদৌ বেগ পেতে হয় নি, এমন কি লোক-দেখানো কোন কৈফিয়ৎই তৈরী করতে হয় নি কারণ সুন্দর একটা সুযোগ উপস্থিত হোল। অনুর ছেলে খোকার হোল জ্বর।

সামান্য ফ্লু, কিন্তু প্রথম দিনেই জ্বর উঠল বেশ কিছু ওপোর দিকে। মনোরমা মাকে বলতে মা নিজেই বল্লেন, আজ রাত্তিরে তুমি ছেলের কাছে থাক গে। রাতে খোকার কিছু দরকার হোলে কে দেখবে ?

মায়ের নির্দেশ অনু পালন করল। ঘটককে কোন কথাই বলতে হোল না। রাত্রে ঘটক খোকাকে দেখতে এসে যাবার সময় বলে গেলেন, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই।

অনু বল্ল, খোকা এখন ভালোয় ভালোয়—

ঘটক বল্লেন, ওর জন্যে ভেবো না। ফ্লুর মেয়াদ তিন দিন।

এর পর ঘটক ভাবতে বসলেন, নিজের নীচে থাকার বন্দোবস্তটা কি ভাবে করবেন।

ভারতীও ভাবছিল, নিজের ব্যবস্থা কি ভাবে করা যায়। অজিতদা সহজে ছাড়বে না, কিন্তু যাই সে বলুক না কেন এ পথে এক দিন-না একদিন সমূহ বিপদে পড়তেই হবে। ভারতীর নিজের সারাটা জীবন নষ্ট হবে, নষ্ট হবে ওর বাবা-মার সংসার, নষ্ট হবে ভাই বোনগুলো। অপর পক্ষে যাকে সে পেয়েছে তাকে যদি মন প্রাণ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারে তা হলে ওর নিজের জীবনে দুঃখ বলে কিছুই থাকবে না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে সে কিছুতেই ঠেলবে না, এ জন্য অজিতদের সঙ্গে ফাটাফাটি যা কিছু করতে হয় সমস্তই সে একা করবে।

ভারতী ভাবতে লাগল, এ পর্যন্ত যত লোককে সঙ্গ দান করতে হয়েছে তাদের কারুর সঙ্গে সুব্রতর তুলনাই হয় না। যদি তাদের কাউকে সে না পেত তা হলেই তার পক্ষে ভাল হোত, কিন্তু তা ত হয় না। তবে এখনও সময় আছে, এখনও—

বি. কম্ থার্ড ইয়ার ক্লাসে অধ্যাপকের লেকচার চলছে, ভারতী ভাবছে ওর পড়া একখানা উপন্যাসের কথা। সেই উপন্যাসের নায়িকা নিজের অপবিত্র দেহ নিয়ে প্রিয় নায়কের কাছে কিছুতেই যাবার মতো মনোবল পেল না। নায়ক বলেছিল, পুরানো কথা ছেড়ে দাও, নতুন করে পত্তন কর, কিন্তু নায়িকা নায়কের কথা নেয় নি। আত্মহত্যা

করেছিল,—চিঠি লিখে জানিয়ে গিয়েছিল, অপবিত্র বাসি ফুল জীবন-দেবতাকে অর্পণ করতে পারলুম না, তাই জন্মান্তরে পাবার আশা এ জন্মের মলিন বুকে পোষণ করে বিদায় নিলাম। তুমি সুখে থেকো ইত্যাদি কত সব বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না! অধ্যাপক চীৎকার করে বক্তৃতা দিচ্ছেন, ছাত্রী আপন মনে হাসছে, ভাবছে আমি ওই নায়িকার মতো পাগল নই। আমি আমার নায়কের কাছে কোন কথাই বলবো না, ভাবের আবেগ নিয়ে ভেসেও যাব না, আমি সুখী হব, এর জন্য যা দরকার হবে তাই করব, সুব্রতকে আমি ছাড়ব না।

ঠিক সেই সময় সুব্রতও তার ক্লাসে বসে এ্যাকাউন্টেন্সির অধ্যাপকের বোর্ড জোড়া অঙ্কের দিকে দৃষ্টি রেখে ভাবছিল, বাবাকে বলে এর ব্যবস্থা করতেই হবে। ভারতীর মত সহজ সরল ভদ্র মেয়েকে আমি ছাড়ব না। সে বৈদ্যই হোক, কি কায়স্থ বা সুবর্ণবণিকই হোক, সে আমার হবেই। ঠাকুরমার যা ইচ্ছে করুক গে, বাবার মত আমি করাবই। ওকে আমি ছাড়ব না।

কয়েকটা জরুরী চিঠি টাইপ করতে পাঠিয়ে মিঃ বি. ঘটক নিজের অফিসের চেম্বারে বসে স্থির করলেন, আজই বাড়ী ফিরে প্রকাশ করতে হবে যে, সব চেয়ে বড় ডাক্তার তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে বারণ করে দিয়েছেন। আজ কোন মতে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বাদলকে ধরে ধরে ওপোরে উঠব। তারপর কাল সকালেই হুকুম দেব, আমার সমস্ত জিনিস গেস্টরুমে আনতে এবং গেস্টরুমের সমস্তই ওপোরের ঘরে পাঠাতে। আজ বাদে কাল রাত্রি থেকে ওকে আবার কাছে পাব। এ জন্য গোটা কয়েক ওষুধও কিনতে হবে, কারণ যে ছেলে সময়মত অফিসে না বেরুলে খবর নেয়, সে ছেলে নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং জানতে চাইবে ডাক্তার কি কি ওষুধ দিয়েছে, কি রকম পথ্য দিয়েছে, ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও দুটো বড় রকমের অসুবিধে তাঁর হবে। সন্ধ্যের সময় মায়ের ঘরে যাওয়া হবে না এবং গাড়ী বারাণ্ডার বিশ্রামটাও

তাঁর বন্ধ হবে। তা হোক, যা তিনি চাইছেন তার জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

ভারতী আর একদিন অজিতকে ধরে বসল। বল্ল, অজিতদা, বিশ্বাস করুন আমার মন ভেঙ্গে পড়ছে। আমি আর পারছি না। আমার পড়াশোনা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। এ ভাবে পার্ট টু পাস করতে কিছুতেই পারব না।

হাসিমুখে অজিত বল্ল, পাস তোমাকে করাবই, তা তুমি পড়ো আর নাই পড়ো। শুধু পাস নয়, ডিস্‌টিংশনে পাস করবে। ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হবার সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে তোমাকে অনার্স নিইয়ে অনার্সেই পাস করাতুম, কিন্তু তা ত আর হয় নি—

কি করে হবে অজিতদা? মনের অবস্থা এমনই হয়েছে যে যাই কিছু পড়ি না কেন, কিচ্ছু বুঝি না,—পড়ে যাই কিন্তু মনে কিছুই ঢোকে না—

নাই ঢুকুক, অধ্যাপক অজিত জোর দিয়ে বলে, সোজা পথে আজকাল ক'জন পাস করে বলতে পারো? ও জন্যে ভেবো না। আমাদের বন্ধু আছেন সর্বস্তরে। পরীক্ষার ঘরে কোশ্চেন পাবার কিছু পরেই সমস্ত উত্তর পেয়ে যাবে। সেইগুলো খাতায় টুকে দিয়ে—

ওরে বাবা, গার্ড নেই?

আছে, অজিত বল্ল, গার্ড নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেও আমাদের লোক। সে দলের লোককে সাহায্য করবে, বিপদে ফেলবে না।

সে কি? ভারতী অবাক হয়ে ভাবতে থাকে। তাও কি হয়!

হাসি মুখে অজিত বল্ল, তাই হয়, তোমার জন্য তাই হবে। আরে, এটা তুমি বুঝছ না কেন যে মেহনতি মানুষ ছাড়া কাজ ত আর কেউই করে না। ঐ যে ওপোর তলায় বসে থাকেন ইন্‌-চার্জ, ওঁর কাছে গার্ড ছাত্রছাত্রী ধরে নিয়ে গেলে তবে ত তিনি স্টেপ্‌ নেন। গার্ডকে যে সব ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে আমরা সাবধান করে দেব, গার্ড তাদের ঠিক পার করে দেবে, দরকার হোলে ধরাবে অন্যদের, যাদের

সম্বন্ধে আমরা সেই রকমের নির্দেশ দেব। তারপর খাতা পরীক্ষা? সেখানেও ত আমরাই থাকব। তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? পড়ো আর নাই পড়ো, তুমি লিখে রেখে দাও যে তুমি ডিস্‌টিংশনে পাস করবে।

যে কথা কাল থেকে প্রবল ভাবে ভারতীর মনকে বিচলিত করেছে সে কথা না বলে সে থাকতে পারল না। বল্লে, অজিতদা, ঐ যে স্নুদেব বাবুরা এখানে এসেছিলেন ওদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি—। ভারতী থেমে গেল।

তীক্ষ্ণ এক সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ভারতীকে দেখতে দেখতে অজিত বল্ল, হ্যাঁ, কি বলবে বলো ওঁর সম্বন্ধে। কোন খারাপ ব্যবহার করেছে?

কানা ঘুষোয় কালই ভারতী স্নুনন্দার কাছে শুনেছে ঐ ছোকরার মেস্ সার্চ করে পুলিশ ওদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। কথাটা বলেই স্নুনন্দা বারণ করেছিল, ভারতী যেন কারুর কাছে এই নিয়ে আলোচনা না করে। ভারতী কাল থেকেই ভাবছিল, অজিতদা দলের নেতা, তার কাছে এ কথা তুললে নিশ্চয়ই দোষের হবে না, কিন্তু প্রসঙ্গটা আজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই অজিতের চোখের চাউনি এমনই কঠোর হয়ে উঠল যে ভারতী মাঝপথেই থেমে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে ভারতী বল্ল, না, কোন খারাপ ব্যবহার সে করে নি। মানে সাধারণ ছেলেরা যেমন করে তেমনই করেছিল।

আর সুদেব? স্নুদেবকে কি রকম দেখলে?

একটু লাজুক গোছের।

হ্যাঁ, ও আমাদের নিউ রিক্রুট, সে জন্যই।

আচ্ছা অজিতদা, সুদেবদা যদি নতুনই হয় তাহলেও ওকে যেন মনে হোল ওর সঙ্গীর ওপোরওয়ালা। দু'জনের মধ্যে ওকেই লীডার বলে মনে হচ্ছিল।

হাসি মুখে অজিত বল্ল, আমাদের মধ্যে ওপোরওয়ালা নীচওয়ালা নেই। সব সমান। তবে সুদেব নতুন বলে ওকে বেশী দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছিল। তাই হয়। এতে কাজের ওপোর টান আসে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, নতুন লোক তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ওঠে।

ওরা এখন কোথায় আছে? কি করছে?

সে আমি জানি না। ও সব জানার চেষ্টাও করি না, তোমরাও করবে না। যখন যাকে যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়, সে তখন তাই করে। পরে সে বিষয়ে আর কোন খবরও নেয় না, দেখা হলে চিনতেও পারে না, চেনা উচিতও নয়। পার্টির এই নিয়ম।

অজিত ঐ প্রসঙ্গ থামিয়ে দিতে চায়।

ভারতী কিন্তু নাছোড়বান্দা। বল্ল, এই যে আপনি বল্লেন, আমাদের মধ্যে কোন ওপোরওয়ালা নেই, তা হলে মেম্বারদের কাজ করার নির্দেশ কে দেন? যিনি দেন তিনি নিশ্চয়ই লীডার।

অজিত বল্ল, হ্যাঁ, লীডার, কিন্তু ওপোরওয়ালা নন। তিনি হোল-টাইম ওয়ার্কার। তিনি চব্বিশ ঘণ্টা সকলের সব দিকের সব খবর রাখেন, সমস্ত অবস্থাটা তার নখদর্পণে, সেই জন্যই তিনি লীড্ করার ক্ষমতা রাখেন। লীড্ করেন বলেই তিনি লীডার, কিন্তু লীডার মানে ওপোরওয়ালা নয়, মনিবও নয়। তিনি হচ্ছেন টীমের ক্যাপ্‌টেন। আজ তিনি লীডার আছেন, কাল তুমি বা আমি যে কেউ লীডার হোতে পারি। আবার লীডার হলেই যে চিরস্থায়ী লীডার তা নয়। আজ যিনি লীডার, কাল তিনি ওয়ার্কার হোলে কেউ মনেও করব না যে তার অবনতি হোল। তার সুবিধে হোল না, তিনি লীডারসিপ্ ছেড়ে দিলেন, কিম্বা ওয়ার্কাররা হয়ত বুঝল যে তার লীডারসিপে কাজ ভাল হচ্চে না, তখন ওয়ার্কাররা তাকে অনুরোধ করল, লীডারসিপ্ ছাড়ো; তিনি ছাড়লেন। এ জন্য তার কোন অসম্মান যে হোলো তা নয়। আমরা ব্যক্তির পূজা করি না, পূজা করি পার্টির এবং কাজের, যে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে পারে তাকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে দিই, গোল্‌-কীপারীতে যে পোক্ত তাকে গোলপোস্টে দাঁড় করাই। ঝাড়ুদার থেকে প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত সবাই সমান ওয়ার্কার, কেউ ছোটও নয়, কেউ

বড়ও নয়। আর্থিক ও সামাজিক অধিকারে সকলেই সমান, পার্টির লক্ষ্যই সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

আর যদি কেউ মনে করে সে পার্টির উপযুক্ত নয় তাহলে তাকে পার্টি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় না? ভারতী প্রশ্ন করে।

না। ছাড়াছাড়ি আমাদের নেই কারণ কাজ এখানে এতো বেশী যে সব রকম মানুষের উপযুক্ত কাজই আমাদের হাতে আছে। কোথাও-না-কোথাও তাকে তার উপযুক্ত কাজ দেওয়া যাবেই।

না না, তা নয়, আমি বলছি, কেউ যদি মনে করে সে পারছে না, কেউ যদি ছুটি চায় তাহলে কি করেন?

ব্যাপার কি? এ সব কথা আবার কেন? ভারতীর ওপোর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে অজিত বলেছিল, এ কথা ত সেদিন হয়ে গেছে।

ঘাড় হেঁট করে ভারতী অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বলেছিল, আমি আর পারছি না অজিতদা। আপনারা আমার অনেক উপকার, অনেক সাহায্য করেছেন, আমিও প্রাণপণে আমার কর্ত্তব্য করে গিয়েছি। এ জন্য আমার সমস্ত সম্মান, সমস্ত নারীত্ব বিসর্জন দিয়েছি, আমি—

থামো থামো, ঢের হয়েছে, এ সব বক্তৃতা স্টেজেই ভালো মানায়, এই সব সেন্টিমেণ্ট পুরনো পচা সাহিত্যে অনেক আছে কিন্তু,—গম্ভীর কণ্ঠে অজিত বল্ল, জেনে রেখো ভারতী, বাস্তবে এই সব সেন্টিমেণ্টের কোন মূল্য নেই। তোমার মত একজন পার্টি কর্মীর কাছে এ রকমটা শুনতে হবে এ আমি কল্পনাও করি নি। তুমি জানো—

অজিত থেমে গেল। ভারতী মুখ তুলে বল্ল, কি? কি জানব অজিতদা?

পার্টি যারা এখন পরিচালন করছেন তাদের মধ্যে একজন তোমার কাছেই দীক্ষিত হয়েছেন সেটা তোমার মনে আছে ত? সেই তিনি তোমার ওপোর কি গুরুদায়িত্ব দেবার বন্দোবস্ত করছেন তা কি তুমি কল্পনা করতে পারো?

না। ভারতী ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিল।

এখন থাক্, যথাসময়ে সবই জানবে। এখন আমি তোমাকে এইটুকুই বলতে পারি যে ঐ সুনন্দা, যে তোমাকে পার্টিতে এনেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী-কর্মশক্তি তোমার রয়েছে। এই শক্তি তুমি সাময়িক অবসাদে হেলায় হারিও না। তুমি হয়ত জানো না, কিন্তু এটাই তুমি স্থিরভাবে মনে রেখো, তোমার ওপোর তোমার বাবা, মা, ভাই বোনেরাই যে নির্ভর করে আছেন তা নয়, তোমার ওপোর আমরা অনেকেই নির্ভর করে আছি। শুধু তোমার পরীক্ষার জন্য তোমার ওপোর বিশেষ দায়িত্ব দিতে আমি নিষেধ করেছি। যে দিন তোমার পরীক্ষাটা শেষ হবে সেদিন থেকে তুমি আমাদের মধ্যমণি হয়ে কাজ করবে। এ সময়ে এ রকম পালিয়ে যাবার কথা তোমার মুখ দিয়ে যেন না বেরোয়।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের হাতের ঘড়ি দেখে অজিত বল্ল, ইস্, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। আমার একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে, আমি উঠি। এই টাকা কটা রাখো।

বলেই প্যাণ্টের পকেট থেকে পাঁচ ছ'খানা দশ টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে অজিত বল্ল, এটা তোমার, মাসিমাকে দিতে হবে না, তুমি কলেজ থেকে বেরিয়ে ঠিক চারটের সময় শিয়ালদহ স্টেশনে আট নম্বর প্লাটফর্মের গেটে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। যেন হঠাৎ তোমার প্রফেসারের সঙ্গে দেখা হোল এই ভাবে তুমি এগিয়ে দেখা করবে।

বলতে বলতেই অজিত ভারতীর ঘর থেকে বেরুল। দরজার কাছে এসে চিৎকার করে বল্ল, কোনো রকম মুখস্থ করার চেষ্টা কোরো না, দু'বার ভাল করে পড়ে জিনিসটা তলিয়ে বুঝে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখবে, আমি তোমার খাতা দেখে নম্বর দেব। তাতে বুঝবে কি রকম লিখলে কি রকম নম্বর পাওয়া যায়।

দরজার বাইরে ভারতীর বাবা ছায়ায় বসে গলির মধ্যে যে এক ফালি রোদ এসে পড়েছিল সেই রৌদ্রে নিজের পা দু'টো লম্বা

করে ছড়িয়ে বিড়ি টানছিলেন। স্কুলের সেক্রেটারী প্রফেসার অজিত বোস অর্থাৎ নিজের মনিবকে দেখে বিড়িটা ফেলে লাঠির ওপোর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই অজিত ওর কাঁধের ওপোর হাত দিয়ে বল্ল, থাক, থাক, উঠতে হবে না মেসোমশাই, আজ আপনার পা কেমন ?

সেই রকমই আছে, লাঠিখানা পাশে নামিয়ে রেখে ওঠার চেষ্টা তিনি ত্যাগ করলেন। বল্লেন, আপনার শরীর ভালো ত ?

হ্যাঁ চলছে। আজ স্কুলে যাবেন না কি ?

দেখি, বিকেলে একটু ভাল থাকি যদি—

না না, কষ্ট করে যাবার দরকার নেই। বেশ সুস্থ বোধ করলে যাবেন, কথাগুলো বলতে বলতেই অজিত এগিয়ে পড়ল।

আরথ্রাইটিসের রোগী পেছন থেকে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েকে লক্ষ্য করে বল্লেন, বুঝলি মন্টি, এমন মানুষ হয় না। যে যাই বলুক, তুই কোনদিন ওর অবাধ্য হবি না।

ঘরের মধ্যে ঢুকে মন্টি বাবার কথায় মনে মনে হেসেছিল। বাবা মায়ের গোপন বিশ্বাস অজিত বোস ভারতী সেনকে বিয়ে করবে, ওঁরা নিখরচায় প্রফেসার-জামাই লাভ করবেন।

তেমনই বিশ্বাস ছিল অনুপমার। তিনমাস ডাক্তারী চিকিৎসার পর খোকার অস্বাভাবিক মহাপুরুষগিরিটা প্রায় চাপা পড়ে গেছে। সে এখন আর পাঁচটা ছেলের মত সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা কয়। অনুর বিশ্বাস, আরও কিছুদিনের মধ্যেই সে বিভুকে বলে ছেলের বিয়ে দেওয়াবে, ছেলের থাকার মতো একটু ঘর বাঁধার ব্যবস্থা করাবে এবং বিভুরই অফিসে ছেলের উপযুক্ত কাজ দেওয়াবে। ছেলে-বউ নিয়ে নিজস্ব বাড়ীতে অনু আবার সংসারী হবে এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে নিজের অনেকখানি অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রৌঢ়া অনুপমা একদার-নর্মসঙ্গী, বর্তমানের রক্ষাকর্তার সমস্ত দাবী নির্বিচারে সহ্য করে। প্রাচীন কালের তেজস্বিনী, ধূর্ত মিসেস্ মুখার্জি বর্তমানের দুরবস্থাকে সম্পূর্ণ

উপেক্ষা করে পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় বুক বেঁধে কর্তব্য-অকর্তব্য সব কাজই মুখ বুজে করে। তার যুক্তি, এক সময় যাকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছি, তাকে এখনও প্রশ্রয় দিতেই হবে; তার আশ্রয়ে নিজের বাকী জীবন নির্ভাবনায় কাটাতে হবে, আধপাগলা ছেলের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পাকা করতে হবে। তাই রাত্রে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের ব্যক্তিগত আকর্ষণ ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গেস্ট্‌রুমে অনুকে আসতে হয়, ঘটকের মন রাখতে হয় এবং একত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার বিলুপ্ত প্রণয়কে নূতন অভিনয়ে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে ভাবে তরুণী অনুপমা নিজের যৌবনে বৃদ্ধ মিঃ মুখার্জিকে মিথ্যা অভিনয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল সেই ভাবেই সে এই বয়সে ঝানু ও অভিজ্ঞ মিঃ ঘটককে মুগ্ধ রাখে। বাণিজ্য-ধুরন্ধর ঘটকের ওপোর অনুপমা এই ভাবেই বাণিজ্য করে। পূর্বস্মৃতির রঙিন চশমায় ঘটকের দৃষ্টি এমনই রঙিন ছিল যে প্রৌঢ়া অনুপমাকে প্রৌঢ়া জেনেও তরুণী ছাড়া তিনি অন্য কিছুই ভাবতে পারতেন না। মা, ছেলে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে হৃদ্‌রোগের অভিনয়ে ব্যবসায়ী মিঃ বি. ঘটক নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন। অনেক চিন্তার পর বিধবা বিয়ের প্রসঙ্গটা আর তুললেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পর ঘটক নিজের একতোলার অফিসে বসে বর্মা চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে আপন কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদে মনে মনে পুলকিত হচ্ছিলেন এমন সময় দরজার চৌকাটে এসে দাঁড়ালেন ঘটকের মা। তাড়াতাড়ি চুরুটটাকে ছাইদানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘটক উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, একি, তুমি আবার নীচে এলে কেন? এ রকম ওপোর-নীচ করা তোমার পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

তিনি বল্লেন, আসব না? তোমায় ক'দিন দেখি নি বলো ত। তুমি কেমন আছ, কি করছ? নীচের ঘরে একা একা পড়ে আছ—

আমি ভালই আছি। আমার অসুখ ত বাইরে থেকে বোঝবার কিছু নয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লেন, সব কাজই করতে পারি কিন্তু

কোন রকম পরিশ্রমের কাজ করা উচিত নয়। সিঁড়ি দিয়ে নামাও আমার বারণ নয়, কিন্তু ওঠাই অন্যায়, সে জন্যই নীচে থাকার ব্যবস্থা করলুম।

তা ত বুঝলুম, কিন্তু ঐ সব ছাইভস্মগুলো কি খাওয়া উচিত। তিনিও বিড়ি খেতেন কিন্তু তার গন্ধ এ রকম মড়া পোড়ানোর মত ছিল না। তাতেও যখন অসুখ করল তখন আমাদের যদু ডাক্তার বলেছিল ঐ সব খাওয়া না ছাড়লে কোন ওষুধেই কাজ হবে না। আর সত্যিই দেখলুম, ওষুধে কোন কাজই হোল না। তা তুমি এখন ওষুধ-বিসুধ খাচ্ছ—

কথা না বাড়িয়ে ঘটক বল্লেন, হ্যাঁ, ও ত প্রায় ছেড়েই দিয়েছি—

ডাক্তার পুরো ছাড়তে বলে নি? বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন।

না, এলোপ্যাথী চিকিৎসায় ওতে কোন অসুবিধা হয় না। যদু ডাক্তার হোমিওপ্যাথী করতেন তাই তিনি পুরো ছাড়তে বলেছিলেন।

তা বাবা হুমোপাতি আলোপাতি যাই বলো, ঐ বিচ্ছিরি গন্ধ-গুলোয় কি সুখ হয়! ও তুমি আর খেও না।

ঠিক আছে। তাই হবে, কিন্তু তুমি এই ভাবে ওপোর-নীচ করবে না, বুঝলে। তোমার কিছু দরকার হলে অনুপমাকে দিয়ে— না না, ওর নামটা যেন কি, মনোরমা—ঐ মনোরমা, কি চারুকে দিয়ে বলে পাঠাবে। নিজে ওপোর-নীচ করে আবার যদি অসুখে পড়ো তা হলে কি হবে বলো ত?

তোমাকে না দেখে যে থাকতে পারি না বাবা, বৃদ্ধা ধীরে ধীরে বল্লেন, তুমি যদি 'মা' হতে তাহলে বুঝতে মায়ের মনে কত জ্বালা, কি দুর্ভাবনা—

কেন, ভাবনা আবার কি? তুমি ত রোজই আমার খবর পাচ্ছ। আমি খাচ্ছি-দাচ্ছি, অফিস করছি, শুধু সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠি না, এর জন্যে এত ভাবনা কিসের?

হুঃ, সে আর তোমাকে কি বোঝাব বল, তুমি যদি নিজে থেকে না

বোঝো তাহলে কি আর বোঝানো যায়! আমার মন যে বোঝে না! তা আমি বলছিলুম কি, আমাকেও তোমার ঘরে বন্দোবস্ত করে দাও। ঘরটা ত বেশ বড়ই আছে, ঐ ঘরেই আমার খাটটা নামিয়ে দিতে বলো। রাত বিরেতে কখন কি দরকার হয়, অসুস্থ অবস্থায় একা এক ঘরে থাকাটা তোমার পক্ষে ভালো নয়।

ঘটক প্রমাদ গণলেন। এ রকম একটা দাবী যে মায়ের তরফ থেকে আসতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। এখন এই স্নেহময়ী মাকে তিনি কি করে ঠেকাবেন! ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, না না, তোমাকে নীচে আসতে হবে না, তুমি যেমন আছ তেমনই থাকো। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই বল্লেন, আমি তুমি সবাই নীচে এলে সুবো কি একা ঐ দোতলায় থাকতে রাজী হবে?

বুড়ী একটু ভেবে নিয়ে বল্লেন, তা বটে, কিন্তু ও এ সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। আর যদিই দরকার হয়, তা হলে না হয় আমার ঘরে মনোরমাকে পাঠিয়ে দাও। সে তার ছেলেকে নিয়ে ঐ ঘরে থাক।

ঘটক বল্লেন, ছিঃ। গলা নামিয়ে বল্লেন, নিজেরা নীচে এসে বাইরের লোককে ওপরে পাঠানো, এ কি হয় নাকি?

ভেবেছিলেন, মায়ের ওপোর মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু না, এতেও মাকে নিরস্ত করা গেল না। তিনি বল্লেন, তোমার ত বাইরের ঝি-রাঁধুনী নিয়েই সংসার বাবা। তা ছাড়া আমার কাছে ওপোর আর নীচ কি আছে। তুমি আমার যেখানে থাকবে সেখানেই আমার সব। তুমি থাকবে নীচে পড়ে, আর আমি দোতালায় হাওয়া খাব সে হাওয়া আমার সহ্য হবে না।

না মা, তুমি আর গোলমাল করো না, যেমন আছ তেমনই থাকো। বরঞ্চ আমি না হয় এক একদিন ওপোরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব।

সে কি? তোমার ত সিঁড়ি ভাঙ্গা বারণ, তুমি ওপোরে যাবে কি করে?

ঘটক বুঝলেন, তাঁর এই শেষ কথাটা বলা অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু আর কি বলা যায় তা তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না।

বৃদ্ধা বল্লেন, আজ রাত্তিরটা থাক, কাল দুপুরে বাদলকে বলব, আমার বিছানাটা নীচে নামিয়ে দিতে।

অসহিষ্ণুভাবে ঘটক মাথা নেড়ে বল্লেন, না মা, ও সব বলতে যেও না। বাড়ীতে এতগুলো ঘর থাকতে গোঁজাগুঁজি করে বস্তির লোকের মতো বাস করতে পারবো না।

ও মা, এতে আবার বস্তির লোকের কথা ওঠে কেন? কি যে বলো বাবা কিছুই বুঝি না। তা বেশ, তোমার যদি এতই অসুবিধে হয় তা হলে তোমার মনোরমা তার ছেলে নিয়ে ওপোরে আমার ঘরে থাক, আমি এসে ওর ঘরে থাকি। এতে ত আর তোমার কোন অসুবিধে নেই!

না মা, এ সব হয় না। যা বলি তাই শোনো। যেমন আছ তেমনিই থাকো। কে কোথায় থাকবে এ নিয়ে মাথা ঘামিও না।

আমার কথা শুনবে না? বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ ফুটল।

ঘটকও উষ্ণভাবে বল্লেন, তোমার সব কথাই ত শুনছি, কিন্তু এ সব ব্যাপারে তুমি গোলমাল করছ কেন? দেখ, আমারও বয়স হয়েছে, অশান্তি-টশান্তি আমি আর সহ্য করতে পারি না। ঐ ওরা এসে যে ভাবে আমাকে জ্বালিয়ে গেল, আমার বিশ্বাস সেই জন্যই আমার এই অসুখটা হয়েছে। তুমি আর নতুন কোন অশান্তি কোরো না।

হতাশভাবে ডান হাতটা ঘুরিয়ে বৃদ্ধা বল্লেন, কি জানি বাবা, কিসে তোমার শান্তি আর কিসে অশান্তি কিছুই বুঝি না। মা-ভাই যদি তোমার অশান্তির কারণ হয় তা হলে আর কে তোমার শান্তি দেবে বলো! কে তোমার আছে? বউমা যদি থাকতো—

তুমি ওপোরে যাও। আমি একা থাকতে পেলেই আমার শান্তি।

বৃদ্ধা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘর থেকে বেরুলেন। ঘটক বল্লেন, মনোরমা, মনোরমা—মনোরমা কই?

সে ওপোরে রান্নাঘরে কি যেন করছে। মা উত্তর দিলেন।

নীচের যে ঘরে মনোরমা ছেলে নিয়ে থাকে সেই ঘরের দরজায় খোকা দাঁড়িয়েছিল। ওকে সামনে পেয়েই ঘটক বল্লেন, খোকা, মাকে ধরে ধরে ওপোর নিয়ে যাও ত। দেখো, সাবধান, সিঁড়িতে যেন পড়ে-টড়ে না যান।

না না, আমাকে ধরতে হবে না, মা গুটি গুটি সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। ঘটকের নির্দেশে খোকা মায়ের পেছন পেছন চলতে লাগল।

ওপোরে গিয়ে মা বল্লেন, বোসো খোকা, ঐ চেয়ারটায় বোসো।

মা তাঁর নিজের বিছানায় উঠে বসলেন। মনোরমা সংলগ্ন রান্নাঘরে মায়ের দুধ জ্বাল দিতে দিতে গলা বাড়িয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। খোকা এ ঘরে আসে না বল্লেই হয়, এমন কি খোকা ওপোরেই ওঠে না। সেই খোকা আজ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ওপোরে এলো এবং মা তাকে নিজের ঘরে চেয়ারে বসাচ্ছে, ব্যাপার কি? গলা বাড়িয়ে খোকাকে দেখে আপন মনেই ভাবতে ভাবতে দুধ জ্বাল দিতে লাগল।

বৃদ্ধা খোকার সঙ্গে কথা কইতে স্নুরু করলেন। বল্লেন, ডাক্তারের কাছে কাজ করছ ত?

খোকা বল্ল, হ্যাঁ।

কি কাজ? কি করো সেখানে?

খোকা বল্ল, কথা বলি। তা ছাড়া আরও এটা ওটা গোছগাছ করে দিতে হয়।

কিছুকাল ধরে ডাক্তার ওকে দিয়ে অল্প-অল্প বইপত্র গোছানো, আলমারি সাজানো এই সব কাজ করাচ্ছিলেন। এ সবই ছিল ওর মানসিক চিকিৎসার অঙ্গ।

বৃদ্ধা বল্লেন, কত দেয়?

বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে খোকা কিছুটা বিস্মিত স্বরে বল্ল, দেবে কি?

অনুপমা ও-ঘর থেকেই প্রমাদ গনল। কি একটা অছিলায় এ ঘরে এসে যেন খোকাকে প্রথম দেখল এইভাবে বল্ল, কি রে, দিদিমার সঙ্গে গল্প করছিস্?

গা দুলিয়ে খোকা বল্ল, হ্যাঁ।

গা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশের মুদ্রাদোষটা খোকার এখনও ঠিক কাটে নি।

বৃদ্ধা বল্লেন, হ্যাঁ গা মনোরমা, তোমার ছেলে ডাক্তারের কাছে কাজ করে কিন্তু ডাক্তার কিছু দেয় না? ও বেচারী এমনি এমনি ব্যাগার খাটে?

হ্যাঁ মা, এখন কাজ শিখছে ত; কাজ শিখুক তারপর মাইনে বেরুবে, মিষ্টি করে মনোরমা উত্তর দিল। ছেলেকে বল্ল, দিদিমাকে বাজে বাজে বকাচ্ছিস্ কেন? তুই নীচে যা।

বা রে, আমি আবার বকাচ্ছি কোথা? উনি আমাকে বসতে বল্লেন, তাই ত বসলুম।

হ্যাঁ মা মনোরমা, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে ওপোরে এল তাই একটু ওর সঙ্গে গল্প করছি। বসুক-না, বসুক। সারাদিন একলাটি মুখ বুজে থাকি, তবু দুটো কথা বলতে পাচ্চি ত। তা ছাড়া তোমার ছেলেটি খুবই ভালো, বৃদ্ধা খোকার প্রশংসা করল।

এতদিন এ বাড়ীতে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্কশূন্য অবস্থায় দিন কাটানোর পর আজ বাড়ীর গিন্নীর প্রশংসা স্বকর্ণে শুনে খোকার মনটা আহ্লাদে নেচে উঠেছিল। অল্পদিনের ভুলে-যাওয়া মহাপুরুষভাব আবার যেন অলক্ষ্যে গজিয়ে উঠছে। চেয়ারে বসে বসেই সে আনন্দে গা দোলাতে লাগল।

যাও মা মনোরমা, তুমি তোমার কাজ কর গে, আমি একটু ওর সঙ্গে গল্প করি, বৃদ্ধা মনোরমাকে ঘর থেকে সরিয়ে দিতে চান।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনোরমা চলে গেল কিন্তু তার কান রইল এ ঘরের দিকেই।

খোকা বল্ল, আপনি,—আপনি মনোরমা মনোরমা কাকে বলছেন ?

কেন, তোমার মাকে, বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

ও মা, মায়ের নাম ত অনুপমা, আপনি জানেন না বুঝি ?

তাই নাকি ? মুখে এই দু'টো কথা উচ্চারণ করেই বৃদ্ধার মনে হোল কিছুক্ষণ আগে বিভুও নীচের ঘরে মনোরমার কথায় ঐ নামটাই যেন উচ্চারণ করেছিল। বৃদ্ধা ভাবতে লাগলেন।

রান্না ঘরে মনোরমা প্রমাদ গনল। তাড়াতাড়ি এ ঘরে এসে বল্ল, মা, আপনাকে খেতে দি'।

মা বল্লেন, এখনই ? তা দাও।

তুমি নীচে যাও খোকা, চেয়ার সরিয়ে মায়ের খাবার জায়গা করে দি', মনোরমা খোকাকে বল্ল।

খোকা তখনই উঠল না ; ভাবতে লাগল, দিদিমা হয়ত বসতেই বলবে, কিন্তু বৃদ্ধার পক্ষ থেকে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত উঠে ধীর-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধা আপন মনে খেতে খেতে কি যেন ভাবছিলেন।

আহারাদির পর বৃদ্ধা বল্লেন, মনোরমা, তুমি এখন ওপোরে আমার ঘরেই থাকো না কেন, যেমন আগে থাকতে। তোমার ছেলে ত ভগবানের ইচ্ছেয় সেরে উঠেছে।

মনোরমা ইতস্ততঃ করে বল্ল, তা থাকতে পারি মা, কিন্তু আপনিও ত যা হোক এখন সুস্থ হয়েছেন, আর তা ছাড়া ছেলে আমার বড়ো হয়েছে ঐ দেখতে, আসলে ও রাত্তিরে একা থাকতে চায় না। বলে যে ওর না কি ভয়-ভয় করে।

অ। তা, তা হলে না হয় বাদলকে বলব.ওর কাছে থাকবে, কিম্বা রাঁধুনী, না হয়ত ঐ গাড়োয়ান। লোকের ত অভাব নেই! বিভু আমার বাড়ীর লোককে পছন্দ না করলেও বাইরের লোক এনে বাড়ী ত মেলাইখানা করে রেখেছে।

শেষের কথাগুলোয় বুড়ী যেন কেমন আত্মপ্রসাদ পেয়েছিল।

কাজ চুকিয়ে মনোরমা বল্ল, তা হলে আজ আমি নীচেই থাকি গে কাল থেকে যদি আপনি মনে করেন তা হলে ওপোরেই আসব।

কিছুটা বেজার হয়ে বৃদ্ধা বল্লেন, যা ভাল হয় করো।

রাত্রে কথাগুলো শুনে ঘটক চটে উঠলেন। বল্লেন, মায়ের জন্য ় করি, কিন্তু মা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে শান্তিতে থাকতে বে না।

অনু বল্ল, বুড়ো মানুষ, ক'দিন আর আছেন, রাগারাগি করে কি ব। উনি যদি আমার শাশুড়ীই হতেন—

উনি যার শাশুড়ী ছিলেন সে বেচারী কেঁদে কেঁদে মরে বেঁচেছে। রটা কাল ওঁর ঐ রকমেই গেল। কথা যখন কইবেন তখন কি ংকার মিষ্টি মিষ্টি কথা, কিন্তু যারা ওঁকে নিয়ে ঘর করে তারাই লে-পুড়ে মরে। নিজেও শান্তি পান না, যারা ওঁর ধারে-কাছে থাকে রাও পায় না। মায়ের সম্বন্ধে একটি একটি করে কাটা কাটা মন্তব্য রলেন প্রবীন পুত্র বিভু ঘটক।

কান খাড়া করে অনু বল্ল, সর্ব্বনাশ! মা বোধ হয় খোকাকে কিছেন। কি করি?

মায়ের কণ্ঠস্বর ঘটকও শুনলেন, ফিস্‌ফিস্ করে বল্লেন, বাথরুমে ও, তারপর ওখান থেকে ওদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তোমার ঘরে যও।

কাপড় গুছিয়ে অনুপমা এ্যাটাচ্‌ড্ বাথের দরজা খুলে বাথরুমে চলে গল। ঘটক এ ধার থেকে বাথরুমের দরজায় নিঃশব্দে ছিটকানি লাগিয়ে ান পেতে রইলেন। বাথরুমের ওদিকের দরজা খুলে অনুপমা বেরিয়েই ল্ল, মা আপনি? এত রাত্তিরে? কেমন আছেন? কি হোল?

তুমি—তুমি কোথায় গিসলে? রাগত ভাবে মা প্রশ্ন করলেন, তোমার ঘর খোলা—

আমি কল ঘরে গিয়েছিলুম, উত্তর দিল মনোরমা, সেই জন্যই আমার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম।

বিভু কোথায় ?

তিনি ? তিনি তাঁর ঘরে ঘুমোচ্ছেন, অনু জবাব দিল।

ঠক্ ঠক্ করে হেঁটে ছেলের দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা ঠে
বৃদ্ধা বুঝলেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালে
তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, ঠিক করে বলো ত মনোরমা, তোমার আ
নামটা কি ?

আমার নাম ? অনু সবিস্ময়ে বল্ল, আমার নাম আপ
জানেন না ?

না, জানি না। তুমি মনোরমা, না অনুপমা ? আগে তোম
বাড়ী কোথায় ছিল ? তুমি কি আগে বাগবাজারে থাকতে ? স
কথা আমার পায়ে হাত দিয়ে বলো। তোমায় বলতে হবে।

ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্য জোর-করা হাসি মুখে টেনে এনে অ
বল্ল, কি যে বলেন মা, এই সামান্য কথাটার জন্যে এত রাতে একা-এ
নীচে নেমে এসেছেন ? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে, তোমরাই আমার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছ। যা
হোক, ঠিক করে বলো, আমার বিভুর সঙ্গে তোমার কতদিনের চেনা
তাঁর কাছে যে রাক্ষুসী-ডাইনীটার কথা শুনেছিলুম তুমি সেই কি না
বলো, বলতে হবে। বুড়ীর চোখ-মুখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রাচ্ছে।

চাপা গলায় অনু বল্ল, রাত দুপুরে চেঁচামেচি করছেন কেন
লোকজন উঠে পড়লে কি ভাববে বলুন ত ? দাদার অসুস্থ শরীর
ঘুম ভাঙলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

ওঃ, দরদ উথলে পড়ছে! মায়ের চেয়ে বেদিনী তারে বলে ডাইনী
আমার ছেলের অসুখ বাড়লে আমি বুঝবো, তোমার তাতে কি ? য
বলছি তার জবাব দাও।

গোলমালে খোকা বিছানা থেকে উঠে দরজার সামনে এসে অবা
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খোকাকে দেখেই বৃদ্ধা বল্লেন, এই ত খোকা এসেছে
খোকাই বলুক, তোমার নাম কি ? নাম ভাঁড়িয়ে ভদ্দরলোকের বাড়ী

ুন-বাড়ী ছিনালী করতে এসেছ। কি বোলে তোমার ছোঁয়া ভাতটা মাকে খাওয়ালে? নরক হবে, নরক হবে, অখণ্ড নরকে পচে বে। যা ভাবছি তাই যদি হয় তা হোলে কাল সকালে তোমারই দিন কি আমারই একদিন!

বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চল্লেন। এ ধারে মা ং ছেলে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘটকও নিজের দরজায়, ঘরের ভেতরে। র মনে হোল সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু পৃথিবী স্তব্ধ হয় নি। মাঝখানের হল্ ঘরের গ্র্যাণ্ড-ফাদার কে ডুং-ডাং করে শব্দ হোতে সুরু হোল। রাত বারোটা, শব্দহীন াধপুর পার্কে মধ্যরাত্রি। না, নিঃশব্দ ঠিক নয়। রাস্তায় কুকুর কল। কুকুরের কণ্ঠস্বরে মধ্যরাত্রির আকুতি। একখানা লরীও াধ হয় গেল।

ঠিক সেই সময় হালসী বাগানে ভারতীর ঘরে শুয়ে প্রফেসার জিত বোস বল্ল, এটাই তা হলে পাকা হয়ে রইল গো, তোমাতে ামাতে এক সঙ্গে গিয়ে নোটিসটা দিয়ে আসব। নোটিসের পরে াধ হয় মাসখানেক অপেক্ষা করতে হয়।

পরীক্ষাটা হয়ে যাক না, এত তাড়া কিসের, ম্লানকণ্ঠে ভারতী ত্তর দিল।

নোটিস দিতে আপত্তি কি? এ ত দশ মিনিটের কাজ, অজিত জদ করে।

ভারতী ভাবছে কোনমতে এর হাত থেকে পালাতে পারলে হয়! াময়িকভাবে যা করছে করুক, বিয়েয় রাজী নই। সুব্রতকে ছাড়ব না, মন লোক হয় না।

অজিত ভাবছে, বিয়ের লোভ দেখিয়ে এটাকে পুরোপুরি বেঁধে ফলতে হবে, এ রকম ওস্তাদ মেয়ে আমার হাতে আর একটাও নই।

দরজা খুলে সুব্রত বল্ল, এত রাত্তিরে নীচে থেকে আসছ? বাবা বাবার কি—? কোথায় গিস্‌লে ঠাকুমা?

যমের বাড়ী,—তুই শুগে যা, ঠাকুরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

সুবো ঘরে গেল না। ঠাকুরমার পেছন পেছন ঠাকুরমার ঘর অ গিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে?

হবে আর কি? তোমার মতো উপযুক্ত ছেলে যার ঘরে রয়ে তার বাড়ীতে এসব কি অনাচার! কালই যদি মাগীটাকে বাড়ী থে বার করতে পারিস তবে বুঝি তুই ছেলে—

কে? কাকে বার করব? অবাক হয়ে সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

কাকে আবার? ঐ ছিনাল মাগীটাকে। আমার সেবা করার না নিয়ে আমার উপযুক্ত ছেলে যেটাকে বাড়ীতে এনে ঢুকিয়েছে! মে বৌমা ঠিকই বলেছিল। তার কথা তখন নিই নি, কিন্তু এখ দেখছি—

কেন? কি হোল? সে কোথায়? সুব্রত ঠাকুরমার ঘরে উঁ দিয়ে দেখল সেই ধারটা যে ধারে মনোরমা বিছানা পেতে রাত্রিযাপ করত।

চেয়ারটায় বসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঠাকুরমা বল্লেন, দেখছিস্ কি সে কি আর এখানে থাকে? সেও নীচে নেমেছে আর আমার ঐ উপযুক্ত ছেলে, সেও নীচে গেছে। ছি-ছি-ছি, বলতে ঘেন্না, কইতে ঘেন্না! যারে দিলুম ছি তার রইল কি?

মাথা হেঁট করে সুবো বল্ল, যাঃ, কি সব যা-তা বলছ তুমি! মু তুলে বল্ল, তোমাদের মনগুলো ঠাকুমা বড়ই নোংরা।

নোংরা কি আর সাধে হয়, তোমরা নোংরা করো বলেই নোং হয়। না বাপু, ভদ্দরলোকের বাড়ীতে এ সব কখনও শুনি নি আমাদের তিনিও ত ছিলেন, তোর কাকারাও সব রয়েছে, এ রকম অনাচার ত কোথাও শুনিনি।

সুব্রত বল্ল, মন খারাপ কোরো না ঠাকুমা, শুয়ে ঘুমোও গে—

ঘুম ? ঘুম আমার হয়ে গেছে। প্রাচিত্তির না করে জলটুকুও আর খাব না। ছি-ছি, এতটা বয়স পর্যন্ত কখনও কোনো বাইরের লোকের ছোঁয়া জিনিস আমার দাঁতে কাটি নি, সেই আমি কিনা এই শেষ সময়ে নষ্ট-দুষ্টুর হাতে ভাত গিলে মলুম। ছিঃ। বুড়ী থুথু ফেলার ভান করলেন, ওয়াক্-ওয়াক্ করে বমি তোলার ভঙ্গীও করেছিলেন।

ওকি ? সুবো ধমকের সুরে বল্ল।

কি করব ? পেটের ভাত উঠে আসছে। চিরকাল আচার নিয়মে কাটিয়ে শেষ জীবনে আমার বরাতে এই ছিল ! বৃদ্ধা কপালে করাঘাত করলেন।

ঠাকুরমাকে নাতি চেনে। কথা না বাড়িয়ে সুব্রত সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। নিজের ঘরে শুয়ে ভাবতে লাগল, কথাটা কি সত্যি না কি ? বাবার সম্বন্ধে ঠাকুরমা যা বল্লে তা কি সত্যি ?

দু'দিন পরে প্রফেসার অজিত বোসও বল্লেন, সত্যি নাকি ? এমন ধারা ব্যবস্থা হয়ে গেছে !

গ্র্যাণ্ড হোটেলের ঘরে বসে নেফার মিশনারী ফাদার জোন্স সাহেবের সঙ্গে প্রফেসার বোসের নিভৃত আলাপ চলছিল। ফাদার জোন্স বল্লেন, ঐ সব ফালতু কাজে আর এনার্জি নষ্ট করতে হবে না, টাকার ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে করা হয়েছে। এখন আমাদের স্ট্র্যাটেজী অন্য দিকে ফেরাতে হবে।

কিন্তু ঐ সব নোট যে আসবে সেগুলো জাল বলে ধরা পড়লে ? অজিত প্রশ্ন করল।

এখানে যে-মেসিনে, যে-কাগজ ও যে-কালিতে ছাপা হয় ও দেশেও ঠিক সেই ভাবেই কাজ হচ্ছে। একই নম্বরের দু'খানা নোট হাতে নিয়ে, এমন কি ফরেন্সিক টেস্ট করলেও কোন্‌টা এদেশের আসল আর কোন্‌টা বিদেশের জাল তা ধরা যাবে না। অতএব সে রকম কোন ভয় নেই। যত চাও, সবটাই পাবে। তাই বলছিলুম, বাজে বাজে ডাকাতির ঝুঁকি নিয়ে সময় এবং ম্যান্-পাওয়ার নষ্ট করতে হবে না।

সায় দিয়ে অজিত বল্ল, হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো হয়েছে। না হলে আর একটা কথা কি, যে সব ছেলেরা ঐ ভাবে টাকা আনে তারা অনেক সময় মন ভার করে থাকে।

কেন ?

বলে, এত টাকা আনলুম, আর আমাদের হাত-খরচ এত কম কেন ?

বলে নাকি ? তা হলে বুঝতে হবে তোমাদের ট্রেনিং-এ গলদ আছে। এ সব কাজে ডেডিকেশনটাই সব আগে। সেটা শেখাতে পারলে এ রকম কথা উঠতেই পারে না।

অজিত চেপে গেল।

জোন্স বল্লেন, শোন প্রফেসার, তুমি এবার যতগুলো জায়গায় পারো ফ্যাক্টরি স্টার্ট দেবার চেষ্টা করো। তোমার সেক্টরে আমি আশা করব অন্ততঃ একশোটা সেণ্টার হওয়া উচিত। এক একটা সেণ্টারে চারজন ওয়ার্কার থাকবে। র-মেটিরিয়েলস্ তোমার সেক্টরের তিন জায়গায় পৌঁছবে। এখন তোমাদের কাজের রিপোর্ট যেখানে দিচ্ছ সেইখানেই তোমার রিপোর্ট ও রিকুইজিশন দেবে, সে জায়গা বানচাল হোলে আরও দুটো ঘাঁটীর নাম তোমাকে বলে যাব। তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

অজিত বল্ল, বানচাল সহজে হবে না। অথরিটি থেকে মেন্ পর্যন্ত অনেকেই আমাদের বন্ধু।

জানি, কিন্তু তাদের ওপোর সব সময়ের জন্য নির্ভর করা যায় না। ওপোর থেকে তাড়া এলেই ওরা বদ্‌লে যাবে। আফ্‌টার অল্ চাকরীর মায়া ত, ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করে, পুঁটিমাছের প্রাণ। আদর্শের জন্য খানিকটা করে কিন্তু বাস্তবকে ত অস্বীকার করতে পারে না!

কিন্তু টাকার অভাব যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমরা ওদের কিনে নিতে পারি।

তা হয়ত পারি, কিন্তু ওদের পুরো বিশ্বাস করবে না। পার্টির টাকায় ওদের সাময়িক সাহায্য দিতে পারো কিন্তু স্থায়ী কোন

বন্দোবস্তে যাবে না। সেটা ভালো নয়। যাক, এ সব বাজে কথায় দরকার নেই, তুমি শ'খানেক নিরাপদ জায়গা দেখ তোমার সেক্টরের জন্য, আর শ'চারেক ছেলে যাদের ওপোর নির্ভর করা যায়। আট দশ দিন পরে এখানেই আমার দেখা পাবে, তোমার কলেজে ফোন করে জানাব। টাকাটা রাখো, বলেই একটা প্যাকেট অজিতের হাতে দিয়ে ফাদার জোন্স বল্লেন, পাঁচ হাজার আছে।

প্যাকেটটা পকেটে পুরে অজিত উঠে দাঁড়াল।

জোন্স বল্লেন, চীয়ারো—

অজিতও বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে চল্ল। কেবলই মনে হচ্ছে, একশ' সেণ্টার, চারশ' ছেলে, নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী ছেলে, বিরাট ব্যাপার। দশদিনের মধ্যে যোগাড় ক'রে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ট্রামে বসে মনে মনে আগামী কালের প্রোগ্রাম করতে লাগল অধ্যাপক অজিত বোস।

কাল সকালেই লীডারদের খবর দিতে হবে। ইটিণ্ডা, হাবড়া, নৈহাটী থেকে কলকাতার বেলেঘাটা পর্যন্ত বিরাট এরিয়া অজিতের হাতে। গোটা আষ্টেক টোল্ এবং ট্রাঙ্ক কল্ করতে হবে ভোরবেলা থেকে। মোট লীডার আছে বত্রিশ জন। এক জায়গায় দেখা করা চলবে না। চারটে,—না পাঁচটা জায়গায় পাঁচরকম টাইম দিয়ে ঐ বত্রিশ জনকে মীট্ করব। মাল তৈরীর ব্যাপারে ট্রেনিং দিতে পারে মোট এগার জন, আরও কিছু হয়ত টালিগঞ্জ ও ক্যানিং এরিয়া থেকে ধার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু,—কিন্তু উনি যদি সেই সেক্টরেও এই রকম জোর দিয়ে কাজের চাপ দেন, তা হলে তারা কি আমার কাজে তাদের লোক ছাড়তে পারবে। প্রেসার গেজ আছে আমার মাত্র পাঁচটা। পাঁচটা গেজে একশ' সেণ্টারে কি হবে?

নানারকম ভাবতে ভাবতে অজিত ট্রামে বাসে রাত আটটায় বেলেঘাটায় গিয়ে পৌছল।

ঠিক সেই সময় ভারতীও পৌঁছল যোধপুর পার্কে সুব্রতর বাড়ীর দরজায়। বেচারী আজ নিয়ে পুরো চার দিন সুব্রতর দেখা পায় নি। ভারতীর ক্লাবে যাওয়া অজিত বন্ধ করে দিয়েছে, বলেছে তোমার আর ক্লাবে যাবার দরকার নেই, যখন দরকার হবে তখন আবার যেতে বলব। এই নিষেধ যে কি তা ভারতী ভালভাবেই জানে। অজিতের হুকুমই পার্টির হুকুম। পার্টির হুকুম অমান্য করলে তা-বড় তা-বড় রথীরাই লিকুইডেটেড্ হয়, ভারতী ত কোন্ ছার! তবে যে সে সুব্রতর সঙ্গে গোপনে দেখা করার জন্য সাহস ক'রে এত দূরে এসেছে তার পেছনে ছিল ওর যৌবনের উগ্র উন্মাদনা, ভবিষ্যতের উৎকট আশা, আর ছিল সুব্রত এবং তার বাবার শক্তির ওপোর অজ্ঞাত অথচ প্রচণ্ড আস্থা ও নির্ভরশীলতা। শেষ যেদিন সুবোর সঙ্গে ভারতীর দেখা হয়েছিল সেদিন সুবো বলেছিল, দু'জনেই পার্ট টু পরীক্ষা দিয়ে বিয়ে করে বাইরে যাব। বাইরে থেকে যে কোন রকম ডিগ্রী আনতে না পারলে দেশে উন্নতি করা যায় না। সেদিন ভারতী সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল, পরীক্ষার ফল খুব উঁচু দিকে না হোলে ভারত সরকার বাইরে যাবার অনুমতি দেন না। উপেক্ষার হাসি হেসে সুবো সেদিন বলেছিল, ওসব নিয়ম আমাদের জন্য নয়। বাবার ইচ্ছা হলে বাবা এখনই পাঠাতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত বড় সহরেই বাবার লোক আছে; তারা চাকরী দিয়ে ডেকে পাঠাবে, তা হলে বাইরে যাবার কোন বাধাই আর থাকবে না। তারপর সে দেশে গিয়ে চাকরী করব, কি পড়ব, সে আমার খুশি। পয়সার জন্য ভাবতে হবে না। বাবার বন্ধু নেই সারা পৃথিবীতে এমন দেশই নেই; ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাব হবে না কোথাও।

বাবার ওপোর সুব্রতর অগাধ বিশ্বাস।

ভারতীরও অগাধ বিশ্বাস সুব্রতর ওপোর। মন-মন ওর বাড়ীটা ভারতী একবার দেখে যেতে চায়। সুব্রতর সম্বন্ধে পাড়ায় কোন খবর পেলে আরও ভাল হয়। আর যদি দেখা হয়ে যায় তা হলে ত কথাই নেই।

তাই টেলিফোনের এন্‌কোয়ারী থেকে সুব্রতদের ফোন নম্বর দিয়ে বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ভারতী এ পাড়ায় এসেছে সন্ধ্যা সাতটার পরেই, কিন্তু যোধপুর পার্কে নম্বর নিয়ে বাড়ী খুঁজে পাওয়া যে এত দুরূহ ব্যাপার সেটা ওর ধারণাই ছিল না। তিয়াত্তর নম্বর বাড়ীর পাশেই একশ' একচল্লিশের-একের-বি, আবার তার গায়েই ছেষট্টির-সাতের-এ। এক ঘণ্টা ধরে ভারতীর গলদঘর্ম অবস্থা, শেষে বাড়ীখানা আবিষ্কার করে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে নম্বর মিলিয়ে শ্বেতপাথরের নেম-প্লেটে বি ঘটক নাম দেখে প্রথমে অবাক হোল বাড়ীর বাগান, ফোয়ারা ও চাকচিক্যে, তারপর ইতস্ততঃ করতে লাগল সুব্রতর খোঁজ-খবর করবে কি না এই চিন্তায়। বাড়ীর হাতায় মোটর বাইকটা দেখতে পেলে আশ্বস্ত হোত, কিন্তু তা নেই। কোনো গাড়ী বা কোনো লোক কেউই নেই, তবে গেটে, একতলায় এবং দোতলায় আলো জ্বলছিল।

এখনও বোধ হয় ওরা কেউ ফেরে নি, এটাই ভেবে নিয়ে রাস্তার অপর দিকে পান-বিড়ির দোকানে ভারতী জিজ্ঞাসা করল, এটাই কি সুব্রত ঘটকের বাড়ী ?

হ্যাঁ, কাকে চাই ?

দোকানের সামনে বসে ছিল ফর্সা গেঞ্জী গায়ে এক ছোকরা, সে-ই জবাবটা দিয়ে প্রশ্ন করল, কোথা থেকে আসছেন ?

সাদার্ন এভিনিউ থেকে। উত্তর দিতে গিয়ে ভারতীর গলাটা বুজে এসেছিল। গলাটা ঝেড়ে সাফ্ করে বল্ল, তিনি কি বাড়ীতে আছেন বলতে পারেন ?

না, তিনি এখনও ফেরেন নি, ন'টা নাগাদ ফেরেন, আপনি কি অপেক্ষা করবেন ?

হাতের ঘড়িটা দেখে ভারতী বল্ল, নটা ? এখনও এক ঘণ্টা। না, এতক্ষণ থাকতে পারব না। অন্যদিন আসব।

আপনার নাম বলে যান, তিনি এলে বলব।

ভারতী ওর ব্যবহারে ওর দিকে ভাল ভাবে দেখে বল্ল, আপনার নাম কি, আপনি—

হ্যাঁ, আমি ঐ বাড়ীতেই থাকি। আমার নাম বাদল। আপনার নামটা বলুন, তিনি এলে বলব।

আমার নাম, ভারতী ইতস্ততঃ করে বল্ল, আমি ওঁর সঙ্গে একই কলেজে পড়ি, আমার নাম ভারতী। নাম বল্লেই উনি বুঝতে পারবেন।

আচ্ছা। তা বসবেন না?

না, এমনিতেই আটটা বেজে গেছে, আর থাকতে পারব না।

ভারতী চলে গেল। বাদল পেছন থেকে ভারতীর সুঠাম গতিভঙ্গীর দিকে চেয়ে রইল।

বিড়িওয়ালা বল্ল, তারপর?

তারপর আর কি? বাবু মাকে সাফ্ বলে দিয়েছেন, বাড়ীতে কে কী করছে না করছে সে বিষয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তোমার যা দরকার তুমি বলবে এবং নেবে। অন্যের ব্যাপারে তুমি থাকবে না।

অন্তরঙ্গভাবে রিফিউজী বিড়িওয়ালার সঙ্গে বাদলের সব কথাই হয়। বিড়িওয়ালা বল্ল, সত্যি না কি রে বাদল, ঠাকুরমা যা বলেছে সব সত্যি?

দূর, তা কি হয় না কি? বাবুর অঢেল টাকা, কত ভালো ভালো জায়গায় বাবুর যাতায়াত। একটা ফিরিঙ্গী মেয়ে আছে লটি, তাকে দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে, তার সঙ্গে বাবুর অনেক দিনের বন্দোবস্ত, সে সব ছেড়ে বাবু ঐ বুড়ীটার সঙ্গে লটঘট্ করবে এ কি হয় না কি? ঠাকুরমা ত সে সব জানে না, ঠাকুরমার ভীমরতি হয়েছে।

তুই সেই ফিরিঙ্গীটাকে দেখেছিস্?

দেখেছি বৈকি, তা ছাড়া বৈজুর কাছেও শুনি। সে বাবুর গাড়ীতে কত জায়গায় যাতায়াত করে।

তবে ঠাকুরমা অত রাগারাগি করলে কেন?

ঐ ত কে বলে! বুড়োমানুষের পাগলামি!

দাদাবাবু কি রকম রে? এই মেয়েটার সঙ্গে কি ব্যাপার?

কি জানি? এটাকে এর আগে কোনদিন দেখি নি। তা ছাড়া দাদাবাবুর কোন বেচাল কোন দিনই দেখি নি। ওর খালি মটর বাইক নিয়ে ছুটোছুটি। হাজার হোক বাচ্ছা ত!

কোথায় যায়?

কে জানে? দাদাবাবুর বন্ধু-টন্ধুও বিশেষ কেউ নেই। কাউকে ত আসতে দেখি না।

তোর চারুর খবর কি রে?

যাঃ, তোর খালি এক কথা। যা না, রাত হোল, দোকান বন্ধ করে গৌরীর খোঁজ কর্‌গে যা।

সে গুড়ে বালি রে! আমদানী-পত্তর কিচ্ছু নেই, শুধু হাতে গেলেই ঝাঁটা!

বাদল ও বিড়িওয়ালা দু'জনেই হাসতে লাগল। বিড়িওয়ালা বল্ল, তুই বেড়ে আছিস বাদ্‌লা, তোর কোন ভাবনা চিন্তা নেই, কাল কি খাবি তার হিসেব করতে হয় না, তোর মতন সুখের চাকরী পেলে দোকান বেচে দিয়ে বেঁচে যেতুম।

বাজে কথা বলিস্ নি। আমি তোকে চাকরী দিই নি? তুই কি সে চাকরী করলি?

ওঃ, সে কী চাকরী! বাপ্। সে চাকরী মানুষে করে না।

আর একটা বিড়ি নিয়ে দোকানের ঝোলানো দড়িতে ঠেকিয়ে টান দিয়ে ধরাতে ধরাতেই বাবুর গাড়ী এসে গেটের কাছে হর্ণ দিল।

তাড়াতাড়ি বিড়িটা দেওয়ালে ঘসে নিভিয়ে হাতের মধ্যে নিয়ে বাদল এক লাফে রাস্তা পার হয়ে গেট খুলে সরে দাঁড়াল।

রাত্রে সুব্রত ফেরার পর বাদল বল্ল, আপনাদের সঙ্গে পড়ে ভারতী বলে একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

কি? কি বল্লি? ঘুরে দাঁড়িয়ে সুব্রত প্রশ্ন করল।

আর একবার বলতেই অতি-আগ্রহে সুবো বল্ল, এসেছিল, এসেছিল সে? কখন? কি বল্ল?

চোখ কুঁচকে বাদল বল্ল, তখন আটটা। বল্লুম বসুন, দাদাবাবু ন'টা নাগাদ আসেন।

কি বল্ল সে?

তিনি বল্লেন, না, এক ঘণ্টা বসতে পারব না। তুমি বলে দিও, আমি এসেছিলুম।

গাড়ী নিয়ে এসেছিল?

না ত, পায়ে হেঁটে। গাড়ী-টাড়ী দেখিনি।

ও। আচ্ছা।

নিজের ঘরে যেতে যেতে সুবোর কেবলই মনে হচ্ছিল, কেন এল? এলই যদি তা হলে ফোন করে এলেই পারত। ক'দিন ধরে ক্লাবে গিয়ে গিয়েও পাত্তা পাচ্ছি না। সুদর্শন-দা দু'দিন ধরে খোঁজ করছেন। দু'সপ্তাহ পেছিয়ে পেছিয়ে আগামী পরশু ওদের সেই সাহিত্য-সভার অধিবেশন। কিন্তু কি ব্যাপার, তার কোন পাত্তা নেই, অথচ পায়ে হেঁটে খুঁজে খুঁজে ওর বাড়ীতে এসেছে; কোন বিপদ-টিপদ হয় নি ত!

কিন্তু এর চেয়ে বেশী আর বাদলকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। আর ও কিছু জানেও না। বিশেষঃকিছু বলে গেলে ও-ই বলতো, নিশ্চয়ই বলতো। আহা, যদি ওর ফোন নম্বরটা জানা থাকত!

সারাটা রাত ওর ছটফট করেই কাটল।

সেই রকমই ছটফট করে সে রাতটা কেটেছিল খোকার। মা ত ওর ঘরেই শুয়েছিল, কিন্তু তারপর গেল কোথায়? একটুখানি পরেই ঘুম ভেঙ্গে খোকা দেখে, পাশের বিছানা খালি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে উঠল। বাইরের দালানে এসে এদিক ওদিক দেখল। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে দু'বার ডাকল, মা, মা। কোন সাড়া নেই। চাবির গর্তে চোখ রেখে দেখল বাথরুম অন্ধকার। মামাবাবুর ঘরের দরজায় আঙুলের

চাপ দিয়ে দেখল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘড়িতে ডুং ডাং করে দু'টো বাজল। সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠে সিঁড়ির দরজা টেনে দেখল, ওধার থেকে যথারীতি বন্ধ। কি জানি, মা কি তাহলে ওপোরে দিদিমার ঘরে গিয়ে শুয়েছে! কিন্তু মাথার বালিশ ত নীচেই রয়েছে। কে জানে? বাইরে বেরোবার দরজাতেও চাবি!

খোকার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। দু'দিন ধরে বাড়ীতে খুবই অশান্তি চলছে। কেন জানি না, দিদিমা মায়ের ওপোর ভীষণ চটেছে। মাকে ওপোরে উঠতেই দেয় না। নিজেই রান্না করে। মাকে খুব গালাগাল দেয়। মায়েরও মুখখানা থম্‌থমে, জিগেস করলে কিছুই বলে না। একবার ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, তোর জন্যেই ত আমার বিপদ। কিন্তু আমি ত কিছুই করিনি।

ঘরে এবং দালানে কয়েকবার পায়চারি করে হয়রান হয়ে খোকা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল; শুলো বটে কিন্তু ঘুম নেই। চোখ দু'টো বোজাতেও ইচ্ছে করে না। এর চেয়ে শ্যামপুকুরের সেই বাড়ী অনেক ভালো ছিল, রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাড়ীর ত কথাই নেই। এখানে খাওয়া ভালো, ঘর ভালো, সব ভালো, কিন্তু শান্তি নেই, আমোদ নেই। এখানকার লোকগুলো যেন কি, আর সেই সঙ্গে মা-টাও যেন কী হয়ে গেছে। আগেকার বাড়ীতে মা কখনও ঘর ছেড়ে বেরুত না, আর এখানে? প্রথম প্রথম ওপোরে দিদিমার ঘরে থাকত, আর আজ? পরশু ত এই নিয়ে কি কাণ্ডই হয়ে গেল!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে খোকা শুনল ঘড়িতে তিনটে বাজল, চারটে বাজল, পাঁচটাও বাজল, কিন্তু মায়ের দেখা নেই। শেষে এক সময় মাকে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকতে দেখে খোকা কিছুটা রাগ এবং কিছুটা অভিমান-ভরে চুপ করে পড়ে রইল। মা নিঃশব্দে দরজাটি বন্ধ করে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল। বুঝতেও পারল না যে, তার পেটের সন্তান অতন্দ্র অবস্থায় রাত্রির শেষার্দ্ধ তারই প্রতীক্ষায় ছিল এবং মনে মনে মাতৃদেবীর অকারণ অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ সেই পেটের ছেলেই নিঃশব্দে তলব করছে।

আট

সভ্যজীবনের বিচিত্র জটিল সমস্যাকে ছকের মধ্যে ফেলে কোন্ রসিক লোক কবে দাবা খেলার সৃষ্টি করেছিলেন সে ইতিহাসের ধার না ধারলেও দাবাটা খেলি আমরা অনেকেই। খেলাটার নিয়ম কানুন খুবই সরল অথচ বত্রিশখানা ভিন্ন ক্ষমতার ঘুঁটী, চৌষট্টিটা ঘরের মধ্যে লক্ষ রকম সমস্যার এমন ভাবে সৃষ্টি করে যে, কোন পক্ষ কি ভাবে কিস্তিমাৎ হবে তার কোনই ঠিক থাকে না, আবার কখনও বা দু'পক্ষই নির্বল হলে গোটা খেলাটাই নষ্ট হয়। তুচ্ছ একটা বোড়ে সর্বশক্তিমান রাজার মাৎ হবার কারণ হতে পারে। পাকা খেলোয়াড়ও এমন সব চাল দিয়ে বসেন যা আনাড়ীর চোখেও সহজে ধরা পড়ে। সংসারের সতরঞ্চে ঝানু ব্যবসাদার মিঃ বি ঘটক এবং সুচতুরা নায়িকা শ্রীমতী অনুপমা মুখার্জী, chess-এর ভাষায় কিং এবং কুইন, দাবাড়ুর সংজ্ঞায় রাজা ও মন্ত্রী গোটা কয়েক pawn অর্থাৎ বোড়ের জ্বালায় নাজেহাল।

রুক্ষ গলায় ভোর বেলা খোকা বল্ল, মা, কাল রাত্তিরে তুই কোথায় ছিলি ?

এতদিন পরে আবার সেই পুরাতন তুই-তোকারি। ডাক্তারের চেষ্টায় এই রকম কথাবার্তা কিছুদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অনু চমকে উঠল, কিন্তু মনের ভাব মনে চেপে মুখে বল্ল, ছি খোকা, আবার ঐভাবে কথা কইছ ? ঐভাবে কথা কইতে ডাক্তার-না বারণ করে দিয়েছে।

সামলে নিয়ে খোকা বল্ল, ও হ্যাঁ, তা তুমি কোথায় ছিলে তা বল্লে না ?

কোথায় আবার ? এখানেই ছিলুম।

না ত, আমি সেই রাত দু'টো থেকে জেগে আছি। এই ত একটু আগে তুমি এসে ঘরে ঢুকলে।

ও হ্যাঁ, আমার ঘুম হচ্ছিল না বলে বাইরে ফাঁকায় গিয়ে বসেছিলুম।

কই? আমি ত দেখতে পেলুম না। বাইরে সব জায়গায় খুঁজে এসেছি।

বাগানে ছিলুম। ভেতরে গরম যে।

গরম? এই ঠাণ্ডার মধ্যে গরম! আর বাইরে গেলে কি করে? সব ত চাবি দেওয়া।

খোকার কথায় যে বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে তাতে অনুর খুশি হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আজ সে আসামী, তাই খুশির বদলে বিব্রত হোল। মুখে বল্ল, চাবি খুলে বাইরে গিয়েছিলুম।

তা হলে আবার চাবি দিলে কি করে? আমি দেখলুম ভেতর থেকে চাবি দেওয়া।

খোকা—গম্ভীর কণ্ঠে অনু ধমক দিল, বল্ল, তোমার এত খবরে কি দরকার! আমি মরছি আমার জ্বালায়, এর ওপোর তুমি আর অশান্তি কোরো না; যেমন আছ তেমনি থাকো।

খোকা গুম্ হয়ে গেল, কিন্তু নতুন জেগে-ওঠা মন তার গুম্ হয়ে রইল না, ভাবতেই লাগল।

এ্যাটাচড্ বাথে বাথরুমের কাজ সেরে ঘটক খুশি মনেই এসেছিলেন খাবার ঘরে। একা একা প্রাতরাশ সেরে নিজের অফিস ঘরে যাবার সময় দেখলেন অনুপমা গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরুল।

ঘটক ভাবলেন, কি আর করবে ও। কাজ ত কিছুই নেই। মা ওকে ওপোরে উঠতে দেয় না তাই বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছে। থাক।

অলক্ষ্যে মৃদু হেসে নিজের ঘরে তিনি চলে গেলেন।

চুরুট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে ভাবলেন, এই ভাবে বিনা কাজে ওকে রাখলে চাকর-বাকররা কি ভাববে, ছেলে কি মনে করবে। উঁহুঁ কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। ভয়ানক দৃষ্টিকটু।

আবার ভাবলেন, মরুক গে, চুলোয় যাক গে। আমার বাড়ীতে আমি যা খুশি করব। তাতে কার কি? তিনি আজ বেপরোয়া। যুক্তিবিরোধী প্রবল ইচ্ছা মানুষকে বেপরোয়াই করে।

ডায়রী খুলে আজকের করণীয়গুলোর দিকে চোখ বুলোতে লাগলেন। সেটা কাজের চাপে কিম্বা নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার তাগিদে, ঠিক কি কারণে কে জানে!

বাদল গেল ঠাকুরের কাছে বাজারের ফর্দ নিতে। ঠাকুর ওর দিকে রহস্যভরা চাউনি চেয়ে বল্ল, রাত্রে ঘুমিয়েছিস্ ত?

বাদল ভাবল, ঠাকুর চারি-ঝিয়ের ব্যাপারে ওকে ঠাট্টা করছে। বল্ল, থাম্ তুই। কি কি আনতে হবে বল্।

তা ত বলব, কিন্তু আর একটা মজার কথা আছে, সে ত জানতে পারিস্ নি!

কি রে?

পরে বলব।

না-না, বল্-না শুনি। কি হয়েছে?

হাসতে হাসতে ঠাকুর বল্ল, কাল রাত্তিরে,—হ্যাঁ, আলু যা নিস্ তাই নিবি কিন্তু গ্যাঁদাল পাতা যত দামই হোক নিতে যেন ভুলিস্ নি। চারু বলে গেছে, ঠাকুরমার গ্যাঁদাল পাতা চাই-ই চাই।

ঠাকুরের প্রসঙ্গ বদলানোয় বাদল চকিত হয়ে দেখল, দরজার পাশে মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছে।

বাদল বল্ল, কিছু বলবেন জ্যাঠাইমা? বাজার যাচ্ছি, কিছু চাই আপনার?

ম্লান কণ্ঠে মনোরমা বল্ল, আমার হীটারটা জ্বলছে না বাদল। ওটা দেখার সময় হবে কি?

হবে জ্যাঠাইমা। এখনই দেখছি।

বাদল জ্যাঠাইমার হীটার মেরামত করে দিয়েছিল।

নিজের ভাত ফোটাতে ফোটাতে অনুপমা ভাবছিল, এ ভাবে

এ বাড়ীতে ক'দিন আর থাকা যাবে! যে কাজে এসেছিলুম সে কাজ ত চুকে গেল। এখন শুধুমাত্র নিজের জন্য রান্না করে খেয়ে এ ভাবে থাকলে লোকে কি বলবে?

তারপরই মনে হোল, আমার আর থাকার কি দরকার! যার জিনিস সে নিয়েছে, লাঞ্ছনা অপমান যতদূর হবার তা আমার হয়েই গেছে, এখন শুধু বাকী আছে ছেলের হাতের গলাধাক্কা। সুবো কোনোদিনই আমার সঙ্গে ভাল ভাবে কথা কয় না, এই দু'দিন সে একেবারেই কোন কথা বলে নি। বুড়ী যা করল তাতে আর কোন্ ছেলেই বা ঠিক থাকতে পারে? এ অবস্থায় কি করব? এক কাপড়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই।

বিছানার ওপোর বই খুলে নিজের টুলটিতে বসে ভারতীও ঠিক এই সময় ভাবছিল এক কাপড়ে গা ঢাকা দিয়ে পালানো ছাড়া আর কোন উপায়ই আমার নেই। কাল রাতে অজিতদা এখানেই ছিল। ভাগ্যিস্ বেশী রাত্তিরে এসেছিল, না হলে কোথায় গিয়েছিলুম সেই কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণান্ত হোত। কিন্তু সে যাই হোক, অজিতদা'র দাবী এবার সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। যাদের ভাল ভাবে এখনও চিনি না এমন ধারা আটজনকে পার্টির মধ্যে টেনে আনতে হবে। সুবোকে আর খেলালে চলবে না, সোজাসুজি কাজে নামাতে হবে। এ আমি কি করে করব? ঐ আটজনের সঙ্গে না হয় আজ-কালের মধ্যে আলাপ জমিয়ে নিতে পারি, কিন্তু ঘটককে প্রাণ গেলেও ফাঁসাতে পারব না। আমার হাত দিয়ে ওর জীবন কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না।

চোখের সামনে বইটা খোলা রয়েছে, কিন্তু বইয়ের পড়া নয়, কাল রাতের কথাই ভারতীর একটি একটি করে নিখুঁত ভাবে মনে পড়তে লাগল। ভারতীর হাত ধরে অজিত বলেছিল, 'দিন আগত ঐ'। যারা লীডার তাদের হুকুম এসেছে, কাজে স্পীড বাড়াতে হবে। মুখে মুখে আটটা ছেলের নাম বলে অজিত বলেছিল, তিন দিনের মধ্যে রিক্রুট

করা চাই-ই। ওরা হবে হোল্ টাইম ওয়ার্কার, পার্টির ঘরে বসে কাজ করবে। সে জন্য টাকা তোমার যত দরকার তুমি পাবে, মাল-মশলা অফুরন্ত, কিন্তু সত্যকার বিশ্বাসী কর্মী চাই, ম্যান পাওয়ার।

ভারতী বলেছিল, কি করে বাগাবো ওদের? ওদের ভাল করে চিনিই না—

অজিত বলেছিল, চেনার সুযোগ করে দেব, কিন্তু বাগাতে হবে তোমাকে। হাসতে হাসতে বলেছিল, জেলেনীকে জাল দেব, পুকুর দেব, মাছের চার দেব, কিন্তু মাছ ধরার এলেমটা জেলেনীর নিজস্ব। তা ছাড়া আরও একটা কাজ আমি তোমাকে দিতে চাই। কতকগুলো দামী মাল নিরাপদে রাখার জন্য সুব্রত ঘটকের বাড়ীতে ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা তুমি এ সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই করবে। দিন দশেক পর থেকে সেই কাজ চালু হবে। তখনই ঘটক-বাড়ীতে মাল যাবে, সেই মাল ওখানে নিরাপদে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

ভারতী বলেছিল, ও বাড়ী ত আমাদের সেক্টরে পড়ে না!

অজিত বলেছিল, সে বিচার তোমার নয়। তোমাকে যা বল্লুম তাই করবে।

ক্ষীণকণ্ঠে ভারতী বলেছিল, আমার পরীক্ষার দেরি ত বেশী নেই—

অজিত ফোঁস করে উঠল। বল্ল, লেখাপড়া তুমি ত ছেড়েই দিয়েছিলে। আমরাই তোমার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম। এখন যদি লেখাপড়া আবার ছাড়তেই হয় তা হলে তোমার বলার কি থাকতে পারে? তা ছাড়া জেনে রেখো, কলেজ তোমায় ছাড়তে দেব না এবং আসছে বছর পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছুই হবে না। এর পর পরীক্ষা যা হবে তা আমাদেরই হাতে হবে। তোমার হাতেই তোমার পরীক্ষা তুমি নেবে। সেই দিনই আসছে। সেই দিনটাকেই আনার জন্য তোমাকে, আমাকে, আমাদের সকলকে চেষ্টা করতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে ভারতী বলেছিল, ঘটক-বাড়ী কী মাল রাখতে হবে? সে জন্য কতটা জায়গা চাই? তার জন্য ওদের ঝুঁকি কতটা?

গম্ভীর কণ্ঠে প্রফেসার অজিত বোস বলেছিল, তোমার শিক্ষা দেখছি এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। কী মাল, কতটা ঝুঁকি এ সব প্রশ্নে তোমার কোন অধিকার নেই এটা মনে রেখো। তবে হ্যাঁ, জায়গা কতটা লাগতে পারে সেটা বলতে পারি। ধর, হাফ-এ-ডজন সুটকেসেস্, এর কমও হতে পারে, বেশী নয়। এর ওপোর রেডিওর কিছু সাজসরঞ্জামও থাকবে।

অনেক পরে, অনেক আপাত-মধুর ভালবাসা বিনিময়ের পরে ভারতী যেন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, ওবাড়ীতে ও সব রাখার কি দরকার, এখানে রাখলে হয় না? অত দূরে ওগুলো টানাটানি করে আনা-নেওয়া —

অজিত বলেছিল, এখানেও থাকবে, তবে ওখানে রাখার কারণ, ও বাড়ীতে কেউ কোন সন্দেহ করবে না। বাড়ীতে ছোট ছেলে কেউ নেই যে ওগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামাবে। তা ছাড়া বোঝো ত, মিঃ বি. ঘটকের প্রভাবে ওখানে কোন সার্চও হবে না। বাস্, এর বেশী আর কিছু জানতে চেয়ো না।

কিন্তু এ সবের দায়িত্ব যে কতখানি তা ভারতীর ভাল ভাবেই জানা আছে। কোথা থেকে কোন সূত্রে খবরটা বেরুবে তার ঠিক নেই। একবার ধরা পড়লেই সুব্রতর জীবনটা শেষ, সেই সঙ্গে ভারতীর সমস্ত ভবিষ্যৎও একেবারে মুছে যাবে। সকালে অজিত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতী মনে মনে সংকল্প করল, এ কাজ ভারতী প্রাণ থাকতে কিছুতেই করবে না, অন্য কেউ সুব্রতকে দিয়ে এই কাজ করাতে চাইলেও সে কিছুতেই হ'তে দেবে না, তাতে তার বরাতে যা থাকে তাই হবে এবং এর ব্যবস্থা আজই বিকালে করতে হবে। অজিত বলে গেছে, আজ বিকেলে ক্লাবে যেতে ও সুব্রতর কাছে কথাটা পেড়ে রাখতে এবং যাতে সুব্রত আজ অবশ্যই ক্লাবে যায় সেজন্য আজ সকালেই টেলিফোনে ওকে অনুরোধ করতে। ভারতী অজিতের কথামত টেলিফোনও করবে, ক্লাবেও যাবে, কিন্তু ভাবী বিপদ সম্বন্ধে

সুবোকে যথাসম্ভব সাবধানও সে করবে। এতে ওর নিজের বরাতে যা থাকে তাই হবে। জেনে শুনে সুবোকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলতে সে পারবে না। সুবোকে তার চাই, সুবো না থাকলে ভারতীর কি হবে তা সে ভাবতেও পারে না।

প্রফেসার অজিত বোস নারী-পুরুষের মিলিত একটা এত বড় সংগঠন চালাচ্ছে কিন্তু এক জায়গায় ছিল তার প্রকাণ্ড অজ্ঞতা। সে বোধ হয় জানত না যে নারী জাতি, তা সে মেয়েই হোক কিম্বা মেয়েমানুষই হোক, কোন নারীই তার কল্পনার স্বামী বা সংসারকে কোনো মতেই ক্ষুণ্ন হতে দেয় না, অপর পক্ষে সেই কল্পনার ভাবী স্বামী ও সংসার থেকে আঘাত পেলে সেই নারীই ক্ষিপ্তা বাঘিনীতে রূপান্তরিতা হয়।

সুবোকে নিয়ে ঘর বাঁধার অদম্য আশায় ভারতী আজ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। পার্টি ভারতীকে লিকুইডেট করলেও ভারতীর দুঃখ নেই কিন্তু বাঁচতে যদি হয় তা হলে সুবোকে নিয়েই বাঁচতে হবে; মরতে যদি একান্তই হয় তা হলে সুবোকে শুধু নিরাপদে রেখে নয়, তার ভবিষ্যৎ বিপদের সম্বন্ধে তাকে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল করিয়ে তবে যেন চোখ বুঝতে পারে এই হোল ভারতীর অটুট সংকল্প। আশ্চর্য, আসন্ন মৃত্যু-ভয়ের সূচনায় অবলম্বনহীন বাপ, মা, ভাই, বোনদের কথা ওর মনেই এল না, ও ব্যস্ত হোল সামান্য ক'দিনের পরিচিত সুব্রতর জন্য, যার সহায় সম্বল যে কত বেশী তা ভারতীর ইয়ত্বারও বাইরে। নারীত্বের যৌবনধর্মী এই বেগটা দাবার ছকে বসে অত বড় ধুরন্ধর খেলোয়াড় অজিত বোসের নজরেই পড়ল না।

সকালে স্নান সেরে একখানা বাসী রুটি ও চা খেয়ে ভারতী পড়ার বই নিয়ে বসেছিল।

বইখানা সামনে বিছানার ওপোর যথারীতি খোলাই আছে। বিছানাটাই ওর টেবিল, ও নিজে টুলের ওপোর বসে ভাবতে ভাবতে আকাশ-কুসুমে চলে গেছে। অজিতদাকে কাজ দেখিয়ে ঐ আটটা ছেলেকে ঘায়েল ক'রে কোনো অজুহাতে মোটা কিছু টাকা

আদায় ক'রে সেই টাকাটা মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে ও যদি সুবোকে নিয়ে উধাও হোতে পারে তা হলে সেটাই হবে সব থেকে ভাল, সব চেয়ে সুখের। দেশের অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে এমনই হবে যে কে বাঁচবে কে মরবে তার ঠিক নেই। প্রফেসারের হিসাব মত সারা দেশে ভয়ঙ্কর রকম ওলোট-পালট নাও যদি হয়, তা হলেও ও:দের জীবনে যে নিদারুণ বিপদ নেমে আসবে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। উলুখড়ের মতো ভারতীর প্রাণ দেবার ইচ্ছা নেই। হয়ত সে স্বেচ্ছায় আত্মবলিও দিতে পারত কিন্তু সুবোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর এখন সে রকমের ইচ্ছা ওর আদৌ নেই। আশ্রয়হীন দিগন্তজোড়া বিশাল মরুভূমির মধ্যে বুকফাটা তেষ্টা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অসহায় পথিক আত্মহত্যার সংকল্প নিলেও নিতে পারে, কিন্তু পথিক যদি সামনেই মরূদ্যানের আমন্ত্রণ পায় তা হলে আত্মহত্যার প্রস্তাবটা তার কাছে একেবারেই ফালতু ও হাস্যকর। ভারতীরও হয়েছে তাই। তার মরূদ্যানের মালিক সুব্রত ঘটক এখন তার হাতেরই মধ্যে। সেই সুখের মরূদ্যান সে কিছুতেই ছাড়বে না, ছাড়তে পারবে না। সেই সুন্দর মরুকুঞ্জে অশান্তির আগুন জ্বালার কল্পনাও ভারতীর কাছে ভয়াবহ বিভীষিকা। ভারতীর সঙ্কল্প সে নিজে বাঁচবে এবং যে করেই হোক সুবোকে বাঁচাবে।

কলেজ যাবার আগেই সুব্রত ভারতীর ফোন পেল। গলা শুনেই সাগ্রহে বল্ল, তুমি কাল এসেছিলে ?

ওপার থেকে শব্দ এল, হ্যাঁ। অনেক জরুরী কথা আছে। আজ বিকেলে ক্লাবে দেখা হবে ত ?

হবে, ক'টার সময় আসছ, সুবো প্রশ্ন করল।

সাড়ে পাঁচটা। তুমি ঠিক থেকো কিন্তু।

কি ব্যাপার ? কি বিষয়ের কথা ?

সে সব ফোনে বলব না। তারপর কিছুটা হেসে কিছুটা রহস্য করে ভারতী বল্ল, রামের চাহিদা সীতা পুরণ করতে প্রস্তুত। বাকী শুধু দণ্ডকারণ্যের পর্ণ-কুটীরে যাওয়া।

সেখানে রিফিউজীদের ভিড়। তার চেয়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, ঢের ভাল, সুব্রতর উত্তর।

অথবা লস্ এঞ্জেলস্ কি মেলবোর্ণের যে কোন একটা হোটেল, ভারতী সকৌতুকে জবাব দেয়।

সত্যি? কি ব্যাপার কি গো?

পরে বলব। ধৈর্য্যং কুরু। বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, ক্লাবে।

হ্যালো, হ্যালো। নাঃ, ছেড়ে দিয়েছে।

ক্ষুব্ধ চিত্তে ফোনটা নামিয়ে সুব্রত আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ এ ভাবে সেধে কিসের আভাস দিল সে? কাল রাত্রে মোটর না নিয়েই বাড়ীতে এসেছিল। আজই টেলিফোন। লস্ এঞ্জেলস্ কি মেলবোর্ণ বলার মানে কি? তবে কি আমার সঙ্গে পালাতে চাইছে? বাড়ীতে বোধ হয় জানাজানি হয়েছে। হয়ত আর সহ্য করতে পারছে না।

নানা রকম ভাবতে ভাবতে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে সুব্রত সেণ্ট জেভিয়ার্সের থার্ড ইয়ার ক্লাসের লেকচার শুনতে লাগল কিন্তু সেটা কিসের ক্লাস, প্রফেসার ইংরাজী পড়াচ্ছেন কিম্বা ব্যাঙ্কিং-এর ওপোর লেকচার দিচ্ছেন তা সে বুঝতেই পারল না। মাঝে মাঝেই ঘড়ি দেখেছিল, সাড়ে পাঁচটার দেরি কত?

ক্লাবে ওরা দু'জনেই ঠিক সময়ে গিয়েছিল। সুদর্শন-দা অভিযোগ করলেন, ভারতী এতদিন আসেনি কেন? ওদের সাহিত্য সভা দু' হপ্তা পেছিয়ে দেওয়া হোল ভাল ভাবে জিনিষটা করার জন্য, কিন্তু মেম্বাররা সবাই যদি কামাই করে তাহলে একা সুদর্শন কোন দিক সামলাবে।

ভারতী বল্ল, আপনি আছেন দাদা, আমরা নিশ্চিন্ত।

পাশেই ছিল কাপুর। সুব্রত বল্ল, আমরা সাহিত্যের বুঝি কি দাদা, আপনি আছেন, মিঃ কাপুর আছেন—

কাপুর বল্ল, আমার কাজ আমি কবে করে দিয়েছি। চিঠি

ছাপিয়ে, খাম ছাপিয়ে দাদার হাতে কবে দিয়ে গেছি। এখন দাদা ইজ্‌ অল্‌ ইন অল্‌।

এক সময় ভিড় থেকে টুক্‌ করে সরে এসে ভারতী বল্ল, শোন, কাল প্রধান অতিথি হয়ে ঐ যে এক প্রফেসার আসছেন ওকে চেন ?

প্রফেসার ? কে ? ও, ঐ কি যেন অজিত বোস্‌ ? কোন কলেজের প্রফেসার ? না ইউনিভার্সিটির ?

ভারতী বল্ল, জানি না, তবে ওঁর সম্বন্ধে শুনলুম, উনি নাকি পার্টি-বাজী করেন। ওর পেছনে বোধ হয় পুলিস ঘুরছে। সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে মেলামেশা কোরো না, লোক সুবিধের নয়।

ভারতীর মনে মনে বিশ্বাস ছিল, কাল মিটিং-এর পর অজিত সুবোর সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব জমাবে। অজিতকে ভারতী চেনে।

সুব্রত হতাশ হোল। বল্ল, এই তোমার জরুরী কথা ? এর জন্যই ছট্‌ফট্‌ করছিলে ?

ভারতী বল্ল, হ্যাঁ গো। কেন, এত বড় খবরে তোমার মন ভরল না।

দূর্‌, এ কি একটা খবর না কি ? পার্টিবাজী অনেকেই করে, তাতে আমার কি ? আমার কলেজেই কি পার্টিবাজী নেই ? যারা করে তারা করুক। আমি কিন্তু আমার পার্টির কাছ থেকে আরও অনেক দরকারী খবর শুনব বলে ভেবেছিলুম।

সুব্রত চীনা সিগারেট কেস্‌ থেকে সিগারেট নিয়ে লাইটার জ্বালল।

হেসে গালে টোল পড়িয়ে ভারতী বল্ল, আরও অনেক দরকারী খবর আছে গো, কিন্তু সেজন্য কি তুমি তৈরী ?

নিশ্চয়, বলো, অতিরিক্ত আগ্রহের প্রবল নিশ্বাসে লাইটার গেল নিভে।

হাতে তালি দিয়ে ভারতী হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বল্ল, নাও, নাও, ওটা ধরাও। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে ছেলেদের মগজ খোলে না। মৌজ করে টান দাও, তারপর বলব।

সিগারেটটা হাতের ভেতর রেখে ভারতীর দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুব্রত বল্ল, না, আগে বলো কি বলবে, তারপর সিগারেট ধরাবো।

হঠাৎ ভারতীর মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। বল্ল, কি জানি, হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা।

কেন? কেন? একথা বলছ কেন?

বাবা আমার বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছেন, ঘাড় হেঁট করে ভারতী কথাগুলো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

কবে? অসহায় কণ্ঠে সুব্রত প্রশ্ন করে।

ভারতীকে নীরব দেখে আবার বলে, দিন স্থির হয়ে গেছে?

গেছে। শুনছি আগামী ২রা তারিখে। আর মাত্র ষোল দিন বাকি।

তুমি আপত্তি করো নি?

সে সব অনেক কিছু করেছি। সে জন্যই এ ক'দিন আসতে পারি নি। ঐজন্যই কাল রাত্তিরে তোমার কাছে লুকিয়ে গিয়েছিলুম।

এই মিথ্যাটা ভারতী জেনে শুনে সজ্ঞানে অবলীলাক্রমে বলে গেল।

ফোন করে গেলেই পারতে, সুব্রো উত্তর দিল।

ফোনের ঘরে সব সময় জটলা থাকে। সে যাক্, এখন তুমি কি করবে বলো?

কি করব তুমিই বলো।

ম্লান কণ্ঠে ভারতী বল্ল, আমি আর নতুন কি বলব বলো। আমার ক্ষমতায় যা ছিল সমস্তই করেছি কিন্তু ঠেকাতে পারি নি। সে জন্যই তোমার কাছে কাল রাত্তিরে দৌড়ে গিয়েছিলুম। ফোন গাইড থেকে তোমার ঠিকানা নিয়ে অনেক হাঁটাহাঁটি করে বাড়ীখানা খুঁজে বার করেছি—

সত্যি, কাল তোমার খুব কষ্ট হয়েছে তা বুঝছি। তা-তা এ অবস্থায় কি করা যায় বলো ত? তুমি কোথাও যেতে চাও? মানে ইলোপ-মেণ্ট?

শব্দটা উচ্চারণ করেই সুব্রত কেমন যেন লজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু ভারতীর কথায় কোন প্রতিবাদ নেই। সে বল্ল, আমি জানি না। ভারতী শব্দগুলো একটি একটি করেই উচ্চারণ করল।

আবার তোমার কখন দেখা পাব? সাগ্রহে সুব্রত প্রশ্ন করে।

কাল, এমন সময়, এখানে। কাল এখানকার সাহিত্য সভার জন্য আজ আর কাল এই দু'দিন বাড়ী থেকে ছুটি পেয়েছি।

তা' হলে আমি কি করব সেটা কালই তোমাকে জানাবো। এসো কিন্তু, নিশ্চয়। আর—আর তোমার ঠিকানাটা কি বলো না গো—

কালই বলব, কিন্তু খবর্দার ওখানে যেও না, তা হলে আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না।

তোমার বাবা এমনই কড়া? এই এখনকার দিনেও?

হ্যাঁ, এ রকমটা যে করবেন তা আমি ভাবতেই পারি নি।

কি? আপনারা মিটিং-এ বসবেন না? ওরা সব এসে গেছে, আপনারা চলুন, সুদর্শনদা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওদের ডাক দিলেন।

আজ কিসের মিটিং সুদর্শনদা, ভারতী প্রশ্ন করে।

সে কি? কাল কি-হবে না-হবে, আজ সমস্ত ঠিক করতে হবে না? কে কি পড়বে, কে কি গান গাইবে, আজই সমস্ত ঠিক করে না রাখলে—

সুদর্শনদা হল-ঘরে চলে গেলেন। কাজ-পাগল লোক নিজের কাজেই মেতে আছেন।

ভারতী বল্ল, চলো, এভাবে আড়ালে থাকা আর ভাল দেখায় না। ভারতী এগিয়ে পড়ল।

গম্ভীর চিন্তিত মুখে সুব্রত ভারতীকে অনুসরণ করে।

এ বিষয়ে এর পরে ভারতী আর কোন কথাই বলে নি। সুব্রতও ক্লাবের কোন ব্যাপারে কোন কথা বলে নি, বাড়ী ফিরেও কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে নি। কোন মতে চাট্টি খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে সারাটা রাত দুর্ভাবনায় অতিবাহিত করে সব শেষে স্থির করল, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কোন কথাই সে বলতে পারবে না, কিন্তু আর ত না বল্লেও চলে

না। অনেক চিন্তার পর সুবো ঠিক করল, এই দারুণ দুর্বিপাকে তাকে সাহায্য করার মত একটি মাত্র ব্যক্তিই আছে, সে তার জামাইদা। দিদির বাড়ী সুব্রত কালে-ভদ্রে যায়, যদিও দিদি ওকে খুবই ভালবাসে। জামাইদাও খুব আমুদে লোক, তাদের চিন্তাধারাও খুবই আপ-টু-ডেট্। সেই জামাইবাবুর কথা বাবাও ফেলেন না। ও যখন সাইকেল ছেড়ে মোটর সাইকেল কেনার প্রস্তাব করেছিল তখন ওর বাবা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন হাড়-গোড় ভাঙ্গার এমন সহজ উপায় আর কিছুতেই নেই। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, মোটর বাইক চড়া কোনো মতেই হবে না, শেষে জামাইদা'র অনুরোধে বাবাই টাকা দিয়েছিলেন মোটর বাইক কিনতে। তখন বাজারে একমাত্র রাজদূত গাড়ী ছাড়া অন্য কোন গাড়ীই রেডি স্টক থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। রয়েল এন্‌ফিল্ড কিনতে গেলে এক বছর দেড় বছর অপেক্ষা করতে হোত, সেই জন্য জামাইবাবু নিজে সঙ্গে গিয়ে সুবোকে ঐ রাজদূতই কিনিয়ে দিয়েছিলেন। এ সেই দু'বছর আগেকার কথা, যে বছরে সুবো ভাল ভাবে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস ক'রে বি. কম্. প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়। সারাটি রাত ধরে গভীর চিন্তা করে সুব্রত ঠিক করল কাল সকালেই দিদির বাড়ী গিয়ে দিদি ও জামাইদা'কে সমস্ত বলে ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে ওর একার সাধ্যে কিছুই হবে না। টাকা ত চাই। ওর টাকা কোথায়? অথচ কালই বিকালে ভারতীকে কথা দিতে হবে এবং দশ-বারো দিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা সেরে ফেলতে হবে। ষোল দিন পরেই—না না, আগামী কালকের হিসেবে পনের দিন পরেই ভারতীর সেই বিষম দিনটি, সেই doomsday ধার্য হয়েছে। ভারতী বলেছিল, ওর পার্ট-টু পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও বাবা রাজী নন।

সকালে চা খেয়ে সামনে বাদলকে না পেয়ে হঠাৎ দেখতে পেল মনোরমাকে। যা সে কোন দিনও করে না সেই কাজই সে করে বসল। ডাক্‌লো, জেঠাইমা—

অনু চমকে উঠল। ব্যাপার কি? পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, কি বাবা?

আমি একটু বেরুচ্ছি। বাবা খোঁজ করলে বলবেন, আজ রবিবার কলেজ নেই, ফিরতে আমার দেরি হতে পারে।

কোথায় যাবে? জেঠাইমা ততোধিক মিষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল।

কাজ আছে। বলে দেবেন। এ্যাঁ?

আচ্ছা।

সুবো একলাফে বেরিয়ে গেল। অনুপমা ওর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। সুবো চোখের আড়ালে চলে যাবার পর অজ্ঞাতভাবেই অনুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। আপন মনেই ভাবল, ছেলেটা সত্যিই ভালো। ঐ ঠাকুরমাটা যদি না থাকত তা হলে অনু ওকে স্নেহে ভালবাসায় একেবারে নিজস্ব করে নিতে পারত। যাই বল, ও ত পর নয়, খোকারই ভাই ত! যে রকম ছেলের মাতৃত্বকে আধুনিক কালের জননীরা একান্তভাবে কামনা করে সুব্রত সেই রকমই একটি ছেলে। চেহারায়, স্বাস্থ্যে, লেখাপড়ায়, ব্যবহারে সব দিক দিয়েই উজ্জ্বল। ওর খোকাও বোধ হয় অমনটিই হতে পারত, কিন্তু—যাক, সে আর কি হবে? সবই বরাত!

দিদির বাড়ীর কাছ বরাবর গিয়ে সুবোর মনে কেমন জড়তা এল। নাঃ, জামাইদা'কে এ সব বলা যাবে না। ওরা হাসবে, তামাসা করবে!

মোটর বাইকের মুখটা ঘোরাল। আজে-বাজে মাইল দুই ঘুরে পুনরায় মনস্থির করে কেমন যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে দিদির বাড়ীর হাতায় গাড়ীটা ঢুকিয়ে ফেল্ল। সি. আই. টির বিরাট হাউসিং এস্টেট্। দশখানা চারতলা বাড়ী অনেকটা 'ইউ শেপে' দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যে বড় একটা লন্। সেই লন্-এর মাঝখানে কংক্রীট পোস্টের মাথায় বৃহৎ জলাধার। সেই আধার থেকে সব ফ্ল্যাটে জল যায়। দিদির ফ্ল্যাটের নম্বর হচ্ছে ডি-ফোর। ফ্ল্যাটটা দোতলায়।

বাইক থেকে নেমে গাড়ীতে চাবি দিতে দিতেই দোতলার বারাণ্ডা

থেকে কলকণ্ঠে আমন্ত্রণ এল। দিদির মেয়ে রিনি হৈ হৈ করে চেঁচাচ্ছে, ওমা, ওমা, দেখবে এস, মামা এসেছে! মামা-মামা—

মুখ তুলে সহাস্যে ভাগ্নীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিন লাফে সিঁড়ি ভেঙ্গে সুবো এসে দাঁড়াল ফ্ল্যাটের দরজায়। ততক্ষণে দরজা খুলে দিদি এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। বল্ল, কি রে, কেমন আছিস্‌, বাড়ীর সব ভালো ত?

দিদি একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল। সুবো এ বাড়ীতে বড় একটা আসে না, বিশেষ করে সকালে সে কোন দিনই আসে নি। এলে বিকেলে আসে, তাও ফোন্ করে। আজ সকালেই এসেছে, বিনা ফোনে, ব্যাপার কি? ঠাকুরমার কোন রকম বাড়াবাড়ি হোল না কি?

সুবো বল্ল, ভালো।

ঠাকুরমা?

ভাল আছেন।

সামনের দালানে ইজি চেয়ারে জামাইদা স্টেট্‌স্‌ম্যান নিয়ে ব'সে। তাঁর গায়ে ছিল সিল্কের ড্রেসিং গাউন, আরাম চেয়ারের হাতলের ওপোর নিঃশেষিত কফির পেয়ালা, আঙ্গুলের ফাঁকে ধূমায়মান সিগারেট, ঠিক যেন মূর্তিমান আরাম। সেখান থেকে আন্তরিক আহ্বান এল, এসো, এসো বাবু সাহেব, আজ আমার কি সৌভাগ্য, 'প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু দিন যাবে মোর ভালো'। বোসো।

ইজি চেয়ারের আশে পাশে খান তিনেক গদি আঁটা চেয়ার ছিল। সুবো কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করতেই জামাইদা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বল্লেন, আরে ব্রাদার, ও সব কি আর এখন আছে না কি, ওসব সেকেলে বৃত্তি ছাড়ো। বোসো দেখি মৌজ করে, তোমার সঙ্গে দু'টো প্রাণের কথা বলি।

স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, কই গো, তোমার ভাঁড়ারে কি আছে বার করো। বড় কুটুম্বুর জন্য বড় আদর চাই কিন্তু। গণ্‌শাটা গেল কোথায়?

স্ত্রী বল্লেন, অত হৈ হৈ করছ কেন। বোস্ সুবো, বোস্, গল্পগাছা কর্। আমি আর একবার কফির জল চড়াই। আজ এখানেই খাওয়া দাওয়া করবি ত? কলেজ আছে নাকি?

সুবো বল্ল, আজ আবার কলেজ কি? আজ ত রবিবার।

ও, তা বটে। আচ্ছা তা হলে বোস্, আমি একটু কাজ সেরে আসি।

আর আমরা দুই অকেজো, অভাগা একজন বিশেষ কেজো লোকের প্রতীক্ষায় হা-পিত্তেশ করে থাকি? কেমন? এটাই কি রাণী এলিজাবেথের সুবিচারে সাব্যস্ত হোল? জামাইদা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বল্লেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে দেখে দিদি পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

নাও ভাই, হেল্প্ ইওরসেল্ফ্। ক্যাপস্ট্যান সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাইটা ভগ্নীপতি সুবোর দিকে এগিয়ে দিল। মাস চারেক আগে সুবো যখন এ বাড়ীতে শেষ এসেছিল তখন এই জামাইদা'ই সুবোর আঙ্গুলে হলদে দাগ দেখে, ছোট হওয়া সত্বেও সামনে স্মোক করিয়ে তবে ছেড়ে ছিলেন। এই অপকার্যে দিদির ক্ষীণ অভিযোগ সেদিন টেঁকে নি।

সুবোর কুণ্ঠা কিন্তু এখনো পুরো কাটে নি। প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশ্ন করল, কেমন আছেন?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জামাইদা বল্লেন, আছি? এখনও পর্যন্ত ভালই আছি। আরে ব্রাদার, ভাল থাকতেই ত চাই, কিন্তু তোমরা যে ক'দিন ভাল থাকতে দেবে সেটাই ত বুঝছি না। দিনকাল যা হচ্ছে?

কেন? নতুন কি হোল আবার? সুব্রত প্রশ্ন করে।

নতুন? নতুন কিছু নয়, সবই পুরনো, তবে পরশু আমার ভাগ্যে নতুনই হয়েছে। অফিস থেকে বাড়ী ফিরেছি রাত্রি তিনটেয়। সেজন্য শরীরটা কাল থেকেই খারাপ লাগছে।

কেন ? কেন ? এত দেরি হোল কেন ? সুব্রত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

ঘেরাও, সংক্ষেপে উত্তর দিলেন জামাইবাবু।

তাই না কি ? কই কাগজে—

না, খবরটা কাগজে দেওয়া হয় নি। ও দিয়েই বা কি হবে। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত মিটমাটই হয়ে গেল।

কি হোল ?

লেবারদের সব দাবীই মেনে নিতে হোল।

কি দাবী ছিল ওদের ?

দাবী ছিল অনেক। মানে এক কথায় বলতে গেলে সেই সব দাবী পূরণ করে এখানকার ইউনিট চলবে বলে ত মনে হয় না।

তা হলে দাবী মেনে নিলেন কেন ?

উপায় কি ? ঐ দিন ছুপুরে বম্বে থেকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে আমি, আমাদের পারসোনেল সেক্রেটারী, চীফ্ এ্যাকউন্টান্ট এবং জোন্যাল ডাইরেক্টর আমরা পাঁচ জনে বেলা তিনটার সময় আমারই ঘরে কন্‌ফারেন্সে বসেছিলুম, আর সেই সময়েই, মানে সাড়ে তিনটেও তখন বাজে নি, এমন সময় হঠাৎ সমস্ত লেবার কাজ বন্ধ করে আমাদের ঘেরাও করে চিৎকার, হৈ হল্লা সুরু করল। ওদের ইউনিয়ন সেক্রেটারী পরেশ সাঁতরা এসে লম্বা এক দাবীপত্র পেশ করে জানালো, এখনই এর মীমাংসা করতে হবে। আমরা অনেক বিবেচনা করে দেখলুম সেই সব দাবী মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু উপায় কি ? আমাদের সলিসিটরকে ফোন করা হোল। তারা বল্ল, বর্ত্তমানে গভর্নমেণ্টের যা পলিসি তাতে তারা মালিকপক্ষকে এই সব ব্যাপারে পুলিশ হেল্প দেবে বলে মনে হয় না। সন্ধ্যের পর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ওদের ছাব্বিশ দফা দাবীর উনিশ দফা মেনে নিলেন। তাতেও ওরা শুনল না। ছাব্বিশ দফা পুরো মানতে হবে, না হলে ঘেরাও চলবে। রীতিমত নার্ভ শ্যাটারিং ব্যাপার। রাত্রি দেড়টার

পর নিরুপায় অবস্থায় ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে, আমাকে এবং আমাদের জেনারাল ডাইরেক্টরকে সই করে ওদের ছাব্বিশ দফাই মানতে হোল। এর পর ওরা নানা রকম শ্লোগান দিতে দিতে চলে গেল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলে গেলেন ঝাঁপ বন্ধ করার জন্য তৈরী থাকতে। তাই ভাবছি, এখানকার ইউনিট যদি বন্ধই হয় তা হলে আর কি করব, আমাকে সেই বম্বেতেই যেতে হবে। চাকরি ছাড়লে এ রকম চাকরি আর কে দেবে বল? ওঃ, দিনকাল যে কি হোল!

সদাপ্রফুল্ল তাপস চট্টোপাধ্যায় ভেতরে ভেতরে মুষড়ে পড়েছেন।

কফি, স্যাণ্ডুইচ্, কলা ও সন্দেশ নিয়ে দিদি এসে ঘরে ঢুকলেন। সুব্রত অনুযোগ করল, এ কি? এত সব কি আনলে দিদি? এই সাত-সকালে—

না হে সাতটা নয়, আটটা বাজে। আট-সকালে বলতে পার, জামাইদা টিপ্পনী কাটলেন।

রিনিকে দেখছি না দিদি, সেই বারাণ্ডায় একবার দেখলুম—

সে পড়ার ঘরে। তুমি আসার পেছন পেছনই ওর মাস্টার মশাই এলেন যে, দিদি উত্তর দিল। নাও ভাই, খেয়ে নাও।

তা হলেই বোঝো, এতক্ষণ মামাবাবু ভাগ্নীর খোঁজ করেন নি, এখন এই খাবারগুলোর একটা অংশ রিনি-বেচারীর মুখে ঢোকাবার জন্য ভাগ্নীর খোঁজ পড়ছে। ওঃ, মানুষ কি স্বার্থপরই না হয়, তাপস চাটুজ্জে থেমে থেমে মন্তব্য করলেন। শেষে এক কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, নাও ব্রাদার, কি আর হবে। সমূহ বিপদে কি আর কারুর সাহায্য মেলে। একা একাই খেয়ে নাও, উপায় কি!

মহাশয়ের সাহায্য লাভও ত করতে পারি। রিনির না হয় মাস্টার এসেছে, রিনির বাবার ত মাস্টার আসে নি, সুব্রত জামাইদার বাচন ভঙ্গী অনুকরণ করল।

সখেদে জামাইদা বল্লেন, না হে, তুমি জানো না। রিনির অবস্থা অনেক ভাল। তার মাস্টারের খবরদারী সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা

পর্যন্ত, কিন্তু তার বাবার ওপোর তোমার বাবা যে হোল্‌-টাইম গার্জেন টিউটর নিযুক্ত করে দিয়েছেন—

তুমি থাম্‌বে, না কি? দিদি ধম্‌কে উঠল।

দেখছ, দেখছ ত? এবার বোঝো। আমাদের সংবিধানের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট যে বাক-স্বাধীনতা, তোমার দিদি আমাকে তাও দেবেন না। আমি ভাবছি, আমাদের শোষিত পুরুষদের নিয়ে মিছিল করে রাজ্যপালের কাছে যেতে হবে নারীজাতির অত্যাচার বন্ধের দাবীতে। বলব কি জানো, বল্‌ব, দিতে হবে, দিতে হবে, বাক্‌-স্বাধীনতা দিতে হবে—

হ্যাঁ গো কথার ভট্‌চায্যি মশাই, ক'টা বাজল সে দিকে হুঁস্‌ আছে, শেষে নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকবে না, দিদি স্বামীকে তাড়া লাগালেন।

ক'টা হে? সচকিত ভাবে তাপসবাবু শ্যালককে প্রশ্ন করলেন।

আটটা পাঁচ। সুবো হাতের ঘড়ি দেখে বল্ল, আজ ত রবিবার জামাইদা।

না ভাই, রবিবার হোলেও একবার যেতে হবে। তুমি ভাই খেতে খেতে তোমার দিদি-ঠাকরুণের সঙ্গে গল্প কর। আমি উঠি। আটটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে আমাকে বেরুতেই হবে।

তাপসবাবু চটি জোড়া পায়ে গলাতে গলাতে ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পাশের চেয়ারে বসে দিদি বল্লেন, নে নে, খেয়ে নে, কফিটা জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।

জামাইদা'র সামনে কাজের কথা পাড়াই গেল না এই ভেবে মনঃক্ষুণ্ণ সুব্রত স্যাণ্ডউইচে কামড় দিয়ে ভাবল, দিদির কাছেই কথাটা পাড়া যাক। দেরি করলে চলবে না। স্নান সেরে জামাইদা যখন খেতে বসবেন তখন যাতে ব্যাপারটার একটা কিনারা করা যায়।

ধীর কণ্ঠে সুবো বল্ল, দিদি, একটা ব্যাপারে কি করা যায় তাই ভাবছি।

কি? কি ব্যাপার?

মানে জিনিসটা এখনও কেউ জানে না। তুমিই প্রথম শুনবে,— ছোট ভাই বড় বোনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তা বল্, তবে ত শুনব। কি রে? চুপ করে রইলি যে—

মানে—

সুবো থেমে গেল।

হাসিমুখে দিদি বল্ল, আগে কথাটাই বল তারপর তার মানে বলিস্।

বোধ হয় যেন তাপসবাবুর প্রভাবে এ বাড়ীর কথাবার্তাগুলো সবই এক ধাঁচের। আট বছর ঘর করে গম্ভীর বাড়ীর মেয়ে সুভদ্রা ওরফে ভদ্রাও কথাবার্তায় খানিকটা সরস হয়েছে।

সুবো খেতেই লাগল। কফিতেও চুমুক দিল।

কি হয়েছে রে? বাবা কিছু বলেছেন? দিদির চোখে মুখে বেশ কিছু উৎকণ্ঠা।

না না, বাবা কিছু বলে নি। বাবা জানেও না। সুবো তাড়াতাড়ি উত্তর দিল।

তবে কি ঠাকুরমা? ভাইকে প্রবোধ দিয়ে ভগ্নী বলে, ঠাকুরমা মাঝে মাঝেই বেফাঁস রকম বলেন, ওতে কিছু মনে করিস নি।

না দিদি, ঠাকুরমাও কিছু বলে নি। মানে বলাবলির সময় এখনও আসে নি।

তবে কি? যা বলবি বল্ না, ও রকম হেঁয়ালি করছিস্ কেন? দিদি এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে যে কালই বোধ হয় এমন কোন সমস্যা হয়েছে যে জন্য আজ এই সকাল বেলা ছোট ভাই তার কাছে দৌড়ে এসেছে; না হলে এ রকম সকালে সে কোন দিনও আসে না।

সুবোও প্রাণপণে চেষ্টা করছে কথাটা বলার জন্য। আজ বিকেলের মধ্যেই ওকে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, কিন্তু কোথা দিয়ে কি ভাবে কথাটা পাড়া যায় সেটাই সে ঠিক করতে পারছিল না।

গরম কফি আধ পেয়ালার ওপোর খেয়ে নিয়ে কফি কাপের দিকে দৃষ্টি রেখেই সুবো বল্ল, দিদি, একটি মেয়ে আমাদেরই সঙ্গে পড়ে, খুব ভালো মেয়ে, তার সঙ্গে তুমি আলাপ করলে তোমারও খুব ভালো লাগবে—

সুবো থেমে গেল।

দিদি অবাক হয়ে ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল। ভাইকে থামতে দেখে বল্ল, তা তাতে হয়েছে কি ?

মেয়েটির বিয়ে, মানে তার বাবা, বিরাট বড়লোক তারা, তারা সেই মেয়েটির বিয়ে ঠিক করেছে। আসছে মাসের দোসরা তারিখে তার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, কিন্তু—

সুবো থেমে গেল। তার কপালে ঘাম।

কিন্তু কি রে ? কি ব্যাপার বল্ ত ?

মানে, কি বলব বুঝতে পারছি না, সে ঐ বিয়েয় রাজী নয় দিদি।

তা তোর কি ? তার বাবা বিয়ে দেবে, সে রাজী নয়, তার ভেতর তুই কি করবি ?

মানে, আমিও রাজী নই।

তুইও রাজী নোস্। তোর রাজী-অরাজীতে কি আসে যায়। তারা ত আর আমাদের কেউ নয়। কে সে ? তারা কি তোর কেউ হয় ?

আঃ, তুমি বুঝতে পারছ না, সুব্রতর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে উঠল।

দিদি বল্ল, কি তুই বলতে চাস, খুলে বল্ ত। তুই কি সেই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাস্, না কি ?

নিরুত্তরে সুব্রত দিদির মুখের দিকে চোখ তুলে চাইল। ওর চাউনিটাই দিদির প্রশ্নের উত্তর।

তাই বল্, নাটক নভেল করছিস। তা বেশ ত, তাদের জাত-টাত কি, তাদের ঠিকানা কি, সেগুলো বল্, আমি বাবাকে বোলে ব্যবস্থা করি। এর জন্যে এত 'কিন্তু' কিসের। তোর বিয়ের জন্যে বাবাকে

সেদিনেও ত বলে এসেছি। মা নেই, ঠাকুরমা অথব্ব, ঝি-চাকর নিয়ে তোদের বাড়ীটা ত হোটেল বাড়ী হয়ে আছে। ও বাড়ীতে যেতেই ইচ্ছে করে না। তবু একটা বউ এলে—

কার বউ আস্‌বে গো? আমার না কি? তাপস বাবু দালানে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে সুরু করলেন।

তুই বোস্ ভাই, ওঁর খাবার ব্যবস্থা করেই আমি আস্‌ছি।

দিদি দৌড়ে চলে গেল। জামাইদা বল্লেন, এইখানেই দাও গো, শালাবাবুকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাব। দেখো ভাই, যেন নজর-টজর দিও না।

ওর নজর ঐ সব ছোট দিকে আর নেই, অনেক বড় দিকে গেছে, কথাগুলো বলতে বলতেই ভদ্রা ও-পাশের রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

মাথা আঁচড়ানো শেষ করে তাপস বাবু বসলেন টিপয়ের সামনের চেয়ারটায়। বল্লেন, ব্যাপার কি হে সুব্রত, যেন একটু কি-রকম কি-রকম গন্ধ এসে নাকে লাগছে।

কি গন্ধ জামাইদা?

তোমার দিদির অমৃতময়ী বাণীতে কেমন যেন প্রজাপতি-বাহিত পারিজাতের গন্ধ বেরুচ্ছে।

সাজানো ট্রে এবং লাল কম্বলের বোরখামোড়া কফির কেটলী এনে ভদ্রা টিপয়ের ওপোর রাখল, বল্ল, সুখবর শুনেছ?

হাতের ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে তাপস বাবু বল্লেন, বোধ হয় যেন শুনেছি; কার যেন বউ আসছে। তা কার গো? কার বৌ? আমার নাকি?

ওঃ, আদরে আর ধরে না! পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বল্ল, তোমার বউ ত এসেই গেছে, সামনে দাঁড়িয়ে। আসবে তোমার শালার বৌ, বুঝেছ চ্যাটার্জী সা'ব। সেই বিষয়ে খাটা-খাটনি করতে হবে।

শিওর। সুন্দরী শালাজের দর্শন পাব, খাটব না! কি বলছ! আপিস থেকে ক'দিন ছুটি নেব বলো ত? বিয়েটা কবে?

আসছে মাসের দোস্‌রা। তাই না রে?

আঃ দিদি, তুমি যেন কি! আমি কি তাই বলেছি—

এই ত বল্লি, আসছে মাসের দোস্‌রা—

সে ত ওরা ঠিক করেছে—

ডিমের পোচটা গলাধঃকরণ ক'রে তাপস বাবু বল্লেন, আজকাল বুঝি মেয়ের বিয়ে হয় এক দিনে, ছেলের বিয়ে অন্য দিনে? কি জানি, আমাদের সেকালে ত একই তারিখে মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোত। তাই না গো?

রাগ দেখিয়ে সুবো বল্ল, না, আমি চলে যাচ্ছি। দিদিকে বলে আমি অন্যায় করেছি।

সুবো উঠে দাঁড়াল। জামাইদা বল্লেন, আহা হা, চট্‌ছ কেন ভাই বড় কুটুম, বোসো, এসব ব্যাপারে কি চটাচটি করতে আছে? কোথায় বিয়ে, কি রকম মেয়ে, সব কথা বলো, তারপর যদি সুযোগ সুবিধে হয় তখন চটাচটি কোরো। প্রথমেই রেগে উঠলে কি বুঝব বলো?

দিদি বল্ল, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি। আমার ভাই ত তোমার মত বেহায়া নয় যে, নিজের বিয়ের কথা নিজেই হড়্‌হড়্‌ করে বলবে। শোনো,—একটি মেয়ে ওদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে। সেই মেয়েটির বাবা আসছে মাসের দোস্‌রা তারিখে তার বিয়ের দিন স্থির করেছে। তারা বিরাট বড়লোক। বিয়ের সম্বন্ধও নিশ্চয়ই উপযুক্ত ঘরে হয়েছে। কিন্তু এই বিয়েয় মেয়ের মত নেই। মেয়ে চায় ওকে বিয়ে করতে, ও-ও চায় তাকে, কেমন তাই না রে—

সুবো ঘাড় হেঁট করে রইল। তাপস বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। কাপ থেকে কফি চল্‌কে কিছুটা পড়ল মেঝেয়, কিছু তার পরনের লুঙ্গিতে। হাত দিয়ে লুঙ্গির কফিটা ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বল্লেন, রীতিমত রোমান্স যে হে! গুড্‌ গুড্‌,* উই আর রেডি, ব্রাদার পৃথ্বীরাজ। না না, ইওর এক্সেলেন্সি পৃথ্বীরাজ, উই আর রেডি ফর সংযুক্তাহরণ।

তুমি থামো ত, লুঙ্গিটা নষ্ট করলে! চাপা গলায় দিদি ভর্ৎসনা করে।

ড্যাম্ ইওর লুঙ্গি, বৃহৎ কার্যে এ রকম অনেক কিছুই হবে। তুমি মনে রেখো, হিজ্ এক্সেলেন্সি পৃথ্বীরাজ দি গ্রেট্-এর সঙ্গে আমাদের পাইক বরকন্দাজ হয়ে যেতে হবে। আমরা সব নায়িকা হরণের সুইসাইড স্কোয়াড্।

চেঁচামেচির চোটে রিনি এসে দালানের দরজায় দাঁড়িয়ে বল্ল, কি হয়েছে মা?

মা মেয়ের দিকে চেয়ে বল্লে, কিছু না, ও সব গল্পগাছা হচ্চে। তুমি পড়গে যাও, পরে শুনো।

রিনি কিছুটা ক্ষুণ্ণ মনে পড়ার ঘরে চলে গেল।

ছিঃ, কি চেঁচামেচি করছ বলো ত? মাস্টার মশাই কি ভাববেন, চাপা গলায় ভদ্রা স্বামীকে ধমক দিল।

স্ত্রীর ভর্ৎসনায় স্বামী কিছুমাত্র আমল না দিয়ে নিজের খেয়ালেই বল্লেন, শৃণু দেবি সুভদ্রে, সুভদ্রা-হরণে যার অভিজ্ঞতা আছে সে সংযুক্তা-হরণে অবশ্যই সাহায্য করবে। এতে হরণ কার্য নিশ্চয়ই সুশৃঙ্খলায় সমাধা হবে। হবে না?

হ্যাঁ হবে! কৃত্রিম ক্রোধে ভদ্রা বল্ল, একটা কাজের ব্যাপারে পরামর্শ করার জো নেই। শুধু কেবল হাঁকাহাঁকি, আর হৈ হল্লা! সাধে কি আর আপিসে ঘেরাও করে—

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তাপস বাবু উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, আচ্ছা ভাই, আমি উঠি। আটটা পঁচিশ হয়ে গেল। তুমি কিন্তু পালাবে না। আমি আজ খুব সকাল সকাল, এই ধরো দেড়টা দু'টোর মধ্যেই ফিরব, তারও আগে ফিরতে পারি।

তা হলে আজ বাড়ীতে খাবে না কেন? স্ত্রী প্রশ্ন করল।

স্বামী বল্লেন, সেটা ঠিক বলতে পারছি না; দশটা নাগাত ফোনে জানিয়ে দেব, কারণ আমাদের কন্‌ফারেন্স বোধ হয়

লাঞ্চ টেবিলেই হবে। জোন্যাল ডিরেক্টার কি বন্দোবস্ত করেছে জানি না।

নিখুঁত সাহেব সেজে মোটরের চাবিটা আঙ্গুলে ঘোরাতে ঘোরাতে চ্যাটার্জী সাহেব দালানে এসেই বল্লেন, বায়্ বায়্।

একটা স্যুটকেস নিয়ে গণেশ ওঁর পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে মোটরে তুলে দিতে গেল।

গাড়ীতে স্টার্ট দেবার শব্দটা দালান থেকেই পাওয়া গেল। বাইরের বারাণ্ডা থেকে রিনি তার বাবাকে টা-টা জানাল সেটাও দালান থেকে শোনা গেল। সুবো বল্ল, দিদি, রিনির মাস্টার রবিবারেও পড়ায়?

দিদি বল্লে, হ্যাঁ ভাই। ভদ্রলোক মেলা ছেলে-মেয়ে পড়ান। আমাদের এখানে সপ্তাহে তিন দিন পড়াতেন। উনি পীড়াপীড়ি করায় এখন চারদিন পড়াচ্ছেন এবং রবিবারে না হোলে ওঁর আর সময় হয় না। অন্য দিন পড়ান সাড়ে সাতটা থেকে নটা, আজ সাড়ে নটা, দশটা পর্যন্ত পড়াবেন। পড়ান খুব ভালো, সেজন্য উনি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রবিবারের পড়ানোয় রাজী হলেন। ভাল মাস্টার পাওয়া যে কি দুরূহ ব্যাপার তা ত জানো?

সুবোকে নীরব দেখে দিদি বল্ল, হ্যাঁরে বাড়ীতে বলে এসেছিস ত যে এখানে সারাদিন থাকবি?

না দিদি, সারাদিন থাকব বলি নি, বলেছি দেরিতে ফিরব।

তা হোলে ফোনে বলে দি। না হলে আজ রবিবার বাবা বাড়ীতে থাকবেন আর ভাববেন। ঠাকুরমাও ব্যস্ত হবে।

কিন্তু দিদি, আজ বিকেলে আমার একটা মিটিং আছে।

ঠিক আছে। এখান থেকেই যাবি। দাঁড়া, ফোনটা করে দিয়ে আসি।

দিদি তার শোবার ঘরে প্রবেশ করে।

সুবো আশা নিরাশায় দুলতে লাগল। তার কেবলই মনে হোতে

লাগল কাজের কাজ কিছুই হোল না। খালি হাসা-হাসি আর হৈ-হল্লা। আজ বিকালে সে ভারতীকে কি বলবে তার ঠিক নেই!

তবে একটা বিষয় সুবো মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে। ব্যাঙ্কে তার নিজস্ব কিছু টাকা আছে। বেশী নয় আটশোর মতন। সেই যখন ওর পৈতে হয়েছিল তখনই ওর বাবা ওর নামে ঐ পাস-বইটা করে দিয়েছিলেন। এর পর দরকার হলে ওর রাজদূত গাড়ী এবং দামী ক্যামেরাটা বিক্রি করলে তাও কোন্-না হাজার দুই-তিন টাকা হবে। এই নিয়ে ওরা এখন স্বচ্ছন্দে পালাতে পারবে। তারপর বাবা ওর জন্যে নিশ্চয়ই কাগজে ছাপাবেন, যেখানে থাকো, খবর পাঠাও ইত্যাদি। ও যাই কিছু করুক-না কেন, বাবা ওকে ফেল্‌বেন না। মা যাওয়ার পর থেকে বাবা ওকে প্রাণ ভরে ভালবাসেন, কখনও কিচ্ছুটি বলেন না, ভারতীকে নিয়ে পালালেও বাবা ওকে ভেসে যেতে দেবেন না। ঠাকুরমা যদি নেহাতই বিগড়ে যায়, তা হলে বাবা ওদের ফরেনে পাঠিয়ে দেবেন। তা ছাড়া ভারতীর বাবাই কি আর মেয়েকে ফেলে দেবেন! একমাত্র মেয়েকে কি আর কেউ ভাসিয়ে দেয়! এর ওপোর ভারতীর দাদুও যা আছে শুনেছি—কিন্তু ও সবের বোধ হয় কোন দরকারই হবে না। জামাইদা যদি হাত লাগান তা হলে সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে। ভারতীর বাবা অরাজী হলেও শেষ পর্যন্ত রাজী তাকে হোতেই হবে। সুবো ত আর ফ্যালনা নয়। আশা ও নিরাশার মধ্যে আশাটাই সুবোর মনে বেশী করে জাগতে লাগল!

দিদি এসে সুবোর সামনে বসল। বল্ল, মেয়েটা কি রকম রে? তোদের ফটো আছে?

সুবো বল্ল, না দিদি, ফটো তোলাতে সে মোটেই রাজী হয় নি।

দিদি প্রসন্না হল। বল্ল, তোদের সঙ্গে সে এক সঙ্গে পড়ে?

সুবো বল্ল, এক সঙ্গে নয়, অন্য কলেজে। আমি সেণ্ট জেভিয়ারে, সে গোয়েঙ্কায়।

গোয়েঙ্কা কলেজ? ও, আমাদের শীলাও ত গোয়েঙ্কায় পড়ে। কোন্ ইয়ারে?

থার্ড ইয়ার। গেল বারে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় পাস করেছে।

তা হলে শীলার সঙ্গে একই সঙ্গে পড়ে বল্। শীলাও গোয়েঙ্কায় পড়ে; এই ত এবার বি. কম পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় পাস করল সে, মানে তোর সঙ্গে রে।

ও, তাই নাকি! তা কে শীলা? কোথায় থাকে? প্রশ্ন করে সুব্রত।

থাকে ঐ এগার নম্বর ফ্ল্যাটে। ওর বাবা এয়ার ইণ্ডিয়ার একজন অফিসার। শীলা আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই আসে, আমাকে মাসিমা মাসিমা করে। ওকে ডাকব?

দ্বিধা ভরে সুব্রত বল্ল, নাঃ, আর ডাকা ডাকিতে দরকার নেই। কি হবে তার ঠিক নেই, এখনই এত জানাজানিতে কি দরকার?

একটু ভেবে নিয়ে দিদি বল্ল, হ্যাঁরে সুবো, ও আমাদের পাল্টি ঘর ত? ওর পুরো নাম কি?

ঘাড় হেঁট করে মৃদুকণ্ঠে সুব্রত বল্ল, ঠিক পাল্‌টি বোধ হয় নয়।

সেকি রে, ওর নাম কি? পুরো নাম? দিদির গলায় আর্তনাদের আভাস!

ভারতী সেন, মৃদুকণ্ঠে সুব্রত জবাব দেয়।

বলিস্ কিরে? দিদি আঁৎকে উঠল। সেন? সেন কি? সেন ত বদ্যি হয়, কায়স্থও হয়, আবার শুনেছি নাকি সোনার বেনেদেরও সেন উপাধি থাকে।

বোধ হয় বদ্যিই হবে, সুব্রতর চেষ্টা ভারতীকে বামুনের কাছাকাছি টেনে তোলা।

বোধ হয় মানে? সেটাও খবর নিস্ নি। না বাপু, এ বিয়ের ঘটকালি করলে ঠাকুরমা আমায় ছিঁড়ে খাবে। একেই ত আমার বিয়ের সময় কি কাণ্ড হল?

তোমার বিয়ের সময় কাণ্ড আবার কি হোল?

মানে, এঁরা ত নৈকষ্য কুলীন নয়, তোরা নৈকষ্য কুলীন। বাবা যখন এখানে কথাবার্তা পাকা করেন তখন মা কিছুই বলেন নি, কিন্তু ঠাকুরমা ভীষণ রাগারাগি করেছিলেন। ভঙ্গতে মেয়ে দিলে কুল থাকে না, এই সব নিয়ে ঠাকুরমা আর বড় কাকা অনেক আপত্তি তুলেছিল। সেই ঠাকুরমার চোখের সামনে তারই নাতি অ-ঘরে বিয়ে করবে, এ বাপু হবে না। এ মৎলব তুমি ছাড়ো।

সুবো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ওর দিকে চাইতে চাইতে দিদির মনটা করুণায় ভরে উঠল। কিছু পরে দিদি বল্ল, ওর বয়স কত রে?

তা ত জানি না।

দিদির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। কিছুই জানিস না অথচ কথা দিয়ে বসে আছিস্? ও বোধ হয় তোর বয়সীই হবে, কিম্বা বড়ো হোতেও পারে।

কি রকম? কি করে বুঝলে?

কেন, এ ত সহজ হিসেব। তোর সঙ্গে য্‌খন পড়ে তখন তোরই বয়সী হবে। তা ছাড়া তুই হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করেছিস পনের বছর বয়সে। তোর মোটর বাইকের লাইসেন্স করার সময় বয়স বাড়াতে হয়েছিল মনে নেই?

সুব্রত ঘাড় নাড়ল অর্থাৎ হ্যাঁ, তার মনে আছে। নেহাৎ চেহারাটা লম্বা চওড়া বলে রাইডিং লাইসেন্সের ব্যাপারে সে উৎরে গিয়েছিল। দিদি বল্ল, হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট দেখলেই মেয়েটার বয়সটা পেয়ে যাবি। দেখেছিস্ সেই সার্টিফিকেট?

না।

একটু থেমে দিদি ফতোয়া দিল, না বাপু, এ আমি কোনো দিক থেকেই ভাল বুঝছি না। এ মৎলব তুমি ছাড়ো।

সুবো গুম হয়ে গেল। তার এ কথাও মনে হল যে দিদি যদি জামাইদা'কে এই ভাবে বলে তা হলে জামাইদা অত হাসি খুসি করলেও শেষ পর্যন্ত বিগড়ে যাবে।

দিদি ডাকল, গণেশ, গণেশ।

গণেশ রান্নাঘরে কি যেন করছিল। বেরিয়ে এসে বল্ল, কি দিদিমনি।

ওরে, একবার শীলাকে ডাক ত। বল্ যে আমি ডাকছি।

সুবো বাধা দিতেই দিদি বল্লেন, শুনি-না কি বলে ও। ওর কাছে কোনো কথা ভাঙ্গব না।

গনেশ চলে গেল এবং কিছু পরেই শীলা এসে হাজির, আমায় ডেকেছেন মাসি-মা?

হ্যাঁ। তোকে একটা কথা জিগেস করব। আমাদের একটি চেনা ছেলের সঙ্গে তোদের ক্লাসের ভারতী সেন নামে কে একটা মেয়ে আছে তার বিয়ের কথা হচ্চে, তাই বলছি, ভারতী কি রকম মেয়ে রে? তুই তাকে নিশ্চয়ই চিনিস্।

শীলা ইঙ্গিতে সুবোর দিকে দেখাতেই সুভদ্রা বল্ল, ওকে চিনিস না? ও আমার ছোট ভাই রে, আপন ভাই, ওই ত সুব্রত, যে সেণ্ট জেভিয়ারে থার্ড ইয়ার বি. কম্ পড়ে।

শীলা দু'হাত জোড় করে সুবোকে নমস্কার করল। সুবোও প্রতি-নমস্কার করে বল্ল, বসুন।

বোস্ বোস্, সুভদ্রাও শীলাকে এতক্ষণে বসতে বল্ল।

শীলা বসল, বল্ল, কি নাম বল্লেন মাসিমা, ভারতী সেন?

হ্যাঁ।

ভাবতে ভাবতে শীলা বল্ল, ভারতী সেন নামে কোন মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে না, একজন আছে ভারতী ভট্চায্যি সে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ত, সেণ্ট-আপ্ হয়েছে, এবার পার্ট-ওয়ান দেবে।

ভট্চায্যি নয়, সেন, থার্ড ইয়ার, ভেবে দেখুন, অতিরিক্ত উৎসাহে সুবোই বলে ফেলল।

সুবোর দিকে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে শীলা বল্ল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন আছে বটে, বুঝতে পেরেছি, সেও ভারতী, সেনই বোধ হয়

হবে। সে এক বছর আগে পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল। সে ছিল আমাদের এক বছরের সিনিয়ার, এ বছর আবার থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়ে 'ই' সেক্সানে পড়ছে। সে বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না। আমরাও তাকে ভারতীদি' বলে ডাকি। আমাদের চেয়ে বড়ো ত!

দিদি বল্ল, কি রকম মেয়ে রে? পড়াশোনায় কেমন?

মন্দ নয়, খারাপ কিছু শুনি নি।

তা হলে পড়া ছেড়েছিল কেন? দিদি প্রশ্ন করে।

ঠিক জানি না মাসীমা, তবে যতটা শুনেছিলাম, ওদের খুব অভাব; অনেকগুলো মেয়ে পড়িয়ে বহু কষ্টে কলেজের মাইনে দিত, দামী বই একখানাও কিনতে পারত না, সে জন্যই পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পর থার্ড ইয়ারে ভর্তি হতে আর পারে নি। তারপর এক বছরে হয়তো খেটে খুটে কিছু জমিয়ে আবার এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে; তা সত্বেও পড়ার বই অনেকেরই কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করে। অবশ্য ফেরতও ঠিক ঠিক দেয়! ভারতীদি'র পড়ায় খুব যত্ন আছে তবে বড্ড গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কারুর সঙ্গে মেলা-মেশা করে না।

চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে সুবো বল্ল, আর কোন ভারতী সেন নেই? আমরা যার খোঁজ নিচ্ছি তার বাড়ীতে গাড়ী আছে। সে বাড়ীর মোটরে কলেজে যাওয়া আসা করে, হাল্কা সবুজ রংএর ফিয়াট গাড়ী, নিজস্ব ড্রাইভার—

গাড়ী? শীলা ভাবতে ভাবতে বল্ল, আমাদের ওখানে যত মেয়ে পড়ে তার মধ্যে তিন জন গাড়ীতে যাতায়াত করে। একজন হচ্ছে মোহিনী জয়শোয়াল, আর একজন লীনা বাকৃচি, আর তৃতীয় হচ্চে সায়েন্স কলেজের প্রফেসার চক্রবর্তীর মেয়ে সুস্মিতা চক্রবর্তী।

তুইও ত গাড়ীতে যাস, মাসীমা বল্ল।

হ্যাঁ, আমি যাই বটে, তবে রোজ ত আর হয় না। যেদিন সাড়ে দশটায় ক্লাস থাকে সেদিন বাবা আমাকে কলেজের দরজায় নামিয়ে

দিয়ে চলে যান। আসার সময় রোজই আমি বাসে আসি। এ ভাবে আরও দু'তিন জন যায়। কিন্তু ভারতী যে খুবই গরীব ঘরের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুবো নীরব। ভদ্রা বল্ল, ঠিক আছে, এটাই জানার জন্য তোকে ডেকেছিলুম।

শীলা বল্ল, যাই মাসীমা। রিনি কি করছে, কোথায় সে?

তার মাস্টার তাকে পড়াচ্ছে।

ও হ্যাঁ, রোববারেও সে পড়ে বটে! তা হলে উঠি মাসীমা।

এসো।

কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে পাকাতে পাকাতে শীলা দালান থেকে বেরিয়ে গেল। শীলার পাতানো মাসী ভাইকে বল্ল, দেখলি ত, কোথা থেকে কি সব আজে-বাজে মেয়ের সঙ্গে ভাব করিস্ তার ঠিক নেই, তা ছাড়া গরীব বড়লোক যাই হোক, সে মেয়ে তোর চেয়ে নির্ঘাত বয়সে বড়। আরও খোঁজ করলে হয় ত দেখা যাবে সে এক জন রিফিউজী, কোনো বাড়ীতে রান্না ক'রে মেয়ে পড়িয়ে কোন রকমে নিজের পড়াশোনা চালাচ্ছে; অন্য রকম দোষও থাকতে পারে।

ম্লান হেসে সুবো বল্ল, হতেই পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হচ্ছে। তার গাড়ী, ড্রাইভার সবই আমি দেখেছি। তা ছাড়া রিফিউজী সে হতেই পারে না, কথাবার্তা পুরো এদেশীয়, পূর্ববঙ্গের কোন টানই তার নেই।

তোর সঙ্গে এত আলাপ হোল কোথায়? দিদি প্রশ্ন করে।

আলাপ হোল আমাদের ক্লাবে। অবজ্ঞার হাসি হেসে সুবো বল্ল, ক্লাবের মাসিক চাঁদাই হোল পঁচিশ টাকা, তা ছাড়া আরও অনেক খরচ হয়। মাসিক পঞ্চাশ ষাট টাকা সে ক্লাবে খরচ করে। রোজই তার নিজের ফিয়াট গাড়ীতে সে যাতায়াত করে। শীলা যার কথা বলে গেল সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও ভারতী সেন।

ঠিক আছে, তার ঠিকানা কি? মানে থাকে কোথায়?

ক্ষীণকণ্ঠে সুবো বল্ল, থাকে সাদার্ণ এভিনিউ-এ, কিন্তু ঠিকানাটা জানি না।

বাড়ী দেখেছিস্? বাড়ীতে গিয়েছিলি?

না।

কেন?

ওর বাবা বড় কড়া লোক। ও আমায় বাড়ীতে নিয়ে যেতে সাহস পায় নি।

তোর কাছে আসে ও?

না। একদিন যে এসেছিল সেটা সুবো চেপে গেল।

তা হলে ঐ ক্লাব ছাড়া অন্য কোথাও তোদের মধ্যে দেখাশোনা কথাবার্তা হয় না।

হয়। ও মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে।

ফোন করে? ওর ফোন নম্বর বল্। আমি এখনই ডেকে খবর নিচ্ছি।

ওর নম্বর আমি জানি না।

সে কি রে? ডাকিস্ কি করে?

আমি ডাকি না, ও ডাকে।

দিদি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্ল, ও যে বাড়ীর ফোন থেকেই ডাকে তার প্রমাণ কি? পাবলিক ফোন থেকেও ডাকতে পারে ত?

বিরক্ত হয়ে সুবো বল্ল, আঃ দিদি, তুমি বুঝছ না। বাড়ীতে ওর ফোন ঠিকই আছে, কিন্তু নম্বর কাউকে দিতে চায় না, তার কারণ আমি ডাকলে ওর বাবা যদি ফোন ধরেন তাহলে ওকে জবাবদিহি করবেন ত। সেই জন্যই ও ফোন নম্বর দিতে চায় না।

দিদি আপন মনেই চিন্তা করতে লাগল। ক্ষুণ্নকণ্ঠে সুবো বল্ল, তোমরা যে কেবলই সন্দেহ করছ, এই সন্দেহের কোন কারণই নেই। শীলা যার কথা বলে গেল, এ সেই মেয়ে হতেই পারে না। ওর গাড়ী,

ওর সাজ পোষাক, ওর চালচলন সমস্তই আমি দেখেছি। তুমি দেখতে চাও?

চাই। কবে দেখাবি বল?

আজই দেখাব।

কি রকম? তোর সঙ্গে এন্‌গেজমেন্ট আছে বুঝি?

না দিদি না, এন্‌গেজমেন্ট করার মত সস্তা খেলো মেয়ে সে নয়। ঐ যে-ক্লাবে ওর সঙ্গে দেখা হয় বল্লুম, সেই ক্লাবে আজ বিকালে সাহিত্য সভা। সেখানে ও আসবে। আজ হয়ত ওর বাড়ীর লোকও আসতে পারে। তোমরা আমার সঙ্গে গেলেই ওকে দেখতে পাবে।

বেশ যাব। তোর জামাইদা আসুক, তাকে সঙ্গে নিয়েই যাব। সাহিত্যসভা কটায়?

সাড়ে পাঁচটায়।

রিনি এসে হৈ হৈ ক'রে ঘরে ঢুকে মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কোথায় যাবে মা সাড়ে পাঁচটায়? আমি যাব।

হ্যাঁ হ্যাঁ যাবি। তোকে ফেলে রেখে কোথাও যাই আমি? মা মেয়ের চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

দশটার আগেই ফোন এল। তাপস বাবু আজ বাড়ীতেই খাবেন, ওদের মিটিং হবে হাই টি দিয়ে, কাজেই লাঞ্চ খাবেন বাড়ীতে।

দিদি এসে হাসিমুখে বল্ল, ওরে সুবো, তোর জামাইদা বড় কুটুম্বুর সঙ্গে এক সঙ্গে লাঞ্চ খাবার লোভে বারোটা নাগাদ বাড়ী ফিরবে রে।

ফ্রিজ থেকে দু'দিনের বাসি মাংস বার করে এ্যারিস্টোক্রাটদের রান্না চাপল প্রেসার কুকারে।

সাড়ে বারোটায় বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। গনেশ গ্যারেজের চাবি নিয়ে ছুটল, পেছন পেছন রিনিও লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ওপোরে এসেই তাপস বাবু বল্লেন, কি গো, নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন সব সারা হয়ে গেল?

ভদ্রা বল্ল, কি যে বলো তুমি তার ঠিক নেই!

কেন? তোমার বন্ধু জরদ্গবীকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলুম যে। নিশ্চয়ই তাকে সুসংবাদটা দেওয়া হয়ে গেছে।

কই, সে ত আসে নি, দিদি জামাইদা'কে উত্তর দিল।

সুবো জিজ্ঞাসা করে, জরদ্গবীটা কে দিদি?

নেকটাই-এর বাঁধন খুলতে খুলতে জামাইদা বল্লেন, আরে তুমি তোমার দিদির বান্ধবীদের জানো না? ওঁরা যে এখানে পেন্টাগন ক'রে বসে আছেন—

তুমি থামো ত! সব সময় সকলের সাম্‌নে—মেয়ে রয়েছে না?

আমি জানি, আমি জানি, রিনি নেচে উঠল, বলব বাবা, বলব?

বলো। তোমার মামাকে শুনিয়ে দাও, বাবা মেয়েকে প্রশ্রয় দিলেন।

রিনি! ধমকে উঠল মা। অসভ্যতা করো না। ঘরে যাও।

রিনি পালিয়ে গেল।

টাই খুলে জামার বোতাম খুলতে খুলতে জামাইদা বল্লেন, তোমার দিদির এখানে এক গণ্ডা বন্ধু জুটেছে। ঐ এক গণ্ডা আর তোমার দিদি এদের পাঁচ জনকে আমি পঞ্চ কন্যা বলে 'কন্যা' শব্দের অপব্যবহার না করে পঞ্চ বৃদ্ধাই বলি। সেই শ্লোকটা কি গো?

জানি না, ঝাঁজ দেখিয়ে ভদ্রা রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

জামাইদা'র নতুন কোন ছড়া শুনবার লোভে সুবো বল্ল, কি শ্লোক জামাইদা।

শুনবে? সার্টটা খুলে জামাইদা বল্লেন, জোড় হাত করো, দেবীস্তোত্র করযোড়ে শুনতে হয়।

স্তোত্রটা কি তাই বলুন, হাসিমুখে সুবো অনুরোধ করে।

হ্যাঁ বলছি।

এ্যাটেনসানের পোজে দাঁড়িয়ে জামাইদা বল্লেন,

কাকেশ্বরী, কৌয়া বিবি,
মেনী বিল্লি, জরদ্গবী,

জগভদ্রার চারটি বোন,
পঞ্চ বৃদ্ধা পেন্টাগন।

এর মানে? সুবো প্রশ্ন করল।

অস্যার্থ? অস্যার্থ অতি প্রাঞ্জল। চারটি ফ্ল্যাটে চারটি গিন্নী আছেন। একজনের নাম কাকেশ্বরী, তিনি প্রত্যহ কাকদের ভাত-রুটি খাইয়ে পুণ্যার্জন করেন। দ্বিতীয়া কাক-কণ্ঠে সর্বদাই ঝি-চাকর, ছেলেমেয়েদের ধম্‌কাধম্‌কি করেন, সে জন্য তাঁর নাম কোয়া বিবি, তৃতীয়া বেড়ালের মতো মৎস্যভক্ত, তাঁদের বাজার করা না হলেই তোমার দিদির কাছে মাছ চাইতে আসেন, অতএব তাঁকে বলা হয় বেড়াল এবং তিনি যেহেতু মহিলা সে জন্য তাঁর নাম মেনী বিল্লি, আর চতুর্থা স্থূলাঙ্গী, হাঁটা চলায় কিঞ্চিৎ মন্থরা, কাজেই তিনি জরদ্গব, স্ত্রীয়ামীপ্‌ করে তিনি হলেন জরদ্গবী। এর ওপর তোমার ভগ্নী জগন্নাথের সুভদ্রা, অতএব তিনি হলেন শ্রীমতী জগভদ্রা। এখন বুঝ্‌লে ত, পঞ্চবৃদ্ধা কি ভাবে সি. আই. টি-র এই হাউসিং এস্টেটে পেন্টাগন তৈরী করে বসেছেন। এই পেন্টাগনের একটা অলিখিত গেজেট আছে। দুনিয়ার যাবতীয় সংবাদ, দুঃসংবাদ, বিসম্বাদ, অসংবাদ সমস্তই সেই ওর‍্যাল গেজেটে মুখে মুখে প্রচারিত, পল্লবিত ও প্রকাশিত হয়। সেই গেজেটের সংবাদ সমীক্ষায় একই ব্যক্তি শীর্ষস্থানে শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হইয়া হয়ত পরক্ষণেই নিকৃষ্টরূপে গণ্য হইয়া ধুল্যবলুণ্ঠিত হন। পেন্টাগনের এবম্প্রকার অমোঘ শক্তি—

তোমার ফাজলামো শেষ হোল? বেলা একটা বাজতে চল্ল সে হুঁস আছে? ভদ্রা দেবী রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই ধমক দিল।

যথা আজ্ঞা দেবী। নেকটাই ও সার্ট জামা হাতে নিয়ে তাপস বাবু শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন।

নিজের ভবিষ্যৎ সংসারে সুবো নিজেকে জামাইদা'র স্থানে ও ভারতীকে দিদির ভূমিকায় বসাতে গিয়ে ঠিক করল ভারতী নিশ্চয়ই দিদির মতো বেরসিক হবে না। জামাইদা চমৎকার লোক। অত বড়

একটা অফিসের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও কি রকম সরস ছেলেমাম্লুষি করেন। কথাগুলো যে কি রকম করে বলেন কে জানে? আগে থেকে মনে মনে ঐ রকম ভেবে রাখেন, না কি? স্লুবো কিন্তু চেষ্টা করেও এমনটি পারে না।

একসঙ্গে চার জনে খাবার টেবিলে বসে ভদ্রা কথাটা পাড়ল। বল্ল, চল, আজ ওদের সাহিত্যসভায় গিয়ে কনে দেখে আসি।

তাপস বাবু বল্লেন, যথা আজ্ঞা, কিন্তু—

আবার কিন্তু কি?

আমরা ত ক্লাবের মেম্বার নই, যদি আমাদের ঢুকতে না দেয়।

সে ভার আমার জামাইদা, তা ছাড়া আমি আপনাদের নেমন্তন্ন করছি। আমার কাছে পাঁচখানা কার্ড আছে, স্লুবো অভয় দেয়।

পাঁচ-খা-না? এত কার্ড কার কার জন্য এল?

ক্লাবের স্লুদর্শনদা প্রত্যেককে পাঁচখানা করে কার্ড দিয়েছেন। আজই আমাদের প্রথম সাহিত্য সভা বসছে। তিনি বলেছেন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে যেতে, যাতে প্রথম সভাটা বেশ জমজমাট হয়।

তা হ'লে আমাদের ফি দেবে ত? তোমাদের সভায় আমরা ত আর বিনা পয়সায় সভাস্লুন্দর হয়ে বসতে পারি না।

হ্যাঁ, ফি দেবে। এক চাপ কা পাবেন।

হাসতে হাসতে তাপস বাবু বল্লেন, ঠিক আছে ব্রাদার। মাগ্‌গি গণ্ডার বাজার, যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

ভদ্রা বল্ল, ভাইটি তোমার খুব ভক্ত হয়েছে দেখছি।

কি রকম?

তোমার ঐ 'এক চাপ কা' কথাটা মুখস্থ করে ফেলেছে।

সময় বুঝে ও রকম ভক্ত সবাই হয় গো! যে ঘটক তোমার সম্বন্ধ নিয়ে বাবার কাছে এসেছিল আমিও মনে মনে তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পর—

আঃ—ভদ্রা স্বামীকে থামিয়ে দিল।

সুবোর পকেটে পাঁচখানা কার্ডই অক্ষত অবস্থায় বর্তমান ছিল। খেয়ে উঠে হাত ধুয়েই সুবো দু'খানা কার্ডে দিদি ও জামাইদা'র নাম লিখে তাদের হাতে দিয়ে দিল।

রিনি বল্ল, আমার? বা রে, আমি বুঝি বিনা কার্ডে যাব?

নিশ্চয় নিশ্চয়, তুমিও কার্ড পাবে। সুবো তার নামেও একটা কার্ড লিখল।

জামাইদা বল্লেন, ভাই, এবার আমায় কিঞ্চিৎ ছুটি দিতে হবে। হপ্তান্তিক দিবানিদ্রাটা আমার রুটীনের অপরিহার্য অঙ্গ।

দিদি বল্ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ঘুমিয়ে নাও।

আর সেই অবসরে তুমি বিয়ের ফর্দ-টর্দগুলো লিখে ফেলো, পরে ত আর সময় পাবে না, তাপস বাবু উপদেশ দেন।

রিনির কানে বিয়ে শব্দটা এই বোধ হয় প্রথম গেল। সে বল্ল, কার বিয়ে বাবা?

বাবা বল্লেন, মামাকে জিজ্ঞেস কর।

কার বিয়ে মামা?

তোর বিয়ে, মামা উত্তর দিল।

যাঃ, কি অসভ্য! দেখছ মা, মামা কি অসভ্য হয়েছে দেখছো!

ঘণ্টা তিনেক পরে ভারতীও মনে মনে বলে, কি অসভ্য! একটা জানোয়ার কোথাকার! কিন্তু এ লোকটা কে? হাতের লেখা থেকে কিচ্ছু ধরা যাচ্ছে না। ছিঃ, কি রুচি!

ভারতী কাগজটাকে হাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে ফেল্ল—

কিন্তু তবুও চিঠিটা ফেলতে পারল না। ক্লাবের পেছনে বেঞ্চির ওপোর নিরিবিলিতে বসে চিঠিখানা আর একবার পড়ল। কে এক অপরিচিত ব্যক্তি ওকে এক খামে-মোড়া চিঠি পাঠিয়েছে ক্লাবের ঠিকানায়। চিঠিখানা জি.পি ও. থেকে ডাকে ফেলা হয়েছে। লিখেছে একটা পদ্য। ওপোরে সামান্য একটু গদ্য। সেখানে লিখেছে,

'তোমাদের সাহিত্য সভায় অনেকেই আজ স্বরচিত কবিতা পড়বেন। অনিবার্য কারণে আমি উপস্থিত হতে পারলুম না। আমার এই অনবদ্য কবিতা তুমি আমার জবানিতে পাঠ কোরো, তা হলেই আমার দূরস্থ আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে।

'দূরস্থ আত্মা', এর মানে কি? ভাবতে ভাবতে ভারতী আর একবার লেখাটা পড়ল। লেখাটা নিম্নরূপ:—

মণ্টুকে—

মনের ভেতর টু দিয়ে যায় এম্‌নি সে মেয়ে ঝণ্টু
ডাক নাম তার মণ্টু,—
গজহস্তিনী বিশাল বিরাট অতিশয় দেহভার
অতি-ভার তাই ভারতী নামের সার্থকতাই তার।
মণ্টু ভারতী শুধু দুটি নাম, 'ওগো' বলিবার কেউ
জোটেনি এখনও, যদিও পিছনে লেগেছে পার্টির ফেউ।
তাদের মধ্যে কেউ নাবালক,
বৃদ্ধেরা চেয়ে থাকে অপলক,
দূর হোতে এই কবি পলাতক,
পাঠায় তাহার বাণী—
ভুলায়ে ফাঁসায়ে এখন কি মোরে
ভুলেছ মণ্টুরাণী?

ঢাক্ ঢাক্ আর গুড়্ গুড়্ ক'রে হয় না ত লেখাপড়া
তাই কি তোমার পরীক্ষাগৃহে চোখ হয় ছানাবড়া।
হায় ভগবান, এ কোন বিধান,
জন্ম মৃত্যু তব অবদান
বিনা ঝঞ্ঝাটে এ দু'টি প্রধান
জিনিসকে যায় পাওয়া;
কিন্তু দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী
পরীক্ষা সব রুদ্রমূর্ত্তি

পরীক্ষকেরা কাঁচাখেকো ভূত
নির্দয়, নির্মায়া,—
পাস করিবার আশা ছেড়ে তাই পার্টিতে করেছ ধাওয়া ?
যেখানেই থাকো, যাই কিছু করো, তুমি যে আমারই জানি—
ভালোয়-মন্দে, আলোয়-কালোয় আমারই মণ্টু রাণী।

তুমি যে তোমার পার্টিতে এখন হয়েছ কুন্‌কী হস্তী
বুর্জোয়াদের ক্লাবের আসরে গিয়েছ ছাড়িয়া বস্তি ;
অজিত বোসের খেদায় টানিয়া
খোকা হাতিদের ফেলিছ আনিয়া
নব তরুণেরে গুণ্ডা বানিয়ে
পাবে কি জীবনে স্বস্তি ?
পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ভাই
চিরকালটাই পাবে কি রেহাই ?
সময় থাকিতে ব্যবসা বন্ধ
কর প্রিয়ে সাবধানী
বিপদে অন্য বন্ধু কোথাও
পাবে না মণ্টু রাণী !

এবার কি মোরে চিনিতে পারিলে জনগণ-প্রেমপাত্রী ?
তব যৌবন-বিমানেতে আমি পয়লা-ওড়ার যাত্রী !
তব হোটেলের খাতায় আমার
স্বাক্ষর খুঁজে দেখ একবার
বউনি-বেলার এ খরিদ্দার—
স্মরিও সে সুখরাত্রি !
এখন রূপসী, ভালবাসাবাসি যত করো সবই জানি
তবুও সুদিনে তোমায় দখল করিব মণ্টু রাণী।

ইতি—

বল-ত-আমি-কে

মণ্টুর দিনটা আজ খুবই খারাপ যাচ্ছে। সব দিক দিয়েই ব্যর্থতা, তারপর এই চিঠিটা পাবার পর থেকেই দুশ্চিন্তা সুরু হোল। অজিতদা আজ ভোরে হুকুম দিয়েছিলেন, সে যেন সুব্রতকে ফোন করে জানায় যাতে সুবো চারটের পরেই ক্লাবে আসে। সাড়ে পাঁচটায় মিটিং বসার আগেই যেন ভারতীর সঙ্গে সুব্রতর সব কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। মিটিং-এর পরে ভারতী যেন সুব্রত ঘটককে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রফেসার এ. বোসের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করে দেয়। সেই হিসেবে আজ পৌনে চারটেয় হাজরার মোড়ে সবুজ রং-এর ফিয়াট গাড়ীতে ভারতীকে তুলে নেওয়া হবে। কথাটা পাকা করে অজিত সকালেই চলে গিয়েছিল কিন্তু ভারতী দু'দুবার ফোন করেও সুবোকে পেল না। প্রথম বারে ফোন ধরেছিল বোধ হয় সুবোর বাবা। ভারতী ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বারে অন্য কে একজন ধরেছিল। বোধ হয় কোন চাকর, নিশ্চয়ই চাকর, কথাবার্তায় সেই রকমই মনে হয়েছিল; চাকর এবং বাবু ছাড়া ও-বাড়ীতে আছেই বা আর কে? দ্বিতীয় বারে ভারতী সাহসে ভর করে সুবোর কথা জিজ্ঞাসা করে শুনেছিল, সে সকালেই বেরিয়ে গেছে তার দিদির বাড়ীতে, সন্ধ্যের পরে ফিরবে। ভারতী হতাশ হয়ে গিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও হাজরা মোড়ে পৌনে চারটেয় ওকে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল, গাড়ীও সে পেয়েছিল এবং মিটিং আরম্ভ হবার এক ঘণ্টা আগে ক্লাবে এসে ক্লাবের চাকরের হাতে পেল এই চিঠি। চিঠিটা হাতে নিয়ে বুঝতেই পারে নি, কার চিঠি। শুনল, চিঠিটা কাল থেকে ক্লাবে এসে পড়ে রয়েছে, কেউ ওকে দেয় নি। চিঠিখানা খুলে পড়েই ওর মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। সুনন্দা চিঠিখানা দেখতে চেয়েছিল। তার কাছ থেকে কোনমতে চিঠিটা রক্ষা করে ভাবতে ভাবতে ক্লাবের পেছনের বারাণ্ডায় নিরিবিলিতে বসে আগাগোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর একবার পড়ে বেচারী ঘেমে উঠল। কে এই চিঠির লেখক? নিজের সম্বন্ধে সে বলছে, কবি পলাতক; বলছে, তোমার যৌবন-বিমানের ফার্স্ট ফ্লাইটের যাত্রী, বউনির খদ্দের, এ সবের মানে কি?

তা ছাড়া ওর সম্বন্ধে সমস্ত খবরই সে ভাল ভাবে জানে। যাদের সঙ্গে ও মিশেছে বা মিশতে বাধ্য হয়েছে তাদের সকলকেই ওর মনে আছে, কিন্তু পার্টির কোনো ছেলে যে ওকে এ ভাবে লিখেছে বা লিখতে পারে তা মনে হয় না। অপর পক্ষে পার্টিতে আসার আগে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মাত্র দু'জনের। তাদের কেউ এ ভাবে ওকে লিখবে না, অর্থাৎ এ রকম লেখার ক্ষমতাই তাদের নেই। তাদের একজন ছিল ওদের আগেকার বাড়ীওয়ালার ছেলে। সেটা মস্তান গোছের আড্ডাবাজ ছোকরা, লেখাপড়ায় ঢুঢু। দ্বিতীয়টা ছিল ওর ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসের সহপাঠী। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা কিন্তু ফুটবল খেলায় ঐ বয়সেই নাম করেছিল। সে ছেলেটা পার্ট ওয়ান পরীক্ষার আগেই কলেজ ছেড়ে কোথায় ভেগেছে তা ভারতী আজও জানে না। তা হলে এ চিঠি কার হতে পারে? 'অজিত বোস', 'কুন্কী হাতী', 'নব-তরুণেরে গুণ্ডা বানিয়ে' এ সবই যে জানে, সে কে? এ চিঠিতে কিসের ইঙ্গিত? 'পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে চিরকাল কাটবে না' এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে কে বলতে পারে, 'আমি ছাড়া আর কেউ তোমার নেই' এবং যত ভালবাসাবাসি করি সব জেনেও 'সুদিনে আমায় দখল' করবে, এই দরদীটি কে হতে পারে? আকাশ-পাতাল ভেবে সেই অচেনা-লেখকের-মন্ট্রাণীটি ঠাণ্ডার দিনেও ঘেমে উঠল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হোল সুব্রত নয় ত? ওর পক্ষে এ রকম লেখা কি সম্ভব? ও কি ভারতীর সমস্ত ছলাকলাই বুঝতে পেরেছে? টের পেয়েছে ওর হালচাল, গতিবিধি!

আবার মনে হোল, সেটা সম্ভব নয়। পার্টির খবর সে আদৌ জানে না, বরং ও-ই এক সময় অজিত সম্বন্ধে সুবোকে সাবধান করে দিয়েছিল। সুবোর হাতের লেখা ভারতী জানে না, কখনও দেখেনি। তবুও ওর লেখাটা যদি কোথাও পাওয়া যায় তা হলে মিলিয়ে দেখতে পারে। ঠিক আছে, তাই দেখতে হবে, কিন্তু—কিন্তু ও নয়। ও হতেই পারে না। তবুও আজই দেখতে হবে ওর হাতের লেখাটা।

ঘড়ি দেখল ভারতী, চারটে চল্লিশ। সুবো আজ দিদির বাড়ী গেছে। আসবে ত? নিশ্চয়ই আসবে। ভারতী বলেছে আজই ওদের দেখা হবার শেষ দিন। আজই সুব্রত বলবে, ভারতীকে নিয়ে কোনো দূর দেশে যাবার কথা। নাঃ, আর পারা যায় না! যত শীঘ্র সম্ভব এই পাপচক্র থেকে পালানো দরকার। লেখাপড়ায় আর দরকার নেই। পরীক্ষা মাথায় থাক, প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে ভারতী বাঁচে। এখন কিছু টাকা চাই। মোটা টাকা। মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে ভারতী সরে পড়তে চায়। মাকে বেশ কিছু টাকা না দিয়ে গেলে ওরা উপোষ করে মরবে। সেজন্য ভারতী প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তা সত্বেও যদি টাকার যোগাড় করতে না পারে তা হলে আর উপায় কি! বাবা-মায়ের বরাতে যা আছে তাই হবে, ও আর কি করবে! সুবোর সঙ্গে রেজেস্ট্রিটা একবার হয়ে গেলে তার পর ও হয়ত মাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু সুবোর বাবা যদি ওদের পরিচয় পেয়ে দু'জনকেই তাড়িয়ে দেন তা হলে উপায়?

ভেবে চিন্তে ভারতী কুল-কিনারা পায় না। যেমন আছে তেমনই ভাবে পার্টিতে থাকলে সামনে ভীষণ বিপদ,—ওরও, সুবোরও। পার্টি ছেড়ে সুবোকে নিয়ে ভেসে পড়লে গভীর অন্ধকার, কি যে হবে তার কোন আন্দাজই পাওয়া যায় না। অজিতদা'র দল অসন্তুষ্ট হলে অবধারিত মৃত্যু, পার্টির বিচার ও শাস্তিদান সে জানে। তার পর যে লোক এই চিঠিটা লিখেছে সেই বা কে? কি তার মৎলব? তার কতখানি শক্তি? ভারতীর মনে সব শুদ্ধ এমনই জট পাকিয়ে যাচ্ছে যে সে কোন রকম মীমাংসাই করতে পারছে না।

পাঁচটার পর থেকেই উৎসাহী সদস্যরা আসতে আরম্ভ করলেন। মাঝখানের হল্‌টায় প্রকাণ্ড ফরাস পেতে সাহিত্য সভার আসর করা হয়েছে। জলচৌকির ওপোর ভাল টেবেল ক্লথ দিয়ে সভাপতির জায়গা নির্দিষ্ট, তার ওপোর ফুলদান ও ধূপদান, প্রত্যেকের জন্য গোলাপ ফুলের বটন্‌-হোল, সভাপতি ও প্রধান অতিথির জন্য মালা এ সমস্তই সুদর্শনদা

নিজে এনেছেন। পেছনের ক্যান্টিনে চপ্ ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে। মাংসের চপ, কাটলেট ও চা হচ্চে মাংসাশীদের জন্য, নিরামিষাশীদের জন্য সন্দেশ, কেক এবং চা। আয়োজনের ত্রুটী নেই, কিন্তু স্থবো কই?

ভারতীর হঠাৎ মনে হোল স্থবো বোধ হয় আসবে না। ঐ চিঠি সে-ই পাঠিয়েছে। সে যদি আজ না আসে তাহলে স্পষ্ট প্রমাণ হবে ঐ চিঠি তারই। কিন্তু চিঠিখানা কাল এখানে এসেছে। তাহলে হয় পরশু কিম্বা কালই সকালে ওটা ডাকে দেওয়া হয়েছে, ডাকের তারিখটা একেবারেই অস্পষ্ট কিন্তু,—কিন্তু কাল বিকালেই ত স্থবোর সঙ্গে ভারতীর দেখা হয়েছে। কালও ভারতীর সঙ্গে স্থবোর কথাবার্তা যা হয়েছে তা থেকে ঘুনাক্ষরেও সন্দেহ করা যায় না যে স্থবো অন্য কোন রকম সন্দেহ করছে। কালকের কথাগুলো যথাসম্ভব স্মরণ করে ভারতী ভাবতে লাগল। না, কোন রকম বিসদৃশ কিছুই সে অনুমান করতে পারল না। তাহলে—

যাই হোক, ভারতী ভাবল, ওর বাংলা হাতের লেখাটা দেখতে হবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি বোঝে, ও চিঠি স্থবোরই লেখা তা হলে কি হবে?

ভারতী স্থির করল, সে ক্ষেত্রে ভালই হবে। ভারতী সোজা বলবে, তুমি ত সবই জানো। এ অবস্থায় আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি আমার সঙ্গে রেজেস্ট্রীটা করে নিয়ে আমার ব্যবস্থা কর। স্থবোর বাবার এ ক্ষমতা আছে যে তিনি ওদের দু'জনকে অজিতদের নাগালের বাইরে পাঠাতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে ওর বাবা-মাকে অনাহার থেকেও বাঁচাতে পারেন। কিন্তু স্থবো যদি কিছুই না করে, যদি ঘৃণাভরে ওর সঙ্গে বাক্যালাপই না করে—

ভারতীর চাউনি হোল কঠোর, পেশী হোল শক্ত। সংকল্প নিল, সে অবস্থায় স্থব্রত নামে কোন যুবক আর পৃথিবীর হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। পার্টির যে শিক্ষা, যে কর্মপদ্ধতি তাকে শেখানো

হয়েছিল সেই পদ্ধতি তার মনঃপূত না হোলেও আজ সে সেই পদ্ধতি-কেই বিশ্বাস করল মনে প্রাণে। তোমার এক সময়ের সহকর্মী তোমার সঙ্গে অসহযোগ করলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে, এই হচ্চে ওদের দলের প্রধান নীতি। কারণটাও সুস্পষ্ট। তোমার সহকর্মী তোমার সব কিছুই জানে। তোমার দুর্বলতা, তোমার মন্ত্রগুপ্তি এই সব নিয়ে যে লোক তোমার সঙ্গে আজ অসহযোগিতা করছে, সে আগামী কাল তোমার বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলাতেও পারে। যদি মেলায় তা হলে সেই আগামী কালই হবে তোমার চরম বিপদ ; অতএব সেই বিপদের সম্ভাবনাকে আগামী কালটা আসার পূর্বেই সমূলে উৎপাটন কর। তারপর তার শবদেহে মাল্যদান কর, তার জন্য যত পারো শোকসভা কর। এতে তোমার মহানুভবতারই পরিচয় দেওয়া হবে কিন্তু আসলে তুমি নিজে থাকবে নিরাপদ। পার্টির জন্য অন্য সমস্তই তুচ্ছ। দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা সমস্ত কিছুর অনেক উর্ধ্বে হোল পার্টি। ব্যক্তি যায় ও আসে, পার্টি শাশ্বত। তবে সেই পার্টি ও আজ ছাড়তে পারে ওর নিজের স্বার্থে, সেখানে ভারতীর নিজস্ব চিন্তাধারায় কোন ঘোলাটে ভাব নেই, কিন্তু নিজের স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হয় তা হলে পরের জন্য ওর কোন দরদ নেই। এই ব্যাপারে পৃথিবীর জনারণ্যে বাস করেও সকল স্বার্থপর আত্মকামীর ন্যায় ভারতীও একা। নিছক একাকী। প্রেমের জন্য নিজেকে জলাঞ্জলি দেবার মতো কবিত্বের বোকামি ওর নেই। ও হচ্চে রিয়ালিস্টিক, ওর দাদাদের ভাষায় এটাই বোধ হয় ডায়ালেক্টিক মেটিরিয়ালিজম্। ঐ শব্দটার মানে ও নিজে বোঝে না, কিন্তু ও জানে, ওর স্থির বিশ্বাস, ও বেঁচে থাকলে, সুস্থ থাকলে অনেক প্রেম, অনেক অর্থ ওর পায়ে এসে লুটোলুটি করবে ; এই ওর আসল মনোভাব। একে হয়ত বোকারা নিকৃষ্ট তামসিক কাম আখ্যায় অভিহিত করতে পারে কিন্তু ও জানে, ওকে শেখানো হয়েছে, ওর তরুণ মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই রকমের বিশ্বাস। এতে ওর কোন রকম ঘৃণা বা অপরাধ-বোধ কিছুই হয় না।

পার্টিতে যাবার পর প্রথম প্রথম যে শিক্ষা ভারতীকে নিতে হয়েছিল সেই সব কথা ওর একে একে মনে পড়ল। সেই প্রথম ও শুনেছিল যে, পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ এই যে মানুষ মনের ভাব গোপন রেখে অভিনয় করতে পারে, পশু তা পারে না। সেদিন সবিস্ময়ে নতুন লজিক ও শুনেছিল। সভ্য মানুষ কাপড়-চোপড় পরে থাকে। এটাই সভ্যতা, কিন্তু ভেবে দেখ, জিনিসটা কত বড় মিথ্যা, কত বড় ধাপ্পা। প্রাকৃতিক নগ্নতাকে পশুরা গোপন করে না, আদিম নরনারীও উলঙ্গ অবস্থায় থাকত, কিন্তু জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে গোপন করার চেষ্টাটা মানুষের মধ্যে গজিয়ে ওঠে। আদিম মানুষের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে তার দেহকে ঢাকতে, গোপন রাখতে চেয়েছে ; তারপর জ্ঞান যত বাড়ে তত সে তার নিজের সব কিছুই গোপন করে। মনের ভাব মনে চেপে যেটা দৃষ্টি এবং শ্রুতিসুখকর সেটাই দেখিয়ে ও বোলে যারা সকলকে তাক্ লাগাতে, বিভ্রান্ত করতে পারে তারাই কৃতী ও মহৎ বলে জনসমাজে পরিচিত হয় এবং অপর সকলের বাহবা নেয়। সে জন্যই সব কিছু উজ্জ্বল, বৃহৎ ও মহতের পেছনে অনেক গোপন ক্ষুদ্রতা চিরদিনের মতো গোপনই থাকে। যারা কৃতী, যারা মহাত্মা, যারা অতি-মানব বলে সকলের পূজ্য তারা অন্য সকলের তুলনায় অনেক বেশী ভাল অভিনেতা। পৃথিবীতে সকলেই সমান ভাবে জন্ম নিয়ে একজন হঠাৎ বড় হয় কি করে ? উত্তর এর একটাই আছে। যে গোপনে, প্রচ্ছন্ন ভাবে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে পারে সে-ই সকলের চাইতে অনেক বেশী উন্নতি করে সকলের মাথায় চেপে বসে, যাকে সাধুভাষায় বলে শীর্ষস্থান অধিকার করা। ওর পার্টির পণ্ডিতরা এই শিক্ষা দিয়ে সাধারণ ভাবে সর্ব্বজনপূজ্যদের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষমাত্রেই নিজের কোলে ঝোল টানে। যে সকলের চাইতে বেশী ঝোল টানতে পারে, সকলের মাথায় পা দিয়ে ওপোর তলায় উঠতে পারে এবং সুনিপুণ অভিনয়ে যে ব্যক্তি

সকলকে ঠকিয়ে, শোষণ করে, সকলের সব কিছু নিজে আত্মসাৎ করেও মিষ্ট কথা ও আপাতমধুর ব্যবহারে ঐ শোষিত অল্পবুদ্ধি হতভাগ্যদের নিজের গোয়ালের পোষা গরু-ছাগলে পরিণত করে ক্রমান্বয়ে দোহন করতে পারে, নিজের দেওয়া বুক্‌নিতে সকলের সমস্ত স্বাধীন চিন্তাকে ঘুম পাড়িয়ে মন-গড়া লজিক ও ডিসিপ্লিনের দোহাই দিয়ে প্রচণ্ড গতিশীল যুবশক্তিকে নিজের প্রয়োজনে ভারবাহী ঘোড়া বা পাহারাদার কুকুরে রূপান্তরিত করতে পারে সেই হয় নেতা, সেই হয় স্মরণীয়, সেই সকলের পূজা পায়। এই বিরাট ধাপ্পাবাজী সভ্যতার আদি যুগ থেকে সমানে চলে আসছে। এগুলো সেই প্রাথমিক বর্বর যুগে চলেছিল দলপতি বা সর্দারের নামে, তারপর সুরু হোল রাজা ও সম্রাটের নামে। এই রাজারা দেশের তরুণ জ্বলন্ত মনকে পোষ মানাবার জন্য আদিম সভ্যতার সেই প্রাচীন যুগে অত্যাচারের স্রোত বহিয়েও যখন হালে পানি পেলেন না, তখন সুরু করলেন মনগড়া এক রহস্যময় ধর্মের প্রলেপ দিতে। অলৌকিক ভয় ও বিশ্বাস, সাজানো সব ভাল ভাল বুলি, যেগুলোকে তারা নিজেরাই প্রচার করল 'জ্ঞানগর্ভ বাণী' নামে, মাঝে মাঝে বোকাদের দু'চারজনকে পুরস্কার বিতরণ, বাহবা দেওয়া, এই সব সস্তা নেশায় নবজাগ্রত তারুণ্যকে স্থায়ীভাবে ঘুম পাড়িয়ে ঐ ধুরন্ধর বুদ্ধিমানরা নিজেদের কোলে ঝোল টানার কাজটা বরাবরই হাসিল করে আসছেন। ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা, আইন, আদালত সবেরই অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য হচ্চে কতিপয়ের দ্বারা অগণিতকে অবাধে শোষণ-পেষণের প্রচলিত ধারাকে অব্যাহত রাখা। দীর্ঘ দিনের এই সব ব্যবস্থায় সুবিধাবাদীদের চিরা-চরিত ধাপ্পাটা ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে। সেই সংস্কারকে ভাঙ্গতে হবে—এটাই ওদের পার্টির শিক্ষা,—ধর্ম নামক জুজুর ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে, শোষকদের মহান্ আখ্যায় অভিহিত করার নেশা ছুটিয়ে তাদের মুখোস টেনে ফেলে দিয়ে সমস্ত মেহনতি জনতাকে দেশের যা কিছু সুযোগ, যা কিছু সম্মান সমস্ত সমানে ভাগ করে দিতে হবে। ধনী

মালিক পুরুষানুক্রমে শোষণ কার্য চালিয়ে তবেই সে আজ ধনী এবং মালিক হয়েছে। সেই ধনী মালিকদের শ্রমিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। ওপোরওয়ালাকে ওপোর থেকে নামিয়ে সাধারণের স্তরে বসাতে হবে। এই সব শিক্ষা প্রসঙ্গে পার্টির এক নূতন সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলেছিলেন, বাবা-মাকে অযথা ভক্তি শ্রদ্ধার কোন মানে হয় না। সেই প্রাচীন কাল থেকে বাবা-মায়েদের দলই নিজেদের ঢাক নিজেরা ঘাড়ে করে প্রচার করেছিলেন যে সন্তানকে বাবা-মা পৃথিবীতে এনেছে, অতএব পিতামাতাই সন্তানের প্রথম গুরু। বাপ্ মায়েরা নিজেরাই নিজেদের দেবতার আসনে বসিয়ে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' এই সব পিতৃস্তোত্র রচনা করে গেছে। কিন্তু শাস্ত্র থেকেই বুঝে দেখ, সেই বাপ যেখানে প্রবল সেখানে বাপ তার ছেলে পরশুরামকে মাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এখন এই বৈজ্ঞানিক যুগে মূল্যবোধ বদলেছে, খোলা চোখ দিয়ে দেখে আমাদের বলার সময় এসেছে যে, বাপ মা তাদের জৈব আকর্ষণে সন্তানকে সৃষ্টি করেছে, অপত্যের স্বাভাবিক মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে সন্তানকে পালন করেছে। সন্তানের জন্মদান এবং পালনের আনন্দের দ্বারাই তারা নিজেদের সমস্ত প্রাপ্য উশুল করে নিয়েছে, কাজেই বাবা-মার কাছে ছেলেদের ঋণ বলে কোন কিছুই থাকতে পারে না। বুড়োবুড়ীদের কাছে ঋণ যদি কারুর থাকে তাহলে তা স্টেটের। যে-স্টেটের বাসিন্দা হয়ে ঐ সব বুড়োবুড়ীরা আজন্ম খেটেছে সেই স্টেটই তাদের শক্তিহীন বার্ধক্যে দেখা শুনা করবে।

ভারতী শুনেছে যে উচ্চ পর্যায়ের এমনই এক আলোচনা চক্রে একদা স্থির হয় যে, অতীতের নাম করা বৃহৎ মনীষীদের শ্রদ্ধা করা, সম্মান দেখানোর যুক্তিহীন ভাববিলাস বুর্জোয়া-স্থাপিত প্রাথমিক পাঠশালার প্রথম পাঠ থেকেই শিশুমনে এমন দৃঢ়ভাবে ক্ষোদিত হয় যে তার ফলে সেই সৌখিন দুর্বলতা যাবতীয় শিক্ষিতদের আবাল্য সংস্কারে পরিণত হয়ে শিক্ষিত তরুণদের মেরুদণ্ড সোজা রেখে বাস্তবের সঙ্গে

পাঞ্জা কষতে কখনও দেয় না। অতএব সেই বৈঠকেই স্থিরীকৃত হয় যে পার্কে, চৌরাস্তায়, পাবলিক বিল্ডিং-এ প্রাচীনদের যে সব মূর্তি, ছবি ইত্যাদি আছে সেগুলো সমস্তই ভাঙ্গতে, পোড়াতে, নষ্ট করতে হবে। এই ভাবেই আধুনিকদের মন থেকে অহেতুক ভক্তি শ্রদ্ধার গুরুভার সরিয়ে দিয়ে তাদের মগজ ধোলাই করে যুবচিত্তকে সতেজ, সক্রিয় করা সম্ভব। ভারতী এও শুনেছিল যে এই যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রবীণ কর্মীরা কেউ কেউ আপত্তিও তুলেছিলেন কিন্তু পার্টির জাগ্রত প্রাণশক্তি সেই সব আপত্তি নস্যাৎ করে ছেড়েছিল।

এই রকমের অপর এক আলোচনা বৈঠকে কে যেন বলেছিল, এ সব জাঙ্গল্ ল। শুনেই বক্তা বলেছিলেন, জঙ্গলের আইনটাই স্বাভাবিক আইন। সুবিধাবাদীদের বাক্যজালে স্বভাবজাত প্রাকৃতিক আইনকে ঘুলিয়ে দিয়ে সভ্য জগতের মনগড়া কৃত্রিম আইনকে ভাঙ্গতে না পারলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে না, মুষ্টিমেয়র স্বার্থে অগণিত জনতার হাজার হাজার বছরের অবারিত শোষণও বন্ধ হবে না। আলো, হাওয়া, জল, মাটি, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদই যেমন সকলের সমান প্রাপ্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোটী কোটী মানুষের শ্রমলব্ধ সম্পদেও তেমনই ভাবে সকলের সমান অধিকার। কোনও একটি বিশেষ ডাকাতের বংশধর হয়ে জন্মানর দাবীতে বিরাট জমিদারী, সমৃদ্ধ খনি অথবা হাজার হাজার লোকের রুজি-রোজগারের উপায়-স্বরূপ যে কারখানা সেটার একচ্ছত্র মালিক হিসাবে যে আইন সেই ডাকাত-পুত্র অর্থাৎ ধনী-সন্তানকে স্বীকৃতি দেয় সেই নিকৃষ্ট জুয়াচুরির আইন থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দেবার সময় এসেছে। এবং এর জন্যই তোমাদের তৈরী হতে হবে। যে কাঠামোর মধ্যে এখন তোমরা বাস করছ সেই কাঠামোর প্রতি স্তরে এমন ভাবে গাঁথুনি দেওয়া হয়েছে যে এই কাঠামোর তিলমাত্র বজায় রেখেও নতুন কাঠামো গড়া যাবে না। কাঠ ও কাঁচের ঝালর দেওয়া সুন্দর সাজানো বাংলো বাড়ীর এদিক ওদিক বদ্‌লে বিশ তলা স্কাই স্ক্রেপার তৈরী করা যায়

না। বাংলো বাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে, তার ভিত পর্যন্ত উপড়ে ফেলে স্কাই স্ক্রেপারের উপযুক্ত বনিয়াদ তৈরী করলে তবেই উঠবে ঐ মজবুত বিশ পঁচিশ তলার স্থায়ী দালান। সেই জন্যই বলছি, তোমরা যারা এই কাজে নতুন ব্রতী হয়েছ, তারা খেলাঘরের চকচকে বাংলো বাড়ীর কথা ভুলে যাও, এদিক ওদিক সংস্কার করে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করার অসম্ভব স্বপ্নকে ত্যাগ কর, ভবিষ্যতের আমূল পরিবর্তনের প্রস্তুতিরূপ বর্ত্তমানের সর্বাঙ্গীন ধ্বংসকে বিভীষিকা বলে মনে কোরো না, এই ধ্বংসটাকেই গঠন কার্যের প্রথম পর্যায় হিসাবে সাগ্রহে বরণ কর।

শিক্ষকের কথাগুলো ভারতীর প্রথম দিকে ভাল না লাগলেও তারুণ্যের গ্রহণক্ষমতা, অথবা অভিনবত্বের দুর্ণিবার মোহ, কিম্বা কচি ও কাঁচা মনের ওপোর প্রচণ্ড বিপদের অমোঘ হাতছানি, ঠিক কি কারণে সে বলতে পারে না, এই পথকেই সে নিজের পথ বলে গ্রহণ করেছিল। বিনিময়ে সে পেয়েছিল হাত-খরচের পর্যাপ্ত টাকা। সারা মাস মেয়ে পড়িয়ে মাসান্তে অনেক চাওয়া-চাওয়ি করে যে মেয়ে হাতে পেত বেতনের দশটা, বারোটা কি বড় জোর পনেরটা টাকা, সেই মেয়ে অজিতদা'র নির্দেশে কিছুটা অভিনয়ে, কিছুটা মিথ্যাচারে গোছা গোছা নোট অবলীলাক্রমে হাতের মুঠোয় পেতে লাগল। যে জীবনধারাকে সে দূর থেকে লোভীর মত তৃষাতুর হয়ে দেখত আর ভাবত ওটা তার জীবনে চিরদিনই অপ্রাপ্য,—সেই মোটর গাড়ী, সেই শাড়ী, ঘড়ি ও রঙিন সোনালী স্বপ্নভরা পরিবেশে সে নিজেই মক্ষিরাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠাকেই সে স্থায়ী করতে চায় ধনীপুত্র সুব্রতকে কুক্ষিগত করে। কেন, কেন ও পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। আর নাই যদি সে পারে তা হলে সে প্রতিশোধ নেবে। ভয়ঙ্কর রকম প্রতিশোধ সে তুলবে তারই ওপোর যে ওর সকলের চেয়ে প্রিয়, যে ওর একমাত্র বল-ভরসা।

কিরে? কি হোল তোর, এক মনে চুপ চাপ আড়ালে বসে আছিস, ব্যাপার কি?

সুনন্দা এসে ওর কাঁধে হাত দিতেই ভারতীর হুঁস হোল, ও ক্লাব-ঘরের পেছনের বারাণ্ডায় একা একা বসে আছে। সুনন্দা বল্ল, প্রেমে পড়েছিস্ নাকি রে? ঐ চিঠিখানা পেয়ে যে তন্ময় হয়ে গেছিস্।

টপ্ করে মনে হোল সুনন্দা কি চিঠির বিষয়বস্তুটা জানে, না কি? হতেও পারে, ওরাই হয়ত ওকে পরীক্ষা করার জন্য চিঠিটা পাঠিয়েছে।

মনের ভাব মনে চেপে ভারতী বল্ল, এসেছেন সব? মিটিং আরম্ভ হচ্ছে?

বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়াল।

সুনন্দা বল্ল, আসছেন সব একে একে, কিন্তু তোমার 'সবটি' এখনও এসে পৌঁছয় নি।

সে হাসতে লাগল।

নিজেকে সামলে নিয়ে ভারতী বল্ল, যাঃ, তোর মতো আমি হ্যাংলা নই যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য মুখিয়ে বসে আছি।

দিগ্বিজয় করা কি নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নাকি রে? তোর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তুই একটা সেকেলে—

সেকেলে কি? থাম্‌লি কেন, বল্? সেকেলে বুড়ী, এই ত?

বুড়ী কেন? সেকেলে রাধিকাও হতে পারে যে 'কৃষ্ণ পায়ে নিবেদিয়া হিয়া সমর্পলু"।

সুনন্দা হাসতে হাসতে ভারতীর হাত ধরে পেছনের বারাণ্ডা থেকে হল ঘরে ঢুকল।

সামনেই কাপুরের সঙ্গে দেখা। সুনন্দা বল্ল, মিঃ কাপুর, আজ কেমন জব্দ হয়েছেন? ড্রেন পাইপ প্যাণ্ট পরে ফরাসে বসবেন কি করে?

অসুবিধে, কাপুর বিরক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, সুদর্শনদাকে এত করে বল্লুম চেয়ার ভাড়া করতে, উনি বল্লেন, না, সাহিত্যসভা চেয়ারে হয় না, ফরাসেই হয়ে থাকে।

উনি বলবেন না কেন, ওঁর ত প্যাণ্টের বালাই নেই, বল্ল অভিজিৎ সোম, তারও ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট।

ভারতী বল্ল, আজ সাহিত্যসভা জানেন ত। ঐ অসভ্য চোঙ্গা প্যাণ্টগুলো না পরে এলেই পারতেন।

আমার যে কাপড় নেই মিস সেন। একখানা কাপড় আবার কিনব না কি? বল্ল মিঃ সোম।

আমার কাছে চাইলে একখানা সাড়ী দিতে পারতুম, গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েই ভারতী হেসে ফেল্ল।

সুনন্দাও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বল্ল, দেখলেন্ ত, ভারতী আপনাকে সাড়ী পরাতে চায়। পরবেন?

আরে আরে প্রেসিডেণ্ট এসে গেছেন, কয়েকজন এগিয়ে গেল আজকের সভাপতি কলকাতার এক সংবাদপত্রের সম্পাদককে স্বাগত জানাতে।

ভারতী বল্ল, প্রেসিডেণ্ট কি দাসের গাড়ীতে এলেন?

সুনন্দা বল্ল, হ্যাঁ, মিঃ দাস গিয়েছিলেন ওঁকে আনতে। আর মিঃ বটব্যাল গেছেন প্রধান অতিথিকে আনার জন্য।

এখনো আসেন নি তিনি?

কে? প্রফেসার বোসের কথা বলছিস্?

হ্যাঁ।

না, এখনও আসেন নি। এখুনি এসে পড়বেন। এই ত মোটে পাঁচটা বত্রিশ। হাতের ঘড়িটা দেখে সুনন্দা বল্ল, তোর মোটর বাইক কোথায় রে?

অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে ভারতী বল্ল, কে জানে?

কেন রে? ঝগ্ড়াঝাঁটি করেছিস্? সুনন্দা প্রশ্ন করে।

আমার বয়ে গেছে। ভারতী ঝঙ্কার দিল।

ওরে বাবা, কি রাগ! তুই বুঝি বাজে লোকের সঙ্গে ঝগড়াও করিস্ না?

তুই থাম্ দিকি। কেউ শুনলে কি বলবে?

বলাবলির যুগ কি আর আছে রে? সবাই জানে, জেনে ফেলেছে। সুনন্দা উত্তর দিল।

জানুক। জানলে আমার বয়েই গেল।

ম্লান কণ্ঠে সুনন্দা ফিসফিসিয়ে বল্ল, এই করতেই ত ক্লাবে এসেছি। কি বলিস্ ?

চুপ, চাপা গলায় ভারতী বান্ধবীকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু সে থামতে চায় না। বল্ল, যাই বলিস ভাই, আমার আর ভাল লাগছে না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

কথাগুলো সুনন্দা অস্ফূট কণ্ঠে বলেছিল। ভারতী ওর দিকে নীরব বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে চেয়েছিল। ভাবছিল; এটা কি ওর মনের কথা, না সুনন্দা ভারতীকে পরীক্ষা করছে। মুখে তেমনই অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, কেন ?

একদিন তোতে আমাতে নিরিবিলি বসব, সব কথা না বলে কিছু করব না, সুনন্দা চাপা গলায় প্রস্তাব দেয়।

ভারতী মনোভাব গোপন রেখে বল্ল, ঠিক আছে, কিন্তু কোথায় বসবি ? গাড়ীতেও ড্রাইভারটা গোয়েন্দাগিরি করে।

ঐ দেখ, আজ আর মোটর বাইক নেই রে, আজ গাড়ী, সুনন্দা ইঙ্গিতে তাপসবাবুর গাড়ীর দিকে দেখাল।

ভারতী দেখেছিল সুনন্দার আগেই। সুব্রত নামল ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে। রিনিকে নিয়ে ভদ্রা নামল পেছনের সীট থেকে। তাপস বাবু গাড়ীর কাঁচগুলো ড্রাইভারের সীটে বসে বসেই তুলতে লাগলেন।

সুনন্দা বল্ল, যা, এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আয়।

যাঃ, সঙ্গে গেস্ট এসেছেন দেখছিস্ না ? ভারতী উত্তর দিল। সেই সঙ্গে ওর মনটাও খারাপ হয়ে গেল। কত সব দরকারী কথা আজ রয়েছে, আর আজই কিনা গেষ্ট নিয়ে বেলা পড়িয়ে এসেছে! কি আক্কেল!

ভারতীর হাত ধরে সুনন্দা টান্‌তে টান্‌তে এগিয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্বেও ভারতীকে যেতে হোল।

আসুন মিঃ ঘটক, সুনন্দা দু'হাত তুলে নমস্কার করল, সেই সঙ্গে ভারতীও। এঁরা ? সুনন্দার সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

প্রতিনমস্কার করে সুবো বল্ল, ইনি দিদি, এটি দিদির মেয়ে শ্রীমতী রিনিরাণী আর, চোখ তুলে তাপসবাবুর দিকে দেখিয়ে বল্ল, জামাইদা।

ওরা নমস্কার বিনিময় করতে করতে ভারতী ভাবল নামের সঙ্গে 'রাণী' যোগ করার অভ্যাসটা ভাল ভাবেই রয়েছে দেখছি। 'রিনি রাণী' নাম হতেই পারে না, তা হলে এই কি লিখেছে মণ্টু রাণী!

দিদি বল্ল, পরিচয়টা যে এক তরফা দিলি রে, এদের পরিচয় দে।

সুনন্দা নিজেই সাগ্রহে পরিচয় দিল। বল্ল, আমি সুনন্দা, আর এ ভারতী। আমরা এক সঙ্গে ক্লাবে খেলাধুলা করি।

বাঃ, বেশ, প্রবীণার ভঙ্গিতে কথাটা উচ্চারণ করে ভারতীর দিকে দিদি তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল। জামাইদাও ভারতীর দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ভারতী চোখ নামিয়ে পিছু হটতে লাগল। সুনন্দা বল্ল, আসুন আপনারা, প্রেসিডেণ্ট এসে গেছেন।

কে ? জাস্টিস মুখার্জী ? প্রশ্ন করলেন তাপসবাবু।

সুনন্দা বল্ল, না, তিনি আমাদের ক্লাবের স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট। তিনি এখনও আসেন নি ; তিনি বোধ হয় আজ আসবেন না, সেই রকমই শুনেছি। আমাদের আজকের সাহিত্য সভার সভাপতি বরদাবাবু এসে গেছেন।

সাহিত্য সভার নিমন্ত্রণপত্রে আমন্ত্রণকারী হিসেবে তিনটে নাম ছিল, স্থায়ী সভাপতি জাস্টিস মুখার্জীর নাম, সাধারণ সম্পাদকের নাম এবং সাহিত্য শাখার সম্পাদক সুদর্শনদা'র নাম। তাপসবাবু কার্ড থেকেই জজ সাহেবের নামটা পেয়েছিলেন।

সাহিত্য সভা সুরু হোল। উদ্বোধন সঙ্গীত, সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণ, মাল্যদান এই সব মামুলি কাজ শেষ করে সুদর্শনদা সাহিত্য সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। শ্রোতারা কেউ শুনল, কেউ পাশের লোকের সঙ্গে ফিস্‌ফাস্‌ গল্প করতে লাগল,

উদ্যোক্তারা একবার বসেন, একবার ওঠেন, তাপসবাবুর সঙ্গে ভদ্রা কি একটা কথা অস্ফুট কণ্ঠে বল্ল, তাপসবাবু ঘাড় নাড়লেন, সুব্রত বিব্রত-বোধ করল। চুপচাপ বসে থাকার মত মানসিক অবস্থা আজ তার ছিল না। ভারতীর সঙ্গে একবার নিরিবিলিতে দেখা করলে খুব ভাল হয়, কিন্তু উপায় নেই। ওঃ, আজকেই শেষ দিন। এর পর ভারতীর দেখা হয়ত আর পাওয়াই যাবে না।

ক্যান্টিনের বয় এসে হেঁট হয়ে সুব্রতকে ডাকল। সুব্রত ধীরে ধীরে উঠে কোন মতে সকলের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। দিদি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, সুবো কোথায় যায়।

ক্যান্টিন বয়কে দিয়ে ভারতীই সুবোকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সুবোকে আড়ালে ডেকে ভারতী বল্ল, বড় বিপদে পড়েছি, সাহায্য করতে হবে।

কথাটা শুনেই সুবো ঘাবড়েছিল, কিন্তু ভারতীর চাল চলনে কেমন যেন মনে হোল বিপদটা তেমন গুরুতর নয়। বল্ল, কি বিপদ?

এঁরা বলছেন আমাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস্ দিতে হবে, ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। তুমি এই কাগজে লিখে দাও, কি বলব। বেশ ছোট্টর ভেতর চট্ করে লিখে দাও ত। একটা কাগজ কলম এগিয়ে ধরল ভারতী।

আমি? আমি লিখব? সে কি? সুব্রত আকাশ থেকে পড়ল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি একটু গুছিয়ে লিখে দাও।

না না, আমি নয়, সুদর্শনদাকে বলো, সুবো অনুনয় করল।

সুদর্শনদা? এখন উনি কি রকম ব্যস্ত তা দেখছ ত?

তবে অন্য কাউকে—

ছিঃ। তাতে প্রেস্টিজ থাকে?

তবে যে আমাকে বলছ?

তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু এ কথা কি আর কাউকে বলা যায়। নাও নাও, চট্ করে পেছনের দালানে গিয়ে নিরিবিলিতে বসে দু'লাইন লেখ। সেটা পড়ে মুখস্থ করে নেব।

মুস্কিল করলে। ও সব লেখা-টেখা আমার তেমন আসে না। কথাগুলো মুখে বল্ল বটে, কিন্তু মনে মনে খুসিই হোল।

যা আসে তাই হবে। চলো—

ভারতী সুবোকে এক রকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেল।

এর পর সুবো অনেক কাটাকুটি করে যা হয় একটা খাড়া করেছিল। ভারতী ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর লেখাটা ভাল করে দেখল এবং সুবোর হাতের লেখায় মনে মনে আশ্বস্ত হোল এই ভেবে যে কবিতায় যে গালাগালি তাকে করা হয়েছে তার লেখক নিশ্চয়ই সুব্রত নয়। সুব্রতর হাতের লেখা যত খারাপ, বাংলা ভাষায় তার রচনাশক্তি ততই কম। বাস্তবিক পক্ষে সুব্রত বাংলার চেয়ে ইংরাজীতেই বেশী পোক্ত। শুধু অনার্স সাবজেক্ট নয়, পাস্ সাবজেক্টও সে ইংরাজীতে তৈরী করে। তার বাবা বি. ঘটক ছেলেবেলা থেকেই সুবোর ইংরাজী পড়ার দিকে সবিশেষ চাপ দিয়ে এসেছেন।

কিছুটা লেখার পর ভারতী বল্ল, থাক, আর লিখতে হবে না, এবার ঠিক করে ফেলেছি কি বলতে হবে। ও আমার তৈরী হয়ে গেছে।

হয়েছে? সুবোর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

হ্যাঁ। ভারতী উত্তর দিল। শেষে বল্ল, আর একবার চেষ্টা করবো, ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় কি না।

কেন? তুমিই বলবে, সুব্রত উৎসাহ দিল।

দেখা যাক। ভারতী নীরব হোল। ভারতী জানে, ওকে কেউই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য বলে নি। সুবোর হাতের বাংলা লেখাটা দেখার জন্যই ত এই মিথ্যা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিল। হাতের লেখা দেখার পর বাজে বাজে সময় নষ্ট করতে আর রাজী নয়। ভাবতে লাগল, কি ভাবে কাজের কথা পাড়া যায়। সেই সঙ্গে এটাও ভাবছিল, কাল পরশুর মধ্যে গোপনে কোথাও দেখা করার বা ফোন করার সময়টা ঠিক করে মিটিং ভাঙ্গার আগেই সুবোকে কি ভাবে সরিয়ে দেওয়া যায়, যাতে অজিতের সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত পরিচয়টা না হয়। এ বিষয়ে

একটা সুবিধেও আজ ছিল। সুবোর বোন ও ভগ্নীপতির সঙ্গে ও তাড়াতাড়ি চলে গেলে কারুর কিছু বলার থাকবে না। সেই ভাবেই সুবোকে তাড়াতাড়ি সরাতে হবে।

ভদ্রা ওর স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বল্ল, কি গো, কেমন দেখলে? শালাজ পছন্দ হয়?

মন্দ কি? ভালই ত।

ছিঃ।

ওরা ফিস্ ফিস্ করেই কথা কইছিল। ভদ্রা বল্ল, ওর বয়স কিছুতেই পঁচিশের কম নয়, বেশীও হতে পারে। মুখখানা পেকে গেছে।

স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়েই আবার কবিতা পাঠকের দিকে নজর দিলেন। এমন একটা আধুনিক কবিতা পড়া হচ্ছিল যার মাথা-মুণ্ডু কিছুই কেউ বুঝছিল না। ভদ্রতা বজায় রেখে অনেকেই শোনার ভান করছিল।

ভদ্রা বল্ল, ঐ মেয়েকে তুমি ভালো বলো!

এবার তাপসবাবু উস্‌খুস করে উঠলেন। শেষে বল্লেন, যার অদৃষ্টে যেমন জুটুক তোমরা সবাই ভালো।

ভদ্রা স্বামীর হাঁটুতে খোঁচা দিল।

রিনি বল্ল, কি বলছ মা?

চুপ, মিটিং হচ্চে না?

এ কি মিটিং! রিনি বিরক্ত হয়ে গেছে।

কবিতা পাঠকের পাঠ শেষ হোল। সভাপতি বল্লেন, সাধু সাধু। পাশের একজন অস্ফুটে বল্ল, বাঁচলুম। কবিতা-পাঠক সকলের দিকে সগর্ব দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

সুদর্শনদার হাতে প্রোগ্রাম। তিনি বল্লেন, এবার স্বরচিত গল্প পাঠ করবেন শ্রী মুকুল দে। মুকুল বাবু!

মুকুল বাবু উঠলেন। তার হাতের কাগজগুলোর বহর দেখে তাপস

বাবুর ঠিক পেছনেই যিনি ছিলেন তিনি তাঁর পাশের লোককে বল্লেন, ক'পাতা হবে বল্ ত ?

যাকে প্রশ্ন করা হোল সে বল্ল, দু'পিঠে লেখা, এক পিঠে নয়, বলেই উঠে দাঁড়াল।

তাপস বাবু বল্লেন, এবার উঠবে না কি ? যে জন্য আসা তা ত হয়ে গেছে।

সুবোটা গেল কোথায় ? ওর সঙ্গে একবার দেখা করলে হোত না ? ভদ্রা মৃদুকণ্ঠে স্বামীকে বল্ল।

স্বামী বল্লেন, তা হলে এখনই ওঠো। পড়া সুরু হলে আর ওঠা যাবে না।

ওরা তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। গল্প পাঠকের গল্প আরম্ভ হোল।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে-থাকা একজনকে সুব্রতর কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে বল্ল, মিঃ ঘটক ? দেখুন ত, তিনি বোধ হয় ক্যান্টিনের দিকে গেছেন। ঐ দিকে যান।

পেছনের বারাণ্ডায় গিয়েই ভদ্রা দেখল বেঞ্চের ওপোর সুবো আর ভারতী মুখোমুখি বসে আছে। ভারতীর হাতে কাগজ কলম।

ভদ্রা এগিয়ে যেতেই সুবো উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীও। ভদ্রা বল্ল, এই যে সুবো, তুই এখানে ? তারপর ভারতী, তোমার কোন প্রোগ্রাম নেই ?

আছে দিদি, আমাকে ভোট অফ্ থ্যাঙ্কস্ দিতে হবে।

সে ত সব শেষে।

তা হলে আপনিই মধুরেণ সমাপয়েৎ করবেন, ফোড়ন দিলেন তাপস বাবু।

ভারতী স্মিতহাস্যে সায় দিল। ভদ্রা বল্ল, সুবো, ওঁর আবার কি কাজ আছে, ওঁকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

এখনই ?

কথার সুরে বোঝা গেল ওদের রাখার জন্য সুবো তেমন আগ্রহী নয়

দিদি বল্ল, হ্যাঁ ভাই। তোমাদের মিটিং ত দেখা হোল। তাই উনি বলছিলেন—

আর একটু থাকবেন না দিদি? আপনার সঙ্গে আলাপ করার সময়ই পেলুম না, ভারতী এই ভাবেই মৃদু অভিযোগ করেছিল। সেটা অবশ্য লোক-দেখানো অভিযোগ, আন্তরিক নয়।

ভদ্রা বল্ল, আমিও ত তাই ভাবছিলুম। তা—তা এক কাজ করো না কেন, তুমি কাল বিকেলে আমাদের ফ্ল্যাটে চল। ওখানেই একটু চা-টা খাবে আর গল্পগাছা করা যাবে।

এই রকম আমন্ত্রণের জন্য ভারতী তৈরী ছিল না। ইতস্তত করে বল্ল, আমি? আমি,—কাল ত সোমবার। আমার কলেজ রয়েছে।

কলেজের পরে। পাঁচটা, ছটা, যখন তোমার সুবিধে। তোমরা দু'জনে এসো, কেমন?

ভারতী সুব্রতর মুখের দিকে চোরা চাউনি চেয়েছিল। সুবো সোৎসাহে বল্ল, ঠিক আছে। কাল এই ক্লাব থেকেই যাওয়া যাবে। সেই ভাল।

কাল যদি ক্লাবে আসতে না পারি, ভারতী ধীরকণ্ঠে বলেছিল।

ঠিক আছে, কাল যদি না-ই হয় তা হলে পরশু এসো, দিদি উত্তর দিল, বড় বোনের বাড়ী ছোট বোন যাবে এতে আবার দিন ক্ষণের কি আছে! ওকে নিয়ে আসবি সুবো।

নিশ্চয়! পারলে কালই যাব, সুবো উত্তর দিল।

তা হলে তুমিও ত দিদির সঙ্গেই যাচ্ছ, ভারতী যেন সুবোকে তাড়াতে চায়।

আমি? আমি এখনই গেলে কেউ কিছু বলবে না ত?

কে আবার কি বলবে, আমি ওদের বোলে দেব'খন।

তুমি কখন যাবে?

আমাকে ত শেষ পর্যন্ত থাকতেই হবে। ঐ যে এক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ব্যাপার রয়েছে।

ও হ্যাঁ, সুবো নিজেকে সামলে নিয়ে বল্ল, তা হলে আমিও শেষ পর্যন্ত থেখেই যাই।

থাকলে ত ভালই, কিন্তু আজ তোমার গাড়ী আনো নি বলেই বলছিলুম—

ভারতীর ইঙ্গিতটা গ্রহণ করে তাপস বাবু বল্লেন, বিদেশ বিভুঁয়ে আমাদের সঙ্গে করে এনে শেষটা এমনি ভাবে তাড়াবে ব্রাদার! সেটা কি ভাল হবে ?

কেন ? জামাইদা কি পথ চিনে যেতে পারবেন না ? সুবো হাসি-মুখে প্রশ্ন করে।

ভারতী বল্ল, না দিদি, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যান, না হলে আমার ধন্যবাদ-জ্ঞাপন শুনে ও হাসাহাসি করবে।

করবে বুঝি ? ভদ্রা হাসতে লাগল।

হ্যাঁ দিদি ; আপনি জানেন না। ও ভয়ানক কথার ছল ধরে।

তা হলে চলি বোন, তুমি একদিন যাবে কিন্তু।

সুনন্দা এসে বল্ল, কি রে, তোরা এখানে জটলা করছিস ? ও দিকে মিটিং যে ফাঁকা হয়ে গেল।

ভারতী বল্ল, না ভাই। মিঃ ঘটক তাঁর দিদিদের নিয়ে চলে যাচ্ছেন কি না তাই—

সে কি ? আপনারা এখনই যাবেন ?

ভদ্রা বল্ল, হ্যাঁ ভাই, ওঁর কাজ আছে।

তাই বুঝি, ভুরু নাচিয়ে সুনন্দা বল্ল, চা খাওয়া হয়েছে ?

না ত। শশব্যস্তে ভারতী বল্ল, এক মিনিট দাঁড়ান, বলেই ছুটল।

চা খেয়ে গাড়ীতে বসে কিছুটা জোর দিয়ে দিদি বল্ল, এ মতলব তোমায় ছাড়তে হবে বাপু, এ মেয়ে মোটেই সুবিধের নয়।

সে কথার জবাব না দিয়ে সুবো বল্ল, ওর গাড়ীটা দেখলে ত ? ঐ গাড়ীতেই ও বরাবর ক্লাবে যাতায়াত করে।

তা করুক। ওর বয়স পঁচিশের কম নয়, ভদ্রা পূর্ণ বিশ্বাসে বলেছিল।

গাড়ী চালাতে চালাতে তাপস বাবু বল্লেন, পোস্ট ডেটেড্ চেক হয়, পোস্ট ডেটেড্ বার্থডে হয় না ?

ভদ্রা সে কথায় কান দিল না। রিনি বল্ল, পোস্ট ডেটেড্ বার্থডে কি বাবা ? বাবাকে নিরুত্তর দেখে রিনি বল্ল, পোস্ট ডেটেড্ বার্থডে কি মা ?

জামাইদা বল্লেন, ঘটক সাহেবকে বাড়ীতে নামিয়ে দেব না কি ?

আপনি এখন যাবেন কোথায়, প্রশ্ন করে সুব্রত।

হয় নিজের বাড়ী, না হয় শ্বশুরবাড়ী।

তবে যে বল্লেন আপনার কাজ আছে, সুবো যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত!

আছেই ত। সে কাজ হোল আত্মরক্ষা। তোমাদের সভায় আরও গোটা কতক কবিতা-পাঠ শুনলে ডাক্তারবাড়ী যেতে হোত। তাই আত্মরক্ষার জন্য সাফল্য সহকারে পশ্চাদপসরণ করলুম।

সুবো হাসতে লাগল। ভদ্রা বল্ল, তা হলে বাবার কাছেই চল।

তাই চল, তাপস বাবু সায় দিলেন।

সুবো বল্ল, আমার গাড়ীটা যে আপনাদের ওখানে পড়ে রইল।

অ, তাও ত বটে। তাহলে বাড়ীতেই যাওয়া যাক, তাপস বাবু মত পরিবর্তন করলেন।

দিদি বল্ল, গাড়ী পরে আনিস, এখন চল্, বাবার কাছেই যাই।

কিন্তু তুমি যেন এসব কথা বাবার কানে তুলো না। ঠাকুরমার কাছেও নয়, সুব্রত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল।

না না, তোর কোন ভয় নেই, দিদি অভয় দেয়।

ওরা সকলে মিলে যোধপুর পার্কে এল কিন্তু বি. ঘটকের দেখা পেল না। তিনি চারটের সময় কোথায় যেন বেরিয়েছেন ; বলে গেছেন ফিরতে রাত্রি হবে। ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করে প্রণাম সারতেই ঠাকুরমা নাতনী ও নাতজামাইয়ের সামনে অঝোরে কেঁদে ফেল্লেন।

ভদ্রা চমকে গেল। কি ব্যাপার! কি হয়েছে ঠাকুরমা ? কাঁদছ কেন ?

কাঁদছি আমার জ্বালায়।

কেন, কেন, কি হোল? কোন কিছু—তাপসবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

ঠাকুরমা বল্লেন, আমার যা হয়েছে দাদা সে আর কারুর কাছে মুখ ফুটে বলা যায় না। এখন শুধু ভাবছি আর কতদিন যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? কবে ছুটি পাব?

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ঠাকুরমা। সুবো পাস্-টাস্ করুক, ঘরে নাৎবৌ এনে তুলুন, নাৎবৌর সেবা যত্ন খান, তার পর ছুটির কথা ভাববেন, সান্ত্বনার ছলে নাৎজামাই ঠাকুরমাকে উত্তর দিলেন।

আমার সেবা যত্ন অনেক হয়েছে দাদা, অনেক হয়েছে। আর আমি কারুর কোন সেবাই চাই না।

নিজের আঁচলে ঠাকুরমা চোখ মুছলেন। ডাকলেন, চারু।

চারু এল। ঠাকুরমা বল্লেন, ঠাকুরকে চা জলখাবার করতে বল।

ব্যস্ত হয়ে তাপস বাবু বল্লেন, না ঠাকুরমা, আজ ও সব কিচ্ছু চলবে না। বাড়ীতে চা খেয়ে সুবোর সঙ্গে এক জায়গায় গিয়েছিলুম। সেখানেও যথেষ্ট খাওয়া হয়েছে। রাত ন'টার আগে কোন রকম খাওয়ার কথা আর ভাবতেই পারছি না।

তবে আজ রাত্রে এখানেই খেয়ে যাবে, কেমন? ঠাকুরমা অনুরোধ করল।

না ঠাকুরমা, আজ থাক। আজ বাড়ীতে কিছু বলে আসি নি। গণেশটা রান্না করে রাখবে। সেগুলো সব নষ্ট হবে।

কেন, টেলিফোনে বারণ করে দাও।

সে হয় না ঠাকুরমা। আর একদিন এসে খেয়ে যাব।

তাপস বাবু বার বার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। ঘড়ি দেখার ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে ভদ্রা বল্ল, আজ যাই ঠাকুরমা, আবার একদিন আসব। কোন একটা ছুটির দিনে আসব, সারাদিন থাকব, সেদিন যত পারো তোমার নাৎজামাইকে খাইও।

আমি আর কি খাওয়াব দিদি, আমার কি আর গতর আছে যে ভালমন্দ রান্না করব। ঐ ঝি-চাকরের হাতেই সব। ওরা যে কি রাঁধে আর কি দেয় তা আর আমি এখন দেখতেও পারি না। সেই জন্যই ত বলছিলুম, এভাবে আর থাকা কেন? এখন মানে মানে বিদেয় নিতে পারলেই বেঁচে যাই।

কোন রকমে ঠাকুরমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে ওরা খোঁজ করল রিনি কোথায়। চারু বল্ল, সে নীচে বাগানের দিকে গেছে।

নীচে নেমে দেখা গেল রিনি জেঠাইমার হাত ধরে বাগানে ঘুরছে। তার হাতে দুটো বড় লাল গোলাপ।

কেমন আছেন জেঠাই মা, ভদ্রা জেঠাইমার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

জেঠাইমা বল্ল, এস মা এস, চল ঘরে গিয়ে বসি।

ভদ্রা বল্ল, না জেঠাই মা, আজ আর বসব না। ওঁর যেন কি কাজ আছে, আজ এখনই যেতে হবে!

সে কি? এই মাত্র এসে এখনই যাবে? ঠাকুর চায়ের জল চড়িয়েছে, বাদলকে খাবার আনতে পাঠালুম—

দেখেছ? দেখ। ওপরে ঠাকুরমাকে কোন রকমে থামিয়ে নীচে এসে জেঠাইমার কাছে ধরা পড়ে গেলুম, ভদ্রা স্বামীকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বল্ল।

তাপস বাবু বল্লেন, সেই ছড়াটা কি রে রিনি? জেঠাইমাকে তোমার সেই ছড়াটা একবার শুনিয়ে দাও।

রিনি বল্ল, ছড়া? না বাবা সে ছড়া বল্লে মা বকবে।

কি ছড়া দিদি, সাদরে রিনির পিঠে হাত বুলিয়ে অনুপমা প্রশ্ন করল।

বলব মা? বলব? মেয়ে মায়ের অনুমতি চাইল।

মা বল্ল, বলো, না বল্লে ত ছাড়বে না।

অনু বল্ল, বল ভাই বলো, তোমার ছড়াটা শুনি।

আমার ছড়া নয় জেঠাইমা। ছড়াটা বাবার। বাবা মুখে মুখে ঐ সব বানায়, আমি শিখে নিই।

দুর পাগলী। আমি আবার ছড়া বানাই কবে? তাপস বাবু সহাস্যে বল্লেন।

বারে, মা যে বলে ও সব তোমার বানানো ছড়া।

যারই বানানো হোক, তুমি বলো ত দিদি, অনুপমা রিনিকে অনুরোধ করে।

রিনি বল্ল, শুনবেন, শুনুন।

জেঠাইমা, মেঠাই খাবো
হটাই যাও, পেটাই দেবো—

ওমা, এ আবার কি ছড়া! অনুপমা হাসতে লাগল।

আপনি কিছু মনে করবেন না জেঠাইমা। হাতে কোন কাজ না থাকলে বাপ-বেটিতে বসে বসে ঐ সব হয়। এ কিন্তু আপনাকে নিয়ে বলা হয় নি। আমাদের ওখানে এক তিরিক্ষি মেজাজের বৃদ্ধা আছে তাকে নিয়ে—

হাসতে হাসতে অনু বল্ল, না না, মনে করব কেন? ততখানি পাগল আমি নই।

আপনার ছেলে কেমন আছে জেঠাইমা, আমাদের খোকাদা? ভদ্রা প্রশ্ন করল।

ভাল।

কোথায়?

এই কোথায় যেন একটু বেরিয়েছে।

খাবার নিয়ে বাদল এল। জামাইয়ের দিকে চেয়ে অনু বল্ল, এস বাবা, এস। চলো রিনি।

জামাই বল্লেন, ওপোরে ঠাকুরমার হাত ছাড়িয়ে এসে এবার জেঠাইমার পাল্লায় পড়ে গেলুম। তা যাক, জেঠাইমার কাছে হার মানা লাভজনক, কি বল, বলেই ভদ্রার দিকে সহাস্যে চাইলেন তাপস বাবু।

হরিবোল, হরিবোল—

বাগান থেকে সকলেই ওপোর দিকে মুখ তুলে দেখল, গাড়ী বারাণ্ডার রেলিংএ ভর দিয়ে ঝুঁকে রয়েছেন ঠাকুরমা। তিনিই ঐভাবে হরিবোল দিচ্ছেন। ওরা সকলেই দালানে ঢুকে গেল। দিদি বল্ল, সুবো কোথায়? তাকে দেখছি না। অনু বাদলকে পাঠাল সুবোকে ডাকতে।

জলযোগ সেরে সবাই মিলে গাড়ীতে উঠল। গাড়ী থেকে রিনি বল্ল, জেঠাইমা, টা টা।

অনুও হাসিমুখে বল্ল, টা টা।

গাড়ীখানা রাস্তায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই তাপস বাবু বল্লেন, এখনকার দিনে এ রকম জেঠাইমা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভদ্রমহিলা সত্যিই খুব কাজের।

আর বাদলও তেমনি বিশ্বাসী, ভদ্রা স্বামীর মন্তব্যে যোগ দিল।

ঠিক সেই সময় ঠাকুরমা চারু-ঝিকে বলছিলেন, দেখলি ত চারু, দেখলি ত! এখনকার ছেলে মেয়েদের ব্যবহারগুলো দেখ। আমি যখন জল খাবার কথা বল্লুম তখন নাতজামাই বল্ল রাত্তির ন'টার আগে কোন কিছু খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না, অথচ নীচে নেমেই তার মত বদলে গেল। ঝিয়ের হাতে খাবার খেতে কি মিষ্টিই লাগে!

ঠাকুরমার মন রেখে চারু বল্ল, যা বলেছেন ঠাকুরমা!

ঠাকুরমা বল্লেন, ভাইপো ভাইঝিরা গাছের ফুল তুলেছে কি তোলে নি তার ঠিক নেই, বাড়ীর কত্তা তাদের যার বাড়া নেই মরণ টেঁকে গালাগালি করল, মুখে একটুও আটকালো না, আর পেয়ারের ঝি পট্ পট্ করে ফুটন্ত গোলাপগুলো ছিঁড়ে নাতনী-নাতজামাইয়ের মন রাখল, এতে কোন দোষ হয় না? এত সাহস ও পায় কোথা থেকে?

চারু বল্ল, হুঁ।

তোমরাই দেখো, তোমরাই পাঁচজনে বলো—

থাকগে ঠাকুরমা, ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না। ওদের

সংসারে ওরা যা ইচ্ছে করুক, আপনার কি! আপনি ত যেতেই বসেছিলেন—

গেলেই ছিল ভাল রে! বেঁচে থেকে এই যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হোত না। চোখের সামনে ছেলে পর হয়ে গেল! কিন্তু এও বলি, তুই শুনে রাখ, ঐ বিভু আমার এরকম ছিল না। বাপ্‌মায়ের মুখের দিকে চোখ তুলে কথা বলত না। ওর কাল হোল কলকাতায় বাসা নিয়ে থাকা, আর পাঁচটা পেত্নী শাঁকচুন্নীর কুমন্তন্না পাওয়া। সেই সঙ্গে মা-লক্ষ্মী ওকে পয়সা দিয়ে ওর নরক কুণ্ডের পথ পরিষ্কার করে দিল।

চারু নিরুত্তর। বৃদ্ধা কিছুক্ষণ পরে আপন মনেই বল্লেন, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার। এ রকম পয়সার মুখে ঝাড়ু মারি। যার বাড়া নেই মা সেই মাকে দাসী বাঁদি করে আপন ভাইপোদের পর করে বাইরের মেয়ে মানুষকে ঘরে এনে আমার শিক্ষিত উপায়ী ছেলে কি অনর্থই না করছে। দেখ, দেখ, তোরা সবাই শুধু দেখ একবার কাণ্ডটা।

কিছু পরে বল্লেন, যাবে, যাবে, সব যাবে। কিচ্ছু থাকবে না। অধর্ম্মের সংসারে মা-লক্ষ্মী কখনও টিকতে পারেন না। ঠাকুর দেবতারা পয়সা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন রে! এ সব পরীক্ষা। তিনি বলতেন—

এর পর ঠাকুরমা হঠাৎ চেয়ে দেখলেন, চারু সেখানে নেই।

বিড় বিড় করে বল্লেন, কোথায় গেল ওটা?

কিছু পরে আপন মনেই বিড়বিড় করে বল্লেন, সব সমান, সব সমান, কেউ কারুর নয়। দেখ্‌ত তোর, না দেখ্‌ত মোর।

গলা থেকে মালাটা খুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে জপের ভঙ্গীতে মালাটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে আপন মনেই বল্লেন, নাঃ, দেশ থেকে ওরা বোধ হয় চিঠিপত্তর আর দেবে না! এত দিন হয়ে গেল, পৌঁছানর খবরটা পর্যন্ত পেলুম না!

কিছু পরে মালা ঘোরানো অব্যাহত রেখেই বল্লেন, কাকেই বা দেবে, এখানে তাদের কেই বা আছে!

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঠাকুরমা মালাই জপতে লাগলেন।

নয়

থার্ড ক্লাস কামরায় বসে অধ্যাপক অজিত বোস মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করছেন। ট্রেনটা এত লেট্‌ হবে জানলে—

কিন্তু জানলেই বা কি হোত! আজ বিকেল থেকেই বাস নেই। পাটকলের ধর্মঘট নিয়ে সব বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকেই কারফিউ। নৈহাটী থেকে ট্রেন ছাড়া ফেরার অন্য কোন যানবাহনই নেই। কিন্তু ট্রেনটা এত লেট! যে লালগোলা প্যাসেঞ্জার শিয়ালদহে পৌঁছানোর কথা দশটা কুড়িতে সেই দশটা কুড়ি এখানেই হয়ে গেল। অজিত বোস স্থির হয়ে বসে আছেন বটে কিন্তু বার বার হাতের ঘড়িটা দেখছেন।

স্টেশনে গাড়ী থামল। মনে মনেই ভাবলেন, এটা কোথায়? নিজের মনেই বল্লেন, এতক্ষণে শ্যামনগর? উঃ।

লম্বা কামরা। দরজা খুলে ঢুকল তিনটি ছেলে। টেরিকটের জামা প্যাণ্ট, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, চোখে মুখে চন্‌মনে চাউনি। অজিত বাবু ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। ওদের বয়স কারুরই কুড়ির বেশী বলে মনে হয় না।

রাত্রির লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ভিড় বলে কিছুই নেই। যাত্রী ছিল বড় জোর ষোল-আঠারো জন। ওদের মধ্যে দু'জন মহিলা, বাকী সবাই পুরুষ। মহিলা দু'জনও বর্ষীয়সী, সধবা, মধ্যবিত্ত ঘরের বলেই মনে হয়।

ছেলে তিনটি উঠে একসঙ্গেই বসল। গাড়ীটায় স্পীড দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন উঠে দাঁড়াল, একজন বসেই রইল। ওরা দু'জন দু'পাশে গিয়ে হঠাৎ তিনজনে একই সঙ্গে ফস্‌ করে তিনখানা ছোরা বার করে বলে উঠল, খবরদার, কেউ নড়বেন না।

অজিত চমকে উঠল। অজিতের সামনে বসে-থাকা ছেলেটি অজিতের সামনে ছোরাখানা ধরে বল্ল, চুপ্‌।

গাড়ীর সকলেই হতভম্ব।

মানি ব্যাগ বার করুন, ওরা তিনজনেই সকলকে লক্ষ্য করে হুম্‌কি দিল।

ও পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাতর কণ্ঠে বল্লেন, এ কি বাবা, এ কি?

আমরা নক্‌শাল, ভাল ভাল ছেলেরা আজ হাজতে, তাদের জন্য কেস্‌ লড়তে হবে। চাঁদা দিন। ছেলেরা ছোরা-হাতে রাত্রি সাড়ে দশটায় এইভাবেই চলন্ত লালগোলা প্যাসঞ্জারে চাঁদা দাবী করল।

স্মিতমুখে অজিত পকেট থেকে ব্যাগ বার করে বল্ল, সামান্য চার পাঁচ টাকার মত আছে, এ নিয়ে তোমাদের কি হবে ভাই?

ওর কথায় ওর সামনের ছেলেটি কিছুটা বিস্মিত হোল কিন্তু ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিল।

মহিলাদের সামনে অপর একজন তখন বলছে, মা বোনের গায়ে আমরা হাত দিই না। আপনারা নিজেরাই হার চুড়ি সমস্ত খুলে দিন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাত থেকে একজন পট্‌ করে ঘড়িটা ছিঁড়ে নিল। স্টীল ব্যাণ্ডের ছিঁড়ে যাবার শব্দটাও অজিতের কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে অপর ছেলেটি অজিতের ঘড়িও ছিনিয়ে নিল।

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ছেলেদের ছিন্‌তাই কাজ সমাপ্ত হোল। গোটা পাঁচ ছয় ঘড়ি, দশ বারোটা মনি-ব্যাগ এবং মহিলাদের গহনা নির্বিঘ্নে তিন জন আগন্তুকের হাতে চলে গেল। অজিত নির্বিকার দৃষ্টিতে বসে বসেই দেখল। তার মনি ব্যাগ এবং ঘড়িও ওদের হাতে চলে গেছে।

ওদের মধ্যে যাকে নেতা বলে মনে হোল সে ফতোয়া দিল, খবর্দার, কেউ গোলমাল করবেন না। যদি বাঁচতে চান তা হলে যে যেখানে আছেন সে সেখানেই থাকবেন।

কেউ কোন উত্তর দেয় নি।

বারাকপুর স্টেশনে গাড়ীটা ঢুকল। ওরা তিন জনে নেমে গেল।

জানলা দিয়ে অজিত নজর করল, ওরা পাশের কামরায় ঢুকল। গাড়ী ছেড়ে দিল।

সপ্রশংস নেত্রে অজিত চেয়ে রইল। ততক্ষণে গাড়ীর মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। মহিলা দু'জনের এক জন গহনার শোকে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, অন্য জন অভিযোগ করছেন, মেয়ে কামরায় উঠলুম না, এ কামরায় এলুম, এত লোকের সামনে—; বৃদ্ধ বলছেন, আশ্চর্য, কেউ কোন কথাটি বল্ল না, ছিঃ, যত সব কাপুরুষ, ভেড়া!

অজিতের কানে এ সব কোন কথাই যাচ্ছিল না। সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল আর ভাবছিল—

টিটাগড় স্টেশনের আলো দেখা গেল। প্ল্যাটফর্মে গাড়ী থামতেই অজিত নেমে পড়ল। ঐ ছেলে তিনটিও পাশের কামরা থেকে নামল। ওদের মধ্যে একজন অজিতকে দেখেই তাড়াতাড়ি সরে গেল, বোধ হয় অন্যদেরও ইঙ্গিতে কি জানালো।

যেন কিছুই হয় নি এই ভাবে অজিত ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ইসারায় ডেকে বল্ল, একটা কাজের কথা ছিল, খুব দরকারী কথা।

লীডারটি বল্ল, সময় নেই, ব্যস্ত আছি।

প্ল্যাটফর্মের ওখানটা অন্ধকার-মতন। চেকার-টেকার কেউ নেই, যাত্রীও নেই।

অজিত পকেট থেকে পিস্তল বার করে ওদের দিকে দেখিয়ে বল্ল, কথা আছে, আমি শত্রু নই, ওরা তাড়াতাড়ি চলতি গাড়ীর একটা কামরায় উঠে পড়ল।

অজিতও সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

সে কামরায় লোকসংখ্যা আরও কম। অজিত ওদের লক্ষ্য করে বল্ল, চল হে, ঐখানটায় ঠাণ্ডা হয়ে বসা যাক।

তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল।

গাড়ী তখন জোরে চলতে আরম্ভ করেছে। একটা বেঞ্চে ওরা তিনজনে একত্রে বসল, অজিত বসল সামনের বেঞ্চে। অজিতের

বেঞ্চে এক বৃদ্ধ পশ্চিমা পা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বোধ হয় যেন ঘুমুচ্ছিল।

অজিত বল্ল, তোমরা কোনো ইউনিটের নও তা বুঝেছি, কোনো পার্টিরও নও। ইউনিটে এসো, অনেক সুবিধে হবে। আসবে ভাই?

ওরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল, কেউ কোন উত্তর দিল না।

অজিত বল্ল, কলকাতায় যাচ্ছ ত? সেখানেই কথা হবে।

অজিত সহজ ভাবে বসে রইল, ওরা কিন্তু এ্যাটেনশনে সজাগ হয়েই ছিল।

লীডারের দিকে ঝুঁকে অজিত অন্তরঙ্গতার সুরে বল্ল, তোমাদেরই চাই। অনেক কাজ আছে।

অজিতের নির্ভিক অন্তরঙ্গ ব্যবহারে ছেলে তিনটি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হোল। আবার ভাবল, কি জানি, পুলিশ নয় ত, টিকৃটিকি? তারা তাদের নেতার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। কেউ কোন কথা বলে নি।

যে পশ্চিমাটি পা গুটিয়ে বসেছিল সে নেমে গেল আগরপাড়ায়। তখন ওদের দখল-করা সামনাসামনি ছুটো বেঞ্চে ওরা ছাড়া আর কেউই রইল না।

মুখে হাসি এনে অজিত বল্ল, তোমাদের কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু মাত্র তিনজনে আর কি করবে, তাই ভাবলুম, যদি আমরা একজোট হতে পারি—

আপনি ঘড়ি আর ব্যাগ ফেরৎ চাইছেন, এই ত? লীডার প্রশ্ন করল।

আরে না না, ও সব কিছু নয়, ও ছেড়ে দাও। অনেক বড় কাজ আমাদের সামনে আছে। পিস্তলটি বার করে দেখিয়ে অজিত বল্ল, এই সব কত চাই তোমাদের? সবই আছে, কিন্তু আজ রাত্রে ত বেশী কথাবার্তা হয় না, তোমরাও আমার সঙ্গে যেতে রাজী হবে না। একটা ঠিকানা দিচ্ছি, কাল বিকেল চারটেয় একজন দেখা কোরো। কি বল?

ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখেছিল। ওদের নেতা বল্ল, ঠিক আছে, আমি যাব। ঠিকানা দিন।

অজিত কাশীপুরের ঠিকানা দিয়ে বল্ল, কাল বিকেল পাঁচটায় যাবে।

ওখানে কার খোঁজ করব?

বলবে, প্রকাশ মুন্সীর সঙ্গে দেখা করব। ঐ ঠিকানায় ঐ সময়ে দেখবে বাইরের ঘরে জনাকয়েক তাসটাস খেলছে; তাদের বল্লেই তারা আমার কাছে নিয়ে যাবে।

লীডার এদিক-ওদিক চেয়ে বল্ল, আপনার ঘড়ি ও ব্যাগটা নিয়ে নিন।

অজিত বল্ল, ঘড়ি থাক, কাল নিয়ে যেও; ব্যাগটা দাও, না হলে রাতে বাড়ী ফিরতে অসুবিধা হবে।

ওরা আর একবার দৃষ্টি বিনিময় করেছিল! এরপর ব্যাগটা অজিতের হাতে দিয়ে বল্ল, কোথায় নামবেন? শিয়ালদয়?

হ্যাঁ।

আমরা দমদমে নেমে যাব।

ঠিক আছে।

দমদমে গাড়ী থামতেই ছেলে তিনটে নেমে গেল। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে অজিত নিজের জায়গায় বসেই রইল। কিন্তু শিয়ালদয় রাত সাড়ে এগারটায় গাড়ীখানা আসার পর অজিত প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখল ঐ ছেলে তিনটের মধ্যে একজন প্যাণ্ট-পরা অবস্থাতেই গায়ে-মাথায় র‍্যাপার জড়িয়ে দূর থেকে অজিতের গাড়ীর দরজার দিকে নজর রেখেছে। অজিত দূর থেকেই বিশ্বস্ত বন্ধুর মত নীরব অমায়িক হাসি দিয়ে ছেলেটিকে বুঝিয়ে দিল যে সে ওকে চিনতে পেরেছে কিন্তু কাছে আসা বা কথা বলার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পর্যন্ত না করে অজিত আপন মনে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে একখানা ট্যাক্সিতে চেপে বসে দেখল ঐ ছোকরাও স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় না নেমে সিঁড়ির ওপোর থেকেই ওর দিকে নজর রাখছিল।

অজিত আপন মনেই ভাবল, ছেলেগুলো নেহাৎ বাজে নয়, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, গুড্ ক্যাচ।

পরের দিন বিকেলে যথাসময়ে যথাস্থানে একজন প্রকাশ মুন্সীর খোঁজ করেছিল। তাসের দলের একটি ছেলে হাতের তাস হাতে নিয়ে আগন্তুককে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। আগন্তুক দেখল ভেতরের ছোট ঘরে একখানি তক্তপোষ, একটি টেবিল, খান দুই সাধারণ চেয়ার এবং একটিমাত্র কাঠের আলমারি আছে। একখানি চেয়ারে প্রফেসর অজিত বোস একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

প্রকাশদা, ইনি আপনার কাছে এসেছেন।

কে? ও, এসো এসো, প্রকাশদা ওরফে অজিতবাবু আগন্তুককে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। পরিচয়কারী ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আগন্তুকের চোখে মুখে কেমন একটা ভীতিবিহ্বল ভাব। অজিত বল্ল, জায়গাটা খুঁজতে কষ্ট হয় নি ত?

না, আগন্তুক সংক্ষেপে উত্তর দিল। তারপর পকেট থেকে নতুন ব্যাণ্ড লাগানো ঘড়িটি বার করে অজিতের সামনে টেবিলের ওপোর রাখল।

ও, এটা এনেছ? বেশ বেশ, আবার নতুন ব্যাণ্ড লাগিয়েছ দেখছি!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার ব্যাণ্ডটা ত ছিঁড়ে গিয়েছিল।

বেশ বেশ, ব্যাণ্ড কিনতে ক'টাকা গাঁটগচ্ছা লাগল?

ও আর কি!

না না, এটা যে কিছু নয় তা ভেবো না। এই সব ব্যবহারেই বুঝতে পারছি যে তোমরা ভদ্রঘরের ছেলে, না হলে পরের জন্য কেউ কি এ রকমটা করে?

অজিতের কথায় ছেলেটি সহজ হয়ে নড়েচড়ে বসল। অজিত ঘড়িটা নিজের হাতে পরে বল্ল, ব্যাণ্ডটা ভালই হয়েছে। হয় নি? কি বল?

সে বল্ল, হ্যাঁ স্যার।

বিকেলে খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ স্যার।

আর একটু চা হোক না? কেমন? একা এসেছ, না তিনজনেই এসেছ?

না স্যার, একাই এসেছি। সেই রকমই ত কথা ছিল।

হ্যাঁ।

অজিত বাবু উঠে পেছনের দরজার পরদা সরিয়ে কাকে যেন উদ্দেশ করে বল্লেন, একজনের মত চা হবে।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন উত্তর এল না। অজিত বাবু ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। বল্লেন, তারপর? কাল থেকে ভেবে চিন্তে কি ঠিক করলে বলো?

ঠিক কিছু করি নি। আপনি আসতে বল্লেন তাই এসেছি। এতক্ষণে আগন্তুক অনেকটা সহজ হয়েছে। সে বোধ হয় এতক্ষণে নিজের মেজাজ ফিরে পেল।

গলা নামিয়ে অজিত বল্ল, তোমাদের মত কর্মীই আমরা চাই। দেশ জোড়া, রাজ্য জোড়া কত অসংখ্য কাজ পড়ে রয়েছে, লোকের অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না; না হলে জিনিসপত্র, টাকাকড়ি, কোন কিছুরই অভাব নেই। দেখবে?

টেবিলের ড্রয়ার থেকে অজিত বাবু দু' বাণ্ডিল করকরে নোট বার করে দেখালেন। বল্লেন, কত চাই? এটা ত মাত্র আমার এখানে রয়েছে। এমন ধারা অসংখ্য বাণ্ডিল যেখানে যেমন দরকার সেখানেই পাঠানো হচ্ছে।

ছেলেটি লোলুপভাবে চেয়ে রইল।

অজিত বাবু বল্লেন, আরও দেখ।

ছেলেটি বুঝল না, অজিত বোধ হয় পকেট থেকে কিম্বা কোথা থেকে এক নিমেষে দু'হাতে দুটি পিস্তল তুলে ওর দিকে লক্ষ্য করে ধরলেন। স্মিতহাস্যে বল্লেন, দেখেছ?

ছেলেটি চমকে উঠল। ত্রাস এবং ভয় তার মুখে চোখে ফুটে উঠল। হয়ত এটা হবে জেনেই প্রফেসার অজিত বোস ছেলেটিকে টাকা এবং অস্ত্র এইভাবে দেখিয়ে ছিলেন। মুখে হাসি এনে বল্লেন, এর ব্যবহার জানো?

সভয়ে ছেলেটি ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল। বুঝিয়ে দিল, জানে না।

পিস্তল তুটি সরিয়ে টাকার বাণ্ডিল যথাস্থানে চালান করে হাসিমুখে অজিত বল্ল, জানি, এ আমি কালই বুঝেছি। আরও একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না, ছোরা ধরতে এখনও শেখোনি? কাউকে মেরেছ কি?

এবারেও আগন্তুক ঘাড় নাড়ল, না, সে মারে নি।

সে আমি কালই বুঝেছিলুম। যে ভাবে ওগুলোকে ধরেছিলে তাতে গাড়ীর একজন লোকও যদি রুখে দাঁড়াতো তা হলে তোমরা তিন জনেই ঘায়েল হোতে।

ছেলেটি চুপ।

কি কর? মানে এই কাজে নামার আগে কি করতে?

পড়তুম।

কোথায়?

ইস্কুলে।

কোন ক্লাসে?

ক্লাস নাইন-এ।

এখনও পড়ছ?

না। ইস্কুলে আর যাই না।

কেন?

বাড়ীতে গোলমাল, মাইনে-টাইনে দেওয়া হয় নি—

কবে ছেড়েছ?

এই ডিসেম্বরে।

ক্লাসে উঠতে পারো নি ত?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

বাড়ীতে কে আছে ?

বাবা, আর বলতে পারেন মা, অনেকগুলি ভাই বোন, পিসিমা এই সব।

বল্‌তে-পারেন-মা কেন ? সৎমা ?

সেই রকমই।

বাবা কি করেন ?

পেপার মিল্‌-এ কাজ করেন।

টিটাগড়ে ?

হ্যাঁ।

কি কাজ ? অফিসে ?

না, ফ্যাক্টরীতে, মেশিনম্যান।

কি রকম উপায় ?

সামান্যই। মাস্টার ত আমার জন্য রাখতেই পারেন নি, ইস্কুলের মাইনেও অনেক দিন বাকী পড়ে ছিল।

তুমি কি বড় ছেলে ?

আজ্ঞে।

এ কাজে কবে থেকে নেমেছ ?

এই মাসখানেক।

বাবার কাছেই থাক ?

না।

কোথায় থাক ?

ঐ আর একজন যে সঙ্গে ছিল, ঐ ওরই বাসায় ঘুঘুডাঙ্গায় থাকি।

বাবা খোঁজ খবর করেন নি ?

মোটেই না, ঠোঁট উল্টে ছেলেটি জবাব দিল।

আহা, তোমার জীবনটাই নষ্ট হতে চলেছে, অথচ আমি দেখছি তোমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

ছেলেটি নড়ে-চড়ে বসল।

তোমার সঙ্গী তু'জনের কি খবর? ওরা কি ছাত্র?

ছাত্র না ছাই। একজন চায়ের দোকানে কাজ করত, আর একজন ছিল হকার, রেলে ধূপ বিক্রী করত।

তোমরা তিনজনেই এক দেশের?

না না, ওরা তু'জন রিফিউজী। আমি এদেশী।

অজিত নীরবে হাসল। ভাবল, মানুষের অহমিকা এই ভাবেই ফুটে বেরোয়। বল্ল, ওরা এ দলে এল কেন?

মানে, চায়ের দোকানে যে কাজ করত তার একটু হাতটান ছিল। মালিক একদিন দোকান থেকে ওকে তাড়িয়ে দেয়। যে ধূপ বিক্রী করত তারও খাওয়া জুটত না। সে তার বোনের কাছে ঘুঘুডাঙ্গায় থাকত। গেল মাসে আমরা তিনজনে ঠিক করি, এই কাজ করব।

ঘড়ি, গয়না এ সব বেচো কোথায়?

এর লোক আছে, ঐ ঘুঘুডাঙ্গাতেই।

কালকের ঘড়ি, গয়না এগুলো দিয়ে কত পেলে?

কত আর, বাহাত্তর টাকা।

কুল্লে? সোনাই ত পেয়েছ আট দশ ভরি।

না ত, ওরা বল্ল আড়াই ভরি।

আড়াই ভরি? হবে! তা—তা হলে তিনজনে ভাগ করে প্রত্যেকে পেয়েছ চব্বিশ টাকা, এঁ্যা?

হ্যাঁ। তা ছাড়া সবই যখন বলছি আপনাকে তখন বলি, সব কটা মনি-ব্যাগ মিলিয়ে পঁচানব্বই টাকা পেয়েছিলুম।

তা হলে সেটাই ত বেশী!

আজ্ঞে হ্যাঁ। গয়না-টয়নায় শুধুই ঝুট-ঝামেলা।

তা হলে গয়না নিয়ে লাভ? ঘড়িতেও ত আয় দেয় না।

আজ্ঞে না। তবে—

তবে কি?

ছেলেটি নিরুত্তর। অজিত বল্ল, যাতে লাভ নেই সে কাজ কর কেন? ও গুলো না নিলেই পারো।

নিই, তার কারণ ঐ ঘড়ি, গয়না যার কাছে জমা দেওয়া হয় তিনি আমাদের ঘর ভাড়াটা নিয়মিত দিয়ে দেন। ধরা পড়লে তিনি আমাদের হয়ে মোকদ্দমাও চালাবেন, আর অসুখ-বিসুখ করলে, অভাবে পড়লে, তিনি আমাদের ভার নেবেন, এই জন্যেই সিকি দামে এগুলো তাঁর হাতে দেওয়া হয়, ছেলেটি থেমে থেমে উত্তর দিল।

অ। তা তাঁর হাতে এ রকম কতগুলি ওয়ার্কার আছে?

আমি জানি না, তবে মনে হয় বেশ কিছু ছেলে তাঁর কাছে কাজ করে।

ভেতরের দরজার পরদা সরিয়ে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক প্রবেশ করলো হাতে এক প্লেট চিঁড়ে ভাজা এবং ডিমের ওমলেট নিয়ে। তার পেছন পেছন একটি মেয়ে নিয়ে এল এক কাপ চা। ওরা পাত্র দুটি টেবিলে নামাতেই প্রফেসর বোস বল্লেন, নাও ভাই, সামান্য জলযোগ সেরে নাও।

ছেলেটি ব্যাগ্র লোলুপ দৃষ্টি সংবরণ করে বল্ল, আপনি,—আপনার?

আমি এই কিছু আগে খেয়েছি। তুমি খেয়ে নাও ভাই।

ছেলেটি চামচে হাত না দিয়ে থাবা থাবা চিঁড়ে-ভাজা গিলতে লাগল।

প্রফেসার মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, রেখা, এ আমাদের নতুন ছাত্র, ক্লাস টেন-এ পড়ে, আসছে বছর স্কুল-ফাইন্যাল দেবে।

তাই বুঝি? ভাল ত! মেয়েটি দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল।

খেতে খেতেই কোনমতে প্রতি-নমস্কার সেরে আগন্তুক বল্ল, ইনি আপনার মেয়ে বুঝি?

মেয়ে নয়, ভাই-ঝি। অজিত উত্তর দেয়।

উনি?

আমার বউদি। দাদা বউদিই এখানে থাকেন, আমি মাঝে মাঝে

বউদির হাতে ভালমন্দ খাবার লোভে এ বাড়ীতে আসি, প্রফেসার হাসিমুখে উত্তর দিল।

ওম্‌লেট-এ কামড় দিয়ে আগন্তুক বল্ল, দাদাকে দেখছি না?

না, তিনি স্কুলের কাজ সেরে, ছেলে পড়িয়ে সন্ধ্যের পরে বাড়ী ফেরেন।

আগন্তুক বল্ল, বাড়ীর সামনে একটা সাইন বোর্ডে দেখলুম—

হ্যাঁ, এই কোচিং স্কুলটা দাদাই চালান। স্কুলে অনেকগুলি ছেলে পড়ে। তুমিও এইখানে পড়বে। সপ্তাহে দু'দিন আমিও পড়াই তবে নিয়মিত ভাবে প্রতি সপ্তাহে আসতে পারি না। আমারও ত নানারকম কাজ থাকে।

ওম্‌লেট শেষ করে ছেলেটি চায়ের বাটি তুলে নিল।

চা-টা কি ঠাণ্ডা হয়ে গেল? আর এক বাটি দেবে? স্নেহভরে প্রশ্ন করল অজিত।

নাঃ। ঠিক আছে।

এক চুমুকে চা শেষ করে বাটিটা সে নামিয়ে রাখল।

অজিত বল্ল, আচ্ছা ভাই, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব আনন্দ হোল। তুমি আমাদের স্কুলেই পড়বে। আর ওদেরও নিয়ে আসবে। তোমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। এখন দিন-কয়েক রেখার কাছেই পড়াশোনা করবে, তারপর যেমন যেমন বুঝব তেমন তেমন কাজ হবে। আর দেখ, ঐ সব ছোট কাজ বাপু কোরো না, ও কাজ কি ভদ্দরলোকের পোষায়!

অজিতের কথা শেষ হবার পর ছেলেটি চিন্তিতমুখে বল্ল, কি কাজ করব? এখন আমাদের চলবেই বা কি ভাবে?

সে ভার আমার। একবার যখন আমাদের স্কুলে এসে গেছ তখন তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না, তোমার সামনে এখন নতুন নতুন কাজ, অসংখ্য কাজ। তুমি রেখার সঙ্গে কথাবার্তা বলো, ও-ই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। আমি উঠি।

অজিত উঠে দাঁড়াল। ছেলেটিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বল্ল, আমিও আজ যাই, পরে আবার আসব।

অজিত ওর কাঁধে হাত দিয়ে প্রায় যেন চেপে বসিয়ে দিয়ে বল্ল, বোসো বোসো, কোন ভয় নেই তোমার। আমাদের বন্ধু বলেই বিশ্বাস কোরো। তোমার কোন ক্ষতি আমরা করবো না। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলো, স্কুলের নিয়ম-কানুন বুঝে নাও, তারপর যেও। আর হ্যাঁ, ওদের কবে আন্‌ছ।

যেদিন বলবেন। ততক্ষণে ছোকরা আবার চেয়ারে বসে পড়েছে।

ওদের কবে আসতে হবে সেটা রেখাকে জিজ্ঞাসা কোরো। আর হ্যাঁ, তোমার নামটা কি হে?

পঞ্চু।

বেশ। তা পঞ্চু, তোমার হাতে টাকাকড়ি ত এখন কিছু আছে; কালই মবলগ্‌ কিছু পেয়েছ। এরপর যেদিন যা দরকার হবে এখান থেকে নেবে। ঐ সব নোংরা কাজ করবে না। বুঝলে?

আচ্ছা স্যার।

অজিতবাবু পকেট থেকে ক্যাপস্টানের প্যাকেট বার করে পঞ্চুর সামনে ধরলেন।

আমি—আমি—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে কোন রকম লুকোচুরি নেই। নাও, নিয়ে নাও—

পঞ্চু একটা সিগারেট নিতেই অজিত নিজে আর একটা নিয়ে লাইটার দিয়ে ওরটা আগে ধরিয়ে নিজেরটা পরে ধরিয়ে ধীরে সুস্থে যে দরজা দিয়ে পঞ্চু এ ঘরে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার অজিতের চেয়ারে রেখা বসল। বল্ল, পঞ্চুদা, আপনি গান জানেন?

গান? পঞ্চু অবাক হয়ে গেল। ইতস্তত করে বল্ল, গান ত জানি না।

আমিও জানি না, রেখা উত্তর দিয়ে বল্ল, আমি জানি না, কিন্তু গান আমার খুব ভাল লাগে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এই আজই আমি একটা সিনেমায় যাব বলে ঠিক করেছিলুম। ঐ বইটায় শুনেছি খুব ভালো ভালো গান আছে, কিন্তু—

কিন্তু কি? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

থাক গে যাক। আজ আর যাব না। আপনি এসে গেছেন।

না না না, আমার জন্য আপনি সিনেমা বন্ধ করবেন কেন? আপনি যান। আমি বরঞ্চ আজ উঠি, আর একদিন আসব।

না, সে হয় না। কাকাবাবু রাগ করবেন।

কিচ্ছু রাগ করবেন না। আপনি বলবেন আমি চলে যাবার পর আপনি সিনেমায় গেছেন। আমি বরং এখনই উঠি।

আচ্ছা! চিন্তিতভাবে রেখা নিজের গালে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন ভাবল। শেষে বল্ল, আপনার কি কোন জরুরী কাজ আছে?

কেন বলুন ত?

আমার কাছে সিনেমার দু'খানা টিকিট আছে। যদি আপনার কোন ক্ষতি না হয় তা হলে আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন—

আমি—আমি—পঞ্চু সবিস্ময়ে বল্ল, আমি যাব আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ। কেন যাবেন না? ভাই বোনে সিনেমায় যাব, অসুবিধার কি আছে।

তা—তা যেতে পারি।

উল্লাসে মেয়েটা ফেটে পড়ল। বাঃ বাঃ, কি মজা! তা হলে আপনি বসুন, আমি এখনই তৈরী হয়ে আসি। সময় কিন্তু আর বেশী নেই।

রেখা লাফাতে লাফাতে ভেতরে চলে গেল।

একলা ঘরে পঞ্চু অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, ব্যাপার কি? সে কি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে! এই খাওয়া, এই ব্যবহার, এত যত্ন

এ সব সে কোনো দিনও পেয়েছে বলে মনে করতে পারে না। তার মনে পড়ল, ছেলেবেলাকার পড়া একটা গল্প। স্কুলের লাইব্রেরী থেকে বইটা নিয়ে সে পড়েছিল, এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড। সে সময়ে সে ভাল ছেলেই ছিল। পড়াশোনায় তার খুব মন ছিল। স্কুলের অপূর্ব মাস্টার বলতেন, পঞ্চুর খুব মাথা। একবার যা পড়ে তা সে ভোলে না। সেই গল্পের পড়া এ্যালিস্ নামক মেয়েটাকে পঞ্চু মনে মনে অনেক দিন ভেবেছে, তাকে ঈর্ষা করেছে। এতদিনে তার সেই ঈর্ষা, সেই কল্পনা কি সফল হতে চলেছে!

সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ী পরে হাই হিল্ চটি পায়ে নাচের ভঙ্গীতে রেখা এসে ঘরে ঢুকল। বল্ল, চলুন পঞ্চুদা, কুইক্। ছ'টা বাজতে মাত্র কুড়ি মিনিট। ছ'টার মধ্যে হাতীবাগানে পৌঁছতে হবে। ছ'টা-ন'টার শো।

রাস্তায় বেরিয়ে মেয়েটা বাস্-স্টপে ছুটে চল্ল।

পঞ্চু ওর পেছন পেছন এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চায়ের দোকান থেকে আর একটি ছেলে বেরুতেই ও ইসারায় তাকে চলে যেতে বলল। সে ইসারায় প্রশ্ন করতেই পঞ্চু তাকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করে।

বাস-স্টপে তিনজনেই এসে দাঁড়াল। পঞ্চুর সহকর্মী, যে কিনা কাল রাত্রেও ওর সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেণে ছিন্তাই-কাজ করেছে, সে আজ অচেনার মত ওরই পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

বাসে উঠেই রেখা বসার জায়গা পেল, ওরা দাঁড়িয়েই রইল। যেন ভীড়ের ধাক্কায় ওরা সরে যাচ্ছে এই ভাবে কিছুটা সরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রেখা তার সীট থেকে বল্ল, পঞ্চুদা, আমি টিকিট নিচ্চি, আপনি যেন নেবেন না।

পঞ্চু বল্ল, আচ্ছা।

মাইরি শালা, বেড়ে মাল বাগিয়েছিস্ ত, প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে অস্ফুট কণ্ঠে পঞ্চুর সহকর্মী পঞ্চুকে সকলের অজ্ঞাতে ঠেলা দেয়।

চুপ। তুই বাসায় যা, ন'টার পর ফিরব, পঞ্চু বল্ল।

সে ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিল। বেচারী পঞ্চুর বডি-গার্ড পঞ্চুর সঙ্গেই এসেছিল, পঞ্চু রেখাদের বাড়ীতে ঢোকার পর সে অনেকক্ষণ ইতস্তত করে চায়ের দোকানে ঢুকে চা ও টোস্ট খেয়েছিল, চারমিনারও টেনেছিল, তারপর যখন সে বিরক্তির শেষ সীমায় এসে গিয়ে কি করবে তাই ভাবছিল সেই সময় বন্ধুকে একটা মেয়ের পেছন পেছন ও বাড়ী থেকে বেরুতে দেখে ঈর্ষায় ফেটে পড়েছিল, সেই সঙ্গে কিছুটা আশ্বস্তও হয়েছিল, কিন্তু রেখার মুখে 'পঞ্চুদা' সম্বোধন শুনে আর নীরব থাকতে পারে নি। অথচ বাস্-এর মধ্যে কোন রকম কথা বলাও ত যায় না। পঞ্চুর তরফ থেকে কথা বলার কোন প্রশ্রয়ও পেল না। অগত্যা নিজের টিকিটটি নিজের পয়সায় কিনে অচেনা নিরীহ ভদ্রসন্তানের ন্যায় বাস্-এর রড্ ধরে দাঁড়িয়েই রইল। পঞ্চুরা যথাস্থানে নেমে গেল।

সিনেমা হল-এ রেখা ও পঞ্চু পাশাপাশি বসল সিনেমা দেখতে. ঠিক যেন পিঠোপিঠি ভাই-বোন। রেখা বল্ল, পঞ্চুদা, আপনি-টাপনি যেন বোলো না, লোকে সন্দেহ করবে। ভাই-বোনে কি আপনি বলে!

পঞ্চু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

ইন্টারভ্যালের পর পঞ্চু বল্ল, কি ব্যাপার বলো ত, আমার পাশের সীটটাও খালি, তোমার পাশেরটাও খালি। এরা কি এলো না?

কে জানে, ঠোঁট উল্টে রেখা ও কথায় আমলই দিল না। কারণ রেখা ভাল ভাবেই জানে ও দুটো সীটে কেউই আসবে না। ঐ টিকিট দুটো তারই কাছে। প্রকাশ কাকা চারখানা টিকিট এনে রেখাকে দিয়ে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকাশের সন্দেহ ছিল, পঞ্চুরা হয়ত তিন জনেও আসতে পারে, সেইজন্যই চারখানা টিকিট সে এনেছিল। ওরা যে তিনজনে এক সঙ্গে আসে নি এ জন্য প্রকাশ মুন্সী ওদের হুঁসিয়ারীর তারিফ করেছিল। এ ভাবে অচেনা জায়গায় তিন

জনে এক সঙ্গে ধরা দিতে না যাবার মতো বুদ্ধি ঐ ছেলেগুলোর তা হলে আছে! প্রকাশ ওরফে অজিত মনে মনে হেসেছিল; ধরা না দিয়েও ছোঁড়াগুলো কি ভাবে ধরা পড়ল! পুলিসের হাতে পড়লে ওগুলোর বড় জোর ছ'মাস এক বছর জেল হোত, কিন্তু আমাদের হাতে যাবজ্জীবন! সত্যিকার যাবজ্জীবন, এবং সেই জীবনটা পার্টির কাজে দীর্ঘস্থায়ী না হতেও পারে, দু'দিনের খেলা হয়ত তৃতীয় দিনেই ফুরোবে।

প্রকাশ মুন্সী ওরফে প্রফেসার অজিত বসুর দারুণ ফুর্ত্তি। এই-রকম ছেলেই ত চাই। ও তিনজনকে ত পাওয়াই গেল। ওদের মারফৎ আরও হয়ত ডজন খানেক আমদানী হতে পারে। ওর সেক্টরে রমারম্ কাজ চলবে। ভারতীও ভাল কাজ করেছে। সেই আটটা ছোকরাকে বাড়ী থেকে বার করে পুরোপুরী কাজে লাগিয়েছে মাত্র পাঁচদিনের চেষ্টায়। ছোঁড়াগুলো কাজও ভালই করছে কিন্তু ভারতীর সম্বন্ধে কেমন একটা চাপা সন্দেহ অজিতের মনে দেখা দিয়েছে। ভারতীর মতিগতি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটা বিষয়ে ভারতী ওদের নির্দেশ স্পষ্টই অমান্য করল। প্রায় এক হপ্তা হোতে চল্ল, এর মধ্যে ভারতীর সঙ্গে অজিতের চারবার দেখা হয়েছে, কথাও অনেক হয়েছে কিন্তু চিঠির কথা সে ঘুণাক্ষরেও অজিতকে জানালো না, অথচ পার্টির নিয়মে ছোটখাটো সমস্ত খবরই ভারতীর উচিত অজিতকে জানানো। ঐ যে ভারতীর নাম দিয়ে পত্রটা লিখে অজিত ক্লাবের ঠিকানায় পাঠিয়েছিল সেই চিঠি ভারতীর হাতে পৌঁচেছে এ খবরও অজিত জেনেছে, কিন্তু ভারতী নিজে থেকে ব্যাপারটা অজিতকে জানালো না। এটা পার্টি-ডিসিপ্লিনের দিক থেকে ভারতীর পক্ষে যে কত বড় অন্যায় তা ভারতী ভালভাবেই জানে, কিন্তু জেনে শুনেও এই গোপনীয়তা যখন সে ভাঙ্গল না তখন আরও কত কি সে গোপন করছে কে জানে! সুব্রত ঘটককে নিয়ে ভারতী স্পষ্টই এমন খেলা খেলছে যে সেটা তার পক্ষে রীতিমত বেইমানি। অজিত মনে মনে ভাবল, ঠিক আছে,

নানা ঝামেলায় জড়িয়ে আছি, এ দিকটা সামলে নিয়ে আসছে মঙ্গল, বুধবার নাগাদ এ বিষয়ে নজর দেব। দিস্ ক্যান ওয়েট ফর এ্যানাদার হাণ্ড্রেড আওয়ার্স।

সাহিত্য সভার দু'দিন পরে সুব্রত ঘটক ভারতীকে নিয়ে দিদির বাড়ী গিয়েছিল। তখনও তাপস বাবু অফিস থেকে ফেরেন নি।

দিদি ওদের দু'জনকেই যত্ন করে দালানে বসিয়ে ছিল, হাসিখুশি ও গল্পে ওদের বৈঠকটা মনোরম করে তুলেছিল, কফি ও স্যাণ্ডুইচও দিয়েছিল কিন্তু দিদি যে কখন ওদের অজ্ঞতসারে শীলাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তা ওরা দুজনের কেউই জানত না। শীলা এসে দালানে ঢুকতেই দিদি তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আগে থেকে বল্ল, এই যে শীলা, এসো এসো, তোমার কথাই আমার মনে হচ্ছিল, তোমাদের বন্ধু এসেছে। ভারতীকে তুমি নিশ্চয়ই চেন ?

ও, ভারতীদি, শীলা বল্ল, চিনি বইকি। আমি 'এ' সেক্সনে পড়ি, উনি 'এফ্' সেকসনে।

ভারতী ইতস্তত করল, কিছুটা যেন অশ্বস্তিও বোধ করল, কিন্তু হঠাৎ কোন কথা কইতে পারল না।

দিদি বল্ল, তোরা আজকালকার মেয়েরা সব কি হয়েছিস্ রে। এক ক্লাসে এক সঙ্গে পড়িস্, এর ভেতর এত আপনি-আজ্ঞে কেন ?

শীলা সলজ্জভাবে বল্ল, উনি আমাদের সিনিয়র ছিলেন। আমরা বরাবর এক সঙ্গে পড়ি নি। তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে—

এতক্ষণে ভারতী সাম্‌লে নিয়েছে। সে বল্ল, হ্যাঁ দিদি, ওদের এবং আমাদের ক্লাস ত এক ঘরে নয়, সে জন্য ওদের সঙ্গে দেখাশোনাটা কমই হয়। তারপর শীলাদি, আপনি এই বাড়ীতেই থাকেন বুঝি ?

হ্যাঁ, ঐ ওধারের ফ্ল্যাটে। মাসিমার কাছে প্রায়ই আসি ? রিনি কোথায় মাসিমা ? রিনি ?

রিনি এই এতক্ষণ এখানেই ছিল। এখন বোধ হয় ব্যাডমিণ্টন খেলতে গেল।

কোথায় ব্যাডমিণ্টন খেলা হয় দিদি, ভারতী সপ্রতিভ কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ঐ যে ঐ সামনের লন্-এ। বিকেল থেকে বাচ্ছারা বল পেটাপেটি করে। সন্ধ্যের পর আলো জ্বেলে বুড়োদের হুল্লোড় হয়।

আপনি খেলেন? ভারতী অন্তরঙ্গ হয়ে প্রশ্ন করে।

না বাবা, আমার ঐ সব লম্ফঝম্ফ পোষায় না।

জামাইবাবু? প্রশ্ন করল ভারতী। অন্য একটা প্রসঙ্গ পেয়ে ভারতী বেঁচে গেছে। কথাবার্তাগুলো খেলার খাতে বইয়ে দিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে চায়।

না, উনি ওসব খেলার মধ্যে যান না। মাঝে মাঝে কাজ না থাকলে ওখানে বসে আড্ডা জমান এই পর্যন্ত।

উত্তরটা দিয়ে দিদি বল্ল, তোমাদের ঐ সব খেলা-টেলা হয়?

ঘাড় হেঁট করে কিছুটা সলজ্জভাবে ভারতী বল্ল, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খেলি।

এতক্ষণে সুব্রত বলার মত কথা একটা খুঁজে পেল। বল্ল, জানো দিদি, ভারতী খুব পাকা খেলোয়াড়। ক্লাবে ওর নাম আছে।

কোন্ ক্লাবে খেলেন দিদি? শীলা জিজ্ঞাসা করে।

ঐ বালিগঞ্জে একটা ক্লাব আছে। সেখানে মাঝে মাঝে যাই, ভারতী উত্তর দেয়।

খেলুন না, আপনারা খেলবেন, সুব্রত শীলাকে লক্ষ্য করে বলেছিল। হয়ত তার অবচেতন মনে বাসনা হয়েছিল ওরা দু'জনে খেলুক, ভারতীর কৃতিত্বটা দিদির সামনে ফুটে উঠুক।

শীলা বল্ল, আমি পারি না, ও আমার পোষায় না।

তারপর হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে শীলা বল্ল, ভারতী দি, আমাদের কলেজে কি কাল ছুটি আছে?

কে বল্ল?

ঠিক মনে করতে পারছি না। একবার যেন শুনলুম প্রফেসার

অরুণ দাস ডি. ফিল পেয়েছেন বলে তাঁর সম্মানে কলেজ কাল ছুটি দিয়েছে, কিন্তু কোন নোটীশও ক্লাসে যায় নি, আর আসবার সময় তাড়াহুড়োতে কথাটা অফিসে জিজ্ঞাসা করার কথাও মনে পড়ে নি। তা আপনি কিছু শুনেছেন কি ?

না ত, মুখ তুলে ভারতী উত্তর দিল।

দিদি বল্ল, সব মেয়েই সমান, কারুরই কোন হুঁস্ থাকে না। কলেজ ছুটি কি না সে খবরটাও রাখিস্ না।

শীলা বল্ল, ঠিক আছে, কাল ফোন করে জেনে নিয়ে বেরোনো যাবে।

ফোন করে জেনে নিয়ে যেতে হলে ফার্স্ট পিরিয়ড হবে না, সুব্রত মন্তব্য করল।

শীলা বল্ল, ফার্স্ট পিরিয়ডে আমাদের ক্লাস নেই, আপনার আছে ?

ভারতী ঘাড় নেড়ে বল্ল, আছে।

তা হলে ?

দিদি বল্ল, ভারতী, তোমাদের বাড়ীর ফোন নম্বরটা কত ? বল ভাই, লিখে রাখি, আলাপ-পরিচয় যখন হোল—

সুব্রত উৎসুক ভাবে চেয়ে রইল।

ভারতী বল্ল, আমার নম্বর নিয়ে কোন লাভ নেই দিদি। ফোন আছে একতলায় বাবার অফিস ঘরে, আমরা থাকি তেতলায়, তা ছাড়া বাবা ঠিক পছন্দ করেন না যে কেউ আমাকে ডাকে।

আমি ডাকলেও দোষ ? দিদি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

ভারতী বল্ল, বাবা একটু কন্সারভেটিভ, সেকেলে—

তোমার আত্মীয়রাও ডাকেন না ? তোমার মামারা, মাসীরা ?

হ্যাঁ, তাঁরা ডাকেন, বাবার সঙ্গে কথা বলেন। আমি বা আমার মা আমরা কেউই নীচের অফিস ঘরে ফোনে কথা বলতে যাই না।

সব সময় ত আর অফিস ঘরে লোক থাকে না ! এমন ধারা সময় দাও যে সময় ঐ ঘর খালি থাকে। দিদি জেদ করতে লাগল। বল্ল, সেই সময়ই তোমাকে ডাকব।

ভারতী বল্ল, ঘরে কেউ না থাকলে ডেকে দেবে কে? এমন অনেক দিন হয় ফোন বেজে বেজেই থেমে যায়।

আমি যাই মাসীমা, শীলা ভদ্রার অনুমতি চাইল।

বোস্-না, বোস, এত ব্যস্ত কেন? ভদ্রা ওকে ছাড়তে চায় না।

শীলা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

দিদি বল্ল, তোমাদের বাড়ী ত সাদার্ন এভিনিউ-এ?

হ্যাঁ, অস্ফুটকণ্ঠে ভারতী উত্তর দিল।

শীলা ভারতীর দিকে সবিস্ময়ে চেয়েছিল।

তুমি ত শুনেছি তোমাদের বাড়ীর গাড়ীতেই কলেজে যাওয়া আসা কর। বেশ গাড়ীখানি।

আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ। ঐ তোমাদের সভার দিনে সুবো যে আমাদের দেখাল।

ভারতী বল্ল, গাড়ীতে কলেজে বড় একটা যাই না। বাসে-ট্রামেই যাই।

কেন? নিজের গাড়ী থাকতে—

বড় লজ্জা করে দিদি। আগে আগে যেতুম, মেয়েরা ঠাট্টা তামাসা করতো।

শীলা বল্ল, আমি যাই মাসীমা, এবং তারপর মাসীমার স্পষ্ট অনুমতি না নিয়েই দৌড়ে চলে গেল।

ভারতী বল্ল, আজ উঠি দিদি, সন্ধ্যে হয়ে গেল।

আজ—আজ কিসে যাবে? তোমার গাড়ী ত আনো নি, দিদি প্রশ্ন করল।

গাড়ী নিয়ে কারুর বাড়ী যাই না। ড্রাইভার থাকে ত, বাবার কানে কথাটা উঠলেই কোথায় কার বাড়ী গিয়েছিলুম এই সব নানা প্রশ্ন উঠবে।

আজ যাবে কিসে?

আজ বাস্-এ চলে যাবো।

বাস্-এ কেন? সুবোই ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিক। সুবোও ত আজ গাড়ী আনিস নি।

না দিদি। গাড়ীটা অয়েলিং করতে দিয়েছি। আজ সকালে ভয়ানক ট্রাবল দিয়েছে।

ওরা ওঠার উপক্রম করতেই দিদি বল্ল, তাঁর আসতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি, না হলে তোমাদের আর একটু বসতে বলতুম।

বসবে? সুব্রত ভারতীকে অনুরোধমূলক প্রশ্ন করল।

না, আজ আর দেরি করতে পারব না, ভারতীর অনুনয়।

ওরা দুজনেই উঠল। ভদ্রা, ওদের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো।

বাইরে বেরিয়ে সুবো সেদিন ভারতীকে বাসে উঠতে দেয় নি। ট্যাক্সিতে তুলে সাদার্ন এভিনিউ-এর মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল। সুবোর বুদ্ধিতে সুবো বুঝেছিল কাজ এগিয়েছে, ভারতীর স্ত্রীবুদ্ধিতে ভারতী বুঝেছিল যে, দিদি ওকে সন্দেহের চোখে দেখ্ছে। সুবো তার আশা প্রকাশ করেছিল। ভারতী প্রথমটা নীরব থেকে পরে বলেছিল, দিদিরা রাজী না হলে কি হবে? সুবো বলেছিল, একটা কিছু হবেই। কিছুটা ভেবে বলেছিল, যাই হোক, তুমি আমারই।

সুবো ভারতীর হাতে চাপ দিয়েছিল। ভারতী স্থাণুর মত বসেছিল। এ ছাড়া গাড়ীতে আর কোন কথাই হয় নি।

বাড়ী ফিরে ভারতী শুনল, প্রফেসার এসেছিলেন এবং বলে গেছেন ঘণ্টাখানেক পরেই আবার আসবেন। শুনেই সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু কিছু পরেই সে আবার ফিরেছিল এবং প্রফেসারও ঠিক তার পরেই এসেছিল। অজিত বল্ল, তারপর? আজ বিকেল থেকে কোথায় ঘুরছিলে।

ভারতী বল্ল, বিকেল থেকে? না ত। সন্ধ্যের পরে বেরিয়েছিলুম।

কোথায় ?

মানিকতলা বাজারে।

হঠাৎ ?

একটা কারণ ছিল।

কি কারণ ?

সে আমি বলতে পারব না।

তার মানে ? দেখো ভারতী, মনে রেখো, আমার কাছে তোমার কোন কিছুই গোপন রাখতে তুমি পারো না। পারো কি ?

না। খুব সহজভাবেই স্বীকার করে সে বল্ল, পার্টির কথা কিছুই গোপন রাখতে পারি না, কিন্তু অন্য কথা ?

কোন কথাই নয়।

তবে শুনবেন ? কিন্তু—না, সে বলতে পারব না।

কি ? কি ব্যাপার। বলোই না। অজিতের কণ্ঠে মিষ্টি অনুনয়।

না, সে আপনি হাসবেন, টিট্‌কারি দেবেন।

তা হলে টিট্‌কারি দেবার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে ? এটা কি ভাল হবে ?

বাবা রে বাবা ! কি জুলুম। উঃ ! তবে শুনুন, একটা খবর এলো কানে যে মানিকতলার বাজারে বড় বড় কাঁকড়া এসেছে। তাই থলি নিয়ে ছুটেছিলুম যদি গোটা কয়েক পাওয়া যায় সেই লোভে। এখন হোল ত, শুনলেন ত ?

কই মাসিমা ত তা বল্লেন না। তা থাক গে, কাঁকড়া কই ?

ঐ জন্যই বাড়ীতে বলে যাই নি। গিয়ে দেখি, কাঁকড়ার গন্ধ আছে কিন্তু কাঁকড়া নেই। শুনলুম আধঘণ্টা আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

আহা রে ! মুখে চুক্‌চুক শব্দ তুলে প্রফেসর বল্লেন, কি দুঃখু, মরে যাই, মরে যাই। তোমার কাঁকড়ার ওপোর এত লোভ ?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ভারতী বল্ল, ফেরবার সময় বিকট শব্দ শুনলুম আমাদের ও পাড়া থেকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। জানি ত ছুটো

আনকোরা নতুন ছেলে এ বেলা ওখানে কাজ করছে। তাই সোজা বাড়ীতে না ফিরে গেলুম ও-পাড়ায়। আশে পাশে ঘুরে বুঝলুম, আমারই ভুল হয়েছে। ওটা অন্য কোন শব্দ। তবুও একবার উঁকি দিয়ে দেখে এলুম, ওরা কি করছে। আপনার জয়দেব ত আমাকে চা খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। আপনি ওদের চায়ের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন শুনলুম।

গিস্‌লে ওখানে? কি দেখলে? ওরা বুঝি বসে বসে চা-ই খাচ্ছে।

না না, চা খায় নি, দু'জনেই মন দিয়ে কাজ করছে। আমাকে দেখে বল্ল, চা তৈরী করি। আপনি ওদের চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেটা ওরাই বল্ল।

হ্যাঁ, দিয়েছি। সারা রাত কাজ করবে ত। একটু চা না খেলে কিসের জোরে জুঝবে? বিড়ি সিগারেট ত ধরাতে পারবে না!

না।

একটু থেমে ভারতী বল্ল, আমার কিন্তু শব্দটা শুনে খুব ভয় হয়েছিল। ভাবলুম কোন এ্যাকসিডেণ্ট হোল বুঝি।

শব্দটা কোথা থেকে হোল কোন খবর পেলে?

কিছু না। পাড়ায় পানের দোকানে এক খিলি পান কিনলুম পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য। সেও কিছু বলতে পারল না।

খুব জোর আওয়াজ?

হ্যাঁ। অনেকটা দূর থেকে শুনেছি ত, ঠিক কোন জায়গায় হোল ধরতে পারি নি।

ওখানে পুলিস-টুলিস দেখলে?

না, একজনও নেই। থাকলে জিজ্ঞাসা করতুম।

ক'টার সময়?

সেটা এই ধরুন পৌনে ন'টা।

ঠিক আছে। খবর নেব। হয়ত আমাদের সুধীররা টেস্ট্ করছিল

কিম্বা—কিম্বা অপর পক্ষের কেউ। ভাবতে ভাবতে অজিত বল্ল, পৌনে নটা! খোঁজ করতে হবে।

ভারতীর অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎটা এই ভাবেই কেটে গেল। প্রফেসার অজিত বোস বল্লেন, আজ রাত্তিরটা এইখানেই কাটাবো।

হাসি হাসি মুখখানা অজিতের দিকে তুলে চোখের পুলক ও সর্বাঙ্গের আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারতী বল্ল, ভালই ত, আমার সৌভাগ্য। মনে মনে বল্ল, আর ক'দিন? পাখী তার শিকলি কেটেছে, এবার একদিন ফুড়ুৎ।

পাকা লোক অজিতের মনের মেঘ অনেকখানি কেটে গেল। নারী মাত্রেই মায়াবিনী। অমন যে জাঁহাবাজ অধ্যাপক, উনিও ভুলে গেলেন।

দশ

সাচ্ বাৎ বাদলা-ভাই, রামজীকা কসম্, আপ্না আঁখসে দেখা, বেহারী পাচক বাংলা জানা সত্ত্বেও অতিরিক্ত উৎসাহে হিন্দীতে দিব্যি গেলে বাদলের কাছে কথাটা বলেই হাসতে লাগল।

এই কথাই সে দিন বাদলকে বলতে গিয়ে ঠাকুর থেমে গিয়েছিল, কারণ পেছন থেকে অনুপমা গিয়ে পড়ে বাদলকে হীটার মেরামত করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

বাদল বল্ল, দূর পাগল! এ কি হয় না কি? ওর চেয়ে লক্ষ গুণ ভাল সব মেয়েদের সঙ্গে বাবুর কত দহরম-মহরম। তাদের তুলনায় ঐ বুড়ীটা—

বেশ, তোকে দেখিয়ে দেব। রাত্রে আমার সঙ্গে যাস, কিম্বা একাই বাগানে যাস। পেছনের জানালা খোলা থাকে। পরদার ফাঁক দিয়ে দেখিস্।

তুই ওখানে কি করতে গিয়েছিলি? কবে দেখলি?

দু'দিন দেখেছি। ঐ বুড়ী কি করে জানিস, ঐ বুড়ী বাথ্রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ভেতরের দরজা দিয়ে বাবুর ঘরে ঢোকে, আবার কেউ ডাকাডাকি করলে বাথরুমের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। কি বুদ্ধি! এই ভাবেই প্রথম দিন ঠাকুরমাকে ফাঁকি দিয়েছিল।

তুই বুঝলি কি করে?

হুঁ হুঁ বাবা। সব দিকে নজর রাখতে হয় রে। চারিকে নিয়ে পড়ে থাকলে এ সব জানা যায় না।

যাঃ, অসভ্য কোথাকার! যা বলছি তার উত্তর দে। তুই রাত্তিরে বাগানের দিকে কবে গেলি?

ঐ ঠাকুরমা যেদিন বকাবকি রাগারাগি করল তার দু'দিন পরে। ঐ বুড়ীর ছেলে খোকাটাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করতে সেও বলে

ফেল্লে, তার মা কোন দিনও রাতে ঘরে থাকে না, কোথায় থাকে তাও সে জানে না। সেই কথাটা শুনে আমি সেই রাতেই বাইরে বাগানে গিয়ে বাবুর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, জেঠাইমা বাবুর খাটে রয়েছে।

বাদল অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

হাসতে হাসতে ঠাকুর বল্ল, এত কথায় দরকার কি, আজ তুই নিজে গিয়ে দেখিস্; তা হলে ত আর সন্দেহ থাকবে না?

সে রাত্রে বাদলেরও আর সন্দেহ রইল না। রাত তখন একটা হবে। বাদল নিজের আউট হাউসের ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের ঘাসের ওপোর দিয়ে নিঃশব্দে বাবুর গেস্ট রুমের পেছনের জানলায় গিয়ে দেখে, জানলার আধখানা খোলা রয়েছে। নীল রংয়ের পরদা ঝুলছে। পেছনের সরকারী গলির উঁচু ল্যাম্প পোস্ট থেকে বিজলী বাতির রোশনাই জানলার পরদার মাথার ওপোর দিয়ে বাবুর ঘরে ঢুকেছে। সেই আলোর রেশ ঘরের মধ্যে ম্লান হলেও নাইলনের মশারির মধ্যে ছুটো মাথা পাশাপাশি স্পষ্ট দেখা যায়। ছু'জনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। ভাল করে দেখে বাদল তেমনি পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল কিন্তু ফিরে এসেও স্থির থাকতে পারে নি। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে চারু-ঝিকে ঠেলে তুলে দৃশ্যটা উপভোগ করার জন্য পাঠিয়েছিল। চারুও ফিরে এসে বাদলকে ঠেলা দিয়ে তার গায়ের ওপোর গড়িয়ে পড়ে বলেছিল, এ আমরা সবাই জানতুম গো, এ না হলে কি এমন হয়!

কিন্তু বাদল ভাবে, এমনটা সত্যিই কেমন করে হয়! অমন লটি, অমন হাস্নুনা বান্নু, ওদের ছেড়ে বাবু ওঁর চাইতেও বয়সে বড়ো বলে যাকে মনে হয় সেই ঝি-টাকে নিয়ে—। আশ্চর্য, অথচ বাবুর ত কোন অভাব নেই। হাস্নুনা বান্নু, লটি ওরা সকলেই বাবুর কাছে বাঁধা হয়ে থাকতে চায়, বাবুও ইচ্ছে করলেই ওদের রাখতে পারে, টাকার কোন অভাবই নেই, কিন্তু ওদের ছেড়ে—। কে জানে?

আবার বাদলের মনে পড়ে, বাবু আগে নিয়ম মত ঐ সব দিকে যেতেন কিন্তু এখন বেশ কিছুদিন হোল—

ড্রাইভার বৈজুও সেদিন বলেছিল, বাবু সত্যিই বুড়ো হয়ে পড়েছেন। আগে হপ্তায় একদিন ওদের বাড়ী নিশ্চয়ই যেতেন, এবার কিন্তু বেশ কিছুদিন হোল আর ওমুখো হন না।

বাদল ভাবল, কথাটা বৈজুকে বলতে হবে।

চারু বল্ল, এই হয় গো, এই হয়,—যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম। নইলে আমি তোর মায়ায় পড়ব কেন?

চটে গিয়ে বাদল চারুর পাঁজরে এক খোঁচা মারল।

যা বাপু, তোর ঐ খোঁচাখুঁচি ভাল লাগে না। অসভ্য চামার গুণ্ডা কোথাকার—

ভারী আমার মা-গোঁসাই রে। সতীলক্ষ্মী আমার কাছে ঘুরঘুর করতিস্ কেন?

মিছে কথা বলিস্ নি, মুখ খসে যাবে। ঘুরঘুর করতুম আমি, না তুই? দরজায় চাবি দেবার সময় সেই সে রাত্তিরে প্রথম কে কার হাত চেপে ধরেছিল, বুকে হাত দিয়ে বল্ ত মুখপোড়া!

হেসে ফেলে বাদল বিড়ি ধরাল। চারু বল্ল, মা গোঃ, আবার ঐ মড়াপোড়া গন্ধ বার করছিস্।

আর তোর মুখে যে পচা দোক্তার গন্ধ, আস্তাকুড়ের মতো।

বেশ ভালো! আমার মুখে আঁস্তাকুড়ের গন্ধ আছে ত আছে, তোর তাতে কি রে?

বিড়িটা শেষ হবার পরেই ওদের ঝগড়া মিটে গেল। চারু বল্ল, ঠাকুরমা কি সাধে রাগ করেন! সত্যিই ত, তিনি কি এসব সইতে পারেন!

বাদল বল্ল, তোর গুণ ত তিনি জানেন না। তিনি ভাবেন, চারি আমার একখানা ঘরে একা শুয়ে শুয়ে হরিনাম জপ করে।

করতই ত, তুই পোড়ারমুখো তাকে নষ্ট না করলে সে কি এমনটা হোত?

থাম্ থাম্, বাজে বকিস্ নি। তুই বিধবা মানুষ, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ও রকম করতিস্ কেন ?

আমার খুশি! আমি কি তোর ঘাড়ে পড়তে গিয়েছিলুম ?

এ রকম তর্ক ওদের প্রায়ই হয়। কাজটা যে ভাল নয় তা ওরা দুজনেই জানে। এ হোল বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কার। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য নেই। কিন্তু জোড়ার মধ্যে কার যে দোষ, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে টানে অথবা দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুকে, সে মীমাংসা কোন জোড়াই আজও পর্যন্ত করে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। প্রকাশ্য ক্রোধের সঙ্গে চাপা হাসি, চোখ-রাঙ্গানীর সঙ্গে কানাকানি, গাম্ভীর্যের আড়ালে উপছে-পড়া চাপল্য, এ সব মৃচ্ছকটিকের চারু দত্তর আগে থেকে স্বরু হয়ে বাদলা-চারুর আমল দিয়ে অনাগত যুগেও সমানে প্রবাহিত হবে। শাস্ত্র, তন্ত্র, সংহিতা সবই এখানে ভোতা হয়ে থোঁতা মুখে গর্জন করবে, কিন্তু গর্জন যতই করুক না কেন, তারুণ্য কারুর গার্জেনী কখনও সহ্য করে নি, করবেও না। সেই আড়াই যুগ আগেকার ফেলে-আসা তারুণ্যের স্মৃতিতে নবতরুণ বিভূতি মায়ের গার্জেনী সহ্য করল না। তার ছেলে সুব্রতও মনে মনে স্থির করছে বাবার গার্জেনী সহ্য করব না যদি বাবা আমার জীবনের একমাত্র আশা ভারতীর মিলনে অন্তরায় হন, এবং ভারতীও মনে প্রাণে স্থির করছে, পার্টিই বলো আর অজিতই বলো, কাউকে কোনো পরোয়া করব না যদি ওরা—

কিন্তু একটা জিনিস ভারতীকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল,—টাকার ব্যবস্থা কি করে হবে! ঐ আটটা ছেলেকে পার্টিতে আনার জন্য কিছু টাকা তার হাতে পড়েছিল, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয় যা আত্মসাৎ করলে তার কাজের কোন সুরাহা হোত। অদূর ভবিষ্যতে টাকা পাবার কোন আশা-ভরসা সে দেখছে না, সুব্রতর সঙ্গে কথা বলে সে যা বুঝেছে, সুব্রত দু'একশ টাকা এখনই দিতে পারে কিন্তু মা-ভাইদের দুঃখ ঘুচিয়ে ছ' মাস এক বছরের মতন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার

রেস্ত একসঙ্গে কোথায় পাবে, অথচ শুধু হাতে বেরোবার মত সাহস তার নেই। গল্পে, কাহিনীতে, অপরের অভিজ্ঞতায় শোনা যায় এক-কাপড়ে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে কিছুদিন কষ্টভোগ করে শেষে প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী কেউ কেউ হয়েছে কিন্তু সেটা শুধুই গল্প, আকাশ-কুসুমের পরিকল্পনা, সে কি আর বাস্তবে সম্ভব! তা ছাড়া সে যদি সত্যই বড়লোকের একমাত্র মেয়ে হোত, যদি সত্যই তার বাড়ী, গাড়ী, ড্রাইভার এই সমস্ত থাকত, আর্থিক অভাব কাকে বলে তা যদি সে না জানত তা হলে হয়ত এক-কাপড়ে বেরিয়ে পড়ার দুঃসাহস তার হোত, কিন্তু তা ত নয়। অভাব কাকে বলে তা সে হাড়ে-হাড়ে জানে, অভাবের কামড় সে মোক্ষম ভাবে খেয়েছে, কাজেই অর্থশূন্য প্রেমকে সম্বল করে বর্তমান পরিবেশকে ত্যাগ করার সাহস তার নেই। অনন্যচিন্ত্য ভারতী তাই ক্রমান্বয়ে ভাবছে এবং বাস্তব ভাবেই ভাবছে, কোথা দিয়ে, কেমন ভাবে একসঙ্গে মোটা টাকা যোগাড় করা যায়, কারণ বাঁচবার জন্য পালাতে তাকে হবেই এবং পালাবার আগে মায়ের হাতে বেশ কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের জন্য ভাল রকম সম্বলের ব্যবস্থা করে তবেই ঘর ছাড়া সম্ভব, তার আগে সুব্রত যাই কিছু বলুক না কেন, তার বোকামিতে সায় দিয়ে সারা জীবন পস্তাতে সে পারবে না। বড়লোকের ছেলে সুব্রত উচ্ছ্বাসে ভাসতে পারে, গরীব ভারতী উচ্ছ্বাসে বিশ্বাসী নয়।

ওদিকে সুব্রতর বিশ্বাস অন্য রকম। মোটর-বাইক, ফটো, ক্যামেরা, সোনার বোতাম, আংটি, এইগুলো বিক্রী করে সে যা পাবে তার মতে তাই যথেষ্ট, একান্ত পক্ষে পালাতেই যদি হয়। জামাইদা যদি কোন রকম ব্যবস্থা করে না দেন, তাহলে কোন মতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে মাস খানেক খবরের কাগজ দেখলে নিশ্চয়ই বাবার বিজ্ঞাপন সে দেখবে এবং তারপর ঠিকানা দিয়ে একখানা পোস্টকার্ড ছাড়লেই বাস্! আর কোন চিন্তা করতে হবে না। এখনও পর্যন্ত সুব্রত শোনে নি যে বাড়ী ছেড়ে বেরোবার আগে ভারতীকে মোটা টাকা দিতে হবে। ভারতীও

মুখ ফুটে এ রকম কোন আভাস দেয় নি যদিও সে কথাচ্ছলে শুনে নিয়েছে সুব্রতর টাকার দৌড় কতদূর।

এদিকে চারু-ঝি সে রাত্রে স্বচক্ষে দুটো মাথা একখানা খাটের ওপোর দেখার পর সেই মজাদার ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারল না। বাদল বড় লোকের বাড়ীর ওস্তাদ খানসামা। দরকারী, অ-দরকারী, মজাদার, আসর-জমাটি সমস্ত কাহিনীই ইচ্ছামত চেপে রাখতে পারে, কিন্তু সে ক্ষমতা চারুর নেই। চারু কেবলই ভাবে, কথাটা কি ভাবে কার কাছে পাড়া যায়। ঠাকুরমার কাছে বোলে কোন লাভ নেই, ঠাকুরমা সবই বুঝেছে, তার করণীয় আর কিছুই বাকী নেই। শুনলেই আবার খানিকটে গালাগালি মন্দ করবে যেটা চারুর মোটেই ভাল লাগে না। উল্টে চারুর নাম করে ঠাকুরমা হাঁকাহাঁকি করলে ঐ মনোরমাটা বাবুকে লাগাবে, আর তারপরেই বাবু চারুকে তাড়াবে। এমন সুখের চাকরি, আরামের চাকরি চারু ছাড়তে চায় না।

তা হলে আর কাকে বলা যায়? কিন্তু না বলেও কি থাকা যায়! এমন মজাদার ব্যাপার!

চারু ভাবে, মনোরমা বাবুকে কি করে দখল করল। সেও ঝি, চারুও ঝি। মনোরমা না হয় বামুনের মেয়ে কিন্তু একেবারে বুড়ী। সে তুলনায় চারু—বাঁঝা-খাঁজা কড়ে রাঁড়ী মানুষ, কিন্তু হক্ কথা বলতে হবে, বাবু কোনও দিন চারুর দিকে একবারও নজর দেয় নি। পুরুষের নজর মেয়েরা চেনে, পেছন ফিরে থাকলেও পুরুষের নজরের সুড়সুড়ি মেয়েদের চামড়ায় লাগে। চারু কখনও বাবুর বেচাল দেখে নি। বাবুর না, বাবুর ছেলেরও না। সেই বাবু ঐ তেরকেলে বুড়ীটাকে নিয়ে, কিন্তু চোখকে ত অবিশ্বাস করা যায় না। তা হলে সেই যে বৌদিরা সন্দেহ করে ঠাকুরমাকে বলেছিল, আর ঠাকুরমা সেই যে পুরানো আমলের কথা সেদিন রাগের মাথায় চেঁচিয়ে বলেছিল, সেটাই ঠিক। বহুকাল আগে থেকেই বাবুর সঙ্গে মনোরমার নটঘটি ছিল। এখন নাম ভাঁড়িয়ে এ বাড়ীতে এসে ঐ করতেই লোক-দেখানো

চাকরি নিয়েছে! সত্যি-মিথ্যে ঐ জেঠাইমাকেই জিগ্যেস্ করলে হয়। হাসতে হাসতে চারু যদি বলে—

না বাবা, ও লোক সুবিধের নয়। আমিও ঝি, তুইও ঝি কিন্তু কি রকম দেমাকের ওপোর থাকে। ওদের সঙ্গে ভাল ভাবে কথাই কয় না।

আর কইবেই বা কেন? ও যে বড় গাছে বাসা বেঁধেছে। ঠাকুরমাটা আজ মরে গেলে কালই ও খোলাখুলি ভাবে গিন্নী হয়ে বসবে। আর গিন্নী ত এখনই হয়ে আছে। কাজ নেই, কম্ম নেই, মায়ে পোয়ে দিব্যি চব্য চোষ্য খাচ্ছে, ছেলে বাবুর গাড়ী চড়ে মজাসে ঘুরছে, মায়ে পোয়ে ভাল ভাল জামা কাপড় পরছে—মুখে আগুন মাগীর, লজ্জাও করে না! আমরা হোলে এ ভাবে থাকতে পারতুম না! ঈর্ষা, হতাশা, দুঃখ সব কটা ভাবই চারুর মনে যুগপৎ খেলে গেল কিন্তু চারু বোধ হয় ঠিক মত বুঝলই না, তার এতখানি আক্রোশের কারণ কি? শেষে মনে মনেই বল্ল, ছিঃ, কালামুখী মাগীর কথা না ভাবাই ভাল।

একলাটি বসে বসে কি ভাবছ খোকাদা? দুপুরে খোকাকে একলা পেয়ে চারু তার কাছে এসে দাঁড়াল।

ভাবছি? মুখ তুলে চেয়ে খোকা বল্ল, অ চারু, কি বলছ তুমি?

বলছি একা-একা বসে কি ভাবছ ভাই?

ভাবছি? কই কিছু ত ভাবি নি, খোকা উত্তর দিল।

তোমার কাজের কি হোল ভাই, পান দোক্তা ঠাসা মুখটা অল্প নেড়ে চারু যেন মিটি মিটি হাসল।

জানি না ত। খোকা উত্তর দিল।

সেই যে কোন ডাক্তারের কাছে কাজ করতে? সেখানে আর যাও না?

না। ডাক্তার আর যেতে বলে নি।

কেন?

কি জানি? তার কাজ বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে।

ওমা সেকি ! এতদিন খাটিয়ে শেষে ছেড়ে দিল ? কি রকম ডাক্তার গো ? স্নেহার্দ্র কণ্ঠে চারু অভিযোগ করল।

খোকা নীরব। চারু বল্ল, তুমি না হয় বাবুর অফিসেই লেগে পড় ? তোমার মা যদি বাবুকে একটিবার বলে তা হলেই হয়ে যাবে। এই বয়সে একা-একা চুপচাপ থাকতে ভালো লাগে ?

খোকা নিরুত্তর। অগত্যা চারু আপন মনেই বল্ল, কি জানি বাবা, কি যে বোঝো তোমরা তা তোমরাই জানো ? আমরা হোলে বাবু থাকতে থাকতে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতুম। ভগবান না করুন, আজ বাদে কাল যদি বাবু চক্ষু বোজেন তখন তোমার কি হবে বলো ত ?

কি হবে ! এতক্ষণ পরে খোকা মুখ তুলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

হবে ? তা কি বুঝতে পারছ না ? তখন দাঁড়াবে কোথায়, খাবে কি ? এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে কোথাও না দেখে গলা নামিয়ে চারু বল্ল, এ রকম কাজ ত তোমার মা আর কোথাও পাবে না, এ রকম বাবুও কোথাও জুটবে না।

তা হলে কি হবে, খোকা চারুকেই প্রশ্ন করল।

কি হবে তা আমি কি বলব ? আমরা যেখানেই যাব গতর খাটিয়ে খাব কিন্তু তোমরা ত পারবে না। তোমাদের সুখের শরীল।

কি জানি, মাকে বোলো। আমিও না হয় মাকে বলি। মাকে ডাকব ?

মা কোথায় ?

মা ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মাকে ডাকি-না ?

না না, মাকে ডেকো না, আর এসব কথা মাকে বলতেও হবে না। মা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তোমার ভাবনার কি আছে ? এ্যাঁ ? চারু নিজেকে সামলে নিল।

হ্যাঁ, আমিও ত তাই বলি। আমার ভাবনার কি আছে ! খোকা খুশি হয়ে গেল।

তোমার মা এত ঘুমোয় কেন খোকাদা ? রাত্রে ঘুমোয় না বুঝি ?

কি জানি।

ওমা, সে কি ? এক ঘরে শোও আর জানো না, মা ঘুমোয় কি না ?

মা রাত্তিরে ঘরে থাকে না।

সে কি ? তোমার মা ঘরে থাকে না ? আমরা ত দেখি—

খোকা বল্ল, হ্যাঁ থাকে। প্রথম ঘরেই দেখি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর দেখতে পাই না। আবার সেই ভোরবেলা ঘরে আসে।

কোথায় যায় ? সারা রাত্তির থাকে কোথায় ? কপট বিস্ময়ে চারু প্রশ্ন করে।

কি জানি ?

তুমি কিছু বল না ?

বলেছি।

খোকাকে নীরব দেখে চারু বলে, কি বলে তোমার মা ?

বলে ঘরে গরম হয় তাই বাইরে থাকি।

সে কি ? গরম হয় ? এখনও ত বেশ ঠাণ্ডা আছে, তা ছাড়া তোমাদের ঘরে পাখা রয়েছে। এত গরম কিসের ?

কি জানি ?

ঘুমন্ত খোকাকে জাগিয়ে তোলার উপযুক্ত ভাষা খুঁজতে খুঁজতে চারু দেখল মনোরমা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে। মনোরমাকে দেখেই চারু ওর দিকে হাসিমুখে এগিয়ে গেল। বল্ল, ঘুম ভাঙ্গল জেঠাইমা ?

ঘুমুইনি মা, ম্লান কণ্ঠে মনোরমা উত্তর দিয়ে বল্ল, চুপচাপ শুয়ে ছিলুম, ঘুমুই নি।

তবে এরই মধ্যে উঠলে কেন ? এখন তো তিনটেও বাজে নি।

শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগল না। তা তুমি এখানে ? মা কোথায় ?

ঘুমুচ্ছেন। উঠলেই ডাকাডাকি শুরু করবেন, তখন দৌড়ুতে হবে, হাসতে হাসতে চারু উত্তর দিল।

মনোরমাকে নীরব দেখে চারু বল্ল, মায়ের যেমন পাগলামি! তুমি

ব্রাহ্মণের মেয়ে, দিব্যি রান্না করে দিচ্ছিলে, খাচ্ছিলেন, হঠাৎ কি যে মতিচ্ছন্ন হোল, ভগবানই জানেন। ঐ যে লোকে বলে বুড়ো বয়সে ভীমরতি, আমার মনে হয় মায়েরও ভীমরতি হয়েছে। না হলে অমন কত্তাবেক্তি ছেলে, আর এতবড় ছেলের-মা, তোমাদের নিয়ে কি কাণ্ডটাই না করলেন—

থাক্, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কি হবে। আমার বরাতে যা ছিল তা ত হয়েই গেছে। এবার—

মনোরমার কথাটা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য চারু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল কিন্তু মনোরমা তার বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে থেমেই গেল।

চারু বল্ল, হ্যাঁ জেঠাইমা, সেই জন্যই বলছিলুম, বাবুকে ধরে কয়ে বাবুর আপিসে খোকাদাকে যে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দাও না কেন? সমস্ত বয়েস, মন মরা হয়ে বসে থাকে, দেখলেও দুঃখু লাগে।

তা ত লাগে চারু, কিন্তু লেখাপড়া ত শেখাতে পারি নি, কি কাজ ও করবে?

ও জেঠাইমা, বাবুর আপিসে অনেক রকম কাজ আছে। আমি ত এ বাড়ীতে অনেক দিন আছি। তা ধর না কেন প্রায় চার বছর হবে। বাবুর কাছে কত সব বড় বড় লোক আসে, দু'চার দিন এ বাড়ীতে থেকেও যায়। শুনেছি বাবুর মস্ত বড় আপিস। ঐ আপিসে ছোট বড় নানা রকমের কাজ। বাবুর কাছে এসে বহু লোক মানুষ হয়ে গেছে আর তোমার ছেলের কিছু হবে না, তাও কি হয়! একবার বলেই দেখ না? তোমার কথা বাবু নিশ্চয়ই ফেলবেন না। চোখ টিপে চারু ইঙ্গিতপূর্ণ মৃদু হাসি হাসল।

চারুর কুৎসিত ইঙ্গিত যে ধূর্ত মনোরমা বোঝে নি তা নয় কিন্তু ইচ্ছে করেই সে ঐ ইঙ্গিতে কোন রকম আমল দিল না। পূর্বের ম্লান কণ্ঠস্বর বজায় রেখে বল্ল, দেখি, একদিন সময় সুযোগ বুঝে বলতেই হবে। তবে ওঁর এখন শরীর খারাপ—

ও জেঠাইমা, বাবুর শরীর খারাপ বলেই তো আরও তাড়াতাড়ি

কাজটা গুছিয়ে নেওয়া দরকার। হটাৎ ওঁর অসুখ যদি আরও বেড়েই যায়, যদি মনে কর আপিসে যাওয়া উনি বন্ধই করে দেন, তা হলে কি হবে একবার বলো ত? ঐ একটি লোকের ওপোর আমাদের সক্কলের ভরসা, তা ত দেখছ?

সবই ত দেখছি চারু কিন্তু কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

চারু—চারু কোথায় রে—

যাই ঠাকুরমা।

ঠাকুরমার ডাকে চারু সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল এবং ঠাকুরমার ফরমাস খাটতে খাটতে চারুর নিজেরই মনে হল যে ওদের উপদেশ দিতে গিয়ে যে কথাটা ও নিজের মুখে হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলল, সেই কথাটা এর আগে ওর মনে হয়নি কেন? সত্যি, বাবুর কিছু হোলে ও দাঁড়াবে কোথায়, ওর বাদলই বা কি করবে! চারু স্থির করল, যে যা খুশি করুক গে, ও কিন্তু আজ রাত্তিরে বাদলকে জোর করে বলবে, বাদল যেন বাড়ীর কাজ ছেড়ে বাবুর আপিসে যে কোন একটা কাজ পাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। চারুর বুদ্ধিতে বলে, আপিসের কাজ মাত্রই পাকা কাজ, বাড়ীর কাজ মনিবের মর্জি ও জীবনের ওপোর নির্ভর করে।

তা সেকথা সে বাদলকে বলেও ছিল। প্রথমে বাদল রাজী হয় নি। পরে ঠিক হোল, বাদল আপিসেও কাজ করবে, বাড়ীতেও করবে, কিন্তু বাদল যে রকম আয়েসী ও আড্ডাবাজ তাতে যে তার পক্ষে এত কাজ সম্ভব নয় তা বাদল খানিকটা ভেবেও ছিল কিন্তু চারুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করে সে মুখে স্বীকার করে নিল, বাবুকে কালই আপিসের কাজের জন্য অনুরোধ জানাবে। এটা ওরা দু'জনেই জানত যে কাজ থাকলে বাবু নিশ্চয়ই বাদলকে আগে দেবেন।

কিন্তু বাদল বলবে কাল সকালে সুযোগ বুঝে, অথচ সেই রাত্রেই অনুপমা ছেলের কথাটা পেড়ে বসল বিভুর কাছে। বল্ল, ওর একটা আয়ের ব্যবস্থা না হলে কি করে চলবে।

ঘটক বল্লেন, কেন গো, তোমার কি চল্‌ছে না নাকি?

অনু বল্ল, প্রায় ত অচল হয়েই আসছে। বিনা কাজে মায়ে-পোয়ে তোমার কাছে থাকলে লোকে কি বলবে? মা যা ভাবছেন তা ত সকলেই শুনেচে, এবার সুবো থেকে সুরু করে, ঝি, চাকর সবাই যখন ছি-ছিক্কার করবে তখন আমার না হয় যা খুশি হোক, তোমার নিন্দেয় যে চারদিক ভরে যাবে। ডাগর ছেলে রয়েছে বাড়ীতে, মেয়ে জামাই মাঝে মাঝেই আসে, তোমার এতখানি নাম-ডাক, লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

ধীর ভাবে সমস্ত শুনে ঘটক বল্লেন, তা আমি বুঝি অনু, সমস্তই বুঝি, কিন্তু বুঝেই বা কি করি বলো ত? যখন তোমার সন্ধান পেয়ে তোমাকে আদর করে এ বাড়ীতে এনে তুল্লুম তখন ভাবলুম, আমার বাড়ীতে আমি যা খুশি তাই করব কিন্তু এখন দেখছি পদে পদে অনেক বাধা। কিন্তু তাই বলে তোমাকে ত ফেলে দিতে পারি না! কি করে মানিয়ে নেওয়া যায় তাই ভাবছি।

আমি বলব? অনু বল্ল।

বলো।

বালিশ সরিয়ে অনুর হাতে মাথা দিয়ে ঘটক শুয়েছিলেন। অনু বল্ল, এক কাজ করো না কেন। খোকাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে রোজ আপিসে যাও। ও তোমার খাতাপত্র নিয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরুক। তুমি বলবে, তোমার সঙ্গে সারা ক্ষণ থাকার জন্য একজন লোক চাই। এতে আমাদের এখানে থাকার একটা কৈফিয়তও হবে, আর খোকাও ক্রমে ক্রমে আপিসের কাজ শিখতে পারবে।

ম্লান হেসে ঘটক বল্লেন, তা হয়, কিন্তু খোকার সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়ে গেছি। এত দিন তোমাকে কিছু বলিনি, কিন্তু আজ যখন কথাটা উঠেই পড়ল তখন বলি, অত বড় ডাক্তার এত দিন ধরে চেষ্টা করে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সোজা বলে দিলেন, বেশী কিছু উন্নতি হবে না। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি ঐ রকমই থেকে যাবে। সেই জন্যেই তিনি ওর চিকিৎসা করা ছেড়ে দিয়েছেন।

তা হোলে, অনু দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ল।

ঘটক বল্লেন, ভয় নেই, আমি যখন ভার নিয়েছি তখন ব্যবস্থা একটা করবই। ভবানীপুরে একটা বাড়ী দেখেছি। বাড়ীতে অনেক-গুলো ভাড়াটে আছে, সব পুরানো আমলের ভাড়াটে, কম ভাড়ায় আছে, তা সত্বেও মোট ভাড়া ওঠে দুশো সত্তর টাকা, টেক্স দিতে হয় কোয়ার্টারলি ছাপ্পান্ন টাকা। সেই বাড়ীখানা তোমার নামে কিনে দেব। আমি বা তুমি, আমরা থাকি বা না থাকি, সেই বাড়ীখানা বজায় থাকলে খোকার খাওয়া-পরার দুঃখ থাকবে না। গরীবের ঘরের ভালো একটি মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখব সেই বউয়ের সঙ্গে মেলা-মেশা করে ওর বুদ্ধির উন্নতি হয় কি না।' না হলেও বউ ত ওকে ফেলবে না! তোমার আমার পরে সেই বউই ওকে দেখাশোনা করবে।

এটাই ছিল অনুর মনের কথা। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে অনু বল্ল, তা কর, কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি ওকে রোজ সঙ্গে নিয়ে বেরুলে তাতেও ওর কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

আমার আপত্তি নেই কিন্তু ওকে বেয়ারা চাপরাসীদের সঙ্গে থাকতে হবে।

কোন রকম দ্বিধা না করেই অনু বল্ল, তাই থাকবে। ও যেমন বরাৎ করে এসেছে তাই করবে।

ঠিক আছে। তা হলে কাল থেকেই ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে বেরুব, লোক-দেখানো একটা মাইনেও ওকে দেব, কিন্তু ওকে বলে দিও, ও যেন বাইরের লোকের কাছে কোন রকম আজে-বাজে কথা না বলে এবং অফিসে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে না আসে।

না না, তা ও করবে না। বাড়ীতেও ত তোমার কাছে ও ঘেঁষে না।

তা বটে, কিন্তু ধরো, গাড়ীতে যাবার সময় ওকে ড্রাইভারের পাশে বসে যেতে হবে, আপিসের ইউনিফরম পরতে হবে, এতে হয়ত তোমার মনে কিছু হোতে পারে—

কিছু হবে না গো, কিছু হবে না, আমি কি জানি না আমরা কে, কথাটা বলতে গিয়ে অনুর গলাটা ধরে এল।

ঘটক অনুকে আরো নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করলেন।

অনু বল্ল, বাড়ীর কথাটা তুমি আগে ত বল নি! কি রকম বাড়ী গো? তোমার পছন্দ?

হ্যাঁ, বাড়ী ভাল, তোমারও পছন্দ হবে। তবে আগে যে বলি নি তার কারণ সরকারী কর্তাদের মতন আগে থেকে ঢাক ঢোল পেটানোকে আমি ঘেন্না করি। বাড়ীর কথাবার্তা পাকা করে তোমাকে নিয়ে গিয়ে একেবার দেখিয়ে দেব।

তা হ্যাঁ গো, বাড়ীর দাম ত অনেক টাকা! কত দিতে হবে? কত চাইছে তারা?

তা একটু বেশীই চাইছে। পুরনো ধরণের বাড়ী। কিনি যদি, তা হলে এখনই ওটা মেরামত করতে কম পক্ষে দশ বারো হাজার টাকা লাগবে। সেই হিসেবে আমি দাম বলেছি চল্লিশ হাজার, ওরা কমাতে চাইছে না। হু'ভাইয়ের বাড়ী। হু'জনের হু'খানা ঘর খালি পাব, বাকী সব ভাড়া বসানো। ভাড়াটে সমেত ন্যায্য দাম এখনকার বাজারে চল্লিশের বেশী হওয়া উচিত নয়। দেখি, হয়ত চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশে রফা হোতে পারে। তার বেশী দিতে হলে ডাহা লোকসান।

অনু চুপচাপ শুনে গেল। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারল না। ঘটকের নাক ডাকছে। অনু ভাবছে, ওর বাড়ী, ওর ছেলে, ওর বউমা। ছেলে আপিসে কাজ করছে। একটু বোকা ধরণের হলেও এমন কিছু আসে যায় না। সবাই কি আর চালাক হয়! নাতি নাতনীরা চালাক চটপটে হলেই হবে। আবার ভয় হচ্ছে, বাড়ী কি ওর সত্যিই হবে! তিনিও ত রিটায়ার করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় বাড়ী করবেন বলে ঠিক ছিল, কিন্তু কিছুই হোল না। ভগবান হয়ত এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন, কিন্তু ওর যা বরাৎ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

এলো মেলো, আবল তাবল বহু রকম চিন্তা করতে করতে রাত শেষ হোল। রাস্তার যেটুকু আলো ঘরে এসে পড়েছে সেই আলোয় বিভূতির টোল পড়া ঘুমন্ত মুখখানা দেখতে দেখতে অনুপমার মনটা টল্‌মল্‌ করে উঠল। এই সেই বিভূতি যে ওদের একতলায় আট টাকা ভাড়া দিয়ে থাকত, নিজের হাতে রান্না করে খেত, আর মেঝেয় মাদুর পেতে কাঁথা জড়িয়ে ঘুমুত। সেই বিভু আজ এই হয়েছে, আর আমি ওর আশ্রিত, পদানত ; ওর কাছে আজ আমি ভিখারী !

মিসেস্‌ মুখার্জীর বুক খালি করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

পরের দিন সকালে সবাই দেখল খোকা বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল। বৈজু ড্রাইভারও চেয়ে চেয়ে দেখল। ভাবল, আবার বোধ হয় ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে। চারু ঝিও দেখেছিল। ভেবেছিল, কি জানি, বাবু কি আজই ওকে কাজে বহাল করলেন। এক সময় বাদলকে ডেকে চুপি চুপি বল্ল, বলেছিলি ? বাবুকে কাজের কথা বলেছিলি ?

সে বল্ল, না, এখনও বলার সুবিধে পাই নি।

আর ওদিকে ঐ পাগ্‌লাটা যে বাবুর কাছে কাজ পেয়ে গেল !

দূর ! ঐ পাগল করবে কাজ ! তা হলেই হয়েছে।

সঙ্গে গেল দেখলি না ?

ও ত যেতই। কোথায় গেল কে জানে ?

চারু বল্ল, নিশ্চয়ই আপিসে গেছে। ওর মা আজ ঠাকুরকে বলে সকাল-সকাল ছেলেকে খাইয়ে দিল। আগে না খেয়েই যেত, দুপুরে ফিরে এসে খেত।

সেটা বাদলও দেখেছে। চারুর কথায় বাদল কোন উত্তর দেয় নি।

দু'দিন পরে সবাই বুঝল, খোকা বাবুর খাস বেয়ারার কাজ করছে। অফিসের খাতাপত্র সে-ই নিয়ে যায়, ফিরে এসে সে-ই সমস্ত ফাইল-টাইল গাড়ী থেকে নামিয়ে বাবুর আফিস ঘরের টেবিলে রাখে, যে কাজ

এতদিন ড্রাইভার করত। বাদলের মনে যে ঈর্ষা হয় নি, তা নয়। বৈজুও বাদলকে বল্ল, খোকাদা সারাদিন বাবুর কামরার বাইরে টুলের ওপোর বসে থাকে। বাবু সারা দিন যখন যেখানে যান খোকা বাবুর সঙ্গে যায়।

এর পর বাদলও এক দিন আফিসের কাজের জন্য বলেছিল। বাবু বল্লেন, কেন রে, বাড়ীর কাজ তোর পোষাচ্ছে না?

সে বলেছিল, তা নয় বাবু, বাড়ীর কাজও করব, অফিসেও কাজ করব।

বাবু বলেছিলেন, ঠিক আছে, শুনে রাখলুম, দরকার হলেই ডেকে নেব।

সব শুনে চারু বাদলের ওপোর রাগারাগি করেছিল কিন্তু আপন-মনেই নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়েছিল। কেন মরতেই যে বুড়ীটাকে উপদেশ দিয়েছিলুম!

মোটের ওপোর চারু মনে মনে বুড়ীর ওপোর হাড়ে চটে গিয়েছিল। কেন যে চটেছিল, তা সে নিজেও বোঝে নি, কিন্তু চটেছিল।

ঠাকুরমা ত ছিলই, এবার চারুও অনুকে বাড়ী থেকে তাড়াবার জন্য ভাবতে লাগল। এমন কি বাদলও খোকার ওপোর চটে রইল। অথচ খোকার কি অপরাধ তা বাদল নিজেই বুঝতে পারল না। বাদলকে কাজ দিলেও সে করত কি না সন্দেহ, কিন্তু যেহেতু খোকা কাজে লেগে গেল এবং বাদলকে এখনই নেওয়ার সুবিধা হোল না, সেই হেতু বাদল ভাবল ঐ পাগলটা তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। বিচিত্র এই মানুষের মন।

তেমনই বিচিত্র এই মানুষের চিন্তাধারা। সুবোর আশা ছিল দিদি বাবার কাছে এসে কথাটা পাড়বে কিন্তু দিদি আসেও নি, ফোনও করে নি। দিদির ওপোর সুবো চটে গেল। ভাবল, নাঃ, জীবনে আর ও-বাড়ীর দিকেও যাব না। আর জামাইদাটা এমনই হেন্‌পেক্‌ড্‌, দিদি না বল্লে জামাইদা কিছুই করবে না। ছিঃ। সে মনে মনে বাইক

ও ক্যামেরার খদ্দের দেখতে লাগল। আংটিটা যে কোন দিন স্যাকরার দোকানে বেচে দেওয়া যাবে, ব্যাংকের টাকা যাবার দিন তুলে নিলেই হবে, ঘড়িটা সে বিক্রী করবে না। বাইরে বেরুলে ঘড়িটা অবশ্যই দরকার। আর যদি হাজার দু'য়েকের মত হয় ঐ গাড়ী আর ক্যামেরা বেচে, তা হলে আংটিটা সে বেচবে না। নেহাৎ শুধু হাতে যাওয়া কি ভাল! ভারতী কি ভাববে!

ভারতী আজ সত্যিই ভাবছে। গভীর ভাবে ভাবছে। টাকাটা নিয়ে সে কি করবে? দু'পাঁচশ টাকা নয়, চার হাজার টাকা। এ থেকে হাজার দেড়েক কিম্বা দু'য়েক যদি মাকে দিয়ে বাকীটা নিয়ে সুবোর সঙ্গে সরে পড়া যায়, তা হলে দু-তিন মাস বাইরে গা ঢাকা দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। তারপর সুবোর বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা বন্দোবস্ত করবেন। এই চার হাজার টাকা প্রফেসার বোস আজ দুপুরে তাকে দিয়ে বলেছেন আগামী কাল বেলা তিনটের সময় বেলেঘাটার তিনকড়ি ভট্‌চায্যির বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হবে। আজই নাকি অজিত বাবু কি একটা জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছেন, সে জন্যই কাল ঐ টাকাটা তিনকড়ির কাছে পৌঁছে দেবার ভার পড়েছে ভারতীর ওপোর। টাকাটা ভারতীর কাছেই রয়েছে। সে যদি আজই সুবোকে ফোনে ডেকে আজ রাত্রেই পালায় তা হলে কে আর দেখছে। আবার—

হঠাৎ ভারতীর মনে হোল, সবটাই অজিত বাবুর পরীক্ষা নয় ত! ভাগ্‌গিস! পরশু অজিত বাবুর কি রাগ, কিন্তু বাস্তবিক ভারতীর তেমন কোন দোষ ছিল না।

পরশু সকালে অজিত বাবু ভারতীকে পড়াবার নাম করে বসেই বল্লেন, তোমাদের সাহিত্য সভার দু'একদিন আগে তোমাদের ক্লাবের ঠিকানায় তোমাকে কি কেউ কোন চিঠি লিখেছিল?

আমাকে? ক্লাবের ঠিকানায়? কই, কেউ কিছু লিখেছে বলে ত মনে পড়ছে না!

গম্ভীর কণ্ঠে প্রফেসার বলেছিলেন, ঠিক করে ভেবে বলো।

নানা চিন্তায় ভারতী সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়তেই বল্ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা খাম আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তাতে চিঠি কিছু ছিল না।

কি ছিল?

সে কিছু না। কোন এক ফাজিল ছোকরা এক বিশ্রী গোছের পদ্য লিখে পাঠিয়েছিল।

পদ্য? কপট বিস্ময়ের ভান করে প্রফেসার বলেছিলেন, কি পদ্য?

সে এক বাজে পদ্য। তার মাথামুণ্ডু কিছুই হয় না।

ছোকরাটি কে?

কোন নাম দেয়নি।

তুমি চিনতে পারোনি?

না।

কই দেখি সে চিঠি।

চিঠি—সেটা, ভাবতে ভাবতে ভারতী বল্ল, কোথায় রাখলুম তা ত মনে করতে পারছি না!

ফেলে দিয়েছ?

না, ফেলিনি। কিন্তু কোথায় রাখলুম মনে করতে পারছি না।

পরুষ কণ্ঠে প্রফেসার বল্লেন, দুটি ভয়ানক অন্যায় কাজ করেছ, এর জন্য তুমি জবাবদিহি।

কি? কি অন্যায় করলুম, ভারতী ভীত কণ্ঠে বলেছিল।

প্রফেসার বল্লেন, প্রথম অন্যায়, চিঠির কথা আমার কাছে গোপন রাখা। পার্টির নিয়ম ভাল ভাবেই জানো। তুমি যার আণ্ডারে আছ তার কাছে ছোট খাটো সব কিছুই তুমি বলতে বাধ্য। দ্বিতীয় অন্যায়, কোন কাগজ বাড়ীতে কিচ্ছু রাখবে না। রাখলেও এক মিনিটে বার করতে পারবে এই ভাবে রাখতে হবে। পার্টির এই দুটো নির্দেশ তুমি পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছ।

ভারতী নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ পরে বল্ল, মনে পড়েছে, আমার ঐ বইগুলোর পেছনে চিঠিখানা বোধ হয় আছে। দেখছি।

চিঠিখানা বার করে খামশুদ্ধ অজিতের হাতে দিয়ে দিল।

অজিত চিঠিটা নিয়ে খুলে একবার দেখেই নিজের পকেটে রাখল, পড়ল না। ভারতী বল্ল, পড়লেন না।

না। দরকার নেই।

কার লেখা ওটা? কে পাঠিয়েছে? ভারতী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল।

এখনও বুঝতে পারো নি?

না।

ওটা আমারই লেখা। তোমাকে পরীক্ষা করেছিলুম। পরীক্ষায় তুমি ফেল করেছ।

তাই নাকি? আপনার লেখা! কপট উল্লাসে ভারতী উৎসাহ দেখিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিটা হাল্কা করতে চেয়েছিল। বলেছিল, এখনও আমাকে পরীক্ষা করেন?

করি। পার্টিতে সকলেই সকলকে বরাবর পরীক্ষা করে। আমাকেও এ রকম পরীক্ষা অন্যেরা করে।

তাই না কি? ভাল ত!

ব্যাপারটা সেদিন সেখানেই চুকে গিয়েছিল কিন্তু আজ ভারতীর মনে হোল এই যে চার হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে অজিত বলে গেল সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, এটাও বোধ হয় পরীক্ষা। হয়ত সে বাইরে যাবে না, কিম্বা গেলেও হয়ত অন্য লোক ভারতীর ওপোর নজর রাখছে। এই টাকা নিয়ে সে কোথাও পালাবার মতলব করলেই সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে এবং ধরা পড়লে যে কি হবে তা ভারতীর ভাল ভাবেই জানা আছে।

অতএব এ যাত্রা ভারতীকে সংযত হতেই হবে। সেই সঙ্গে আরও একটা আশা হোল, হয়ত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভবিষ্যতে

আরও বেশী টাকা তার হাতে পড়তে পারে। তখন সে চেষ্টা করতে পারবে।

কিন্তু যদি বেশী টাকাই ও পায় তা হলে কোথায় যাবে! ভারতের মধ্যে ওদের পক্ষে কোন্ জায়গাটা নিরাপদ হতে পারে।

ভারতী জানে, সারা দেশ জুড়েই ওদের পার্টি সক্রিয় ভাবে চোরা-গোপ্তা সংগঠন চালাচ্ছে। তবে মধ্যপ্রদেশে ওদের দল নেই। নাগপুর, ইন্দোর, ভুপাল এই রকম কতকগুলো সহর আছে সেখানে ওদের কোন ইউনিট নেই, ইউনিট করবার চেষ্টাও বিফল হয়েছে। নিকট-ভবিষ্যতেও ওখানে ওরা ঢুকতে পারবে বলে মনে হচ্চে না।

অতএব সুযোগ যদি আসে এবং প্রথমেই ভারতের বাইরে যাবার কোন ব্যবস্থা যদি না হয়, যদি দেশের ভেতরেই কোন জায়গায় লুকিয়ে ওদের থাকতে হয়, তা হলে ঐ সব জায়গার কোন একটাতে গিয়ে দিনকতক গা-ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব। তারপর ঘটকের বাবা যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেন তাহলে ওরা আবার দাঁড়াতে পারবে, না হলেই ভোঁ—কাট্টা।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আবার ভাবল, নো রিস্ক নো গেন। যে দলের মধ্যে পড়েছি তা থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসার অন্য কোন উপায় নেই। কিছু দিন এই ভাবে অপেক্ষা করতেই হবে, আর যদি ভগবান মুখ তুলে চান—

পার্টির চাঁইগুলো কি মরবে না? পুলিশ এদের সবগুলোকে ধরে যদি হাজতে পোরে তা হলেও নিষ্কৃতি,—এই শয়তানগুলোর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এ কথাও ভারতী মনে মনে ভেবেছিল, কিন্তু এ সব যে কিছুই হবে না তাও সে জানত। অসহায় ভারতীর চোখ ফেটে জল আসে। কত আশা, কত উৎসাহ নিয়ে এদের কাছেই সে প্রথম তালিম নিয়েছিল, আর এখন? এখন যা অবস্থা, একেই বলা যায় সত্যিকার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'।

অচেনা ঘরে মেঝের ওপোর মাদুর ও সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে

অন্ধকার বিনিদ্র রাত্রে পঞ্চুও ঐ কথাটাই মনে মনে উচ্চারণ করছিল, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। এ আমি কোথায় এসে পড়লুম! এর চেয়ে আমার সেই ছিন্‌তাই জীবন ভাল ছিল, তার চেয়েও ঢের বেশী ভাল ছিল বাতাসী-মায়ের কাছে লাথি-ঝাঁটার চারখানা শুক্‌নো রুটি ও নুন-জলে সিদ্ধ করা মূলো শাক। প্রথম যেদিন রেখার সান্নিধ্য সে পেয়েছিল, দেখেছিল প্রকাশ মুন্সীর কাছে বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট, দু'হাতে দুই পিস্তল এবং বুঝেছিল যে ওগুলো চাওয়ামাত্রই তার হাতে এসে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছে তখন সে ভেবেছিল যে, তার মত ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেউ নেই, কিন্তু তারপর মাত্র এই ক'দিনে সে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁচেছে। ওরা তিনজনেই সেই কোচিং স্কুলে ঢুকেছিল, আদর যত্নও কম পায়নি, চর্ব্য চোষ্য ভুরিভোজে ক'দিন আনন্দে কেটেছিল, রেখা ও তার বোন শিখার আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতায় ওদের রিক্ত লাঞ্ছিত জীবনে তৃপ্তির স্রোত বয়েছিল কিন্তু তারপর যে ট্রেনিং ওদের সুরু হয়েছিল তাতে পঞ্চুর হোল হৃদ্‌কম্প, যদিও সে শুনেছে যে কানাইয়ের কাজটা নাকি ভালই লেগেছিল। সেই কানাই, যে কাপড়ের দোকানে কাজ করত এবং সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে যে লোকাল ট্রেনে ধূপ বিক্রীর কাজ শুরু করেই চলতি রেলে ছিন্‌তাইয়ের কাজে নেমেছিল! ওদের কোচিং-এ নাম লেখাবার দিন তিনেক পরেই প্রকাশ মুন্সী বল্লেন, সে কি রেখা, এখনও এদের দীক্ষা দাওনি? কি রকম শিক্ষয়িত্রী তুমি?

রেখা বলেছিল, আজই দেব।

তখনও ওরা বুঝতে পারে নি, দীক্ষাটা কি।

বুঝল সেই রাত্রে। রেখা ওদের দু'জনের হাতে দুটো ছোরা দিয়ে বল্ল, ঐ যে পাগ্‌লাটা রোয়াকে বসে বিড়ি টানছে ওটা পাগল নয়, ও পুলিসের টিক্‌টিকি। তোমরা দু'জনে ওকে শেষ করে এস। ভয় নেই, আমাদের দল পেছনেই আছে। তোমাদের বিপদ হোলেই সাহায্য পাবে।

এ কাজে পঞ্চুর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কানাই মুখে বড়াই দেখিয়ে বলেছিল, ও কাজ আমি একাই পারব, তু'জনের দরকার নেই।

চোখ পাকিয়ে গালে টোল পড়িয়ে রঙ্গিনী রেখা বলেছিল, না গো মশাই, একা একা হাতের সুখ করলে চলবে না, তু'জনের টীম ওয়ার্ক দেখতে চাই।

ওরা গিয়েছিল, পা টিপে টিপে গিয়েছিল। রাত তখন বারোটা হবে। চারিদিক নিসুতি, বিশেষ করে সমাজ-বিরোধীদের ভয়ে ঐ পাড়ায় সাড়ে আটটা ন'টার পর থেকেই লোক চলাচল বন্ধ হয়। পাগল-বেশী টিকৃটিকি অথবা সত্যিকারের পাগল, ঠিক যে কি তা পঞ্চুরা বুঝতেও পারে নি, আপন মনে রোয়াকে বসে হাসছিল, গুণ গুণ করে গান গাইছিল, আর জ্বলন্ত বিড়িটার দিকে দেখে দেখে এক একবার টান দিচ্ছিল। ওরা তু'জনে অন্যদিকে চেয়ে তার কাছাকাছি যেতেই সে ওদের দিকে বড় বড় চোখ তুলে চেয়েছিল। সেই হাসিমাখা চাউনিতে কোন আশঙ্কা কি সন্দেহ কিছুই ছিল না। ঐ ছিন্নবাস মধ্যবয়সী সমাজত্যক্ত লোকটিকে দেখে পঞ্চুর মন কেমন একটা গভীর অনুকম্পায় ভিজে উঠেছিল কিন্তু ওর সহকর্মী কানাই হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে তার ওপোর পড়ে তার গলার মধ্যে ছুরি বসিয়ে দিল। এর পরেই একটা গোঙানির শব্দ। লোকটা পা ঝুলিয়ে রোয়াকে বসেছিল, এবার মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল। এক ঝলক গরম রক্ত পঞ্চুর হাতের ওপোর ছিটকে এসে পড়ল। কানাই হেঁট হয়ে ওর পেটটায় ছুরি চালিয়ে ফালা ফালা করে দিল। তারপর সজোরে ওর মুখের ওপোর জুতো শুদ্ধ পায়ের একটা লাথি মেরে বিভৎস কণ্ঠে কানাই বল্ল, পালা। বলেই ওরা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে দৌড়ুতে লাগল। পঞ্চুও ওর পেছন পেছন দৌড়ুল, কিন্তু নিহতের হাত পা ছোঁড়াটা ও যেন নিরাপদ আস্তানায় ফিরে এসেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, এখনও যেন দেখতে পায়। ও মারে নি, কিছুই করে নি, শুধু খানিকটা গরম রক্ত ওর হাতের ওপোর এসে পড়েছিল, এতেই ওর সর্ব শরীরের

কাঁপুনি ও হাজার চেষ্টাতেও থামাতে পারছিল না। রেখার দেওয়া জলে হাতটা ধুতেও যেন পারছিল না, কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখতেও ওর যেন কেমন ভয় হচ্ছিল, অথচ চোখের সামনেই দেখল কানাই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের হাত ধুয়ে ছোরাখানা ঘষে ঘষে ধুয়ে বীরদর্পে হেসে হেসে রেখার কাছে বলছে কি ভাবে ও কাজ সেরেছে এবং লেখাপড়া-জানা পঞ্চুর অপদার্থতার কথাও বাদ দিল না। রেখা প্রথম বল্ল, আস্তে, পরে বল্ল, চুপ, শোবে চল।

সে রাত্রে এক ঘরেই ওরা ছিল কিন্তু পঞ্চু রইল অবজ্ঞাত, কানাই হোল সে রাত্রের হীরো।

পরের দিন কোচিং স্কুলের ভেতরের ঘরে প্রকাশ মুন্সী বলেছিল, তোমাকে দিয়ে ও কাজ হবে না। তুমি কারখানায় কাজ করবে, কানাইকে অন্য কাজে পাঠাব।

কারখানার কাজের কথা শুনে পঞ্চু মনে মনে খুশি হয়েছিল, কিন্তু কারখানায় গিয়ে বেচারী ফের মুষড়ে পড়ল। এ আবার কি কারখানা!

বস্তির মধ্যে চালাঘর। সেখানে ওকে কাজ করতে হবে জগৎ ভট্চায্যির অধীনে। ও হবে জগৎদা'র হেল্পার।

ছোট্ট ছোট্ট এলুমিনিয়মের বাটিতে বিভিন্ন কেমিক্যাল্‌স্ মেপে কলাইয়ের ডিসে ঢেলে ছুরির ফলার মত একটা জিনিষ দিয়ে সেগুলোকে চেপে চেপে মিলিয়ে শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা এসিড ঢেলে —ওঃ, সে কি বিড়ম্বনা! আবার ঐ জিনিসগুলোর নামই বা কত! ঐ ছুরির ফলাটাকে বলে স্প্যাটুলা, ছোট একটা মুখওয়ালা কাঁচের গ্লাস, তার নাম মেজার গ্লাস, যে খোলটার মধ্যে ওগুলোকে সাবধানে ঢেলে জগৎদা নিজের হাতে মেশান সেই খোলটার ছুটো অংশের ছুটো নাম, একটা সরু পেরেকের মতন কাঠি তার নাম ইস্‌প্লিট পিন, ঠাস্‌বার আগে ঐ গুঁড়োগুলোকে স্যাকরার দোকানের নিক্তির মতন নিক্তি দিয়ে ওজন করে তবে ঠাসতে হয়। ঠাসা হয়ে গেলে জগৎদা কোন কোনটাকে আবার পরীক্ষা করেন। যে জিনিসটা দিয়ে পরীক্ষা করেন তার নাম

প্রেসার গেজ। তৈরী হয়ে গেলে ইলেক্ট্রিকের বাল্ব জ্বালা গরম বাক্সে সাজাতে হয়। জগৎদা বলে দিয়েছে, খুব সাবধানে কাজ করবে; অসামাল হলেই ফেটে যাবে, আর ফাটলে তোমার আমার কারুর কোন চিহ্নই থাকবে না, এমন কি এই ঘরখানা পর্যন্ত টুক্‌রো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে। খবর্দার, এই ঘরে বিড়ি-টিড়ি খাবে না।

পঞ্চু বলেছিল, এ কাজে আমার দরকার নেই জগৎদা, আমি পালাব।

হাসতে হাসতে জগৎদা বলেছিল, কোথায় পালাবে ভাই? পার্টিতে একবার ঢুকলে আর বেরোনো যায় না। পার্টির দরজা একমুখো, আসা সহজ, যাওয়া অসম্ভব। আর যাবেই বা কেন? হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে জগৎদা বলেছিল, বাইরে তোমার জন্য লবডঙ্কা, সে ত দেখেই এসেছ। ভেতরে থাকলে ভবিষ্যতে প্রচুর উন্নতি। গোটা দেশই ত আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। দিন কতক কষ্ট করো, তারপর যা চাইবে তাই পাবে।

বস্তির যে ঘরে এই সব কাজ হয় সেই ঘরের পাশে একজনের থাকার মতো ছোট্ট একখানা ঘরের মেঝেয় মাদুর ও সতরঞ্চি পেতে পঞ্চু সারা দুপুর কারখানা ঘরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে চীনা বাদাম, ঝাল মুড়ি বিক্রয় করার পরেও বিনিদ্র অবস্থায় নিজের কথাই ভাবছিল। দিনের বেলায় ওকে জগৎদার হেল্পার হয়ে কাজ করতে হয়, সন্ধ্যায় চীনা বাদাম, ঝাল মুড়ি বিক্রয়ের অভিনয় করতে হয় চৌরাস্তার ফুটপাথে এবং সেই সঙ্গে চোখ কান খুলে নজর রাখতে হয় পাড়ার ছেলেদের ওপোর। কে কোন দলের, কার কি মতিগতি, দশ থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত উপযুক্ত ছেলে বাগিয়ে পার্টির কাজে লাগাতে পারলে রেখা শিখারা মধুর পুরস্কারে পুরস্কৃত করে। পঞ্চুর দুপুর ও সন্ধ্যাগুলো মোহমুগ্ধ অবস্থায় কেটে যায় কিন্তু রাত্রে একা শুলেই ওর মনটা ভার হয়ে আসে। এমন কি সেই যে হিন্দুস্থানী বাতাসী-মা, যে ওর নিজের মা মারা যাবার পর থেকেই ওদের বাড়ীতে ওর বাবার কাছে

রয়েছে এবং কাগজের কলে এখনও যথারীতি কাজ করছে, যে মা ওকে একদিনের জন্যও ভাল চোখে দেখে নি বলে ওর বিশ্বাস, সেই মায়ের জন্যও ওর মন কেমন করে। সেই অসহায় পাগল ভিখারীটার কথাও ওর মনে পড়ে, যেটাকে ওর সহকর্মী কানাই ওরই সামনে ছোরা মেরে শেষ করেছিল। ওরা শুনেছিল ঐ ভিখারীটা পুলিসের ছদ্মবেশী গোয়েন্দা, ওকে সাবাড় করতে না পারলে ওদের সমূহ বিপদ, কিন্তু যে রাত্রে ওরা তাকে শেষ করল তার একদিন পরে বাংলা কাগজে ও পড়েছিল যে কয়েকজন অজ্ঞাত আততায়ী এক অসহায় পাগল ভিখারীকে রাত্রির অন্ধকারে নির্মম ভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। রেখাকে খবরটা দেখাতে সে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, কে জানে, হবেও বা, অথবা পুলিস ঐভাবেই খবরটা স্বেচ্ছায় রটাল। কিন্তু এর পর পঞ্চু যেন কার কাছে শুনেছিল, প্রথম শিক্ষার জন্য এই রকম নিরাপদ শীকারই বেছে বেছে নেওয়া হয়। এই ভাবে প্রথম রক্তদীক্ষা শেষ হোলে সেই নবদীক্ষিতকে দায়িত্বের কাজে লাগানো হয়।

নানা রকম ভাবতে ভাবতে বেচারী পঞ্চু ঘুমিয়ে পড়ে। রাত পোহালেই অভ্যস্ত রুটীন। আহারাদি অধিকাংশ দিনেই চৌরাস্তার হোটেলে, মাঝে মাঝে রেখাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। সেই নিমন্ত্রণের আশাতেই ওরা যেন বেঁচে থাকে। সেটাই ওদের পুরস্কার। আহার, বিহার, আনন্দ, স্ফূর্তি এবং তৎসঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে মগজ-ধোলাই। সেই সব দিনগুলো পঞ্চুদের সত্যই ভাল লাগে। সেই অভীপ্সিত দিনের আশাতেই ওরা যেন বেঁচে থাকে। ওদের মনের সমস্ত জমা গ্লানি সেই রকম দিনের কয়েকটা মাত্র ঘণ্টায় সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে যায়; সাফ্ হয়ে যায় বিবেকের শেষ ছিটে ফোঁটা। এক দিকে নিরুপায় পরাধীনতা, অপর দিকে যাবতীয় দৈহিক আকর্ষণ ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মরীচিকা। সর্বোপরি দলের বাইরে যেখানে যাবার কোন পথ নেই, সেই বাইরের পরিচিত শূন্যতা পঞ্চুদের দল ছেড়ে বাইরে যাবার ক্ষীণতম আকাঙ্ক্ষাকেও সম্পূর্ণ লুপ্ত করে। এই ভাবেই হয় ওদের মগজ-

ধোলাই। এই ভাবেই সব জেনে-শুনে মনের তলায় পড়ে-থাকা সদিচ্ছার সামান্যমাত্র তলানিটুকুও পশুরা সবলে দমন করে।

ভারতীও এতদিন তাই করেছে। মগজ-ধোলাইএর যাবতীয় পাঠ এবং প্র্যাক্টিক্যাল তার শেষ হয়ে গেছে কিন্তু যেদিন সে উপলব্ধি করেছে যে তার জন্য সুব্রত ঘটক মধু ও দুধের ভাণ্ড নিয়ে মাল্য হস্তে অপেক্ষমান, সেই দিন থেকেই ভারতী উন্মনা। নূতনের আশায় পরিচিত ভরসাকে সে ঘৃণা করতে সুরু করেছে। সহজ, সুস্থ, মানবিক জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষায় যে কোন বড় রকমের ঝুঁকি নিতেও সে প্রস্তুত, শুধু এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছে যে, সে যেন সাফল্যলাভ করে। হঠাৎ কোন রকম হঠকারিতায় সে যেন নিজের কল্পনার রঙিন ঘরে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে না ফেলে। নিজের দলকে সে জানে, তাদের কার্যধারাও তার অজানা নয়, তাই তার একান্ত চেষ্টা, দলের প্রচণ্ড নির্মম দৃষ্টি এড়িয়ে ফস্কে বেরিয়ে যাবার উপযুক্ত উপায় অনুসন্ধান করা। সেদিন সে কাগজে পড়েছে আমেরিকার মহাকাশচারীরা বিপজ্জনক মহাকাশের নিরাপদ রন্ধ্র দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চাঁদের দিকে ছুটে গিয়েছিল এবং সেই রকম নিরাপদ বায়বীয় সুড়ঙ্গপথে চাঁদ থেকে মর্ত্যলোকে ফিরে এসেছে। ভারতীও সেই রকম নিরাপদ রন্ধ্রের সন্ধান করছে, যে রন্ধ্র তার কল্পনার ভবিষ্যৎ সুখী জীবনের দিকে তাকে ও সুব্রতকে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবে।

কলেজের শেষ পিরিয়ড কামাই করে ভারতী নোটের বাণ্ডিল নিয়ে তিনকড়ি ভট্টাচার্যের ঘরে গিয়েছিল এবং খামে মোড়া টাকাটা তিনকড়িদা'কে দিয়ে বাড়ী ফিরে কেবলই ভাবতে লাগল কবে সে মুক্তি পাবে। এই সন্দেহ, ভয় ও অন্ধকার অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ নিয়ে ওকে কত দিন এই বিভীষিকার জীবন যাপন করতে হবে। ঐ ফোয়ারা দেওয়া ফুলবাগানের বাড়ী কি ওর কাছে আকাশ কুসুমই থেকে যাবে?

এগার

মা, মা-

উগ্র, রুক্ষ, বিকৃত কণ্ঠে খোকা বিকট ভাবে চিৎকার করতে লাগল। চারু ওকে টানতে গিয়ে ওর ঠেলা খেয়ে পড়তে পড়তে কোনো ক্রমে নিজেকে সামলে নিজের ঘরের দিকে ছুটে পালাল। নিশুতি গভীর রাত্রের নীরবতা ভেদ করে খোকার তারস্বরে চিৎকার চারুর কাছে এক অভাবনীয় পরিস্থিতি।

ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে অনু কোনক্রমে মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে জানলার পরদার পাশে এসে চাপা গলায় বল্ল, ছিঃ, এখানে চেঁচাচ্ছিস কেন, ঘরে চল, ঘরে চল।

রোজ তুই এখানে থাকিস আর আমাকে বলিস্—

গম্ভীর কণ্ঠে অনু বল্ল, চুপ্, ঘরে চল্। বলেই অনু জানলাটা বন্ধ করে দিল।

খোকা সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে একত্রিশ বছরের খোকা তখন একেবারে আত্মহারা।

খোকার প্রথম চিৎকারে বাদলের ঘুম ভাঙ্গতে সে কান খাড়া করেছিল। দ্বিতীয় চিৎকারে সে উঠে বসে দেখল, বিছানায় চারু নেই, ঘরের দরজা খোলা। বাদল মশারি ঠেলে বেরুতে বেরুতেই দেখল চারু হাঁপাতে,হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকছে। চাপা গলায় বাদল বল্ল, কি ? কি হয়েছে ?

চারু ঘরের দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়েই রইল। দরজা বন্ধ করতেই ঘরটা পুরো অন্ধকার। বাদল সুইচ জ্বেলেই চারুর ভয়বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বল্ল, কি রে ?

রাত্রে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বল্‌তে বাদলের অভ্যাস হয়ে গেছে।

চারু ঠোঁটের ওপোর আঙুল দিয়ে ইসারা করল, চুপ। তারপর এগিয়ে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিল।

পাশের ঘরে খট্ করে শব্দ হোল। ঐ ঘরে থাকত ড্রাইভার ও ঠাকুর। ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সে বল্ল, কৌন হ্যায় রে?

বৈজু ড্রাইভারের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি।

দোতলার পেছনের ঝুল-বারাণ্ডা থেকে সুব্রত হাঁক দিল, চেঁচায় কে? খোকাদা?

নিচে থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সুব্রত ডাক দিল, বাদল, বাদল—ঠাকুর।

চারিদিক শুনসান, কোথাও কোন শব্দ নেই।

কি হয়েছে, সুবো, ঠাকুরমার সাড়া পাওয়া গেল।

সুবোর উত্তরটাও শোনা গেল। সে বল্ল, বুঝতে পারছি না ঠাকুরমা। খোকাদার গলা পেলুম, তারপর আর কোন সাড়া নেই।

পায়ের আওয়াজে বোঝা গেল সুবো দ্রুতপদে ঝুল-বারাণ্ডা থেকে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

অন্ধকারেই চারুর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বাদল ফিস্ ফিস্ করে বল্ল, কোথায় গিস্‌লি? কি ব্যাপার?

পরে বলব, বলেই চারু বাদলকে টেনে নিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

এর পর পুনরায় সুবোর সাড়া পাওয়া গেল, কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে? খোকাদা?

ঠাকুর উত্তর দিল, জী।

সুবো ওপোর থেকে টর্চের আলো ফেলে পেছনের বাগানটা ভাল করে দেখছিল। বল্ল, তোমরা ওখানে কেন? কৈ চোট্টা আয়া?

ঠাকুর বল্ল, নেহি জী!

তব্?

কুছ্ মালুম হোতা নেহি।

তা খোকাদা ওখানে কি করছ ? বাইরে বেরুলে কেন ?

খোকা তেমনই খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

টর্চ হাতে সুব্রত সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামছে, তার চটির আওয়াজে বাদল ঘর থেকেই বুঝতে পারল। আর শুয়ে থাকা ভাল দেখায় না, অথচ চারুকে তার নিজের ঘরে চালান করা যায় কি ভাবে সেটাও সে ভেবে পাচ্ছে না ; কিন্তু কিছু একটা এখনই করতে হবে, না হলে বাবু কি দাদাবাবু এসে যদি এখনই ওর ঘরে ধাক্কা দেয় তা হলে কি হবে ?

তোর ঘরে যা, বলেই বাদল নিজের ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছন পেছন চারু টুক্ করে বেরিয়েই নিজের ঘরের তালা খুলে দরজার চৌকাঠে এমন করে দাঁড়াল যেন সে এইমাত্র গোলমাল শুনে ঘরের দরজা খুলেছে। ঠাকুর মুখ টিপে হাসল।

ব্যাপার কি ঠাকুর-ভাই, বাদল প্রশ্ন করে।

জানি না। খোকাদা'ই চিৎকার করেছে, কিন্তু কেন বুঝছি না।

বাদল খোকার হাত ধরতেই খোকা এক ঝট্‌কায় বাদলের হাত থেকে নিজের হাতটা ছিনিয়ে নিল। বাদল মধুর কণ্ঠে বল্ল, কি হয়েছে খোকাদা ?

খোকা নিরুত্তর।

টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সুব্রত এদিকের বাগানে এসে গেল। ঠাকুর, বাদল এবং খোকার মুখের ওপোর আলো ফেলে বল্ল, কি ব্যাপার রে, সবাই এখানে এসেছিস্ ? খোকাদা চেঁচাচ্ছিল কেন ?

বাবুদের বাড়ীর চালাক চাকর বাদল বোধ হয় কিছুটা অনুমান করেছিল। জিনিসটা লঘু করার উদ্দেশ্যে বল্ল, কি জানি, রাত্তিরে হয়ত ঘুম-টুম হয় নি, মাথাটা ত ঠিক নয়—

কী! মাথা ঠিক নয় ? আমি নিজে চোখে দেখলুম,—খোকা গর্জে উঠল।

কি দেখলে খোকাদা? কোন চোর-টোর এসেছিল, সুব্রত প্রশ্ন করল।

চোর কেনে, মা। ঐ মামার খাটে মা শুয়েছিল, আর রোজ রোজ বলে, গরমে ঘরে থাকতে পারি না।

হরিবোল, হরিবোল, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে।

সবাই মুখ তুলে দেখল, ওপোরের ঝুল-বারাণ্ডায় ঠাকুরমা এসে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাঃ, যত সব বাজে কথা। সুবো আপন মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করে বল্ল, দেখলে কি করে? জানালা ত বন্ধ।

খোকা বল্ল, না, খোলা ছিল। মা-ই বন্ধ করল। বিশ্বাস না হয় চারুদিকে জিগেস করো। সেও দেখেছে।

সে এখানে কি করে এল? আমি ঘর থেকে বেরোনোর পর সে তার ঘরের দরজা খুলেছে, বাদল জোর দিয়ে বলেছিল।

না। সেই আমাকে সঙ্গে করে এখানে এনেছে। চারুদি,—খোকা চারুর দিকে চেয়ে ডাক দিল, চারুদি, কি দেখলে বলো।

চারু এগিয়ে এসে বল্ল, ওমা, সে কি কথা! আমি তো এই গোল-মাল শুনে এখন ঘর থেকে বেরুচ্ছি। আমি আবার তোমার সঙ্গে কখন এলুম! কি যে বলে, পাগল-ছাগল মানুষ!

আজ দুপুরে তুমি আমাকে বলো নি যে, মা রাত্তিরে কোথায় থাকে আমাকে দেখাবে? তারপর তুমি ত এই ঘর থেকে বেরুলে, ওঘরে ত ছিলে না। খোকা বাদলের ঘরটা দেখিয়ে চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করল।

গালে হাত দিয়ে চারু বল্ল, কি সর্বনাশ, তুমি কি বলছ খোকাদা! আমি—আমি তোমাকে কখন বল্লুম যে তোমার মা রাত্তিরে কোথায় থাকে আমি দেখাব? ছি ছি ছি, মিথ্যে কথা বোলো না।

তুই বলিস্ নি? দুপুরে আমি যখন সিঁড়িতে বসেছিলুম—

দুপুরে তুমি থাকো কোথায়, তুমি ত বাবুর সঙ্গে আপিসে যাও, চারু উত্তর দিল।

কাল আবার কোথায় আপিসে গেলুম, খোকা উত্তর দিল।

সুবোর মনে হোল, সত্যিই ত, কাল ছিল রবিবার, বাবাই অফিসে যান নি।

খোকা, খোকা কোথায় রে, বাড়ীর ভেতর থেকে জেঠাইমার গলা শোনা গেল।

ওঃ, কিছু জানেন না, নেকি! ওপোর থেকে ঠাকুরমার সশ্লেষ মন্তব্য নীচে সকলেরই কানে এল, কিন্তু কেউ তাতে কান দিল না। বাদল ডাকল, জেঠাইমা, একবার বাইরে আসুন ত।

কেন বাবা, কি হয়েছে, এদিককার বন্ধ জানালা খুলে সুচতুরা অনুপমা নিজের ঘর থেকে বল্লেন, কি ব্যাপার, রাত দুপুরে সবাই ওধারে কেন?

বাদল বল্ল, খোকাদা বোধ হয় ঝোঁকের মাথায় এধারে এসে হাঁকাহাঁকি সুরু করেছে।

খোকা! তুই ওখানে কেন? অনুপমা প্রশ্ন করেই উত্তরের জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে প্রায় যেন দৌড়ুতে দৌড়ুতে বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, সব দরজা খোলা, ব্যাপার কি?

দরজার চাবি সব কোথায় থাকে, গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুব্রত।

আমার ঘরের তাকের ওপোর। কে খুলল দরজা? মনোরমা সবিস্ময়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে।

আমি খুলেছি, খোকা সগর্বে উত্তর দেয়।

কেন? জেঠাইমা জিজ্ঞাসা করে।

কেন, মুখ ভেংচে খোকা বল্ল, কেন তা বুঝছিস না, তোকে দেখতে। তুই মামার খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলি।

সে কি রে, এ সব কি বলছিস্ তুই, মনোরমা ভেঙ্গে পড়ল।

যা দেখেছি তাই বলছি। আমি ডাকাডাকি করতে তুই ত উঠে ঐ জানলাটা বন্ধ করলি।

নাও কথা! তুই কি বলছিস্ রে? আমি ত আমার ঘরে শুয়ে

ঘুমুচ্ছিলুম। তুই কখন উঠেছিস্, কখন দরজা খুলেছিস, আমি ত কিছুই জানি না।

তুই ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলি? ঘরে ছিলি তুই? তুই কোনও দিন ঘরে থাকিস্? কোথায় থাকিস্ তাও জানতুম না। কাল দুপুরে চারুদি বল্ল, তাই রাত্তিরে—

খবদ্দার খোকা, আমার নাম করবে না, আমি তোমায় কিচ্ছু বলিনি। লোকের নামে মিছেমিছি লাগালে মুখ খসে যাবে, চারু গর্জন করে উঠল।

খোকা চারুর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এতক্ষণে বৈজু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সুবো বল্ল, সবাই উঠল কিন্তু বাবার কোন সাড়া-শব্দ নেই কেন? বাবাকে ডাকব?

অনু বল্ল, না বাবা, এই সব নোংরামির মধ্যে ওঁকে ডেকো না। উনি রোজ রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোন্, এ আমি জানি।

হ্যাঁ, শুনেছি বটে। যাক, আর বাজে বাজে গুলতান কোরো না, যে যার ঘরে যাও। কথাগুলো বলেই সুবো বল্ল, খোকাদা, ঘরে যাও।

খোকা খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কি, যাবে না? সুবো পুনশ্চ প্রশ্ন করল।

না, খোকার সরোষ গম্ভীর উত্তর।

এবার সুব্রত গম্ভীর কণ্ঠে বল্ল, বাদল, ঠাকুর, তোমরা ঐ পাগলটাকে ধরে ওর মাথায় জলটল ঢেলে ওটাকে ঘরে নিয়ে যাও।

তারপর যেতে যেতে আপন মনেই সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্ল, কালই ওটাকে বাড়ী থেকে বিদেয় করতে হবে। পাগল নিয়ে এক বাড়ীতে বাস করা যায় না।

খানিকটা এগিয়ে সুব্রত বল্ল, চাবি দিয়ে চাবি আমি ওপোরে নিয়ে যাব। যার খুশি হয় ভেতরে এস, না হলে বাকী রাত বাইরে থাকতে হবে।

কথাটা যে বিশেষ করে অনুপমাকেই শুনিয়ে বলা হল সেটা সকলেই বুঝল, কারণ বাইরে যারা ছিল তাদের মধ্যে অনুপমা ও খোকার ঘরই বাড়ীর ভেতরে, বাকীরা সবাই বাইরে আউট-হাউসে থাকে।

বাদল ও ঠাকুর দু'পাশ থেকে দু'জনে খোকাকে ধরে টানতে লাগল। খোকা প্রথমে টানাটানি করে শেষে বল্ল, আমি যাচ্ছি, কিন্তু ও যাবে না। শেষ কথাটা অনুপমাকে লক্ষ্য করেই বলেছিল।

ছিঃ, ও রকম বলতে আছে, বাদল চাপা গলায় খোকাকে ধমক দেয়।

এর পর বাড়ীতে এনে বাদল খোকার মাথায় মুখে জল দিতে গিয়ে দেখল ওর মাথা দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। জল দেওয়াতে খোকা আপত্তি করল না, কিন্তু মায়ের দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রইল;

অনুপমা ঘাড় হেঁট করে নিজের ঘরে ঢুকল। বাদল ও ঠাকুর দু'জনেই পায়ে-পায়ে বাইরে চলে গেল। সুব্রত ভেতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে গম্ভীরভাবে চাবির গোছা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠে গেল। ভিজে মাথায় খোকা ওর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই রইল।

বিভু ঘটক নিজের বিছানায় উঠে বসেছিলেন। তাঁর কাশি এসেছিল। অনেক কষ্টে কাশি দমন করে নিঃশব্দেই ছিলেন। বাইরের সমস্ত কথাই তাঁর কানে যাচ্ছিল। সব থেমে যাবার পরে গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন, অতঃপর কি হবে। এই নোংরা অবস্থার হাত থেকে কি ভাবে মান-সম্মান বজায় রেখে কাল সকালে ছেলের কাছে মুখ দেখাবেন। এমনটা যে হতে পারে, ঐ পাগল যে এতখানি উৎকট অবস্থার সৃষ্টি করবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। অনুকে অবশ্য এরকম আশঙ্কার কথা একদিন প্রকাশ করে বলেও ছিলেন। অনু কথাটাকে একেবারে আমল দেয় নি, বলেছিল, খোকার এ রকম বুদ্ধি নেই। এখন বুঝলেন, অনু নিদারুণ ভুল করেছিল। তিনিও ভুল করেছেন। খোকাকে আগে থেকে বাদলদের ঘরে চালান করলেই ঠিক হোত। বাগানের দিকের জানলা বন্ধ করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন

কিন্তু এদিক ওদিক দু'দিকের জানলা বন্ধ রাখলে ঘরটায় হাওয়া আসার সব পথই বন্ধ হয়ে যায়। এদিকের জানলা খুলে রাখা যায় না, সেজন্যই ওদিকেরটা খুলে রেখে ভেবেছিলেন রাত্রে আর ওদিকে কে যাবে! তা ছাড়া জানলায় পরদা ত থাকেই, কিন্তু আজ দেখা গেল কোন পরদাই তাঁকে আড়াল করতে পারল না। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে সব ফেঁসে গেল।

হঠাৎ পাশের ঘরে ছোট্ট অথচ তীব্র চিৎকার। কান পেতে ঘটক সেই শব্দটা শুনেই তড়াক্ করে বিছানা থেকে বেরিয়ে কোন কিছু চিন্তা না করেই দরজা খুলে বাইরে এসে অনুর ঘরের দরজায় গিয়ে দেখেন দরজাটা পুরো খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে, আর বিছানার ওপোর অনু পড়ে আছে, অনুর ওপোর খোকা চেপে বসে দু'হাত দিয়ে সজোরে তার গলাটা টিপে ধরেছে। অনু কোন শব্দ পর্যন্ত করতে পারছে না, কেবল পা দুটো ছুঁড়ছে।

মুহূর্তের মধ্যেই ছুটে ঘরে ঢুকে বিভু ঘটক খোকাকে এক ধাক্কায় অনুর ওপোর থেকে ঠেলে ফেলে দিলেন। বল্লেন, হারামজাদা খুনে কোথাকার, বেরোও ঘর থেকে।

অতর্কিত ধাক্কায় খোকা বিছানার ওপাশে ছিটকে পড়ল; দেওয়ালটা না থাকলে বিছানা থেকে পড়েই যেত, নেহাৎ দেওয়ালে আটকে আর পড়ল না। ঘটক ওর দিকে নজর না দিয়েই অনুকে নাড়া দিতে লাগল, অনু, অনু—

সে সময়ে মনোরমা নামটা পর্যন্ত ঘটকের মনে পড়ল না।

জিভটা বার করে ঠোঁট ভিজিয়ে অনু সাড়া দিল, উঁ।

খোকা বিছানার ওপোর উঠে বসল। ঘটক সাবধান হলেন। কঠিন কণ্ঠে বল্লেন, যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

কি জানি কেন খোকা ঘটকের নির্দেশ পালন করল; ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘটক অনুকে পুনরায় নাড়া দিয়ে বল্লেন, অনু।

অনু চোখ মেলে দেখল। চোখ তার লাল, জবাফুলের মত।

লেগেছে, খুব লেগেছে? সস্নেহে ঘটক প্রশ্ন করলেন।

অনু ওঁর দিকে সকাতরে চেয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না, হয়ত উত্তর দিতে পারল না।

ঘটক ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বিজলী বাতির আলোয় দেখা গেল অনুর গলায় কালশিরে পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে অনু বল্ল, জল, একটু—

ঘটক এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, শেল্‌ফের ওপোর এক গ্লাস জল প্লেটে ঢাকা অবস্থায় রয়েছে। এক গ্লাস ভর্তি জল। ইতস্তত করে নিজে কিছুটা খেয়ে আধ গ্লাস মত জল অনুকে দিলেন। অনু হাত দিয়ে গ্লাসটা ধরবার চেষ্টা করল কিন্তু হাত তার এতই কাঁপছিল যে ধরতে পারল না। ঘটক নিজে গ্লাস ধরে অল্পে অল্পে অনুকে কিছুটা খাওয়ালেন। শেষে অনুর ইঙ্গিতে গ্লাস সরিয়ে নিয়ে বল্লেন, এখন কেমন লাগছে? একটু সুস্থ বোধ করছ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে অনু বল্ল, ও কোথায়?

বাইরে কোথাও হবে, তাচ্ছিল্য সহকারে ঘটক উত্তর দিলেন।

ওকে মেরো না, অনুর অনুনয়সূচক প্রার্থনা।

না, না, ওকে আর কে মারছে?

অনুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘটক উঠে পাখাটা ফুল পয়েন্টে চালিয়ে দিয়ে আবার এসে বসলেন।

অনুর পাশে বিছানায় অল্প কিছুক্ষণ অনুর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বসে থাকার পরেই বাইরে থেকে উৎকট হাসির শব্দ এল। অনু উৎকর্ণ হোল, ঘটক সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমেই অনেকখানি আলো এবং বেশ কিছু ধোঁয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজের ঘরের খোলা দরজার কাছাকাছি এসেই হতভম্ব হলেন। খোকা হাততালি দিয়ে হাসছে, আর ঘটকের বিছানাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আগুন, আগুন, ঘটক বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে জল জল করে

বাথরুমের দরজা খুলে প্ল্যাস্টিকের বালতিতে কলটা পুরো খুলে জল ভরতে দিলেন। সেই সঙ্গে চেঁচাতে লাগলেন, বাদল, বৈজু, ঠাকুর—

আউট হাউস থেকে বাদল সাড়া দিল, বাবু, বাবু, কি হয়েছে, দরজা খুলুন।

ঘটক হাঁকছেন, আগুন আগুন, তোরা কে কোথায় আছিস, শিগ্‌গীর আয়।

সুবোর কানে গেল কথাগুলো। চাবি তার কাছে, কিছুক্ষণ আগেই সে বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজে নিয়ে এসেছে।

পড়ি কি মরি করে সুবো সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রথমেই দেখল, জেঠাই-মাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে খোকা টান্‌তে টানতে বাবার ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আগুনের লাল আলোয় খোকার হিংস্র মুখখানা দেখেই সুবো সেদিকে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরার আগেই খোকা তার মাকে প্রায় যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল বাবার ঘরের বিছানার দিকে! চেঁচিয়ে উঠল, মর মর, পুড়ে মর।

ঝাঁপিয়ে পড়ল সুব্রত; আগুনের ওপোর থুব্‌ড়ে পড়া জেঠাইমার পা ধরে জেঠাইমার দেহটাকে টেনে এনে ঘরের বাইরে ফেল্ল। ওদিকে বাইরে বাদলরা দরজা ঠেলছে আর হাঁকছে, বাবু, বাবু,—কিন্তু দরজা আর কে খুলবে! এদিকে মশারি পুড়ে ডানলোপিলোর গদি জ্বলছে, খাটের কাঠে আগুন ধরেছে, গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া বেরিয়ে দালানটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়েছে, সেই ধোঁয়ায় সকলেরই দম বন্ধ হবার উপক্রম।

পাগল হাসছে, বাদলরা বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছে, বিভু ঘটক দৌড়ে দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা বন্ধ। বুদ্ধি করে দরজার খিল ও টাওয়ার বোল্ট খুলে তিনি হুকুম দিলেন, ধাক্কা দিয়ে তালা ভেঙ্গে ভেতরে আয়, আগুন লেগেছে।

দু'তিন বার সজোরে ধাক্কা দিতেই আলতারাফ ভেঙ্গে দরজাখানা খুলে গেল। বাদল, বৈজু, ঠাকুর তিনজনেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ওদের পেছন পেছন এল চারু ঝি।

বাবু বল্লেন, আগে আগুন নেভা। আমার ঘরে আগুন।

বাদল দৌড়ে গিয়ে জল ভর্ত্তি বালতি এনে বাবুর বিছানায় ঢেলেই আবার বাথরুমে ঢুকে বাথ-টবের আউটলেট বন্ধ করে বড় কলটা খুলে দিল। বল্ল, বৈজু, আমাদের বালতিগুলো সমস্ত নিয়ে আয়।

বৈজু ছুটল।

বাবু বল্লেন, পাগলটাকে আগে বাঁধ। না হলে হয়ত আরও কিছু সর্বনাশ করবে। ঠাকুর, পাগলটাকে আগে ধর।

পাগলের কাছাকাছি যেতেই খোকা ঠাকুরকে সবেগে ধাক্কা দিল।

ঠাকুর ছিট্‌কে সরে এল।

ঝাঁপিয়ে পড়ে সুবো খোকার হাত দুটো পেছন থেকে সজোরে পাকিয়ে ধরল। হাঁকল, ঠাকুর, ঠাকুর—

ঠাকুর থতমত করছে। এগিয়ে এল বাদল, বল্ল, ঠাকুর, আগুন নেভাও গে, বলেই খোকার পরনের কাপড়টা টেনে খুলে নিয়ে সেই কাপড় দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে কয়েকটা বাঁধন দিল। খোকা চিৎকার করতে লাগল, বাদলকে কামড়ে দেবার চেষ্টা করল কিন্তু বাদল ছাড়ল না। ঘটক দৌড়ে নিজের অফিস ঘরে ঢুকে বার করে আনলেন লোহার বাঁটের ছাতা। এনেই বল্লেন, চুপ, মাথা ভেঙ্গে দেব। পাজী রাসকেল কোথাকার!

খোকা চোখ পাকিয়ে ঘটকের দিকে চেয়ে রইল।

ওধারে বৈজু, ঠাকুর ও চারু তিনজনে বাথটব থেকে বালতি বালতি জল নিয়ে বাবুর ঘরে আগুন নেভাতে ব্যস্ত।

এত রকম ঝামেলার ভেতরেও বাদলের মাথা খুব ঠাণ্ডা। সে বল্ল, পাম্প্‌টা চালিয়ে দাও। ট্যাঙ্কে জল বেশী নেই। ঠাকুর ভাই, পাম্পটা আগে চালাও।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন ঠাকুরমা। কোন কথা না বলে দালানের অপর দিকে দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দশ হাত কাপড়ে পাগলটাকে আষ্টেপিস্টে বেঁধে দালানের এক

পাশে ফেলে রেখে বাদল নজর দিল জেঠাইমার দিকে। জেঠাইমা তখনও অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে।

জেঠাইমাকে চিৎ করে শুইয়ে বাদল আঁৎকে উঠল। একি ?

কি রে ? এগিয়ে এলেন বিভু ঘটক।

মুখের চামড়া অনেকখানি উঠে গেছে! তার ওপোর অজ্ঞান, নিশ্বাস পড়ছে বটে, কিন্তু—

সুবো বল্ল, তাইত! কি হবে! ডাক্তারকে কল্ দেব বাবা ?

দাও।

ঘরের আগুন নিভে গেলেও ভিজে কাঠ ও বিছানা থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

এর পর ডাক্তার এলেন। একটা ইঞ্জেক্শন দিয়েই বল্লেন, এখনই হাঁসপাতালে পাঠান, কেস খুব সিরিয়াস। এ রকমটা কি ভাবে হোল ?

কেউ কোন উত্তর দেয় নি। সুবোর মনে হোল আগুনের ওপোর হুমড়ি খেয়ে পড়া অবস্থায় ঠ্যাং ধরে টেনে আনার ফলেই বোধ হয় মুখের চামড়া ঐভাবে ছাড়িয়ে গেছে। মনে হোল তারই দোষ, ঐভাবে না টানলেই পারত, কিন্তু সে সময় ও ঠিক বুঝতে পারেনি—

নিজের মনেই সুবো নিজেকে দোষারোপ করেছিল, মুখ ফুটে কিছুই বলে নি।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বি. ঘটক অম্বুর মৃতকল্প দেহটিকে নিজের পরিচিত নার্সিং হোমে নিয়ে গেলেন। এ রকম কেস হাঁসপাতালে নিয়ে গেলে নানা রকম জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে। অপর পক্ষে চিকিৎসার সুবিধা হবে নার্সিং হোমে। ঘটক ভাল ভাবেই জানেন যে এত সব বিপদের মূলে একমাত্র তিনিই। নিজেকেই তিনি বারম্বার অপরাধী বলে ভেবেছিলেন।

নার্সিং হোমের ডাক্তারের সঙ্গে অম্বুর চিকিৎসার কথা শেষ করে খোকার কথা তুল্লেন। ডাক্তারের পরামর্শমত ওখান থেকেই ফোন

করলেন লুম্বিনী পার্ক মেণ্টাল হস্পিটালে। টেলিফোনেই কথাবার্ত্তা সেরে বাড়ী ফিরে দেখলেন খোকা সেই রকম বাঁধা অবস্থাতেই পড়ে আছে। পাহারায় আছে সুবো ও বাদল এবং চারু বাবুর ঘর পরিষ্কার করছে। অমন দামী মেহগিনি কাঠের খাটখানা আধ-পোড়া অবস্থায় বাইরে এনে ফেলা হয়েছে। ঠাকুর চা তৈরী করে সুবোকে এখানেই দিয়েছে। চেয়ারে বসে সুবো চা খাচ্চে এবং পাগলের দিকে নজর রাখছে।

দেখামাত্রই ঘটকের মনটা বেদনায় ভরে উঠল। আর কেউ না জানলেও তিনি ত জানেন, ঐ পাগল তার প্রথম সন্তান। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ঐ গোপন তথ্যটি ভাল ভাবেই জানে, সে আর ইহ জীবনে মুখ খুলতে পারবে কি না কে জানে! এও মনে হোল, ছোট ভাই বড় ভাইকে বেঁধেছে এবং পাছে সেই বাঁধন দাদা খুলে ফেলে, সেই ভয়ে ছোট বড়কে পাহারা দিচ্ছে!

সুবো বল্ল, এটার ব্যবস্থা কি হবে?

ঘটক বল্লেন, ওর জন্য লোক আসছে।

কোথাকার লোক? কোথায় নিয়ে যাবে?

লুম্বিনী পার্কে।

ছেলে কি বুঝল কে জানে! ঘটক অফিস ঘরে চলে গেলেন। সুবো চা খাওয়া শেষ করল। ঘটকের মনে হোল, হায়রে, অন্নর কি ভাগ্য! তার নিজের ছেলে এবং আমার ছেলে কেউই তার কথা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না। সে বেঁচে আছে, কি মরে গেছে সেটা পর্যন্ত এদের কারুর জানার দরকার নেই।

চা খাওয়া শেষ করে সুবো ঘাড় ঘুরিয়ে দালানের ঘড়িতে দেখল সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। বাদলরা এখানেই কাজ করছে। পাগলকে পাহারা দেবার জন্য এখানে থাকার কোন দরকার আছে কি না সুবো সেটাই মনে মনে ভাবছিল।

পাগলও ভাবছিল, এভাবে আর কতক্ষণ পড়ে থাকতে হবে।

ও ত অন্যায় কাজ কিছুই করে নি। ওর মা যে মামার বিছানায় মামার সঙ্গে শুয়ে ঘুমোয় এটা খুবই অন্যায়। সেই বহুকাল আগে থেকেই, কবে থেকে তা ও মনেও করতে পারে না, ওর জানা আছে মা ও ছেলে ছাড়া আর কেউ কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকলে খুব পাপ হয়। ভগবান এ রকম অনাচার একদম্ সহ্য করতে পারেন না। এর জন্য ভগবান খুব কড়া শাস্তি দেন। এ জিনিস যখন সে নিজের চোখে দেখল তখন এর শাস্তি ত ওকেই দিতে হবে কারণ ভগবান বলতে ত ওই। ডাক্তার অবিশ্যি অন্য কথা বলত, কিন্তু আজ এটা দেখার পর ওর যেন কেমন মনে হোল, ওকেই এর উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। তারপর ওরা সবাই বল্ল, ওর কথা মিথ্যে। সেটাও কি সম্ভব? ও যে নিজের চোখে দেখেছে। শুধু ত চারুর কথা নয়। চারুদি'র কথা ও প্রথমে বিশ্বাসই করে নি। কিন্তু চারুই বলেছিল, ওকে দেখাবে। তাই ত চাবি খুলে রাত দুপুরে ও বেরিয়ে গিয়েছিল। চারুর কথামত দরজায় টুক্ টুক্ করে ঘা দিয়েছিল। চারু বাদলের ঘর থেকে বেরিয়ে ওকে জানলার পরদা সরিয়ে দেখতেও বলেছিল এবং দেখার পরেই ওর যে কি হয়ে গেল, ওর ঠিক মনেও পড়ে না। আশ্চর্য, এতদূর পর্যন্ত সমস্ত স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু এর পর যে কি হোল ও ভেবে চিন্তে কিছুতেই মনে করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ঠাকুরমা বলেছিলেন, সেই সেদিন যখন ঠাকুরমা ওর মায়ের ওপোর ভীষণ চটে গালমন্দ করেছিলেন, সেই দিনেই ও শুনেছে ঠাকুরমা বলেছিলেন, অত বড় উপযুক্ত ছেলে যার সামনে রয়েছে সেই ছেলে ওর গলা টিপে মারে না কেন? আবার যেন বলেছিলেন, কালামুখীর মুখ জ্বলন্ত আগুনে গুঁজে দিলে তবে ওর উপযুক্ত শাস্তি হয়। সেই কথাগুলো ওর মনে ছিল। কি জানি, কাল রাত্তিরে ও যে কখন কি করে বসল—

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, ঠিক ত। মামাবাবু যখন ওর খাট থেকে ওকে তাড়িয়ে দিল তখন বাইরে এসে ওর মনে হোল মামাবাবুর ঐ বিছানাটা ও ছিঁড়ে খুঁড়ে তবে ছাড়বে। ঘরে ঢুকে এক টানে মশারিটার

একটা দিক নামিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওর নজরে পড়ল টিপয়ের ওপোর দেশলাই ও চুরুটের বাক্স রয়েছে। কোন কিছু না ভেবেই দেশলাইটা জ্বেলে ও মশারির ওপোর ধরেছিল, তারপর গোটা দেশ-লাইটাই আগুনে ফেলে দিতে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো এক সঙ্গে ফরফর করে জ্বলে আগুনটা সারা বিছানায় কি তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল! আগুনটা বিরাট ভাবে জ্বলে উঠতে ওর কোন ভয় ত হয়ই নি বরং খুব আমোদ হয়েছিল। এত আনন্দ ও কখনও পেয়েছে বলে ওর মনেও পড়ে না। ও যখন হাততালি দিয়ে নাচছিল এবং ভাবছিল ওর শাস্তি দেওয়ার কাজ ও করেছে সেই তখনই দেখল ওর কালামুখী মা টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওর মনে পড়ল ঠাকুরমার কথা। মায়ের মুখখানা আগুনে গুঁজে দেবার এই ত উপযুক্ত সময়। কিন্তু ঠিকমত গুঁজে ধরতে পারল না। আগুনের কি ঝাঁজ! বাপ্‌! তাই দূর থেকে কালামুখীটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই পর্যন্ত বেশ মনে আছে কিন্তু এর পর যে কি হোল, কোথা দিয়ে কি সব গোলমাল হয়ে গেল, কেনই বা সবাই মিলে ওকে বাঁধল, কে জানে! কাপড়খানা এমন করে বেঁধেছে যে ঠিকমত লজ্জা নিবারণও হয় না। তাই ওকে কোনও মতে কাৎ হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু এরা এমন নিমক-হারাম, ওর যে তেষ্টা পেয়েছে, সেদিকে এদের কারুর খেয়াল নেই। মা-টাকেও কোথায় তুলে নিয়ে গেল। নিশ্চয়ই তাকেও অন্য ঘরে বেঁধে রেখেছে; না হলে সে ছাড়া থাকলে অবশ্যই ওর কাছে এসে ওর বাঁধন খুলে কিছু-না-কিছু খেতে দিতই। ঐ সুবোদা'টাও এমন হিংসুক, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে দিব্যি চা খেয়ে নিল। মামাবাবুও এসে একবার দাঁড়াল, ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল, কিন্তু ওকে খুলেও দিল না, খেতে দেবার কথাও বল্ল না। সব সমান, সব সমান। যে পায়ের বাঁধন তেমন মজবুত ছিল না সেই পা-খানা খোকা সজোরে মেঝেয় ঠুকল।

এ্যাই, খবরদার, সুবো ধমকে উঠল। দেখছিস, এই লোহার বাঁটের ছাতা তোর পিঠে ভাঙ্গব।

কেনে, কি করেছি ?

সুবোকে নিরুত্তর দেখে খোকা বল্ল, আমাকে খুলে দাও, আমার খিদে পেয়েছে।

সুবো ছাতাখানা হাতে নিয়ে মারবার ভঙ্গীতে বসে রইল।

খুলবে না ? খোকা চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করে।

বাদল কল-ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্ল, কি বলে ও ?

সুবো বল্ল, ওর খিদে পেয়েছে, ওকে পোলাও-মাংস দিতে হবে।

বাদল কল-ঘরে ঢুকে গেল। কোন মন্তব্য করল না।

সাড়ে আটটা নাগাদ মানসিক হাসপাতালের গাড়ী এবং চারজন লোক এল। চারজনই বেয়ারা শ্রেণীর লোক, ওদের মধ্যে যে সর্দার গোছের সে মিঃ ঘটকের কাছে একখানা কাগজ দিয়ে কি সব সই করিয়ে নিয়ে বলেছিল, আপনারা কেউ সঙ্গে যাবেন ত ?

ঘটক বল্লেন, হ্যাঁ যাব, আমিই যাচ্ছি।

সুবো বল্ল, বাবা, আমিও সঙ্গে যাই, ওর সঙ্গে একলা যাওয়া ভাল নয়।

বাবা বল্লেন, কি দরকার ? ওরা ত রয়েছে।

ইতস্তত করে সুবো বল্ল, তা হলে বাদল সঙ্গে থাক।

বাড়ীর কাজ ? ঘটক প্রশ্ন করলেন।

ও ত অনেকটা সারা হয়ে গেছে। বাকী যা আছে চারু একাই করে নেবে।

এর পর হাসপাতালের গাড়ীতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় খোকাকে ওঠানো হোল, ঘটকের গাড়ীতে উঠলেন ঘটক, বৈজু ড্রাইভারের পাশে বাদলকেও বসতে হোল। ঘটক ভাবলেন, ঠিক আছে, ছেলের ভয়টাও ভাঙ্গল, অপর পক্ষে ছেলে সঙ্গে থাকলে চিকিৎসা বাবদ ঢালাও খরচ করার হুকুমটা দিতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকত। ছেলে ভাবত, ঐ পাগলটা কি এমন যে ওর জন্য বাবা হাসপাতালের ডাক্তারদের চিকিৎসা বাবদ বেহিসেবী খরচ করার অবাধ অধিকার দিচ্ছেন।

সেদিন ছিল সোমবার। বহুদিন পরে এই সোমবারে অত্যন্ত কড়া রকমের সময়নিষ্ঠ মিঃ বি. ঘটক দেরিতে অফিসে গিয়েছিলেন এবং কয়েকটা জরুরী কাজ কোন রকমে সেরে এবং বাকীগুলো পিছিয়ে দিয়ে বেলা আড়াইটের মধ্যেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বৈজুকে বল্লেন, নার্সিং হোম চল।

সেদিন সুব্রতও কলেজ যেতে পারল না। সোমবার প্রথম পিরিয়ডেই ক্লাস ছিল, কিন্তু ঠাকুরের রান্না চাপাতেই অনেক বেলা হয়ে গেল। বাদল বাবুর সঙ্গে গিয়েছিল, ফিরে এসে বাজার যেতেই দশটা। তা ছাড়া কাল সেই রাত থেকেই, কত রাত কে জানে, তখন থেকেই ঘুম নেই। এই দারুণ অশান্তির পর কলেজে কোনও মতেই যাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে হতাশ হয়ে সুব্রত নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। কখন যে ঠাকুর ভাত খেতে ডাকবে তার ঠিক নেই!

ঠাকুরমা এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন, ডাকলেন, সুবো, সুবো—

ঠাকুরমাকে সুবো নিয়ম মত ভক্তি করে কিন্তু ঠাকুরমাকে ওর ভালো লাগে না। ওঁর ঐ বিনিয়ে বিনিয়ে পুরনো কথা আর নীরস উপদেশ ও সহ্য করতে পারে না। ঠাকুরমার প্রথম ডাকে সাড়া না দিয়ে ভেবেছিল উনি চলে যাবেন, কিন্তু দ্বিতীয় ডাকে সে-আশা ছেড়ে দিয়ে সাড়া দিল, উঁ।

তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?

না।

ঠাকুরমা ঘরের ভেতর ঢুকে এসে বল্লেন, নীচে ত আজ ওদের রান্নাবাড়ার গোলমাল,—তা আমার ত যা হয় কিছু করছি, তোর জন্যও দুটো চাল এখানে নেব?

সুবো শুয়ে শুয়েই বল্ল, না না, ওসব হ্যাঙ্গামা করতে যেও না। সবাই যা খাবে আমিও তাই খাব।

তা হ্যাঁরে, তোর বাবা কি এখনও ফেরে নি?

ফিরেছে। এই ত অল্পক্ষণ হোল এসেছে। গাড়ীর আওয়াজ পাও নি?

আওয়াজ ত কত রকমই পাচ্ছি। কে আসছে কে যাচ্ছে কিছুই বুঝছি না। তা হ্যাঁরে, ঐ ছেলেটাকে অতগুলো লোকে চোরের মত বেঁধে নিয়ে কোথায় গেল?

জানি না।

জানিস্ না? চারু বলছিল কোথায় যেন পাগলা গারদে নিয়ে গেল?

তাই হবে।

তা ওর কি দোষ? ওর মাকে যে অবস্থায় ও দেখেছে সে অবস্থায় দেখলে কোন ছেলের মাথার ঠিক থাকে? ও যে একটা খুন-খারাপি করে নি এই ঢের! যাই বলিস বাপু, ছেলেটি কিন্তু ভাল। অমন গর্ভে অমন ছেলে—

আর থাক, ওর কথা আর বলতে হবে না, সুবো ধমকের সুরে বলে উঠল।

তোরা সব এখনকার ছেলে, তোরা কি ভাবিস তোরাই জানিস্। তিনি বলতেন, যার চরিত্তির নেই তার কিছুই নেই। সেই পরশুরাম—

আমি একটু ঘুমুব ঠাকুরমা, তুমি তোমার রান্না-খাওয়া করগে।

ম্লান হেসে ঠাকুরমা বল্লেন, কি যে বলিস তোরা! তোদের কারুর খাওয়া হোল না, বাড়ীতে একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেল, আর আমি সাত তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব, এমন শিক্ষা ত আমাদের হয় নি কখনও।

তবে কি করবে? চেঁচাবে?

না, চেঁচাব আর কি নিয়ে, কার জন্যেই বা চেঁচাব! কেই বা আমার কথা শুনবে! অমন যে বিদ্বান ছেলে আমার, ওই কি আমার কথা শুনল? বল্লুম, কালামুখী মাগীটাকে ভালোয় ভালোয় বিদেয় কর। তা ও কি আমার কথা শুনল? তখন যদি বিদেয় করে দিত তা হলে ত আজ এই বিপদটি হোত না। লোকসান, ঝঞ্ঝাট, শত্তুর

হাসানো, ছি ছি। শনি চেপেছে, বুঝলি সুবো, শনি চেপেছে, শনির দিষ্টি পড়েছে। এই ভাবে চললে এ বাড়ীর কখনও ভাল হবে না। নিজের লোকদের হেনস্তা করে তাড়িয়ে—

তোমার রেডিও থামাবে? এক ঘেয়ে কি যে বকো—

আমি বকি? এই কথাই তোরা বলবি বটে! ওরে, কত জ্বালায় যে জ্বলছি আমি, কত দুঃখে যে বকি, তা তুই কি বুঝবি? তুই ত কালকের ছেলে—

তা হলে আমাকে ছেড়ে যারা তোমার কথা বুঝবে তাদের বলো গিয়ে। আমাকে রেহাই দাও।

পিছন ফিরতে ফিরতে ঠাকুরমা বল্লেন, আমার কথা শোনার লোক কি আর আছে রে, যে কথা বলব! যে শোনবার সে চলে গেছে, যারা এখনও শোনে, তাদের এ বাড়ীতে ঢোকা বারণ হয়ে গেছে। জেলখানা, জেলখানা! আমি তোদের এই জেলখানায় বন্দী হয়ে আছি। আর কতদিন যে এখানকার নরক কুণ্ডে পচে পচে মরতে হবে—

গজগজ করতে করতে ঠাকুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুবো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্ল।

কাল রাত্রে সুবো যে সব কথা ভাবতে ভাবতে শুয়েছিল সেই সমস্ত চিন্তা তার মন থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে সেই সব কথাই নতুন করে গুছিয়ে ভাবতে গিয়ে ঠাকুরমা এসে ওর চিন্তায় বাধা দিলেন। ভারতীর ব্যাপারে কি করা যায় তা ও কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না; বাবাকে কি করে যে ওর বাইরে যাবার কথাটা বলবে তা ও কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না, তার ওপোর এই অভাবনীয় বিপদ! এখন ত বাবাকে এসব কোন কথা বলার চিন্তাও করা যায় না। বাবা—

আচ্ছা সত্যই কি বাবার সম্বন্ধে ঠাকুরমা যে সব নোংরা কথা বলছে সেগুলো ঠিক! ঐ বুড়ীটাকে নিয়ে—

কাল রাত্রে পাগলাটাও খোলাখুলি ভাবেই এই সব কথা বলে বসল।

আবার বল্লে, চারু ঝি ওকে প্রথম বলেছিল। তা হলে কি সবাই জানে নাকি? শুধু ও-ই জানে না। চাকর-বাকর লোকজনের সামনে এ সব কী? ছিঃ। বাবার তুলনায় ওর নিজের ব্যাপারটা অনেক ভদ্র, অনেক সভ্য। ওর সহপাঠিনীকে ও বিয়ে করতে চায়। এতে কোন নোংরামি নেই, নেই কোন অন্যায়। এ রকমটা আজকাল সমস্ত ফ্যামিলিতে আকছার হচ্চে। সোজাসুজি বাবাকে বলে এই ব্যাপারে ও এগিয়ে যেতে পারে। বাবা আপত্তি করলে মুখের ওপোর স্ট্রেট বলে দেওয়া যায়, তোমার মত কেপ্ট নিয়ে ঘর করব না, দস্তুরমত বিয়ে করে বিবাহিত জীবন যাপন করব। তাতেও যদি বাবার আপত্তি থাকে—

চারু এসে ডাক দিল, দাদাবাবু, নীচে একজন ডাকছে।

কে?

কি জানি। দুটি ছেলে এসে আপনাকে ডাকছে।

চট্ করে মাথায় ব্রাসটা চালিয়ে, চটি-জোড়া টানতে টানতে নীচে নেমেই দেখল একটি চেনা এবং একটি অচেনা ছেলে ওর জন্য বাঘছাল মোড়া টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। চেয়ারে বসে নি।

চেনা ছেলেটিকে সুবো বল্ল, কি খবর?

সে বল্ল, আপনি বলেছিলেন তাই এঁকে নিয়ে এলুম। সেই মোটর-বাইক—

ও, আচ্ছা।

অফিস ঘরের দিকে চোরা-চাউনি চেয়ে সুবো ওদের দু'জনকে নিয়ে গ্যারেজের দিকে গেল। গ্যারেজটা খোলাই ছিল। বাবার গাড়ী ছিল বাইরে, সুবোর রাজদূত ছিল গ্যারেজের ভেতর। অচেনা ছেলেটি মোটর-বাইকের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গাড়ীখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বল্ল, গাড়ীর ডান দিকে পাদানির মতো এটা কি লাগানো রয়েছে?

সুবো বল্ল, ওটা কিছু নয়। ও একটা সরু তক্তায় টিন মুড়ে কালো রং লাগিয়ে দুটো ফুট-রেস্টের ওপোর সাইকেলের টিউব কাটা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

কেন?

সুবো হেঁট হয়ে প্লেটটা টেনে খুলে নিয়ে বল্ল, এই যে তলায় সাইলেন্সর পাইপটা রয়েছে, কিছু দূর রান্ করলেই এই পাইপটা দারুণ গরম হয়। সে সময় গাড়ী থামিয়ে ডান পা'টা রাস্তায় নামাতে গেলেই ঐ পাইপের ছ্যাঁকা লাগে। সেজন্য আমার এক বন্ধু ঐ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এটা আপনি রাখতেও পারেন, আবার ইচ্ছে হয় ত খুলে ফেলতেও পারেন। এই ত আমি এখনই খুল্লুম, আবার এই দেখুন লাগিয়ে দিচ্ছি; কথাটা বলতে বলতেই সুবো প্লেটটা পূর্বের মতো লাগিয়ে দিল।

গাড়ীটা ক'বছর হোল?

এটা সিক্সটি সেভেনের অক্টোবরে কিনেছি। বিল-টিল সব আছে।

কত কিলোমিটার রান্ করেছে?

ঐ মিটারে দেখুন।

কত দিয়ে কিনেছিলেন?

সাড়ে আটত্রিশ শো, as on road.

মানে ইন্সিওর-টিনসিওর সব নিয়ে?

হ্যাঁ।

কতয় দেবেন?

এদিক-ওদিক চেয়ে সুবো বল্ল, আস্তে। আমি পঁচিশ শো পেলে দেব।

লোকটা গলা না নামিয়ে বল্ল, বাবা, পঁচিশ শো? এতদিন চড়ার পরেও কখনো এত হয়?

বাদল গ্যারেজের সামনে দিয়ে চলে গেল; এদিকে দেখতে দেখতেই গেল। সুবো নীরব। সুবোর চেনা ছেলেটি মৃদু কণ্ঠে বল্ল, আপনি যা দিতে পারবেন তাই বলুই না।

সে বল্ল, পুরনো জিনিস, আমি এক হাজার দিতে পারি। গলার স্বর সে কমায় নি।

সুবো চটে উঠল। কাল থেকে এই ঝামেলা। এতটা বেলা পর্যন্ত খাওয়া হয় নি। লোকটাও কি বে-আক্কেলী, চেঁচাচ্ছে। বাদ্‌লাটাও সামনে দিয়ে গেল, দেখেও গেল। বিরক্ত হয়ে সুবো বল্ল, হবে না।

সে বল্ল, পুরনো গাড়ীতে এর চেয়ে বেশী কেউ দেবে না।

আমার দরকার নেই, আপনি যান, সুবো গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল।

ছোকরা বেরুল না। হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে ক্লাচটা টিপতেই লাগল। সুবো তার চেনা ছেলেটিকে ডেকে বল্ল, একটু ব্যস্ত আছি।

ভাবী ক্রেতা বল্ল, বারো শোয় হবে?

চোখ পাকিয়ে সুবো বল্ল, না।

সে বল্ল, কি দাদা, রাগ করছেন কেন? বিক্রী করবেন, খদ্দের দর বল্লে রাগ করেন কেন? তারপর এখনও ত ট্রায়াল দেন নি। আগে ট্রায়াল দিন।

সুবো বল্ল, পারব না। আপনি যান।

ও বাবা, পুরানো জিনিস বিক্রী করবেন, তাতেও এত ডাঁট!

সুবো নিরুত্তর। ছেলেটি সুবোর চেনা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে তাকে বল্ল, এ রকম জায়গায় এনেছ কেন? উনি বেচবেন না, আর তুমি মিছিমিছি আমাকে আনলে, বাজে বাজে সময় নষ্ট!

রাগের চোটে সুবো অকারণে গ্যারেজের গেটটা হড়হড় করে টেনে বন্ধ করে বাড়ীর দিকে এগিয়ে এল।

বাদল গেটের কাছেই কোথায় বুঝি ছিল। দাদাবাবুর কাছে দাদাবাবুর বন্ধু-টন্ধু বড় কেউ আসে না। দু'জন অচেনা ছেলে এবং তাদের সঙ্গে দাদাবাবুর এই রকম ব্যবহারের জন্য বাদল তাদের দিকে বিস্ময়ের চাউনি চাইতে চাইতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল।

ওরা চলে গেল। সুবো মনে মনে স্থির করল, এভাবে আর কোনও

খদ্দেরকে বাড়ীতে আসতেই দেব না। ছিঃ, গাড়ী বিক্রীর এত ঝামেলা!

দুপুরে ঘরে শুয়ে সুবো ভাবতে লাগল টাকার জোগাড় কি ভাবে করা যায়। টাকা না পেলে ভারতীকে হারাতে হয়। সেটা সে প্রাণ থাকতেও পারবে না।

ভারতীও ভাবছে টাকার জোগাড় কি ভাবে করি। অবস্থা ক্রমে ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে। কালই অজিতবাবু বলছিলেন, সুব্রতর বাড়ীতে রাখার মত জিনিস তৈরী হয়ে গেছে। সুব্রতর সঙ্গে ভারতী এ বিষয়ে কথা বলেছে কিনা, এবং মালপত্র কবে ও বাড়ীতে পাঠানো হবে?

ভারতী মনগড়া মিথ্যা উত্তর দিয়েছে। বলেছে, মিঃ ঘটক সাহস পাচ্ছেন না। বলেছেন চাকর-বাকরের বাড়ী, জিনিসপত্র গেলেই তাদের কৌতূহল হবে। মুখে মুখে জানাজানিও হবে। শেষে বাবার কানে কথাটা উঠলে—

এতে অজিত বাবু বলেছেন, সুব্রত বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও। ওঁকে এবং দরকার বুঝলে ওঁর চাকরকেও পার্টিতে নিয়ে নেওয়া হবে। তা হলে আর কোন অসুবিধা হবে না। একদিন ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলার সুযোগ করে দাও, এবং যত শীঘ্র পারো সেটা করো। আজই ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে টাইম দিয়ে ক্লাবে দেখা কর।

অজিতের এই জাতীয় অনুরোধ যে নির্দেশ এবং সে নির্দেশ পালন না করা যে কতখানি বিপজ্জনক তা ভারতীর ভাল ভাবেই জানা আছে। ভারতী আকুল মনে চিন্তা করতে লাগল।

চিন্তা করতে লাগলেন স্বয়ং মিঃ ঘটক। ভবানীপুরের বাড়ীখানা বায়না করা হয়েছিল মাত্র তিন দিন আগে। টাকাও বড় কম নয়। রফা হয়েছিল চুয়াল্লিশ হাজারে, তার মধ্যে বিশ হাজার টাকা বায়না দেওয়া হয়েছে। বায়না কেউ এত টাকা দিয়ে কখনও করে না। কিন্তু

তিনি এতটা টাকাই দিয়েছেন অনেকগুলো কারণে। প্রথমতঃ বিক্রেতা তুই ভাইয়ের প্রচণ্ড তাগিদ। নানা ভাবে তারা জড়িয়ে পড়েছে। ঐ টাকাটা এখনই না পেলে তারা বিক্রী করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ মিঃ ঘটকের সলিসিটর দলিলপত্র দেখে এবং টাইটেল সার্চ করে মিঃ ঘটককে বলেছিলেন, টাইটেল ভাল, টাকাটা স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়। তৃতীয়তঃ ঘটক দেখলেন, চুয়াল্লিশ হাজার টাকা একটা ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে অনুপমাকে দান হিসেবে দেখালে এক গাদা গিফ্‌ট ট্যাক্স অর্থাৎ সরকারী দান-কর লাগবে। তার পরিবর্তে এখন এই মার্চ মাসে বিশ হাজার এবং পয়লা এপ্রিলের পর চব্বিশ হাজার দিলে সে দিকেও অনেক সুবিধা হবে। এই সব হিসাব করেই তিনি বিশ হাজার দিয়ে তিন দিন আগে বায়না করেছিলেন, কিন্তু সময় অভাবে বাড়ীটা অনুপমাকে দেখানো হয়নি, ভেবেছিলেন তু'চার দিন পরে এক সময় ওকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীটা দেখিয়ে দেবেন। সেই দেখানো আর হোলো না। এখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে অনুপমা যদি এ যাত্রায় সেরে না ওঠে! অনুপমার পাগল ছেলে যদি পাগল বলেই প্রমাণিত হয়ে লিউন্যাটিক এ্যাসাইলামে আটকে থাকে! এই সবই যদি বাস্তবে হয় তা হলে মৃতার পাগল উত্তরাধিকারী এবং তার আধা-কেনা সম্পত্তি নিয়ে যে সব ফ্যাসাদ উঠবে তার উপযুক্ত মীমাংসা করা গেলেও সুবোর কাছে সবটাই খোলাখুলি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। ঘোর বিষয়ী ব্যবসাদার মিঃ বি. ঘটক তাঁর সারা জীবনের শিক্ষামত আগাম-চিন্তায় অভ্যস্ত। এ সমস্তই তাঁর বাণিজ্যগুরু মিঃ হাণ্ডার কাছ থেকে শেখা। এখানে হৃদয়-টিদয়ের কোন বালাই নেই। টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব, প্রচলিত আইন, আইনের ফাঁক এবং ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান এই নিয়েই তাঁর জীবন-পথের পরিক্রমা। সেই সঙ্গে নিজের পরিবারের প্রেস্টিজটাও ঘটক সাহেব বজায় রাখতে আগ্রহী। অনুপমাকে সারিয়ে তোলার জন্য ঘটক বদ্ধপরিকর কিন্তু সে এখন ভগবানের হাত। তিনি শুষ্ক মুখে নার্সিং হোমে রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন ডাক্তার বল্লেন, মিঃ ঘটক, কেস্ যে খুবই খারাপ তা আপনিও বুঝছেন, আমিও বুঝছি। তবে একটা বিষয় জেনে রাখুন, পেসেণ্ট যদি সেরেও ওঠেন তা হলেও একটা চোখ ওঁর পুরো নষ্ট হবে, অপর চোখের অবস্থা কি হবে এখনই বলা যাচ্ছে না এবং মুখের চেহারা আদৌ স্বাভাবিক হবে না।

প্লাসটিক সার্জারী দিয়ে, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ঘটক প্রশ্ন করেন।

ম্লান হেসে ডাক্তার বল্লেন, সে সব পরে, যে শক্‌টা উনি পেয়েছেন আগে সেটার ব্যবস্থা করি, তারপর—

মানে, হার্টটা কেমন দেখছেন? ঘটক পুনরায় প্রশ্ন করেন।

দু'দিন না গেলে কিচ্ছু বলতে পারছি না মিঃ ঘটক।

আচ্ছা, অন্য কাউকে যদি কন্‌সাল্টেশনে ডাকা যায়?

নিশ্চয় নিশ্চয়, ডাক্তার সাগ্রহে স্বীকার করে বল্লেন, এ সব কেসে কোন দ্বিধা রাখবেন না। কাকে দেখাতে চান বলুন?

ঘটক বল্লেন, আমি আর কি বলব, আপনি সাজেস্ট করুন। এ বিষয়ে বেস্ট কে?

এর পর সব চেয়ে বেশী দর্শনী দিয়ে দু'জন বিশেষজ্ঞকে সেই সন্ধ্যাতেই আনা হয়েছিল। কিন্তু সকলেরই এক কথা। আজ রাত্তিরটা না কাটলে জোর করে কিছুই বলা যায় না।

রাত্রি আটটার পর নিজের গাড়ীতে বাড়ী ফেরার পথে ঘটক বল্লেন, বৈজু, আমি যে এখানে ছিলুম সেটা যেন বাড়ীতে কেউ জানতে না পারে। বাদল কি সুবো কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বোলো, অফিসের কাজে ঘুরছিলুম।

জী, গাড়ী চালাতে চালাতে বৈজু সায় দিয়ে বিস্মিত হোল। এ রকম কথা সাহেব কোন দিনও বলেন না, এমন কি যখন লটীদের বাড়ীতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন তখনও এ রকমের কথা বৈজুকে একবারের জন্যও বলেন নি।

আহারাদি সেরে ঘটক আজ দোতলার ঘরে শুতে গেলেন। একতলার ঘরটা ব্যবহারের অযোগ্য, তা ছাড়া ওটার আর দরকারই বা কি। যার জন্য হার্ট ডিজিজের অভিনয় তার নিজের হার্টই আজ যায় যায়।

মা এসে বল্লেন, কেমন আছিস? ওপোরে উঠতে কষ্ট হয় নি ত?

না। আছি আমি ভালই। নীচের ঘরে শোব কোথায়? তাই ওপোরে এলুম।

মা বল্লেন, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ। তুমি শোও গিয়ে, আমিও শুয়ে পড়ি।

অগত্যা মা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিঃ বি. ঘটক দরজা বন্ধ করে বোতল নিয়ে বসলেন। প্রায় এক মাস পরে আজই এই বিলাতীর বোতলটা এনেছেন। অম্বু সুরাকে হটিয়েছিল, অম্বু হট্‌তেই সুরা এল। আলো জ্বললেই অন্ধকার দূর হয়, আলো নিভলেই ফের অন্ধকার!

বারো

মঙ্গলা মাসী এক হাতে নাতনীটার হাত ধরে অপর হাতে একটা বড় ঘটি নিয়ে ভারতীর বাড়ীর দরজায় ঘা দিচ্চে আর হাঁকছে, মন্টি, মন্টি আছিস।

মন্টির মা দরজা খুলে বল্ল, মন্টি ত নেই, তা,—তা তুমি কে গো ?

পেছনে একটা জোয়ান লোক দড়ি-বাঁধা পুরাতন পোর্টম্যান্টো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখলেই মনে হয় পোর্টম্যান্টোটা দারুণ ভারী, লোকটা যেন সেই ভারে কাঁপছিল।

বৃদ্ধা বল্ল, মন্টি নেই ? সে কি গো ! কখন ফিরবে ?

একটু পরেই আসবে, মন্টির মা উত্তর দিল।

অ। তা হলে ভাই মন্টির ঘরটা খুলে দাও। ও ফিরলে ওর সঙ্গে দেখা করে যাব।

মন্টির মাকে ইতস্তত করতে দেখে যে লোকটা তোরঙ্গ-মাথায় দাঁড়িয়েছিল সে এগিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে বল্ল, অজিতবাবুর লোক আমরা, ঘরটা খুলে দিন।

ভারতীর মা আপাদমস্তক দেখে ভয়ে ভয়ে বল্ল, এসো।

মন্টির ঘরে গিয়ে লোকটা কোন মতে উবু হয়ে বসে বল্ল, ধরতে হবে, এটা নামাব।

মন্টির মা ও আগন্তুক বৃদ্ধা তু'জনে ধরে সেই ভারী তোরঙ্গটা ওর মাথা থেকে কোনমতে নামাল। মন্টির মা মনে মনে ভাবল, এত ভারী কেন ? লোহা-লক্কড় ভরা আছে না কি ? মুখে কিন্তু কিছুই বল্ল না।

লোকটা তোরঙ্গ নামিয়ে চলে গেল। এর পর সে এবং আর একজন ছোকরা আবার এসে ঢুকল।

আগের লোকটার মাথায় ছিল একটা ঝলঝলে ময়লা বিছানা। সেটাও নারকোল দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং ছোকরার হাতে ছিল আর

একটা টিনের রং চটা স্যুটকেস। বিছানা ও স্যুটকেসটা নামিয়ে ছোকরা বল্ল, মঙ্গলা মাসী, আমি তা হলে চলি, তুমি থাকো।

মন্টির মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল। এরা কে, কি ব্যাপার, কিছুই বুঝল না; ভাবল মন্টি আসুক, যা হয় করবে অখন। অজিত বাবুর লোক যখন তখন ত আর কিছু বলা যায় না।

মঙ্গলা বল্ল, দিদিগো, হাত-মুখ ধোবার জল একটু দেবে?

এই যে, দিচ্চি।

মঙ্গলা বল্ল, নক্ষি, ঘটিটা নিয়ে দিদিমার সঙ্গে যা; গিয়ে জল নিয়ে আয় ত।

ময়লা ফ্রক পরা, ছেঁড়া হাওয়াই চটি পায়ে, বছর আটেকের কালো মেয়ে লক্ষ্মী মঙ্গলার ঘটিটা নিয়ে ভারতীর মায়ের পেছন পেছন গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে এল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই মঙ্গলার সঙ্গে ভারতীর মায়ের আলাপ জমে উঠল। স্পষ্ট বোঝা গেল, মঙ্গলা এ বাড়ীর সবই জানে। ভারতীর মা মঙ্গলার খবর কিছুই জানত না। এখন শুনল যে মঙ্গলার একটিমাত্র ছেলে। সেই বউ ভয়ানক দজ্জাল। শাশুড়ীকে দূর-ছাই করে, তাই মঙ্গলা সেখানে টিকতে পারে না, আবার একমাত্র ছেলেকে বেশী দিন না দেখলে মঙ্গলাও থাকতে পারে না। তাই ছুটে ছুটে ছেলের কাছে যায়, আবার বউয়ের তাড়া খেয়ে পালায়। এই আজই সন্ধ্যের পর এমন কাণ্ড হোল যে মঙ্গলা বাধ্য হয়ে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ছেলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু রাত্তিরে মেয়ের বাড়ী যাবে কি করে! তাই অজিত মাস্টার ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে দিয়ে এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। কাল সকালেই মাসী রাজারহাট বিষ্ণুপুরে মেয়ের বাড়ী চলে যাবে।

মন্টির মা বল্ল, এত সব জিনিসপত্র কিসের দিদি? তুমি একলা মানুষ!

আর দিদি, কি বলি বলো। সেই তেনাদের আমলের ভারী ভারী বাসন-কোসন এখনও কিছু আছে। আরও অনেক ছিল ভাই। এই

এত্ত বড়ো কাঠের সিন্দুক ভর্তি বাসন ছিল। একে একে সব গিয়ে মাত্তর এই ক'খানায় ঠেকেছে। তা এগুলোর মায়া কাটাতে পারি না, তাই টেনে টেনে মরছি। কখন কোথায় মরব তার ঠিক নেই, তা আমি বলি কি, যার কাছে মরব সেই এগুলো পাবে, না হলে ছেলে মেয়েরা আমাকে দেখবেই বা কেন? আর ত কিছু নেই, তাই এগুলোকেই সঙ্গে সঙ্গে রাখি। কিন্তু এ নিয়ে আমার ভাই এখন ভয়ানক জ্বালা হয়েছে।

এই মেয়েটি কে দিদি?

ও, এই নক্ষি, এর কথা বলছ? এই ত হয়েছে আমার গলার কাঁটা। এর মা আমার ছোট মেয়ে। ধার-দেনা করে কস্টে-ছেস্টে মেয়েট্যর বিয়ে দিয়েছিলুম। তা ধরো ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল। জামাইয়ের দশ বিঘে ধান-জমি, একতলা পাকা বাড়ী, জামাই ছিল বাপের এক ছেলে, সেই সব পেয়েছিল, আবার হাটের ধারে বড় রাস্তার ওপোর সাইকেল মেরামতির দোকান, বেশ তু'পয়সা রোজগার করত, কিন্তু আমার বরাতে কি সইল? এই মেয়ে যখন তিন বছরের তখন আমার সেই মেয়ে পেটে-পোয়ে মার অনুগ্রহে মারা গেল। তারপর ওদের কে দেখে তার ঠিক নেই! এই আমিই গিয়ে জামাইবাড়ী পড়ে রইলুম। তাও ধর না কেন এক বছর হবে। তারপর জামাই আর থাকতে পারল না। আবার বিয়ে করল। সেই নতুন বউ যে হোল, সে কথা আর কি বলব দিদিগো, হাড়ঝাড়ি ঘরের মেয়ে, সে কি এই সতীন-কাঁটা সইতে পারে! গালা-গাল-মন্দ, মার-ধোর এই তুধের মেয়ে আর কত সইবে? জামাইও তাকে সামলাতে পারে না। তাই জামাই বল্ল, মা, নক্ষিকে তোমার কাছেই রাখ, আমি বরঞ্চ কিছু কিছু খরচ দেব। তা আমি আর কি করব ভাই, এই এক রত্তিটাকে টেনে টেনে বেড়াচ্ছি।

পাশে বসে-থাকা লক্ষ্মীর রুক্ষ্ম-চুলের মধ্যে শুকনো বাঁকা আঙ্গুল চালাতে চালাতে বুড়ী বল্ল, এই মেয়েও আমাকে ছেড়ে কোথাও থাকবে

না। বড় মাসী এত যত্ন করে, সেখানে এ থাকতে চায় না। এই আমি যতদিন বড় মেয়ের বাড়ী থাকব ততদিন থাকবে, তারপর আর নয়। এদিকে আমার বউ-মা পাজী বজ্জাত যতই হোক না কেন, আড়ালের কথা ভাই মিথ্যে বলতে নেই, সে এটাকে খুবই যত্ন-আত্তি করে, কিন্তু সেখানেও এ থাকবে না। আমি বলি তুই থাকবি না কেন, তা ও বলে আমাকে ছেড়ে থাকতে ওর মন কেমন করে। এই গেল আশ্বিন মাসে পুজোর সময় এর বাপ কলকাতায় এসেছিল। আমি তখন ছেলের কাছে মানিকতলায় ছিলুম। এর বাবা, আমার জামাই, তা বলতে নেই ভাই, তার ওপোর মা লক্ষ্মির দয়া যেমন আছে মনটাও তার তেমনি উঁচু, আমার জন্যে একখানা ভাল থান, এই মেয়ের জন্যে ছিটের জামা-প্যাণ্ট, এক ঠোঙ্গা জিলিপি এই সব নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। সেই তখন তাকে বল্লুম, বাবা কেশব, আমি আর কদ্দিন, তুমি একটা ভালো পাত্তর দেখে এটার বিয়ে দাও, না হলে আমি চোখ বুজলে এ দাঁড়াবে কোথায়। তা ভাই, জামাই কিন্তু আমার কথা ফেলে না। বল্ল, মা, সেই চেষ্টাই আমি করছি কিন্তু বিয়ের ফুল না ফুটলে মানুষের শত চেষ্টাতেও ত কিছু হবে না। জামাই কি চায় জানো দিদি, বলে দেশে-গাঁয়ে জমি জায়গা থাকবে, বড় সংসার হবে, লেখাপড়া জানা ছেলে হবে, তবে মেয়ের বিয়ে দেবে। উটকো ঘরে মেয়ে দেবে না, এই হোল তার মনের কথা। তা খরচ পত্তর সে ভালই করবে, আর করবে নাই বা কেন বলো! তাকে ভগবান দিয়েছেন, সে খরচ নিচ্চয় করবে। এই যে আমি, আমি যখন এর বাবাকে জামাই করি, তখন আমার কি ছিল! এর দাদামশাই ত আমাকে কলা দেখিয়ে চলে গেল। আমি ধার-দেনা করে আমার কানের মাকড়ী, নাকের নথ সমস্ত বিক্রী করে, তা ধর না কেন যেমন তেমন হোক, পেরায় দেড়শ দুশো টাকা খরচ করে তবে বিয়ে দিয়েছিলুম। কি গো দিদি, ভাল করি নি?

নিশ্চয়, ভালই করেছিলে, ভারতীর মা বৃদ্ধার কথায় সায় দিল।

বাইরে দরজায় শব্দ হতেই ভারতীর মা বল্ল, দেখি দিদি, এই বোধ হয় মন্টি এল।

মণ্টু ঘরে ঢুকেই বল্ল, এই যে মঙ্গলা-মাসী, আজকে হঠাৎ কি মনে করে? কি রে লক্ষ্মী, কেমন আছিস্?

মাসী বল্ল, এলুম মা তোমার কাছে। তোমাদের অজিত মাস্টার বল্ল, রাতটা এইখানে থেকে কাল সকালের পেরথম্ বাসে রাজার হাটে চলে যেতে।

তাই বুঝি? ভারতী শাড়ী ছাড়বার জন্য আলনায় হাত দিল। বল্ল, খেয়ে-দেয়ে এসেছ ত?

না মা, খাওয়া আর হোল কোথায়? পোড়ারমুখীর তেজ ত দেখ নি, তার মুখের সামনে দাঁড়ায় কার বাপে। বাড়া ভাত ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছি। একটু থেমে বল্ল, আমার পেটের ছাঁ-টাও এমন ভেড়ো যে, আসার সময় তাকে বলতে সেই গুয়োর বেটা দু'ঠোঁট এক করল না, বাক্যি হরে মৌনী হয়ে রইল। ছি-ছি, এমন গব্‌ভে তিন নাথি!

বুড়ী নিজের বুকে এবং পেটে নিজের হাতে চড় মারতে লাগল। ভারতী সে দিকে চেয়ে মুখ-টিপে হেসে বল্ল, ঠিক আছে মাসী, কিন্তু এখানে ত ভাত নেই, এখানে রুটি। খেতে পারবে?

দেখি, জল দিয়ে ভিজিয়ে খাব। আমার আবার খাওয়া, তুমিও যেমন!

রাত্রে ভারতীর ঘরের মেঝেয় মাসীর নিয়ে-আসা বিছানা পেতে মাসী ও লক্ষ্মী দু'জনে শুয়েছিল। মেয়েটা ঘুমুতেই মাসী উঠে এল ভারতীর কাছে। ভারতীও এজন্য তৈরী ছিল। ফিস্‌ফিস্ করে বল্ল, খবর কি?

মাসী বল্ল, ভাল নয়। শত্তুরদের নজর পড়েছে, তাই রাতারাতি এগুলো আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

কে আনলে?

আমাদের সেই রিক্সা।

হরকিষণ ?

হ্যাঁ। সাবধানে রেখো। কাল ভোরেই মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাব। খুব জরুরী।

কি ব্যাপার ?

জানি না। কাল ভোরে যেতে বলেছে।

আচ্ছা।

এর পর সেই অন্ধকার ঘরে মাসী ও ভারতী দু'জনে নিঃশব্দে হ্যারিকেনের আলোটা আবার জ্বেলে ভারতীর তক্তপোষটা তুলে তক্তপোষের তলায় সঞ্চিত কাঠ-কাটরা সরিয়ে পোর্টম্যান্টোটা একেবারে দেওয়ালের দিকে ঠেলে ভাঙ্গা কাঠ-কাটরাগুলো পোর্টম্যান্টোর সামনে চাপা দিয়ে তক্তপোষ পেতে তার ওপোর বিছানা পাতল। দেখা গেল ঐ বৃদ্ধার গায়ের জোর ভারতীর তুলনায় কম ত নয়ই, বরং বেশী বলেই মনে হয়।

কাজ শেষ করে ভারতী ফিস্‌-ফিস্‌ করে বল্ল, কি আছে মাসী ?

জানি না।

লক্ষ্মীটা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। হ্যারিকেন নেভানর আগে ভারতী তার ঘড়িতে দেখল, রাত্রি ঠিক দু'টো।

লেখা শেষ করে অধ্যাপক অজিত বসুও কপালের ওপোর হাত বুলিয়ে চোখ রগড়ে টেবিলের টানাটা টেনে হাত ঘড়িতে দেখলেন, রাত্রি দু'টো, অর্থাৎ এখনও পুরো চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু ঘুম কি এখন হবে ? খবরটা যে নেহাতই ঠিক তাই বা কে বলবে, কিন্তু ঘুম বোধ হয় আজ আর হবে না ; ভাবতে ভাবতেই লেখাটার দিকে আবার চোখ পড়ল। কাটাকুটি-করা কাগজটা পুনরায় দরদ দিয়ে পড়তে লাগলেন—

ভুলের লগ্ন এসেছে এবার ভুল করি দিনরাত
এই জীবনের দাবার বাজীতে হব কি কিস্তিমাৎ ?

সাজায়ে ছিলেম বলগুলি সব হই আগুয়ান করি কলরব
হোল একচুল নজরের ভুল দাবা হোল কুপোকাৎ
এই জীবনের দাবার বাজীতে হব কি কিস্তিমাৎ ?

মনের শত্রু দেহের শত্রু পরোক্ষ অরি যত
কাহাকেও আমি শেষ করি নাই মায়ামুগ্ধের মতো ;
পাল্টা বলের চাপান লাগায়ে শত্রুর বল রাখিয়া দাবায়ে
ভাবিয়াছিলাম ঘোড়ার খেলায় জয়ী হব নির্ঘাৎ,
কিন্তু কি আজ এতটুকু ভুলে হইব কিস্তিমাৎ ?

খেলার সুরুতে মনের রাজাকে ধর্মের ব্যূহ রচি
বাঁধি নাই আমি নিয়ম-নিগড়ে হয় নাই অভিরুচি
রাজা পড়ে ছিল আপন কোঠায় রক্ষী বোড়েটি সহসা ওঠায়
হোল দুর্বল, শত্রুর দল হানিছে চরমাঘাত
এতটুকু হেলা সুরুতে করিয়া হব কি কিস্তিমাৎ ?

সত্যই কিস্তিমাতের সময় কি এসেছে ? প্রফেসর ভাবেন, হয়ত প্রভাতের সম্বন্ধে আমরা ভুলই করেছি। প্রভাত ও পশুকে লিকুইডেট করা হয়ত নেহাতই ভুল হয়েছে। ভাল ওয়ার্কার, কিন্তু চক্রবর্তীর কাছে আজ যে লোক,—নাঃ, ঠিকই হয়েছে, কিন্তু কি হবে, ঠগ বাছতে গাঁ যে উজোড়—

হঠাৎ যেন অজিত বাবু সম্বিৎ ফিরে পেলেন। চোখ রগড়ে আবার পড়তে লাগলেন—

বিদ্যা বুদ্ধি তেজের দম্ভে ছিনু আমি ভরপুর
দেহের শক্তি অর্থের বল সকলই ছিল প্রচুর
নৌকা হাতীরে বাড়ায়ে বাড়ায়ে ঘোড়ার খেলায় লাফায়ে লাফায়ে
ছুটিয়া গিয়াছি অথৈ পাথারে করি নাই দৃকপাত
শক্তির মদে মত্ত অন্ধ হব কি কিস্তিমাৎ ?

একটির পর একটি যেতেছে হব আমি নিঃশেষ
চলে গেছে দাবা, নৌকার জোড়া, নাইকো আশার লেশ !

বোড়ে ঠেলে ঠেলে ফিরিয়া পাব না নৌকা ও দাবা, নাই সান্ত্বনা
শুধু বসে করি চালের গণনা কবে হবে দেহপাত
নিঃস্ব রিক্ত পরিত্যক্ত হব কি কিস্তিমাৎ ?

এই জীবনের সতরঞ্জেতে সকলেই যায় খেলি
কভু জিৎ হয়, কভু পরাজয়, কোন খেলা যায় জ্বলি।
এই জন্মের দাবার বাজীতে হারিয়া কি যাব নিজের ফাঁকিতে
পরাজিত জনে কোলে তুলে নিতে আসে কি বিশ্বনাথ ?
এই জীবনের খেলায় কি আমি হইব কিস্তিমাৎ !

কবিতার নামকরণ করি—নামকরণ করি—'সতরঞ্জ'।

কিন্তু, কিন্তু এই কবিতাটা—

প্রফেসার চিন্তিত,

ঠিক আছে। কবিতার শেষে লিখলেন, ইচ্ছে করেই লিখলেন, 'ডি. ফিল-এর থিসিস্‌টা কিছুতেই দাঁড়াচ্ছে না, পারছি না, ও আর আমার দ্বারা বোধ হয় হবে না'!

নিজেই হাসলেন ; সবেতেই কামোফ্লাজ করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, কারণ ডি. ফিলের থিসিস তিনি কোন দিনও লিখতে চেষ্টা করেন নি। যদি কবিতা কোন শত্রুর হাতে পড়ে তা হলে এই রকম কবিতা রচনার এটা কৈফিয়ৎ মাত্র।

এর পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম এল না। কি জানি ? সার্চ কি হবে ? কে জানে! জিনিসপত্রগুলো সবই নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়েছি, এই যা ভরসা।

অধ্যাপকের সেই ভোরবেলাটা নিরাপদে রইল না, অথচ সেই ভোরেই মঙ্গলা বুড়ী বিছানার অনেকখানি অংশ তক্তপোষের তলায় ঠেলে সামান্য একটা ছোট পুঁটলি, টিনের সুটকেস এবং পেতলের ঘটিটা নিয়ে ভারতীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ভারতীর মায়ের সঙ্গে দেখাও করল না। বল্ল, দিদিকে বোলো, পেরথম বাস ধরার জন্য ভোর-ভোর বেরিয়ে গেলুম।

ভারতী মৃদুহাস্যে বুড়ীকে বিদায় দিল কিন্তু মনটা তার দুশ্চিন্তায় ভরে রইল। হঠাৎ কি এমন ব্যাপার হতে পারে যে তাকে কোন রকম খবর না দিয়েই প্রফেসার অজিত বোস এই ভাবে এত মালপত্র ওর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন! কে জানে!

বেলা আটটা নাগাদ ভারতী বেরিয়ে পড়ল। কলেজের খাতা এবং একটা বই হাতে নিয়ে নিরাভরণ বাঁহাতে ঘড়িটিমাত্র পরে নিরীহ কলেজ গার্ল অধ্যাপকের বাড়ীতে গিয়ে দূর থেকেই দেখতে পেল এক জন পুলিশ স্যারের দরজায় দাঁড়িয়ে। ভারতী পথচারীর ভঙ্গিতে ঐ দিকে দেখতে দেখতে যেমন হাঁটছিল তেমনি হেঁটে চলে গেল। এখানে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না।

একটা গলি ছাড়িয়ে দ্বিতীয় গলির মোড়ে যে মনোহারীর দোকানটা ছিল সেই দোকানে ঢুকে ভারতী বল্ল, রুল-টানা চার নম্বরের খাতা আছে?

দোকানদার ওর দিকে চেয়ে বল্ল, আছে।

বলেই কয়েকখানা খাতা বার করে ওর সামনে শো কেসের ওপোর ফেলল।

ভারতী খাতা খুলে খাতার পাতা পরীক্ষা করতে করতে মৃদুস্বরে বল্ল, কি হোল?

দোকানে আর কেউ ছিল না। দোকানদার বল্ল, ভোর থেকে সার্চ করে এই কিছু আগে ওঁকে নিয়ে গেছে।

পেয়েছে কিছু?

না।

তবে নিয়ে গেল? কারা এসেছিল?

স্পেশাল।

একটি ছেলে এসে দোকানে ঢুকল। হাতের পয়সাগুলো সামনে রেখেই বল্ল, থিন এ্যারারুট পঞ্চাশ।

ভারতী বল্ল, এই খাতার দাম এক টাকা! সে দিন নব্বুই পয়সায় নিলুম যে?

দোকানী বল্ল, দাম বেড়ে গেছে, এক টাকার কমে আজ দেওয়া যাবে না।

তবে থাক, ভারতী রাগ দেখিয়ে খাতা রেখে বেরিয়ে এল।

পঁচানব্বুই দেবেন? দোকানদার চিৎকার করে বলেছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারতী বল্ল, পাঁচ পয়সা বেশী দেব কেন?

দোকানদার সানুনয়ে বল্ল, কি করব বলুন, আমাদের কেনা পড়ছে বিরেনব্বুই। তিন নয়া লাভ দেবেন না?

দেখি, আর একটা দোকান দেখি।

হাই হিল চটির শব্দ করে ভারতী ফুটপাথে নেমে পড়ল।

খবরটা সেই দিনেই মুখে মুখে ছড়াল। অধ্যাপক গ্রেফ্‌তার হওয়ার প্রতিবাদে কয়েকটা কলেজে ধর্মঘটও হোল। ভারতীদের কলেজেও এর ধাক্কা এসেছিল কিন্তু ক'দিন পরেই পার্ট টু টেস্ট পরীক্ষা সুরু হবে এবং এ সময়ে অধ্যাপকদের কাছ থেকে সাজেসান পাওয়া যাবে সেই আশায় ধর্মঘট তেমন ব্যাপক হোল না। ফার্স্ট ইয়ারের কোন কোন সেকশন হয় নি, এই পর্যন্ত। সেকেণ্ড ইয়ার ত কবেই শেষ হয়ে গেছে। থার্ড ইয়ারের ক্লাস প্রায় সবগুলোই হয়েছিল।

পরীক্ষা ভারতীর মাথায় উঠেছে। সে ক্রমান্বয়ে ভাবতে লাগল এখন তার কি করণীয়। অজিতদা যে-জিনিস কাল এখানে পাচার করেছে সেগুলো কি? আঃ, ভগবান যদি এমন করেন যে ওদের গোটা দলটা বেশ কয়েক বছরের জন্য জেলে আটকে পড়ে তা হ'লে ভারতীর জীবনটা নিষ্কণ্টক হয়। ঐ নিষ্কণ্টক পরিস্থিতির অভাবে ভারতীর বর্তমান জীবনটা কণ্টকশয্যায় পরিণত হয়েছিল।

বাড়ীতে ফিরেও ভারতী স্থির থাকতে পারল না। নিয়মমত কলেজেও সে গিয়েছিল, প্রফেসারদের দেওয়া সাজেসানও সে টুকেছিল কিন্তু কলেজ শেষ হবার আগেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল বেলেঘাটায়, মানিকতলায়। নিরাপদ দূরত্ব থেকে খবর নিল তিনকড়িদা'দের আস্তানাতেও আজ ভোরে পুলিস এসে সার্চ

করেছে। বেহিসেবী টাকাকড়ি না কি অনেক পেয়েছে। আপত্তিকর মাল মসলাও বেশ কিছু পেয়েছে এবং তিনকড়িদাও গ্রেপ্তার হয়েছেন। মানিকতলার কারখানায় পুলিস কাউকে পায় নি, পঞ্চু নামক একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গিয়েছিল। তাকে এখনও ছাড়ে নি। ওদের সেরা কর্মী জগৎদাকে স্নুবর্ণা নাম্নী এক পতিতার ঘর থেকে গ্রেপ্তার করেছে। সব শুনে ভারতীর স্পষ্ট মনে হোল, দলের কোন লোক পুলিসকে লাগিয়েছে, না হলে এক দিনে একই সঙ্গে ঐ চত্বরের সব ক'জন এ ভাবে কখনও ধরা পড়তে পারে না। মাত্র তিন দিন হোল মিনিস্ট্রি ফল করেছে। রাজ্যপালের শাসনের তৃতীয় দিনেই পুলিশের এত বড় সাফল্য সত্যই বিস্ময়কর। ভয় হোল, ওর নিজের অবস্থা কি হবে কে জানে! যে লোক এদের সকলের খবর জানে সে কি ওকে জানে না! তা ছাড়া ওর নিজের চৌকির তলায় ঐ যে ওগুলো রয়েছে,—একবার যদি পুলিস এসে ওর বাড়ীতে ঢোকে তা হলেই ওর সমস্ত কল্পনা একেবারে ধুলিসাৎ হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ভারতীর সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠল। স্নুনন্দাকে এ সময় পেলে হয়ত কিছু স্নুরাহা হোত কিন্তু,—না, থাক, কে জানে, হয়ত এটা তারই কাজ!

দ্রুতপদে পা চালিয়ে নিজেদের গলির মোড়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে দুরু দুরু বুকে গলির মধ্যে ঢুকে দেখল গলিতে যথারীতি তেল কলের মিস্ত্রী ও মজুরদের রান্না, গা টেপানো, ভজন গান, এই সব চলছে! ভারতী আশ্বস্ত হোল। বুঝল ওর পাড়াটা এখনও নর্ম্মাল অবস্থায় আছে। কিন্তু হয়ত আজই ভোর রাত্রে ওর বাড়ী সার্চ হতে পারে। ভারতীর গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। এতদিন পার্টিতে থেকে এত রকমের কাজ ও করেছে কিন্তু কখনও পুলিসের মুখোমুখি হতে হয় নি, সেজন্যই আশঙ্কাটা ওর এত প্রবল, এতটা বিভীষিকাময় হয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ভারতী শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুমাল না, রাত গভীর হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করে পড়ে রইল।

তারপর সে উঠল। পুনরায় হ্যারিকেন জ্বালল। এদিক ওদিক চেয়ে নিজের বিছানাটা তক্তপোষ থেকে নামিয়ে মেঝেয় ফেলে একাই অনেক চেষ্টায় তক্তপোষটা এধার পানে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেও-য়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা দড়ি-বাঁধা পোর্টম্যাণ্টোটা পরীক্ষা করতে লাগল। পুরনো আমলের মজবুত স্টীল ট্রাঙ্ক। ছোট একটা তালা ঝুলছে, গা-চাবিও আছে। ওর পাওয়া শিক্ষামত মাথার কাঁটা ও লোহার পেরেক দিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ঝোলানো তালাটা খুলে গেল। ভারতীর কপালে ঘাম জমল, গায়ের জামাটা ভিজে উঠল। বাইরে নিস্তুতি রাত। বড় রাস্তায় মাঝে মাঝে এক একটা লরী যাচ্ছে, সেই শব্দ এখান থেকেই পাওয়া যায়। কুকুর ডাকছে, কুকুরে কুকুরে বোধ হয় ঝগড়াই বেঁধেছে। নতুন বসন্তের সময় কুকুরদের মধ্যেও কুক্কুরীর অধিকার নিয়ে এ রকম ওসমান-জগৎসিংহের লড়াই বাঁধে। ভারতীর মুখে মৃদু হাসির রেখা! পাশের ঘরে ছোট ভাইটা মাঝে মাঝেই কাসছে। সারাটা শীতকালই সর্দি, কাশি ও জ্বরে ভুগেছে। এখন এই ক'দিন ওর খুব শুকনো কাশি হয়েছে। ভারতীর কাছে যে কটা চাবি ছিল সবগুলো দিয়ে একে একে চেষ্টা করেও গা-চাবিটা খুলতে পারল না। শেষে আবার সেই চুলের কাঁটা ও পেরেক। দশ পনর মিনিট চেষ্টার ফলে গা-চাবিও খুলে গেল। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে ভারতী কপালের ঘাম মুছল। কানের কাছে মশা ভোঁ ভোঁ করছে, দু'একটা আরশোলাও বিরক্ত করছে, কিন্তু সে দিকে ভারতীর ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রথম সাফল্যে সে উৎফুল্ল।

এর পর দড়ির গেরোগুলো খুলে কোন রকমে দড়ি সরিয়ে সরিয়ে তোরঙ্গর ঢাকা খুলে ভারতী অবাক। যা ভেবেছিল ঠিক তা না হলেও তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান জিনিস! ওপোর ওপোর জিনিস-গুলো সন্তর্পনে নামিয়ে তলা পর্যন্ত দেখল, রিভলবার ও পিস্তলে মোট

আঠারোটা, ভিন্ন মেকার ও ভিন্ন আকারের জিনিস। পার্টস্ খোলা অবস্থায় একটা দোনালা বন্দুক, একটা রাইফেল, আর একটা, কি জানি, এটাও বোধ হয় কোন রকম বন্দুক, হয়ত একেই স্টেন গান্ বলে। অনেকগুলো বাক্স ভর্তি কার্তুজ। ও ভেবেছিল তোরঙ্গয় হয়ত পার্টির তৈরী ককটেল বোমা আছে কিন্তু না, তার চেয়েও এগুলো অনেক দামী জিনিস, কিন্তু ওর কি লাভ এতে ? শুধুই দায়িত্ব !

তোরঙ্গর তলায় বাদামী কাগজ পাতা। হাত বুলিয়ে এক জায়-গায় মোটা মতন কি যেন হাতে ঠেকল। বাদামী কাগজখানা তুলে নিয়ে দেখল ভেতরে পাশাপাশি পাতা আছে বেশ কয়েকটা মোটা মোটা খাম। ভারতীর মনে হোল বোধ হয় দরকারী কাগজপত্র এই ভাবে রাখা আছে। একটা খাম তুলে খুলতেই ভারতী অবাক। এক বাণ্ডিল একশ টাকার নোট। চক্‌চকে নতুন নোট। ওর হাত কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি গুণে ফেলল। অনেক, পঞ্চাশ খানা। সেগুলো খামে ঢুকিয়ে অন্য খামে হাত দিল, খুল্‌ল, তাতেও তাই। পঞ্চাশখানা একশ টাকার নোট। এই ত! এই জিনিসই ত সে চায়! এই দিয়েই তার ভবিষ্যৎ জীবন সে গড়বে! তাড়াতাড়ি পরের খামটা খুলল। ঐ খামে দু' থাকে পাশাপাশি সাজানো পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশখানা দশ টাকার নোট। ভয়ে, আনন্দে, উত্তেজনায় ভারতী কাঁপতে লাগল, ঘামতে লাগল, তার চোখের ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। সব কটা খাম গুনে সে হিসেব করল, পুরো ষোল হাজার টাকা। ষোল হাজার! রীতিমত গুপ্তধন। দেবী চৌধুরাণীর গল্প মনে পড়ল। ঘড়া ভর্তি মোহর! ভারতী কি অজ্ঞান হয়ে যাবে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভারতী তাড়াতাড়ি খাম-গুলো বার করে নিল। তারপর সেই বাদামী কাগজখানা যেমন ছিল সেই ভাবে তোরঙ্গের তলায় পেতে বন্দুক, পিস্তল, কার্তুজ যেমন ছিল তেমনই ভাবে সাজিয়ে রেখে বাক্সর ডালা বন্ধ করে কি যেন ভাবল। পুনরায় বাক্স খুলে পিস্তল, রিভলভার ও কার্তুজ পরীক্ষা করে সবচেয়ে

ছোট পিস্তলটা টাকার খামগুলোর পাশে রেখে পিস্তলের কার্তুজের একটা বাক্স বার করে সেই কার্তুজ ঐ পিস্তলে দিয়ে পরীক্ষা করে তোরঙ্গর ঢাকা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে মাথার কাঁটা ঘুরিয়ে কোন মতে তালাটা বন্ধ করল। গা-চাবিটাও সেইভাবে বন্ধ করল। এর পর দড়ির বাঁধন আগের মতো লাগিয়ে, গেরো দিয়ে, মাসীর রেখে-যাওয়া বিছানার একটা ন্যাকড়া বার করে সেই ন্যাকড়া দিয়ে তালা থেকে সুরু করে গোটা বাক্সটা ঘষে ঘষে মুছে কোথাও কোন আঙ্গুলের টিপ-ছাপ লেগে থাকলে সেই চিহ্নটা যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা করে তক্তপোষটা টেনে নামিয়ে তার ওপোর নিজের বিছানা পেতে হাত-পায়ের ধুলো ঝেড়ে টাকার খাম ও কার্তুজ গুছিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। বর্তমানের সাফল্য ও অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের নিদারুণ উত্তেজনায় ভারতীর হাত পা কাঁপছিল। স্থির হয়ে শোবার পর সেই কাঁপুনি এমনই বেড়ে গেল যে, শত চেষ্টাতেও বেচারী সেই কাঁপন থামাতে পারছিল না।

সারাটা রাত আদৌ ঘুম হোল না। ঘুম ত দূরের কথা, চোখের পাতাও সে বন্ধ করতে পারছিল না। নানা রকম বিষয় সে ভাবছে, সেই সঙ্গে কান খাড়া রেখেছে বাইরের দিকে। বড় রাস্তায় মাঝে মাঝেই মোটর ছুটছে। সে উৎকর্ণ হয়ে আছে, মোটর থামে কি না সেটাই শোনার জন্য। থামলেই বিপদ!

একবার ভাবে পুলিস এলে পিস্তলের লড়াই দেবে। পার্টিই তাকে পিস্তল ছুঁড়তে শিখিয়েছে। আবার ভাবে, পারব না, মিছিমিছি আরও জড়িয়ে পড়ব। মনে মনে একটা গল্প সে তৈরী করে ফেলেছে। পুলিস যদি আসে, যদি সার্চই হয়, তা হলে সোজা বলবে তার বাবার স্কুলের সেক্রেটারী, যার জোরে তার বাবার চাকরী, যিনি তাকে দয়া করে পড়ান, তার কলেজের মাইনে দেন, তিনি তাঁর ঝিকে দিয়ে একটা বাক্স এবং একটা পুঁটলি পাঠিয়েছিলেন। সে জিনিস না রাখলে কি চলে! ঐ বাক্স ও পুঁটলির মধ্যে কি আছে তা সে আদৌ জানে না।

ভারতী আবার উঠল। যে ন্যাকড়াটা দিয়ে সে তোরঙ্গ মুছেছিল সেই ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পিস্তল, কার্তুজ ও টাকার খামগুলো বেঁধে ঐ পুঁটলিটা সে মঙ্গলা মাসীর অগোছালো বিছানার ভিতর গুঁজে রাখল।

যদি পুলিস না আসে তা হলে কি করবে?

ভারতী ঠিক করল, ওর প্রথম কাজ হবে খবরের কাগজ দেখা। কাল রাত্তিরের রেডিওর খবরের তুলনায় সকালের কাগজে আরও কিছু খবর সে বিস্তারিত ভাবে পাবে। কাগজ দেখে সে যদি বোঝে, ওরা ছাড়া পায় নি, দু'এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবার সম্ভাবনাও নেই, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ করে কালই সন্ধ্যার মধ্যে এখান থেকে সরতে হবে। দশ টাকার নোট আছে পাঁচশখানা অর্থাৎ পাঁচ হাজার। ঐ টাকাগুলো মাকে দিয়ে বলবে লুকিয়ে রাখতে। দরকার মত এক এক খানা নিয়ে সংসার চালাবে। পাঁচ হাজার টাকার একশ টাকার নোট সে নিজের সঙ্গে নেবে। হাজার পাঁচেকের মতো টাকা সে সুব্রতকে দেবে পথ-খরচ, হোটেল-খরচ ইত্যাদির জন্য। এক হাজার সে নিজের পেটের ভেতর বেঁধে রাখবে, সে কথা এমন কি সুবোকেও জানাবে না। পিস্তলটা সব সময় নিজের কাছে রাখবে। যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সে বেরুচ্ছে, তাতে কখন কি হবে তার ঠিক নেই। মাকে বলে যাবে, কেউ খোঁজ করলে মা যেন বলে, মেয়ে চাকুরীর চিঠি পেয়ে উত্তর বাংলার, এই কুচবিহারে গেছে, হয়ত ফিরতে দেরি হতে পারে। আরও বলে যাবে, কোন রকম সার্চ হলে মা যেন বলে, আমার মেয়ে চলে যাবার দু'দিন পরে স্কুলের সেক্রেটারী বাবু তাঁর ঝিকে এবং আর একটা লোককে দিয়ে ঐ বাক্স বিছানা এনে মেয়ের ঘরে রাখিয়ে গেছেন। কিন্তু এ গল্প কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? তা হলে আর কি ভাবে ম্যানেজ করা যায়—

গল্প তৈরী করাও পার্টি-কর্মীদের অন্যতম কাজ। তাতে ঐ মঙ্গলা-মাসীও সিদ্ধহস্ত। মঙ্গলার কেউ নেই। যৌবনে দেহের ব্যবসা

করেছে। পরে কিছুদিন থিয়েটারে মেয়েদের সীটে ঝিয়ের কাজ করেছে। সে সময়ে রোজ থিয়েটার দেখে দেখে মাসী বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। এর পর ফুটপাথে পানের দোকান দিয়েছিল। সেখান থেকেই ওকে পার্টিতে রিক্রুট করা হয়েছে। ঐ বাচ্ছা মেয়েটা এক ভিখারীর মেয়ে। ওর মা'টা মরে যাবার পর ওকে মাসীর কাছে রাখা হয়েছে। ঐ রকম মেয়ে দিয়ে কখন কি কাজ হয় কে জানে! অজিত বাবুর মতে, থাক একটা হাতের পাঁচ, কামোফ্লাজিং-এর জন্য এ সবও দরকার।

তা দরকার ত হয়ই। তাদের কারখানার তৈরী মাল ঐ বুড়ী আর মেয়েটার মারফৎ হরকিষণ রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে জায়গায় জায়গায় কত দিন ধরে কত বারই ত পাঠানো হোল, কখনও কারুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নি। তা ছাড়া ওরা বিশ্বাসীও খুব, আর বুড়ীর কথাবার্তা ও অভিনয় এত নিখুঁত যে কারুর কোন সন্দেহ হতেই পারে না। একটা বোকা হাবা কালো কালো বাচ্ছা নিয়ে বুড়ী যে এমন সব সাংঘাতিক মাল পাচার করে তা কি কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারে! এ সবই অজিতদার ব্যবস্থা, কিন্তু সেই অজিতদা'কে ফাঁকি দিয়ে গুরু-মারা বিদ্যেয় ভারতীকে পালাতে হবে। সে জন্য ভারতীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

সকালের কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে খবর বেরুল. অধ্যাপক গ্রেপ্তার, বিপদজনক ঘাঁটির রহস্যভেদ, আঠার জন আসামীকে জামিন না দিয়ে পুলিস হাজতে প্রেরণ, ইত্যাদি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেই ভারতী ছুটল পোস্ট অফিসের টেলিফোন বুথে। নাউ অর নেভার। সুব্রতকে ওর চাই।

এবং পেয়েও গেল। বল্ল, এখনই দেখা করতে চাই, দরকার, খুব জরুরী।

টেলিফোনের ওধার থেকে সুব্রত বল্ল, আমার কলেজ আজ সাড়ে এগারটায়—

কলেজে পরে যেও। সাড়ে এগারটায় গোয়েঙ্কা কলেজের গেটে চলে এস, নিশ্চিৎ।

আচ্ছা।

দেখাও হোল। ভারতী কলেজের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত মোটর বাইক নিয়ে যেতেই সে বল্ল, ইডেন গার্ডেনে যাব, চল।

হঠাৎ?

কাজ আছে।

বাইকের পেছনে চড়ে বসল ভারতী এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে বেড়াতে ভারতীরা এক নিরাবিলি জায়গায় এসে পৌঁছল। সহসা ভারতী সুবোর একখানা হাত চেপে ধরে বল্ল, চল, আজই এখান থেকে সরে পড়ি।

আজ? সুব্রত কিছুটা অপ্রস্তুত। আমি—আমি কিন্তু এখনও টাকাকড়ির ব্যবস্থা—

নো ওয়ারি। আমি টাকা দেব।

তুমি টাকা পাবে কোথায়?

আমার বিয়ের খরচ বাবদ বাবা মোটা টাকা ব্যাঙ্ক থেকে কাল তুলে এনেছেন। তাই থেকে আজ সকালে আমি পাঁচ হাজার সরিয়েছি। সেটা তুমি নাও। আজই বিকেলের বা সন্ধ্যের কোনো ট্রেনে রওনা দিতে হবে।

সুব্রতকে নীরব দেখে ভারতী বল্ল, টাকার চিন্তা কোরো না। বিকেলে বাড়ী থেকে বেরোবার আগে আরও কিছু টাকা হয়ত যোগাড় করতে পারব। গয়না-গাঁটি কিছু নেব না, বিদেশে ওগুলো বিপজ্জনক, কিন্তু টাকা বোধ হয় আরো কিছু পাবো। সে বিষয়ে ভেবো না, আজই যাবার ব্যবস্থা করো।

কোথায় যাব, ভয়ে ভয়ে সুব্রত প্রশ্ন করে।

যাব? যাব এই ধরো না কেন—

পুরী?

না না, ওখানে আমাদের চেনা লোক থাকতে পারে। পুরী গিয়ে কাজ নেই, চল নাগপুর।

কেউ আছে সেখানে?

কেউ না। ঐখানে বেশ গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে।

তা হলে কিন্তু এবারের পরীক্ষাটা—

কলেজের পরীক্ষার চেয়ে জীবনের পরীক্ষা অনেক বড়ো, বুঝলে মশাই। চল হাওড়া যাই। দু'খানা টিকিট কিনে—

আজই রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে?

দরকার নেই। সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কাটবে, না হয় বসেই যাওয়া যাবে।

বাড়ীতে কিছু বলে যাব না?

বলবে, নিশ্চয়ই বলবে। বলবে, কলেজ থেকে এক্সকারশানে যাচ্ছ, ফিরতে পাঁচ সাত দিন দেরি হতে পারে।

এক হপ্তার মধ্যেই ফিরবে?

পাগল নাকি? তোমার বাবা আমাদের দু'জনকে স্বীকার করে না নেওয়া পর্যন্ত ফিরব না। তুমি কী গো! বোঝ না কেন?

সুবো নিজের বোকামিতে লজ্জিত হোল। ভারতীর কাছে নিজেকে ছোট বলেই সুবোর মনে হয়। দিদি মিথ্যে বলে নি, ওর চেয়ে ভারতী বয়সে বড় কি না জানি না, বুদ্ধিতে অবশ্যই বড়ো।

পঞ্চাশখানা একশ টাকার নোটশুদ্ধ একটা বড় খাম ভারতী এদিক ওদিক চেয়ে সুবোর হাতে দিয়ে বল্ল, দু'খানা বার করে তোমার ব্যাগে রেখে বাকীটা ভেতরের পকেটে ঢোকাও। এখনই হাওড়ায় গিয়ে টিকিট কিনতে হবে।

টাকাটা হাতে পেয়েই কেন কে জানে সুবোর সাহস অনেকখানি বেড়ে গেল। সে সোল্লাসে ভারতীকে নিয়ে মোটর বাইকে হাওড়া গেল।

টিকিট কেনার পর ভারতী বল্ল, তুমি বাড়ীতে বলবে এখন কুচ-বিহার যাচ্ছ; সেখান থেকে কতকগুলো চা বাগান দেখতে যাবে,

জলঢাকায় হাইডেল প্রোজেক্ট, উত্তর বাংলার জঙ্গল, এই সব দেখবে, বুঝলে ?

ঠিক আছে।

আর হ্যাঁ, আমি আসব প্রায় শুধু হাতে। তুমি একটা হোল্ড-অলে দু'জনের মতো বিছানা মশারি এই সব নিয়ে আসবে। তোমার স্যুট কেস্ নেবে, টর্চ নেবে, ক্যামেরাও নিতে পারো। আমরা মিস্টার এণ্ড মিসেস্ ব্যানার্জী হয়ে সকলের কাছে পরিচয় দেব।

সুবো অবাক হয়ে ভারতীর দিকে চেয়ে শেষে বল্ল, রীতিমত থ্রিলিং, কি বলো ?

ইয়েস্ স্যার, সহাস্যে ভারতী উত্তর দিল। পরে বল্ল, ট্রেন হচ্ছে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে, আটটা দশে। আমি ঠিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় এইখানে এসে দাঁড়াব। আমার চোখে থাকবে নীল চশমা, মাথায় কাপড় দিয়ে বউ সেজে আসব। তখন যেন ঘাবড়ে যেও না। আমি এসে কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না। এসেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে নিয়ে ট্রেনের মধ্যে চেপে বসতে চাই, বুঝেছ ?

অল্ রাইট। সুবোর সাহস বেড়ে গেছে। ভারতীর কাছে থেকে সুবোও তৈরী হয়ে উঠেছে। একেই বলে সঙ্গদোষ, সঙ্গগুণও বলা যায়।

মোটর বাইকে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে ব্রাবোর্ণ রোড দিয়ে ডালহৌসি পার হয়ে ধর্মতলার কাছে এসেই ভারতী বল্ল, এইখানে আমি নামব, একটু থামো।

কেন ? বাড়ী যাবে না ?

এখানে একটু কাজ আছে। থামো।

সুবো আর কোন প্রশ্ন করলো না। সে বোধ হয় মনে মনে ভারতীকে সমীহ করতে সুরু করেছে।

ভারতী নেমেই বল্ল, তুমি যাও। আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় ঐখানে দেখা হবে।

একা একা বাড়ী ফেরার পথে সুবোর মনে কেমন একটা ভয় ও দুশ্চিন্তা এল। শেষে নিজেকে নিজে সাহস দিল, ভারতী সঙ্গে থাকবে, ভয় কি!

সুবো বাড়ী ফিরল দু'টোর পরে। কি করবে, বাবাকে কি ভাবে কথাটা জানাবে, কখন জানাবে, কিছুই সে ঠিক করতে পারছিল না।

নিজের ঘরে ঢুকে সুবো নিজের সুটকেসটা গুছতে বসল। জামা, প্যাণ্ট, লুঙ্গি, পায়জামা বেশ কতকগুলো নিয়ে নিল। কিন্তু বিছানার কি করা যায়? বাবার একটা বড় হোল্ড-অল আছে। সেটা থাকে বাদলের জিম্মায়। বাদলকে ডেকে চাইবে না কি? চাইতেই হবে, তা ছাড়া সে ত লুকিয়ে পালাচ্ছে না। রীতিমত সকলকে জানিয়ে এক্সকারসানে যাচ্ছে। অতএব বাদলকে ডাকল। হোল্ড-অলে বিছানা, কম্বল, মশারি সমস্ত নিয়ে নিজের চটি জোড়াও তার মধ্যে ভরে ফেলল। সব কাজ চুকিয়ে বেলা চারটে নাগাদ ভয়ে ভয়ে বাবার অফিসের ফোন ধরল। বাবা ফিরলে বাবার সামনাসামনি বলার চাইতে ফোনে বলা অনেক সহজ। কিন্তু ফোনে শুনল, বাবা আধ-ঘণ্টা আগে বেরিয়েছেন, হয়ত আজ আর অফিসে নাও ফিরতে পারেন। সুবো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাঁচা গেছে, একটা ফাঁড়া উৎরে গেল। কিন্তু কি করা যায়! বাবার সঙ্গে কথা যখন হলই না, তখন একটা চিঠি লিখে রেখে গেলে কেমন হয়! সেই ভালো। বাড়ী থেকে বেরুতে হবে সাড়ে ছ'টার পরেই। ট্যাক্সিতেই যেতে হবে, কিন্তু হঠাৎ ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেলেই সব মাটি। আটটা বাজতে পাঁচ হচ্ছে জিরো আওয়ার। এদিক-ওদিক হলে চলবে না।

সুবো চিঠি লিখতে বসল। এ বাড়ীর ধারা অনুযায়ী বাবাকে চিঠিখানা ইংরাজীতেই লিখল। একখানা কাগজে কাটাকুটি করে পরে আর একটা কাগজে সংক্ষেপে লিখল, কলেজ থেকে চা বাগান, ফরেস্ট এবং হাইডেল প্রোজেক্ট দেখার প্রোগ্রাম। এ কথাও লিখল যে বি. কম

পরীক্ষায় প্র্যাক্‌টিক্যাল এক্সপীরিয়েন্স হিসাবে এগুলো বিশেষ দরকার। কলেজের খরচে এবং তত্ত্বাবধানে একদল ছাত্রের সঙ্গে সে যাচ্ছে অতএব দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতীও মাকে বল্ল, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই মা। পাশ করার পরেও ত চাকরীই করতে হবে। সেই চাকরী যদি এখনই পাওয়া যায় তা হলে ছেড়ে দিয়ে কি হবে? তারা সমস্ত খরচ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অতএব যাওয়াটা খুবই উচিত। ভারতীর বাবাও সেখানে ছিল। বাবা বল্লেন, হ্যাঁ, কুচবিহার খুব দূর নয়। মিলিটারীতে আমাদেরই সঙ্গে কাজ করত এক ভদ্রলোক, ওর নাম যেন কি বর্মণ, ওর বাড়ী ছিল কুচবিহারে। ওর কাছে শুনেছি, কুচবিহার খুব ভাল সহর। তা তুই সহরেই থাকবি ত?

ভারতী বল্ল, নিশ্চয়। সহরে ছাড়া গ্রামে কি আর বড় স্কুল আছে? কি জানি, ওখানে গিয়ে যা হয় খবর দেব।

মাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বল্ল, শোনো, যদি পুলিস থেকে কেউ খোঁজ করতে আসে তা হলে বেলো, আমি মঙ্গলবার কুচবিহারে চাকরীস্থলে গিয়েছি। অজিতবাবু কি মঙ্গলা-মাসী এলে বোলো শুক্রবারে গিয়েছি।

আজ ত শনিবার, না রে, মা প্রশ্ন করেছিল।

হ্যাঁ, ভারতী উত্তর দিল।

মা বল্ল, হ্যাঁরে, পুলিশ থেকে খোঁজ করতে আসবে কেন? পুলিশের কি—

ভারতী বল্ল, বা রে! বাবার কাছে শোনো নি, ভালো কাজ পাকা হবার আগে পুলিশ এন্‌কোয়ারী হয়।

ও হ্যাঁ, তা শুনেছি বটে, উনি ত তাই বলেন, মা আশ্বস্ত হোল।

ভাই-বোনদের সরিয়ে দিয়ে ভারতী মাকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। টাকার বাণ্ডিলটা হাতে দিয়ে বল্ল, কাউকে জানাবে না, এমন কি বাবাকেও না, খুব গোপনে রাখবে, এতে অনেক টাকা আছে।

এতদিন কাজ করে জমিয়েছি। ওখান থেকে কবে কি পাঠাতে পারব ঠিক নেই, তুমি দরকার মতো একখানা করে নোট বার করে নিয়ে খরচ করবে, বুঝলে ?

এত অনেক দেখছি, কত আছে ? ফিস্ ফিস্ করে মা প্রশ্ন করেছিল।

জানি না। তুমিও গোনাগুণতি করতে যেও না। খুব গোপনে তিন-চার জায়গায় ভাগ ভাগ করে রাখবে। কাউকে বলবে না। আর শোনো, অজিত বাবুদের কাছ থেকে কেউ এলে বিশেষ করে তোমাদের অভাব জানাবে, আমি যে তোমাদের কিচ্ছু দিচ্ছি না, সে কথা বলবে এবং যা পারবে আদায় করে নেবে, সকলের কাছেই অভাব জানিও, বুঝলে ?

রুটি খেয়ে সুটকেস নিয়ে ভারতী বেরিয়েছিল সন্ধ্যে সাতটার সময় এবং ট্রেনে চড়েও ছিল যথাসময়ে। ট্রেন ছেড়েও দিল আটটা-দশে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। সেকেণ্ড ক্লাশে শোবার জায়গা পেল না। ওরা দুটিতে পাশাপাশি বসে রইল।

সুবো ভারতীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। একেবারে নব বধূর সাজ। লাল কাপড়, কপালে এবং সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর, হাসি হাসি মুখ, হাসলে গালে টোল পড়ে। নীল রঙের চশমাটা গাড়ীতে উঠেই সে খুলে রেখেছে। মুগ্ধ মোহন দৃষ্টিতে ভারতী সুবোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

কিন্তু সুবোর ত কই তেমন আনন্দ হচ্ছিল না। এর আগে বহু বিনিদ্র রাত্রে সুবো এমনই একটা পরিস্থিতির উজ্জ্বল সম্ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকত, আনন্দে উল্লসিত হোত, অথচ আজ যখন সেই অতি ঈপ্সিত শুভক্ষণটি ওর হাতে এসে পড়েছে তখন ত কই তেমন ধারা পাগল-করা উল্লাস ওর হচ্ছে না। সারা দিনের দুশ্চিন্তা, ছুটোছুটি, কি নেবে, কি না নেবে তার মন-মন হিসেব, বাবা এলে কি বলবে তারই বারংবার মানসিক কল্পনা, স্টেশনে ঠিক সময় ঠিক জায়গায়

ভারতীর দেখা পাবে কি পাবে না সেই সন্দেহ, কোথাও থেকে কোন রকমে ওদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে শেষ মুহূর্তে সব কিছু বানচাল হবে কি না তার আশঙ্কা, সব মিলিয়ে বেচারী এমনই বিপর্যস্ত ছিল যে অতি-আকাঙ্ক্ষিত এই দিনটিকে সে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে পারে নি। এখন এই চলন্ত বোম্বাই মেলে বসে সারা দিনের সেই সব দুশ্চিন্তা কেটে গেলেও কাল কি হবে, কোথায় কি ভাবে আগামী দিনগুলো কাটাবে সেই চিন্তাই যেন ওর মনে উঁকি দিতে সুরু করেছে। মাথার এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়াবার কথা মনে হতেই ও ভাবল, যাঃ, চিরুনি ত নেওয়া হয় নি। বেরোবার সময় অভ্যাসমত চুলে চিরুনি ও ব্রাস চালিয়ে সে-দুটো ড্রেসিং টেবিলে যথাস্থানে রেখেই ও চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, তোয়ালে ? সেও ত নেওয়া হয় নি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই ভাবল, যাক গে যাক, কিনে নেওয়া যাবে।

কি ভাবছ গো, ফিস্ ফিস্ করে হাসিমুখে ভারতী প্রশ্ন করল।

চিরুনি, ব্রাস, তোয়ালে এগুলো আনতে ভুলে গেছি, সুবো উত্তর দেয়।

নেভার মাইণ্ড, আমাকে যখন সঙ্গে নিতে ভোল' নি তখন ও সবের জন্য আটকাবে না, বলতে বলতে ভারতী ওর পাশে রাখা সুটকেস খুলে সেখান থেকে চিরুনি বার করে সুবোর হাতে দিল। সুবো মাথা আঁচড়াতে লাগল।

কিছু পরে সুবো বল্ল, খড়্গপুরে গাড়ীটা কখন যাবে বলতে পার ?

কেন ?

ওখানে একটু জল খেতে হবে।

কেন গো, ওখানে কেন ? এখানে খেতে আপত্তি আছে, ভারতীর মুখে দুষ্টামির হাসি।

এখানে ? এখানে পাব কোথায় ? বাথরুমের জল ? ছিঃ।

নিজের সুটকেসটা খুলতে খুলতে ভারতী বল্ল, বাথরুমের জলে

আপত্তি থাকলে তোমার নিজের রুমের, মানে রুম-মেটের জল ত খেতে পার।

সুটকেসের ভেতর থেকে জলভর্তি বোতল বার করে ভারতী সুবোর হাতে তুলে দিল।

বোতলের তিন ভাগ জল এক নিঃশ্বাসে শেষ করে সুবো বল্ল, খড়্গাপুরে বোতল ভরে নিতে হবে।

সে তখন দেখা যাবে, ছিপিটা ভাল ভাবে এঁটে ভারতী বোতলটা সুটকেসে রাখল।

সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুবো বল্ল, জিনিসপত্র খুব গুছিয়ে এনেছ ত? তুমি বোধ হয় বাবার সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরে ওস্তাদ হয়ে গেছ?

তা একটু হতে হয় বই কি, সায় দিয়ে ভারতী বল্ল, সঙ্গে তালা চাবি এনেছ?

না ত। কেন? তালা চাবি কি হবে?

তালা চাবি? লাগবে না? হোটেলে ঘর নিয়ে কি রাতদিন ঘর আগলে বসে থাকবে? বেরুতে হবে না?

তা ত বটে! তাহলে তুমি এনেছ?

না, সুবিধে করতে পারি নি! ভেবেছিলুম তুমি আনবে। ঠিক আছে। ওখানে গিয়ে কিনে নিলেই হবে।

ওরা গায়ে গা লাগিয়ে বসে ফিস্-ফিস্ করে কথা কইছিল। ওদের সামনের বেঞ্চে এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং তুটি বাচ্চা ছিল। ছোট তুটিকে বেঞ্চিতে শুইয়ে ভদ্রমহিলা বসে বসে ওদের দিকে লক্ষ্য করছিলেন, ভদ্রলোক জুতো খুলে আসনপিড়ি হয়ে চোখ বুজে বসেছিলেন। সেই সীটের ওপোরের বাঙ্কে এক বিরাট বপু মাড়োয়ারী চোখে হাত চাপা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন। গাড়ীর তুলুনির তালে তালে তার ভুঁড়িটি তু'পাশে তুলছিল। ভারতীদের পেছনের সীটে একদল চীনা পুরুষ ও মহিলা গাদাগাদি করে বসেছিল। তাদেরই

দু'জন অল্প বয়সী ছেলে ও মেয়ে ওপোরের বাঙ্কে দু'ধারে দুই মাথা দিয়ে দু'জনে দু'জনের বুকের কাছে পা দিয়ে শুয়ে এরই মধ্যে ঘুমিয়েছিল। অন্ধকার ভেদ করে সে রাত্রের বম্বে মেল ভায়া নাগপুর ছুটছিল, কিন্তু এত কাছে গায়ে গা লাগিয়ে থাকলেও ভারতী ও সুব্রতর মন দুটি পরস্পরের দিকে না ছুটে অনেক দূর দিয়েই ছুটছিল।

সুবো ভাবছিল, বাবা পাঁচ-সাত দিন ওর কোন খোঁজ-খবর নিশ্চয়ই নেবেন না। তারপর চিঠিপত্র কিছু না পেয়ে ব্যস্ত হবেন, হয়ত ওর কলেজে খোঁজ নেবেন কিম্বা জামাইদাকে খোঁজ-খবর নিতে বলবেন। কলেজ থেকে যখন শুনবেন কোন রকম এক্সকারসান পার্টি যায় নি তখনই ঘাবড়ে যাবেন। নানা জায়গায় চিঠিপত্র, টেলিফোন এই সব চলবে। শেষে কবে যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন কে জানে! বিজ্ঞাপন দিলে বাবা নিশ্চয়ই স্টেটস্‌ম্যানে দেবেন, ঐটিই বাবার প্রিয় কাগজ। দিদি হয়ত বলবে আনন্দবাজারে দিতে। কিন্তু বাবা জানেন, আমি স্টেটস্‌ম্যানই পড়ি। নাগপুরে গিয়ে প্রথম থেকেই স্টেটস্‌ম্যান কিনতে হবে। ভারতীকে নিতে যদি বাবার আপত্তি থাকে তা হলে আমি কিছুতেই বাড়ী ফিরব না। মুখের ওপোর সোজা বলে দেব, তুমি যদি জেঠাইমাকে নিয়ে থাকতে পার তাহলে আমি কেন—। যাক গে, এ রকমটা নিশ্চয়ই হবে না। তেমন বুঝলে ওখান থেকেই জামাইদাকে চিঠি লিখব। না হলে—

ভারতী ভাবছে, দলবল সমেত অজিত পুলিস হাজতে। রিক্সাওয়ালা, মঙ্গলা-মাসী বা সেই ছোক্‌রাটা, সে কে ভারতী ঠিক চেনে না, ওরা ধরা পড়েছে কি না তা ত জানা গেল না। ছোক্‌রাটাকে স্যার কেন পাঠালেন, ভারতী কিছুই বুঝল না। নিশ্চয়ই ভারতীর বাড়ীটা চেনাবার জন্যই ওটাকে পাঠানো হয়েছিল। তা যে কারণেই পাঠানো হোক, ছোকরা অবশ্যই মজবুত, না হলে স্যার তাকে পাঠাতেন না। তার নাম যে কি ভারতী তাও জানে না। এমন কি আঠারো জন আসামী যারা ধরা পড়েছে তাদের নামও কোথাও পাওয়া গেল না,

পেলে বোঝা যেত, ওরাও ধরা পড়ল কি না। ওরা যদি ধরা পড়ে, এবং মার-ধোর খেয়ে ওরা যদি ভারতীর বাড়ীতে বামাল সরাবার কথা কবুল করে বসে তা হলেই সর্বনাশ। হরকিষণ পুরনো ঘুঘু লোক, সে কিছু বলবে না, মঙ্গলা-মাসী এমনই ওস্তাদ, সে মুহুর্মুহু ভিরমি যাবে, তাকে মারধোর করতেই পারবে না, কিন্তু সেই ছোক্‌রাটা, সে কি করবে জানা নেই। তবে অজিতদা নিশ্চয়ই বাজে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠান নি। পুলিশ হাজতে কথা বার করার জন্য বেধড়ক মারপিঠ করে, এটা ভারতীর শোনা ছিল। এখন আবার রাজ্যপালের শাসন। কোনো দিক থেকে কোনও রকম ইনফ্লুয়েন্স করা এখন বোধ হয় সম্ভব নয়। যাক্, যা হবার তাই হোক। ও আর কি করতে পারে? ভগবান যদি ভালোয় ভালোয় ওদের কোন সুরাহা করে দেন—

ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে এলোমেলো চিন্তায় ও সামান্য ফষ্টি-নষ্টিতে রাতটা কেটে গেল। সকালটাও গেল। উর্দী-পরা বয়ের আনা চা, ডিম-সেদ্ধ, মাখন-রুটিতে প্রাতরাশও হোল এবং দুপুরে নাগপুরের এক হোটেলে ওরা আশ্রয়ও পেল। জীবনে এই প্রথম মিঃ ব্যানার্জী এক মিসেস্‌কে নিজের বিছানায় নিজস্বরূপে লাভ করল এবং মিসেস্ ব্যানার্জী ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করল, এই ব্যানার্জীই যেন তার শেষ শয্যাসঙ্গী হয়। এর আগে ত অনেকেই ভোগ করে গেছে। এর পরে যেন অন্য আর কাউকে খুশি করার দায়িত্ব তার ওপোর না আসে।

নাগ্‌পুর হোটেলের প্রথম অপরাহ্ণটা ট্রেন-ভ্রমণের জন্য রাত্রি জাগরণক্লিষ্ট এক জোড়া তরুণতরুণীর কিছু তন্দ্রা ও কিছু আবল্লীর মধ্য দিয়ে নিরাপদেই অতিবাহিত হয়েছিল।

পরের দিন সকালে আহারাদির পর সুবো বেরুল তালা কিনতে, ভারতী রইল ঘরে। দরজা ও জানালা ভাল ভাবে বন্ধ করে নিজের গদির তলা থেকে ভারতী বার করল টাকার গেঁজে। এ বিষয়ে একেবারে পাড়াগেঁয়ে কায়দায় ভারতী একটা গেঁজে তৈরী করেছিল। তার মধ্যে এক দিকে নোটের বাণ্ডিল এবং অপর দিকে ছোট্ট ছ'ঘরা

পিস্তল রাখার জায়গা। গেঁজেটা কোমরে বাঁধলে ছুটোই পেটের ছু'ধারে কোমরের কাছে থাকে; ডানদিকে থাকে পিস্তল, বাঁদিকে টাকা। পিস্তলের দিকটায় ছুটো টিপ-কল দেওয়া। টানলেই খুলবে এবং সায়ার ইলাস্টিক কর্ড টেনে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চক্ষের নিমিষে পিস্তলটা সে বার করতে পারবে। অত সহজে টাকা কিন্তু বার করা যাবে না। টাকার জন্য গেঁজেটা পুরো খুলতে হবে। অনেক ভেবে এই ডিজাই-নের গেঁজেতে টাকা ও পিস্তল রাখার একত্র বন্দোবস্ত ভারতী করেছিল যাত্রার দিন ছুপুরে নিজের ঘরে বসে। এই সব কাজ শেষ করে তবে সে তার মাকে বলেছিল তার যাবার কথা। পার্টির শিক্ষা ভারতীর জীবনে পদে পদে এই ভাবেই তাকে সাহায্য করেছে।

হোটেলের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে দরজার সামনে একখানা কাপড় শুকুতে দেবার ভঙ্গীতে ঝুলিয়ে আলো জ্বেলে সে আর একবার গেঁজে ও পিস্তল পরীক্ষা করল। নিজের স্যুটকেসের একেবারে তলায় বাড়তি চব্বিশটা কার্তুজ সে রেখেছিল; ভয় ছিল যদি স্নুবো ঐ স্যুটকেস খুলে ওগুলো দেখতে পায় তা হলে কি বলবে। কিন্তু একদিনেই ভারতী বুঝল, স্নুবোর ঐ সব দিকে নজর নেই, ওর বাক্সে কি আছে জানার কৌতূহলও তার নেই, তবুও—

ও ভাবল, স্নুবোকে পিস্তলের কথাটা জানিয়ে রাখা মন্দ হবে না। আবার মনে হোল, কি জানি, ও যদি কথাটা হজম করতে না পারে! ভারতীর হাসি এল। হজম কথাটা অজিত বাবুর। গোপন কথা ভারতীকে বলেই অজিতদা বলতেন, এটা পুরো হজম করে ফেলবে, অর্থাৎ তুমি নিজে জেনে রাখলে, কিন্তু অন্যে যেন তোমার কাছ থেকে এর ছিঁটে ফোঁটাও শুনতে না পায়। ভারতী ভাবল, এই হজমশক্তি কি স্নুবোর আছে? ও নেহাৎই বোকা হাবা গোছের, ঐ বড়লোকের ছেলেরা যেমনটা হয়।

তা হোক, ঐ ভাল। অনেক চালাক চতুর, খুনে, বাটপাড়, ফোর-টোয়েন্টি ছোকরা সে দেখেছে। দেখে দেখে তরুণ বয়স্কদের

ঘেন্না করতেই সে শিখেছে। ঐ সব লোভী, কামুক, মিথ্যাবাদী গুণ্ডায় আর কাজ নেই। বিগত জীবনকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে, অতীতকে পুরোপুরি ভুলে গিয়ে সে চায় ধনী ঘরের কুলবধূ হয়ে বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটাতে। হোটেল ঘরের আরশিতে নিজের সিঁথের সিঁদুর, কপালের লাল টিপ এবং মধুযামিনীর সুখাবেশে আচ্ছন্ন মুখচ্ছবিতে তার সমস্ত অন্তর তৃপ্তির সুখে ভরে উঠল। ভাবল, যে ক'দিন এই ভাবে যায় সে ক'দিনই ভাল, আর যদি বাকী জীবনটা পুরোপুরি এই রকমে কাটাতে পারি তা হলে পৃথিবীতে আমার চেয়ে বেশী সুখী আর কে!

দরজায় ঘা পড়ল। তাড়াতাড়ি সব কিছু সামলে নিয়ে দরজা খুলে দেখেই চমকে আঁৎকে উঠল, অজিত বাবু!

কি হোল? যেন ভূত দেখলে মনে হচ্ছে,—হাসতে হাসতে আগন্তুক ঘরে এসে ঢুকল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভারতী সুবোর হাত থেকে তালা চাবির প্যাকেটটা নিয়ে বল্ল, তুমি! আমার একা একা ভয় করছিল।

সুবো বল্ল, তাই বুঝি সমস্ত বন্ধ করে দিন দুপুরে আলো জ্বেলে বসে আছ। বাবা কি ভীতু! বাড়ীর জন্যে মন খারাপ হচ্ছে বুঝি?

তা হবে না? কী যে বলো তুমি? স্প্রিং-এর খাটে বসেছিল সুব্রত, ভারতী তার কোলের ওপোর গড়িয়ে পড়ল।

আহা রে, কচি খুকী! সুবো ওর মাথায় গালে হাত বুলতে বুলতে বল্ল, তা হলে না হয় চলো, তোমাকে আবার বাড়ীতে পৌঁছে দি।

গম্ভীর চাপা গলায় ভারতী বল্ল, এই! এ রকম রসিকতা কোরো না। কারুর কানে গেলে লোকে সন্দেহ করতে পারে।

ভারতীর বলার ভঙ্গীতে সুবো ভীত হোল। বল্ল, তা বটে, ভুল হয়ে গেছে। তা, এবার তা হোলে জানালাটা খুলে আলো নিবিয়ে দি? দিন দুপুরে প্যাঁচার মতো—

ভারতী বল্ল, হ্যাঁ। তা—জা—জানালা খোলার আগে একটা জিনিস

তোমাকে দেখাতে পারি যদি আমার বুকে হাত দিয়ে দিব্যি করো যে, যা দেখাব তা কাউকে বলবে না, এমন কি দেখার পরেই ভুলে যাবে।

কি? কি জিনিস? সুব্রত কৌতুহলী হয়।

আগে দিব্যি কর।

সুব্রত বল্ল, বেশ করলুম।

ভারতী ওর ডান হাতটা টেনে নিজের বুকের ওপোর চেপে ধরে বল্ল, ও হোল না। এই ভাবে বলো, যা দেখব, কাউকে বলব না এবং সে জন্য রাগও করব না। বলো এই কথা।

ওর ভঙ্গীতে সুব্রত কিছুটা ভীত হয়েছিল। আবার এও ভাবল, হয়ত ওর কোন পূর্ব প্রেমকাহিনী কিম্বা কোন পুরুষ বন্ধুর ছবি ও দেখাবে। উপন্যাসে এ রকম কত কথাই ত পড়া যায়!

চট্ করে নিজের মনকে শক্ত করে ভারতীর বুকে হাত দিয়ে সুব্রত দিব্যি করল।

এক মুখ হেসে ভারতী বল্ল, কি দেখাব বলো ত?

তোমার কোন পুরুষ বন্ধুর ছবি।

যাঃ। ও রকম নোংরা স্বভাব আমার নয়। আমরা তোমাদের মতো নই।

তবে?

তবে শুনবে? বাড়ী থেকে বেরোবার সময় বাবার একটা জিনিস চুরি করে এনেছি। কেমন যেন মনে হোল, পথে-ঘাটে বিদেশ-বিভুঁয়ে দরকার হতে পারে।

কি? কি জিনিস?

ভারতী উঠে লীলায়িত ছন্দে নিজের বিছানায় গিয়ে গদির তলায় হাত ঢুকিয়ে সুবোর অলক্ষ্যে কোমরের গেঁজে থেকে পিস্তলটা বার করে এনে ওকে দেখাল।

এ কি? এ তুমি চালাতে জানো? সুবো হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিতে চায়।

ভারতী বল্ল, সাবধান, লোড্ করা আছে।

তাই নাকি? সর্বনাশ! সুব্রত হাত গুটিয়ে নিল। বল্ল, ছুঁড়তে পার? এম্ আছে?

হাসিমুখে সুব্রতর কাঁধে মাথা রেখে আকারে-ইঙ্গিতে ভারতী জানিয়ে দিল, আছে।

শিখলে কোথায়?

বাবার কাছে।

কোথায়?

বাইরে গিয়ে। সেবার শিমুলতলায় গিয়ে পাহাড়ের ধারে বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। তারপর কেষ্টনগরে দাত্নর রিভলভার নিয়েও ছুঁড়েছি। তুমি পারো না?

ম্লান হয়ে সুবো বল্ল, আমাদের রিভলভার নেই। বাবার একটা দোনলা বন্দুক আছে। সেটা বাবা কাউকেই হাত দিতে দেন না।

বাবা নিজে ব্যবহার করেন?

কি জানি! আমি ত কখনও দেখি নি। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বাবা সেটাকে বার করে বাদলকে দিয়ে সাফ্ করিয়ে, তেল দিয়ে লাইসেন্স রিনিউয়্যালের জন্য নিয়ে যান, তারপর আবার এনে নিজের শোবার ঘরে লকারে চাবি দিয়ে রাখেন।

তাহলে তুমি কখনও ছোঁড় নি?

ছুঁড়েছি। কলেজে ভর্তি হবার পরেই সাউথ ক্যাল্‌কাটা রাইফেল ক্লাবে ভর্তি হয়ে রাইফেল ছুড়তে শিখেছিলুম। টু-টু বোরের ছোট রাইফেল।

তুমি এন্ সি সি করো নি?

করেছি, কিন্তু ও আমার ভালো লাগল না। এক মাস পরেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে পালিয়েছি।

কেন?

দূর্! ঐ ভোরবেলা মাঠে গিয়ে প্যারেড করা, ও বিচ্ছিরী।

রাইফেল ক্লাবে এখনও আছ ?

না। তিন-চার মাস ছিলুম, তারপর ছেড়ে দিয়েছি। ও সব আমাদের পোষায় না। তুমি এন্ সি সি করেছ না কি ?

না। একটু থেমে বল্ল, বাবা ও সব পছন্দ করেন না।

কিন্তু এ সব ছুঁড়তে ত তিনিই শিখিয়েছেন ?

তা শিখিয়েছেন। তিনি চান যে আমি মজবুত হই, আত্মরক্ষা করতে শিখি ; এ সব তিনি চান, কিন্তু এক পাল মিলিটারির সঙ্গে মাঠে গিয়ে হৈ-হল্লা তিনি পছন্দ করেন না।

পাছে চরিত্তির খারাপ হয় এই ভয়ে ?

হ্যাঁ গো, হাসতে হাসতে ভারতী সুবোর কোলের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফেলল।

ভারতীর পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে সুবো বল্ল, এখানে এই অবস্থায় তিনি আমাদের দেখলে ঐ পিস্তলের একটা গুলি আমার জন্য আর একটা তোমার জন্য তিনি খরচ করবেন।

সোজা হয়ে বসেই ভারতী বল্ল, চুপ, বলেছি না, ও সব কথা নয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গেছি। এক্সিউজ্ মি। এবার দরজা-টরজা খোল, না হলে এতেই লোকের সন্দেহ হবে।

খুলি।

ভারতী উঠে পিস্তলটা সুবোর অলক্ষ্যে তেমনই ভাবে গেঁজেয় পুরে গদির তলায় ঢুকিয়ে ওর কাছে এসে বল্ল, ও বিছানায় হাত দিতে যেয়ো না। লোডেড রইল, বলেই দরজার ভেতরের ঝোলানো কাপড়টা খুলতে লাগল।

কাপড়টা কি ঐখানে শুকুচ্ছিলে ? কি বুদ্ধি তোমার ? সুবো টিপ্পনী কাটল।

শুকুই নি গো, শুকুই নি।

কাপড়টা তুলে আলনায় রেখে সুবোর কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্ল, চাবির গর্তটাকে বিশ্বাস নেই, তাই কাপড়টা ঝুলিয়েছিলুম।

পরদা ঝুলছে ত, সুবো তাচ্ছিল্য সহকারে বলেছিল।

সে ত বাইরে। কেউ সরালেই পারে।

চিন্তিত মনে সুবো বল্ল, তা বটে, এবং তারপর মনে মনে সে ভারতীর বুদ্ধির তারিফ করে। ভারতীর কাছে নিজেকে প্রতি পদে ছোট বলেই তার মনে হয়।

আলো নিভিয়ে জানলা খুলে জানলার পরদাটা ঠিক ভাবে টেনে সরিয়ে দিয়ে ভারতী নিঃশব্দে দরজার ছিট্‌কানি খুলল। এর পর দরজা-জোড়া ভেজানই রইল।

সুবোর সামনে চেয়ারে বসে ভারতী বল্ল, চান-টান করতে হবে না? এগারটা ত বাজে!

হ্যাঁ, এই যাব। তুমি নাইবে না?

নাইব বই কি।

তবে তুমি যাও, আমি ততক্ষণ—

সুবো টিপয়ের দিকে হাত বাড়ালো। সেই চীনা সিগারেট কেস্‌টা টিপয়ের ওপোর ছিল।

ভারতী কাপড়, জামা, তোয়ালে, তেল সমস্ত নিয়ে এ্যাটাচড্‌ বাথের দরজার দিকে যেতে যেতে বল্ল, হ্যাঁ, তুমি ততক্ষণ নেশা ভাং করো, কেমন?

সে বাথ রুমে চলে গেল। সিগারেটের ধোঁয়া মুখ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাড়তে ছাড়তে সুবো ভাবতে লাগল, এমনটা কেন হয়! যতখানি আনন্দ পাবো ভেবেছিলুম ততখানি ঠিক পাচ্ছি না। দিদিকে নিয়ে জামাইদা যেমন হাসিখুশি, ঠাট্টা তামাসায় মসগুল থাকে আমি কেন সে রকমটা পারছি না। গুছিয়ে হিউমার করার চেষ্টা করি, কিন্তু কথাগুলো ঠিকমত মনেই আসে না। জামাইদা কেমন স্বচ্ছন্দভাবে উদ্ভট সব হাসির কথা বলে যান, যেন মনে হয় আগে থেকে সমস্ত ভেবে তৈরী করে মুখস্থ করে রেখেছেন, আমি কিন্তু সে রকম কিছুই পারছি না। উল্টে পদে পদে ওর কাছে হার মানতে হচ্ছে। কেন? কিছুক্ষণ

সিগারেট টেনে সুবোর মনে হোল, বোধ হয় এইখানেই জামাইদার সঙ্গে আমার তফাত,—দিদির বাড়ী জামাইদাই সর্বেসর্বা, আমি কিন্তু এখানে যেন কেউ নই, ও-ই সব, ও-ই প্রধান। ওরই টাকা, ওরই বুদ্ধি, ওরই ব্যবস্থাপনা। এক কথায়,—এক কথায় আমি—আমি যেন ওর কেপ্ট্। ছিঃ, এ ভাবে না এলেই ছিল ভাল।

সুবোর মনটা খুবই খারাপ হোল। এমনও মনে হোল, এখান থেকে ওকে কিছু না বলে এক সময় পালিয়ে গেলে কেমন হয়? স্টেশন ত কাছেই। টুক্ করে ট্রেণে চেপে বসলেই বাস্। আর পায় কে? তবে ওর টাকাটা আমার কাছে রয়েছে এই যা।

ওর টাকা? ওর টাকা ত সামান্যই খরচ হয়েছে। কলকাতায় যাবার ভাড়া, এবং তার ওপোর আরও দশটা মাত্র টাকা নিয়ে বাকীটা মাথার বালিশের তলায় ফেলে রেখে সরে পড়ব। তারপর এক সময়—

ভাবল ছিঃ, কি বোকামিই করেছি! আমার ব্যাঙ্কের টাকাটাও যদি তুলে আনতুম! কিন্তু সে সময়ই ত ছিল না। ওর ফোন পেয়ে গোয়েঙ্কা কলেজ, সেখান থেকে ইডেন গার্ডেন, সেখান থেকেই হাওড়া স্টেশন, ঐখানেই দু'টো বেজে গেল। তা ছাড়া, আমার টাকার কথা উঠলও না, আমার নিজেরও সে কথা মনে পড়ল না। টাকাটা আনলে ওর নয়া পয়সা পর্যন্ত শোধ দিয়ে হিসেব চুকিয়ে চলে যেতুম। তা হলে ঐ মেয়েটা ভাবতেও পারত না যে, সুব্রত ঘটক টাকা মেরে পালিয়েছে।

সুব্রত ভাবতে লাগল। ভাবল, আর এক কথা,—কেউ বলতে পারবে না যে, আমি ওকে পথে এনে ফেলে পালাচ্ছি। আর কেউ জানুক বা নাই জানুক, আমি খুব ভাল ভাবেই জানি, এবং ও আমার চেয়েও বেশী জানে যে, আমি ওকে আনিনি, বরঞ্চ ও-ই আমাকে এনেছে, সুতরাং—

খুট্ করে শব্দ হোল। বাথরুমের দরজা খুলে সদ্যস্নাতা ভারতী একখানিমাত্র শাড়ী পরে বেরিয়ে এল। হাতে তার ভিজে কাপড়।

কেচে নিংড়ে হাতে ঝুলিয়ে এনেছে। হাসি হাসি মুখের ওপোর ভিজে চুল পড়েছে। খালি গা, শুধু কালো শাড়ীর আঁচলখানি গায়ের ওপোর আলগাভাবে পড়ে আছে। দেখামাত্রই সুব্রতর সমস্ত বিরূপ চিন্তা উধাও হোল। বল্ল, বাঃ, 'অচ্ছোদ সরসী-নীরে রমণী যেদিন নামিল স্নানের তরে—'

চোখ পাকিয়ে মুখ টিপে হেসে ভারতী বল্ল, হ্যাঁ গো কবিবর, কবিত্ব থামিয়ে এবার চান-টান সারো দেখি! খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

খিধে? কই আমার ত মোটেই খিদে পায় নি, তবে হ্যাঁ, অন্য রকমের খিধে—,

ভারতী ওর কাছে এগিয়ে এসেই পিছিয়ে গেল। মা গো, কি গন্ধই মুখে বার করেছ! কটা ধ্বংস করলে?

খ্যাঁচ করে সুবোর মনে হোল, বটেই ত, ওর পয়সায় কেনা সিগারেট, এ রকম হিসেব ও চাইতেই পারে!

সুবো গুম হয়ে গেল।

ভারতী বল্ল, যাও, চান করে নাও গে। তেল, সাবান, তোয়ালে সব ভেতরে রেখে এসেছি। তোমার হয়ে গেলে বয়টাকে সবগুলো কাপড় জামা এক সঙ্গে শুকুতে দিতে বলব।

সুবো উঠল। যেন সে মনিবের হুকুম পালন করার জন্যই উঠল!

এর পর একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে একই শয্যায় দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলে বেরিয়ে স্থানীয় সিনেমায় একটা ইংরেজী বই দেখেছিল, হল্ থেকে বেরিয়ে দু'জনে দুটো কোকা-কোলা খেয়েছিল, তারপর এদিক ওদিক ঘুরে হোটেলে ফিরে নৈশ আহার শেষ করে পুনরায় শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতী ঘুমিয়ে পড়ার পর সুবোর মনে হল, ও যেমনটা ভাবছে ভারতী হয়ত সেভাবে আদৌ ভাবছে না। অন্ততঃ তার আন্তরিক আকর্ষণে সে রকমটা মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া সুবোর কি আছে না আছে তা ত ভারতী স্বচক্ষে দেখেও এসেছে। সেই একদিনই ভারতী ওর বাড়ীতে গিয়েছিল যেদিন তার সঙ্গে দেখা

না হলেও বাদলের সঙ্গে কথা বলে ভারতী চলে এসেছিল। ভারতী ঠিকই জানে যে, সুবো অভাবের জন্য ভারতীর পয়সায় খাচ্চে না, সুবোরও পয়সা কড়ি আছে। তার বাড়ী, তার দিদির বাড়ী সবই ত ভারতী দেখেছে। ঘুমন্ত ভারতীর পাশে শুয়ে ধনীপুত্র সুব্রত ঘটক এই ভাবেই মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে।

পরের দিন থেকে হোটেল ম্যানেজার একখানা করে স্টেট্‌স্‌ম্যান ওদের নির্দেশমত ওদের ঘরে পাঠাতে সুরু করলেন। বর্তমান অবস্থায় স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজটাই সুব্রতর একমাত্র ভরসা।

তেরো

যে শনিবার সুবোরা কলকাতা ছেড়ে রওনা দিয়েছে তার পরের রবিবারের পরের রবিবার ভদ্রা ও তাপস বাবু যোধপুর পার্কের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। বাদলকে জিজ্ঞাসা করতেই বাদল বল্ল, বাবু ওপোরের ঘরেই আছেন।

ভদ্রা বল্ল, বাবা তাহলে ভালই আছে। আবার ওপোর-নীচও করছে।

রিনি বল্ল, বাদলদা, ঐ ফুল দুটো আমাকে দাও না?

বাদলের হাত ধরে রিনি গিয়ে বাগানে ঢুকল, ভদ্রারা ওপোরে উঠে গেল।

ঘটক বল্লেন, ও, তোমরা এসে গেছ! তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। কাল থেকে তোমাকেই ফোন করব করব মনে করছিলুম।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বিনীত ভাবে তাপস বাবু শ্বশুরের ঘরের চেয়ারে বসলেন। প্রণাম সেরে ভদ্রা বল্ল, কেমন আছ বাবা? ঠাকুরমা কেমন?

মা ভালই আছে। দেখ গে, বোধ হয় শুয়ে আছে, ঘটক মেয়েকে উত্তর দিলেন। ভদ্রা বেরিয়ে গেল ঠাকুরমার ঘরের দিকে।

আমাদের বাড়ীর খবর সব জানো, ঘটক জামাইকে প্রশ্ন করলেন।

কি খবর? নতুন কিছু ত শুনি নি! বিশেষ কিছু হয়েছে না কি?

ও, তুমি দু' তিন হপ্তা আস নি বটে।

না। আমি আসতে পারি নি। কারুর কোন খবরও নিতে পারি নি। অফিসের ঝঞ্ঝাটে রোববারেও বেরুতে হয়েছিল।

কেন, অফিসে আবার কি হোল?

তাপস বাবু বল্লেন, এখনও কিছু হয় নি, তবে একটা বড় রকম ওলোট পালোট হলেও হতে পারে। হেড অফিস থেকে এক রকম

বলেই দিয়েছে যে লেবার ট্রাবল্ চলতে থাকলে এখানকার ইউনিট বন্ধ করে দেবে। সে জন্য খুবই চিন্তায় ছিলুম। এখন এই প্রেসিডেন্টস্ রুল হবার পরে ওরা বলছে, ওয়েট্ এণ্ড সী। কাজেই এ রবিবারে বিশেষ হ্যাঙ্গামা নেই। তারপর রিনিও বল্লে, অনেকদিন দাতুর বাড়ী যাই নি, তাই ভাবলুম যাওয়াই যাক। তা আপনি আমায় খোঁজ করছিলেন কেন?

তাপসবাবু কথাগুলো বল্লেন বটে, কিন্তু তিনি ভালো ভাবেই জানেন যে, শ্বশুরের 'ফোন করব করব' কথাটা এমন কিছু নয়; ওর সঙ্গে দেখা হলেই ঘটক সাহেব এই কথা বলে থাকেন। ইতিপূর্বে বহুবারই এই রকম কথা বলে তিনি জামাইকে আপ্যায়িত করেছেন।

মানে তেমন কোন বিশেষ দরকারে খোঁজ করি নি, তবে তুশ্চিন্তা যে কিছু নেই তা নয়। ঘটক বল্লেন, স্নবোটা গেল শনিবারে হঠাৎ নর্থ বেঙ্গলে গেছে, এখনও পর্যন্ত একটা চিঠিও দিল না, তাই ভাবছি—

হঠাৎ নর্থ বেঙ্গল কেন?

কলেজ থেকে এক্স্‌কারসানে। শনিবার সকালে পর্যন্ত আমাকে কিছু বলে নি। তুপুরে যেমন কলেজে যায় তেমনই বেরিয়েছিল। বাদলের কাছে শুনলুম বেলা আড়াইটে নাগাদ বাড়ী ফিরে জিনিসপত্র গোছগাছ করে আমার অফিসে ফোন করেছিল। আমি তখন কাজে বেরিয়েছিলুম। অফিসে আর সেদিন ফিরি নি। বাড়ী এসে শুনি, সে বেরিয়ে গেছে। একখানা চিঠিও আমার জন্য রেখে গিস্‌ল। চিঠিখানা নীচে আছে, তোমাকে দেখাব'খন।

কি লিখেছিল?

ছেলের চিঠির বক্তব্য জামাইকে মুখে মুখে বলে মিঃ ঘটক বল্লেন, শনিতে শনিতে আট আজ রবিতে ন'দিন হোল, এর মধ্যে বাবুর একখানা পোস্টকার্ড পর্যন্ত ছাড়ার সময় হোল না। বুড়ো বাপ, ঠাকুরমা বাড়ীতে রয়েছে, তারা যে ভাববে এই জ্ঞানটাও আজকালকার ছেলেদের নেই!

হাসি চেপে জামাই বল্ল, একসঙ্গে দল পাকিয়ে গেছে, হৈ হল্লা করে আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরছে, হয়ত সঙ্গে পোস্টকার্ড নিয়েই যায় নি। তা ছাড়া ওর ত আসার সময় হয়ে গেল। দেখুন, আজকালের মধ্যেই এসে পড়বে।

তাই মনে হয়। কিন্তু আজকালকার কলেজগুলোর কাণ্ডজ্ঞান দেখ। এ রকম প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিং-এর যদি দরকারই ছিল তা হলে এই এক্‌জামিনের মুখে মুখে এ সব কেন? পূজোর ছুটি, গরমের ছুটি ওদের ত কত রকমের ছুটিই আছে। সেই সব ছুটিতে এই সবের ব্যবস্থা করলে ভালো হোত না?

ওর ফাইন্যাল পরীক্ষার দেরি আর ক'দিন?

মাস দু'য়েক হবে হয়ত।

টেস্ট হয়ে গেছে বোধ হয়? জামাই প্রশ্ন করল।

হয়ত।

তা হলে ঐ টেস্টের পরেই বোধ হয় হপ্তা খানেকের জন্য ওরা বেরিয়েছে। এক্সপিরীয়েন্স কাম্‌ রিক্রিয়েশন, তাপসবাবু স্মিতহাস্যে বলেছিলেন।

হতে পারে। কিন্তু একখানা চিঠি ফেলা তার খুবই উচিত ছিল।

হয়ত ফেলেছে। আজকালকার পোস্ট অফিসের ব্যাপার ত জানেন। সে ফিরে আসার পরে তার চিঠি হয়ত আসবে।

ঘটক নড়ে চড়ে বসলেন। প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টায় মনের ঝিমানো ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বল্লেন, তোমরা ত এলে হে, আমার দিদিমণি কোথায়?

সে নিচে বাদলের সঙ্গে বাগানে ঢুকেছে। বড় বড় গোলাপ দেখেছে, আর কি রক্ষে আছে তার! জামাই হাসতে লাগল।

ভদ্রা এসে ঘরে ঢুকল। বল্ল, কি সব হয়েছে বাবা? ঠাকুরমার কাছে শুনলুম, নীচে আপনার ঘরে আগুন লেগেছিল, জেঠাইমা পুড়ে

গেছে, খোকাদাকে পাগলা গারদে দেওয়া হয়েছে, এ সব ব্যাপার ত কিছুই শুনি নি!

নিরাসক্ত গম্ভীর কণ্ঠে ঘটক বল্লেন, হ্যাঁ, ও এক দুর্ঘটনা হয়েছে বটে।

মেয়ে বল্ল, জেঠাইমা কেমন আছে? খোঁজ নিয়েছিলেন?

নিয়েছি, আজ একটু ভাল আছে। হয়ত এ যাত্রা সেরে উঠবে, কিন্তু উঠলেও আগের মত হবে না। একটা চোখ গলে গেছে, অপর চোখও ড্যামেজড্। তাতে কাজ চলার মত দৃষ্টি থাকবে কি না ঠিক নেই।

সে কি? সখেদে ভদ্রা উত্তর করল। আহা, জেঠাইমা সত্যিই খুব ভালো ছিল! ওর কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করতুম। কি রকম যত্ন করত আমাদের!

এই প্রথম এবাড়ীতে অনুপমার সুখ্যাতি শুনলেন বিভু ঘটক। মেয়ের দিকে মুখ তুলে বল্লেন, তোমরা বুঝি কিছুই জানতে না? সুবো মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে যেত না?

না না, সে—সেই অনেকদিন আগে ক'বার গিয়েছিল। তারপর—সেও অনেক দিন হোল। আপনার একটা ফোনও যদি পেতুম!

জামাই বল্ল, কোন্ হাসপাতালে আছে জেঠাইমা?

সে কথার জবাব না দিয়ে ঘটক বল্লেন, ওর ছেলেটা একটু এ্যাবনরম্যাল গোছের ছিল, কিন্তু সে যে এমন উন্মাদ হয়ে এ রকম একটা কাণ্ড করে বসবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এখন দেখি যে সে একেবারে উন্মাদ, ডেঞ্জারাস টাইপ।

কোথায় দিলেন তাকে?

লুম্বিনী পার্ক মেণ্টাল হস্‌পিটালে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম শুনেছি বটে, জামাই উত্তর দিল। তা সেখানে সে কেমন আছে?

ঘটক বল্লেন, ওদের আর থাকা-থাকি কি। শুনছি সব রকম

চিকিৎসাই চলছে। ইলেকৃট্রিক শক্ দিচ্ছে, আরও সব কি কি করছে।

আপনি গিসলেন নাকি ?

টেলিফোনে খবর পাই।

বাদল এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াল। ডাকল, বড়দি।

কি রে, ভদ্রা উত্তর দিল।

চা জল খাবার এখানে আনব, না নীচে দেব ?

ঘটক বল্লেন, নীচেই দে। চলো, আমরা নীচে যাই।

ওর পেছন পেছন রিনি এল দু'হাতে দুই ফুটন্ত গোলাপ নিয়ে। দৌড়ে ঘরে ঢুকে বল্ল, দাদু, আপনার জামার বটনহোলে লাগিয়ে দেব।

দাদু বল্লেন, জামা ? জামা কোথায় রে ? গেঞ্জিতে কি বটন হোল থাকে ? পাগলী মেয়ে !

তবে জামাটা গায়ে দিন, নাতনী দাবী করল।

দাদু হেসে ফেলেন। এখন, এই অসময়ে তোর জন্য কোট পরতে হবে ! তার চেয়ে আমার হাতে দাও দিদি !

দাদু এগিয়ে গেলেন। রিনি বল্ল, না, হাতে নিয়ে আপনি কখন ফেলে দেবেন। জামা বার করুন, জামায় লাগিয়ে দেব।

তোমার দেওয়া গোলাপ কি ফেলতে পারি দিদি ভাই ? দাও, আমার হাতে দাও।

একটা গোলাপ দাদুর হাতে দিয়ে অপর গোলাপটা রিনি একখানা চেয়ার টেনে দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুরমার ফটোর ফ্রেমে গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। ওরা সকলেই ছিল নীরব দর্শক। রিনি দুবার চেষ্টা করেও ফুলটা ঠিকমত লাগাতে না পারায় ভদ্রা এগিয়ে গিয়ে বল্ল, দে, আমায় দে, আমি লাগিয়ে দি।

ঘটক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর সকলে নীচে ডাইনিং রুমে নেমে গেলেন।

চা খেতে খেতে অনেকটা অবান্তর ভাবেই ঘটক বল্লেন, শুধু টাকা পয়সা আর বাইরের মান সম্মান দিয়ে সত্যিকার ফ্যামিলী পীস্ যাকে বলে তা হয় না। ও-একটা আলাদা কাল্‌চার। আমার আত্মীয় স্বজন যা আছে তাদের মধ্যে ও-জিনিস কোথাও নেই কিন্তু তোমাদের মধ্যে ঐটে আছে। দেখে দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার এই ছোট্ট দিদিমণি পর্যন্ত কেমন সব শিখেছে। এ বাড়ীতে কেউ কোনও দিন তার ছবিতে ফুল বা মালা দেয় নি। ভদ্রা সেবার এসে মালা দিয়ে গিয়েছিল, আর আজ দিল এ। ভারী ভাল লাগল।

সবাই নীরবে শুনে গেল।

ঘটক বল্লেন, তোমাকে তাই বলছি তাপস, সুবোর এই বি.কম্ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তুমি তোমার পছন্দমত একটি মেয়ে দেখে ওর বিয়ে ঠিক করো। বেশ ভাল মেয়ে, সংসারকে যে সুখী করতে পারবে এমন মেয়ে তুমি পছন্দ করবে, মানে তোমরা পছন্দ করবে। তোমরা যাকে পছন্দ করবে, আমি তাকেই ঘরে এনে তুলব। তোমা-দের কথার ওপোর আমি কোন কথা বলব না।

বি.কম্ পরীক্ষার পরেই বিয়ে দেবেন? প্রশ্ন করলেন তাপসবাবু।

হ্যাঁ। বেশী দেরি করব না। মিছিমিছি দেরি করে কি লাভ? দিনকাল যা পড়েছে, ছেলে আমার শেষকালে—

ভদ্রা বল্ল, হ্যাঁ বাবা, কোন্ এক হাড়ি-শুঁড়ীর ঘর থেকে একটা ধরে এনে—

বাধা দিয়ে ঘটক বল্লেন, দেখ্ ভদ্রা, তাতেও আমার খুব বেশী আপত্তি আর নেই। মেয়ে যদি ভালো হয়, সংসারে সত্যিকার শান্তি, আনন্দ এ সব যদি আনতে পারে তা হলে সেই হবে সত্যিকার ঘরের লক্ষ্মী; না হলে রাশ-গণ, ঠিকুজি-কোষ্ঠী, পাল্টিঘর কিম্বা এম্.এ, বি.এ পাস, প্রচুর সম্পত্তির মালিক, গাইয়ে-বাজিয়ে এ সবে সত্যিকার শান্তি হয় না। এ সব দিয়ে বাইরে থেকে সংসারটা চটকদারী হতে পারে কিন্তু ভেতরে ভেতরে সমস্ত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সে কি বাবা, অন্য ঘরেও রাজী আছ? ভদ্রা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

বাবা বল্লেন, হ্যাঁ মা। বাইরের ছাপ আমি চাই না, ভেতরের মানুষ আমি চাই। ঐ যে সেই শুনেছিলুম, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃত্ত্যনুসারিণীং, আমি সেই মনোরমা এবং চিত্তবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলবে যে মেয়ে সেই রকম মেয়েকে পুত্রবধূ করে আনতে চাই। একটু থেমে বল্লেন, দেখ্ ভদ্রা, নিজে আমি সংসারের জন্য সারা জীবন খেটেছি। যা করেছি তাতে বাইরের লোক সকলেই বাহবা দেয়, অথচ ঘরের লোকদের কোন দিন খুশি করতে পারি নি। নিজেও আমি কোন দিনই সুখ-শান্তি যাকে বলে তা পেয়েছি বলে ভাবতেও পারি না। সুখ-শান্তি কাকে বলে তা আমি আজও জানি না। তাই যাবার আগে দেখে যেতে চাই যে, আমার ছেলেটা সুখী হোল। তোমাদের জন্য আমার কোন চিন্তা নেই। তোমাদেরই মতো একটি সুখী পরিবার এ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করে যদি চোখ বুজতে পারি তবেই আমার জীবনের শেষ সার্থকতা আমি পাব।

অর্ধশতাব্দীব্যাপী জীবন-সংগ্রামের পর সংগ্রামী ঘটক তাঁর শেষ বাসনা এমনই করে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে প্রকাশ করলেন!

বাড়ী ফিরতে ফিরতে তাপসবাবু তাঁর পাশে-বসা স্ত্রীকে বল্লেন, তোমার বাবার মনে যে এতখানি গভীর দুঃখ ছিল তা আমি আগে জানতুম না। .

স্ত্রী বল্ল, তাই ত দেখলুম! বাবা যেন এবার একটু নরম হয়ে পড়েছে।

তাপসবাবু বল্লেন, ঐ ভারতী মেয়েটার কি খবর কিছু শুনেছ? তোমার ভাইয়ের ত দারুণ ইচ্ছা—

না বাপু, ও কি একটা মেয়ে নাকি! ওর বয়স বোধ হয় আমারই মতো।

তাই নাকি? গাড়ী চালাতে চালাতে স্ত্রীর দিকে একবার দেখে

নিয়ে তাপসবাবু বল্লেন, তা হলে আমার সঙ্গেই ওকে মানায় ভাল, কি বলো ?

চুপ। তোমার সারাক্ষণ খালি ফাজলামি, মেয়ে রয়েছে না! ভদ্রা চাপা গলায় ধম্‌কে উঠল !

পেছনের সীটে একরাশ নানা জাতীয় ফুল-কোলে রিনি আপন মনেই বসে ছিল।

গম্ভীর কণ্ঠে স্বামী বল্লেন, না গো, জুনিয়ার ঘটকের ইচ্ছাটার দাম দিতে হবে ত ? বিয়ে করবে সে, তুমি নও।

তা হলে তোমার যা খুশি হয় করো, আমি ওর মধ্যে নেই।

কেন, তুমিই ত বল্লে মেয়েটা কথায়-বার্তায় মন্দ নয়। তোমার সঙ্গে এসে জমিয়ে গেছে।

তা ত গেছে, কিন্তু বুঝে দেখো, বয়সের তফাৎ একেবারেই নেই, তারপর স্ব-ঘর নয়—

সে ত তোমার বাবা আজ বলেই দিলেন। ঘর-টর নিয়ে উনি আর মাথাই ঘামান না।

তা ত বলেছেন, কিন্তু সেটা ওঁর কথার কথা। ঠাকুরমা বেঁচে থাকতে এ রকম জিনিস কি হতে পারে ? একটু থেমে ভদ্রা বল্ল, কিছু একটা বড় গোছের ব্যাপার হয়েছে, বুঝলে ?

কি ? কি ব্যাপার ?

ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু মনে হোল, ঠাকুরমার সঙ্গে ওঁর আদৌ বনছে না। ঠাকুরমা অবিশ্যি অনেক দিন থেকেই বাবার ওপোর চটা তা জানি, কিন্তু এবার দেখলুম, সেটা খুবই বেড়েছে। এমন কি আমাদের খাওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি এলেন না। তা ছাড়া যতক্ষণ ঠাকুরমার ঘরে ছিলুম ততক্ষণই তিনি বাবার নিন্দা করলেন। নানা রকম নিন্দে—

কিন্তু আমার একটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেল গো। ইস্, কি যে হোল ! তুমিও ত একটু মনে করিয়ে দিলে না !

কি, কি হোল ?

ঠাকুরমার সঙ্গে দেখাই করা হয় নি। একটা নমস্কার করা ত উচিৎ ছিল। হঠাৎ কথা কইতে কইতে নীচে নেমে গেলুম, তারপর—ইস্, এ রকমটা আগে কখনও হয় নি। অথচ আর এখন ফিরে যাওয়াও যায় না।

যাক গে যাক, ও কেউ নজরও করে নি।

কি যে বলো তুমি! অন্য কেউ নজর না করুক, ঠাকুরমা নিশ্চয়ই নজর করবেন। কি ভাববেন বলো ত! ছিঃ, কথায় কথায় একদম ভুলে গেলুম।

গেছো ত গেছ! কি আর হবে। ঠাকুরমার কাছে যাও নি, ভালই হয়েছে। গেলে হয় ত শ্বশুরের চাট্টিখানি নিন্দে শুনে আসতে। কি যে হয়েছে ওঁর! একেই বোধ হয় ভীমরতি বলে। না হলে এই বয়সে বাবার সম্বন্ধে—

কি, কি বলেন উনি ?

সে কিছু নয়। যত সব আবোল-তাবোল।

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে তাপসবাবু বল্লেন, থাক গে, যা হবার তা হয়েছে। এখন তোমার ভাইটির আইবুড়ো নাম খণ্ডাবার কি করছ বলো ?

সে বিষয়ে আমি কি বলবো ? শ্বশুর মশাই শালার ভার দিয়েছে জামাইয়ের ওপোর, আমি কে ?

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে জামাই বল্ল, সে ত একশ'বার, তবে কিনা তুমি সেই জামাইয়ের কর্মচারী ত, পি.এ বা সি. কে অর্থাৎ কন্সান্স কীপার।

গাড়ীখানা হাউসিং এস্টেটে এসে ঢুকল। লন্-এ ব্যাডমিণ্টন চলছিল। গাড়ী থেকেই রিনা ডাকল, যুথি, লিলি, কি এনেছি দেখ্।

গাড়ী থামল গ্যারেজের সামনে। দু' তিনটে ছেলে মেয়ে দৌড়ে এসে গাড়ীর কাছে দাঁড়াল। রুমালশুদ্ধ এতগুলো ফুল নিয়ে রিনি পেছনের সীট থেকে নামতেই লিলি বল্ল, কোথায় গিস্লি রে ?

দাদু-বাড়ী।

যুথি ফুল শুঁকতে লাগল।

গণেশ গ্যারেজের চাবি নিয়ে এল। গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে তাপসবাবু ওপোরে উঠে গেলেন। ভদ্রা আগেই গিয়েছিল। রিনিরা নীচেই গুলতান করতে লাগল।

গণেশ বল্ল, কফির জল চড়াই?

ভদ্রা বল্ল, কি গো, জল চড়াবে?

তাপসবাবু বল্লেন, এই ত ও বাড়ী থেকে এক কাঁড়ি গিলে এলুম।

ভদ্রা বল্ল, কফি, স্রেফ এক কাপ কফি।

যথা আজ্ঞা দেবি। তাপসবাবু দালানের চেয়ারে বসলেন। ভদ্রা কাপড় ছেড়ে স্বামীর পাশের চেয়ারে বসতেই স্বামী বল্লেন, শীলাটাকে একবার ডাকো ত, ভারতীর খবরাখবর নি।

ওঃ, ঐ মেয়েটাকে তুমি ভুলতে পারছ না? ও দেখছি তোমাকেও বশ করেছে!

সে কথা কি আর বলতে! জানো ত, 'যার অদৃষ্টে যেমন জুটুক তোমরা সবাই ভালো।' এ আমার কথা নয়, স্বয়ং বিশ্বকবি বলে গেছেন।

বিশ্বকবি তোমাদের মতো হ্যাংলা ছিলেন না, ভদ্রা টিপ্পনী কাটল।

তবে? তবে কি ও কথা লিখেছিলেন মেয়েদের মন রাখার জন্য, যাতে পাঠিকা-মহল খুশি হয়ে বই কিনে কিনে পড়ে?

গণেশ দু'কাপ কফি এনে ওদের সামনে নামাতেই ভদ্রা বল্ল, গণেশ, শীলাকে একবার ডাক্ ত।

হ্যাঁ দিদিমণি, শীলা-দিদি বিকেলে এসেছিল আপনার কাছে। আপনারা বেরিয়েছেন শুনে চলে গেল।

তাই নাকি! ঠিক আছে, তুই গিয়ে বল, আমরা এসে গেছি। ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

শীলা আসতেই ভদ্রা বল্ল, কি ব্যাপার রে? তুই এসেছিলি শুনলুম।

হ্যাঁ মাসিমা। আমি এসেছিলুম একটু দরকারে।

কি দরকার রে? ভদ্রা শীলার দিকে উৎসুকনেত্রে চেয়ে রইল।

তাপস বাবু বল্লেন, বোসো, বোসো; আগে বোসো, তারপর কন্‌ফারেন্স করো।

হাসতে হাসতে শীলা বসল। বল্ল, মাসিমা, আপনার ভাইয়ের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল ত। এইবার তাঁকে ফোনে যদি বলে দেন তাদের টেস্টের কোশ্চেনগুলো একদিনের জন্য নিয়ে আসতে তা হলে বড় ভালো হয়।

কেন রে, সে কোশ্চেন নিয়ে তুই কি করবি, ভদ্রা জিজ্ঞাসা করে।

শীলা বল্ল, ওঁদের সেণ্ট জেভিয়ারে খুব ইম্পরট্যাণ্ট প্রশ্ন হয়। শুনেছি ঐ সব প্রশ্নের অনেকগুলোই ফাইন্যালে রিপিট করে,—মানে গেল-বছরে তাই নাকি হয়েছিল।

ওদের পরীক্ষা কবে শেষ হোল? তাপসবাবু শীলাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শীলা বল্ল, পরশু শুক্রবারে। ওদের পরীক্ষা পাঁচ দিনেই শেষ হয়। সোমবারে আরম্ভ হয়েছিল।

সোমবারে? তুই ঠিক জানিস্? গেল সোমবার? ভদ্রা জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ মাসিমা। আমাদেরও তাই, তবে আমাদেরটা সোমবারে স্থরু হয়ে শেষ হোল শনিবারে, মানে কাল।

তাপসবাবু শীলার মুখের দিকে চেয়ে আপন মনে সিগারেট টানছিলেন।

তবে যে শুনলুম ওদের পরীক্ষা আগেই শেষ হয়েছে, ওরা পরীক্ষার পর এক্সকারসানে গেছে।

শীলা বল্ল, না ত! ওদের পরীক্ষা এই-মাত্র পরশু শুক্রবারে শেষ হয়েছে।

অসহিষ্ণু ভাবে নিজের কথার ওপোর জোর দিয়ে ভদ্রা বল্ল, না, না, তুই জানিস না। ও ত উত্তর বাংলায় এক্সকারসানেই গেছে আজ ন' দিন আগে। তুই ভুল বলছিস, ওদের পরীক্ষা নিশ্চয়ই আগে হয়ে গেছে।

শীলা বল্ল, না মাসিমা, হতেই পারে না। উনি ত পার্ট টু দেবেন? ওঁদের পার্ট টু-র টেস্ট সোমবার থেকে শুক্রবার এই পাঁচ দিনে হয়েছে। এ আমি ঠিক জানি।

তাপসবাবু বল্লেন, ঠিক আছে, ওদের পরীক্ষা যবেই হোক, সে নিয়ে তর্কে কাজ নেই, তোমার পরীক্ষা কেমন হোল বলো।

হয়েছে এমনি, মেয়েটা যেন মিইয়ে গেল।

অনার্স পাবে ত?

আমার ত অনার্স নেই মেশোমশাই। আমি পাস কোর্সে পড়ছি। ডিস্টিংশন পেলে বেঁচে যাব।

তোমাদের ভারতীর পরীক্ষা কেমন হোল বলো।

ভারতী, মানে ভারতী সেনের কথা বলছেন ত? ভারতী দি, —কই ভারতীদি'কে দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না! ন্-না, একদিনও দেখি নি। কি জানি, ও বোধ হয় পরীক্ষা দেয় নি।

তাই নাকি?

তাপস বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হোল। সে পরীক্ষা দেয় নি? তাহলে কি—

ভদ্রা স্বামীকে লক্ষ্য করে শীলার সামনেই বলে ফেল্ল, ব্যাপার কি, ওরা কি পরীক্ষা বয়কট করল নাকি?

কারা মাসিমা?

তাপস বাবু বল্লেন, তুমি আবার কলেজ যাচ্ছ কবে? কাল যাবে কি?

হ্যাঁ, কাল একবার যাব। ইকনমিক্সের স্যার বলেছেন একটা স্পেশাল ক্লাস নেবেন।

তা হলে একটা কাজ করতে পারবে? কলেজ অফিস থেকে ভারতী সেনের বাড়ীর ঠিকানাটা আনতে পারবে?

অফিস বলবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন বলবে না? তুমি বলবে, ও তোমার একখানা বই নিয়ে গেছে; ও আসছে না, সেজন্য তুমি ওর বাড়ীতে যেতে চাও।

ও,—ও কিন্তু আমার বই নেয় নি মেশোমশাই।

তা বটে। তাপস বাবু থতিয়ে গেলেন। মিথ্যা বলতে যে অভ্যস্ত নয়, তাকে দিয়ে মিথ্যা বলানো শক্ত। বল্লেন, ক্লাস ফ্রেণ্ডের ঠিকানা চাইলে অফিস বলবে না?

শীলা বল্ল, কি জানি, আমাদের অফিসে যাঁরা আছেন তাঁরা বড্ড কড়া গোছের। কোন আমলই দিতে চান না। আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে, যদি ঠিকানাটা পাই।

রিনি এসে দালানে ঢুকল। তখনও পর্যন্ত গোটা কয়েক ফুল ওর রুমালে ছিল। রিনি বল্ল, শীলাদি, ফুল নেবে? দাদুর বাগান থেকে কত ফুল এনেছিলুম। সব দিয়ে দিয়ে এই ক'টায় ঠেকেছে।

ওরা দালান থেকে বেরিয়ে গেল।

কি ব্যাপার বলো ত! দু'জনে ষড়্ করে পালালো নাকি? ভদ্রা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল।

বিচিত্র নয়। কিন্তু দু'জনেই কি এমন পাগল হবে যে টেস্ট্ এক্‌জামিন ফাঁকি দিয়ে একটা বছর নষ্ট করে এ রকম পাগলামি করবে! সুবো ত এ রকম ছিল না!

আমিও ত তাই জানতুম।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে তাপস বাবু বল্লেন, তবে কি জানো, man proposes, woman disposes। এই যেমন তোমার পাল্লায় পড়ে আজ দুপুর থেকেই ঘুরে মরছি—

থামো থামো, ঢের হয়েছে। খেয়ে ঘুমিয়ে তিনটের সময় বেরিয়েছ, তাতেও খোঁটায় খোঁটায় অন্ধকার, ভদ্রা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে অফিস থেকে বাড়ী ফিরতেই ভদ্রা স্বামীকে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বল্ল, দেখ, যা বলেছি তাই। ঐ মিথ্যেবাদী মেয়েটা সাদার্ন এভিনিউ-এ থাকে না ছাই! এই দেখ ওর ঠিকানা, হালসী বাগানের কোনো পচা বাড়ী-টাড়ী হবে বোধ হয়!

ফোন নেই?

না। ওয়ান নাইন সেভেনকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম এই ঠিকানায় কোন ফোন আছে কি না। তারা বল্ল, নেই।

তা হলে সেই এন্‌কোয়ারিও করে রেখেছ?

নিশ্চয়। প্রথম থেকেই ওর ওপোর এমন একটা সন্দেহ আমার ছিল। তোমাকে বল্লে ত তুমি শুনবে না—

পোষাক ছেড়ে চেয়ারে বসে তাপস বাবু বল্লেন, কি করে শুনি বলো! ওর গাড়ী, ওর ড্রাইভার, ওর ক্লাব এ সব ত স্বচক্ষে দেখেছি। এর পরে,—কিন্তু এখনও যেন কি রকম মনে হচ্চে, কোথাও একটা বড় রকমের ভুল আছে। এতখানি ব্যাপার সব মিথ্যে! আর মিথ্যেটাই যদি এই ভাবে এত দিন ধরে বজায় রেখে থাকে তা হলে বলব, ভবিষ্যতে ও একটা মস্ত লোক হবে। কিছু না হোক, মিনিস্টার ত হবেই।

তা হলে ভাবী মিনিস্টারকেই শালাজ করো। আমি কিন্তু এর মধ্যে থাকব না, বরং বাবার কাছে গিয়ে ভাংচি দেব।

এমন একটা রসিকতাতেও তাপস বাবু উৎসাহিত হলেন না। আপন মনেই ভাবতে ভাবতে কফিতে চুমুক দিতে লাগলেন।

ব্যাপারটা ঐখানেই হয়ত চাপা পড়ত, কিন্তু পড়ল না, কারণ ঠিক পরের দিন দুপুরেই বি. ঘটক জামাইকে অফিসে ফোন করে বল্লেন, সুবোর ব্যাপারে বড়ই ভাবিয়ে তুল্ল তাপস, কি করি বলো ত? এইমাত্র সেণ্ট জেভিয়ারে ফোন করে শুনলুম ওদের কলেজ থেকে কোন এক্স-

কারসান যায় নি। তা ছাড়া ওদের টেস্ট পরীক্ষা গত সপ্তাহেই হয়েছে। তা হলে ও নিশ্চয়ই পরীক্ষা দেয় নি।

সে কথা বল্ল ওরা? তাপস বাবু এধার থেকে প্রশ্ন করলেন।

না, তা কিছু বলতে পারল না। বল্ল, পরীক্ষা ও দিয়েছে কি না সেটা খাতাপত্র দেখে বলতে দেরি হবে।

তা হলে?

তা হলে কি করব তা ত বুঝতে পারছি না। তুমি একটু খবর নিতে পারো? উৎকণ্ঠায় ঘটকের বয়স যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে, অন্তত গলার আওয়াজ থেকে তাপস বাবুর তাই মনে হোল।

আচ্ছা আমি খোঁজ নিচ্ছি, তাপস বাবু উত্তর দিলেন।

তাই দেখ বাবা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ঘটক ফোন ছেড়ে দিলেন।

অফিসের চেয়ারে বসেই বি. ঘটক আকুল ভাবে ভাবতে লাগলেন। কোথায় গেল ছেলেটা! দিনকাল খারাপ। কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে—। এ রকম ত আজকাল কতই হচ্ছে। কোথায় যাবেন, কি করবেন, পুলিসের মিসিং স্কোয়াডে খবর দিলে কিছু সুবিধে হবে কি?

অনেক কথাই ঘটক সেদিন ভেবেছিলেন। জীবনে শান্তি বা তৃপ্তি যে কোন দিনই তিনি পান নি সেই কথাটা আজ কিছুদিন হোল ওঁর মনকে ভয়ানক পীড়া দিচ্চে। এতদিন এ কথা মনেই হয় নি কিন্তু অনুপমাকে নার্সিং হোম-এ পাঠাবার দিন থেকেই এই হতাশ অনুভূতি ওঁকে যেন পেয়ে বসেছে। আপন মনের নিভৃত সমীক্ষায় উনি দেখেছেন যে সারা জীবনে বহু কাজই তিনি করেছেন। অসংখ্য দায়িত্ব অসংখ্য ঝুঁকি, আইনসম্মত এবং বে-আইনী অনেক অনেক কাজ উনি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে চালিয়েছেন শুধুমাত্র লাভের আশায়, কিন্তু স্থায়ী লাভ কি হয়েছে! টাকা পয়সা অনেক উপায় করেছেন কিন্তু কাউকেই খুশি করতে পারেন নি। আজ তিনি খতিয়ে হিসেব করে দেখছেন, তিনি

নিজেও খুশি হন নি। ঐ নার্সিং হোমে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে যে অনুপমা তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, তার ছেলে, ওঁর প্রথম সন্তানের অবশিষ্ট জীবন যাতে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে না কাটে সে জন্য আজই বাকী চব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে ভবানীপুরের সেই বাড়ীখানা রেজেস্ট্রী করে অনুপমার নামে কিনে এলেন। এখনও বাকী রইল সরকারের দান-কর দেওয়া ও বাড়ীখানা ভাল ভাবে মেরামত করানো। তাতেও কোন্-না পনের ষোল হাজার টাকা খরচ হবে। হাত ওঁর একেবারেই খালি হয়ে যাবে, অবশ্য জীবনের একটা গোপন কর্তব্য সম্পাদিত হোল, কিন্তু সেই কাজ চুকিয়ে সমাজসম্মত ছেলের কথা মনে হতেই তার কলেজ থেকে ফোনে যে খবর তিনি পেলেন তাতে রীতিমত চিন্তিত হলেন। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষে জামাইয়ের স্মরণ নিলেন। কিন্তু সেই বা কি করবে! বি. ঘটক আকুলভাবে ভাবতে লাগলেন।

বড় বাবু কতকগুলো ফাইল এনে টেবিলে নামাতেই মিঃ ঘটক বড় বাবুর দিকে করুণ ভাবে চেয়ে দেখে বল্লেন, খুব জরুরী ম্যাটার কিছু আছে কি?

তিনি বল্লেন, জরুরী আছে স্যার টোকিওর ক্লেম আর সিঙ্গাপুর থেকে মিঃ লালের একটা টেলিগ্রাম।

মিঃ লাল কি বলছেন?

তিনি জানতে চেয়েছেন, তাঁর মালগুলো ব্যাঙ্ক লাইনের এস্ এস্ ব্যাঙ্ক অফ্ সিড্নী মারফৎ পাঠাতে পারা যাবে কি না। ঐ জাহাজে ওঁদের স্পেশ বুক করা আছে, কিন্তু যে জন্য বুক করা ছিল সেই মাল এই ট্রিপে যাবে না। যদি সম্ভব হয় তা হলে সেই স্পেশে আমাদের চালানটা দিতে বলেছে।

কলকাতায় লোডিং ডেট কবে?

ষোলই মার্চ। মানে আর মাত্র বারো দিন বাকী।

কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে থেকে মিঃ ঘটক বল্লেন, রমেন বাবু, আজ

আমায় রেহাই দিন। আজ কিছু বলতে পারছি না। কাল এ বিষয়ে মনে করিয়ে দেবেন।

হেড্ ক্লার্ক রমেন বাবু অবাক হয়ে গেলেন। এই কি ওঁদের সেই মিঃ বি. ঘটক যার কাছে রমেন বাবু দীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ এক নাগাড়ে কাজ করে আসছেন! এ রকম কথা, এ রকম ব্যবহার জীবনে কোনো দিনও রমেন বাবু দেখেন নি। চট্‌পট্ কাজ, সঙ্গে সঙ্গে জবাব, দ্বিধাহীন স্পষ্ট ব্যবহার মিঃ ঘটক বলতে এই ত বোঝায়, কিন্তু আজ এ কি অবস্থা! ভয়ে ভয়ে বল্লেন, আজ কি আপনার শরীর খারাপ না কি স্যার?

না, তা ঠিক নয়, তবে কিনা—যাক, এগুলো আজ নিয়ে যান।

আর একটা কথা বলব স্যার?

বড়বাবুর দিকে হতাশ দৃষ্টি দিয়ে ঘটক বল্লেন, বলুন।

তিনি বল্লেন, কাল বিকেল চারটের মধ্যে ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের টেণ্ডারটা পাঠাতে হবে। কালই লাস্ট ডেট্।

কাল চারটে? চিন্তিত ভাবে ঘটক বল্লেন, চিত্ত বাবুকে কাগজপত্র তৈরী করতে বলুন। কাল দুপুরে আমি ফিগারগুলো দিয়ে দেব। তিনটে নাগাদ টাইপ করে সাড়ে তিনটের সময় পাঠিয়ে দেবেন। ওদের বাক্সে চারটের মধ্যে পড়লেই ত হোল?

হ্যাঁ স্যার।

ঘটক আর কোন কথা বল্লেন না। হেড্ ক্লার্ক রমেন বাবু ফাইলের বোঝা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিঃ ঘটক চুরুট ধরিয়ে বেল্ বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বল্লেন, পাখাটা পুরো খুলে দাও, আর কেউ এলে বলবে, আজ আমার সঙ্গে দেখা হবে না। যার যা দরকার বড়বাবুর কাছে যেন যায়।

বেয়ারা পাখাটা পুরো দমে চালিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের টুলে বসে ভাবতে লাগল এ রকম ত কখনো হয় না। অফিসে থেকে আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করবেন না এটা এই সাহেব কখনও করেন নি।

ঘটক ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে তিনটে। তা হলে তিনি একভাবে চুপ-চাপ চুরুট টেনেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অথচ বিশেষ কিছুই ভেবেছেন বলে মনে কর:তে পারলেন না। আন্‌থিঙ্কেবল্‌! আই এ্যাম এজিং। নাঃ, আর পারব না।

হঠাৎ ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ল। সেই প্রথম জীবনে স্কুলের শিক্ষকতা। সেবার স্কুলের রেসিটেশনে হেডমাস্টার মশাই বিভুকে আবৃত্তি শেখাবার ভার দিয়েছিলেন। তিনি একটি ছেলেকে অনেক চেষ্টা করে স্পস্ট উচ্চারণে আবৃত্তি শিখিয়েছিলেন, "ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে, সঁপি রাজ্যভার পুত্র তোমায়, করিব মহাযাত্রা"। পৃথিবীর সামাজিক জীবনে সর্ব-কালের সকল পিতার এক এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা। বি. ঘটকের পর এস্‌. ঘটক এই ঘরে বসবে, ঘটকের পৃথিবীব্যাপী কারবার আরও ব্যাপক, আরও লাভজনক হবে। স্বাধীন ভারতে এস্‌. ঘটক চেম্বার অফ্‌ কমার্সের প্রেসিডেন্ট হবে, ভারত সরকারের ফিনান্সিয়াল এড্‌ভাইসর অথবা লোকসভার সদস্য হয়ে কমার্স মিনিস্টার বা ফাইনান্স মিনিস্টার হবে, এই রকম কত আশায় বুক বেঁধে তিনি ছেলের সমুন্নত জীবনের মজবুত বুনিয়াদ সারা জীবনের আপ্রাণ পরিশ্রম দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ছেন, ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে সেই সব বিরাট দায়িত্বের উপযুক্ত করে গড়বার কল্পনা তিনি করেন, আর সেই ছেলে কি না তাঁকে ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা এড়িয়ে স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হোল। এই বয়সে এই ভাবে যদি সে নিজেকে, নিজের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে তা হলে কিসের জন্য, কার জন্য তিনি এই ভূতের ব্যাগার খেটে মরছেন। এখনও সব দিয়ে থুয়েও তাঁর যা থাকবে তাতে তাঁর বাকী জীবন স্বচ্ছন্দে বিনা পরিশ্রমে কেটে যাবে। যা করছেন সব ত ওরই জন্য! সেই ছেলে এমন করে সরে পড়ল! পড়লি পড়লি, বাইরে বেরিয়ে একটা চিঠিও ত দিতে পারতিস্‌! 'আমি ভাল আছি, আমার জন্য চিন্তা করবেন না,' এই দুটো লাইন পেলেও ত একটা সান্ত্বনা ছিল! কার সঙ্গে

কোথায় গেলি, টাকা-পয়সা কিছু নিলি না, এখনকার এই দিনে যত কষ্ট করেই থাকিস্ না কেন, দৈনিক খাওয়া থাকার জন্য বাইরে দশ পনের টাকার কমে কিছুতেই কারুর চলতে পারে না। সেই টাকা তোকে কে দিচ্ছে! শনিতে শনিতে আট, তারপর রবি সোম এই দশ দিন কোথায় কি ভাবে কাটাচ্ছিস্—

অনুপস্থিত ছেলেকে ধমক দিতে দিতে মিঃ ঘটক প্রায় যেন পাগল হয়ে গেলেন। আর একবার ঘড়ি দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ডান দিকের দেওয়ালে ঝোলানো মিঃ হাণ্ডার ফটোর দিকে চেয়ে চেয়ে ঈর্ষান্বিত হলেন; মনে মনে বল্লেন, হাণ্ডা সাহেব, তুমিই ছিলে পাকা লোক। বিয়ে করোনি, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা পেলে না, হু'হাতে উপায় করেছ, প্রাণভরে ভোগ করেছ, তারপর যাকে ভালবেসেছ তার হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে পরম শান্তিতে চোখ বুঝেছ। আর আমি? যে পাগল পাগলামি করে আমার সুখের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল তারই স্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য সমস্ত সঞ্চয় খরচ করলুম! যে আমায় গ্রাহ্যও করে না, তারই ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আপ্রাণ খেটে মরছি! যে-মায়ের নির্দেশে আমার সমস্ত সাংসারিক কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে আমার সংসারটাকে নিজ হাতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মরুভূমি করলুম সেই মা আমায় হু'চোখেও দেখতে পারে না। অন্যদিকে যে আমায় এখনও ভালবাসে সে বাঁচবে কিনা তার ঠিক নেই। বাঁচলেও মানুষ হয়ে বাঁচবে না, বিকলাঙ্গ অথর্ব অবস্থায় বাকী জীবন অন্যের হাত ধরেই তাকে চলতে হবে, অর্থাৎ আমার এমনই ভাগ্য যে বাকী জীবনটা সেই অচল হতভাগিনীকেই টেনে টেনে বেড়াতে হবে এবং যেহেতু সামাজিক বিধানে সে আমার কেউই নয় সেজন্য হুনিয়ার সমস্ত নিন্দা, সমস্ত গ্লানি আমার ওপোর অঝোরে পড়তে থাকবে। এমনই এক সমস্যার মধ্যে বাকী জীবনটা আমার চালাতে হবে।

কোন রকমে থপ্ থপ্ করে ঘটক নিজের ঘর থেকে বেরুলেন। দরজার টুলে-বসা বেয়ারা উঠে দাঁড়াল। ঘটক বল্লেন, বৈজুকে গাড়ী

তৈরী করতে বল্। বলেই এতাবৎ কালের অভ্যাসমত বাথ্ রুমের দিকে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ীতে বসে নার্সিং হোম-এ চলে গেলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ এটাই তাঁর প্রাত্যহিক রুটিনে পরিণত হয়েছে।

ছ'চোখ-বাঁধা বিকৃতমুখী অনুপমার শীর্ণ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ঘটক বল্লেন, ভবানীপুরের বাড়ীখানা আজ তোমার নামে কেনা হয়ে গেল গো।

রোগিনী শান্ত শিথিল হাসি হাসল। তার মুখের ব্যাণ্ডেজের ফাঁক দিয়ে সেই হাসির বিকৃত রূপ ফুটে উঠল। অতিকষ্টে অনুপমা ধীরে ধীরে বল্ল, খোকার নামেই কিনলে পারতে, আমার নামে আর কেন?

তোমার নামে কেনা মানেই খোকার পাওয়া। তুমি আর ও কি আলাদা?

অনুপমা আর একবার তেমনি ভাবে কষ্টের হাসি হেসেছিল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটক ঐখানেই থাকেন। অনুর কাছে চুপচাপ বসে তাঁর বিকালগুলো কাটিয়ে দেন, ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করেন, বড় ডাক্তারকে কন্সালটেশনে ঐ সময়েই ডাকেন, ওষুধপত্তর কেনার জন্য টাকা দেন, তারপর এক সময় ঘাড় হেঁট করে নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ীতে আসেন, আহারাদি করেন এবং সব শেষে বোতল খুলে গেলাসের পর গেলাস গলাধঃকরণ করে স্বেচ্ছায় সুপ্তিলোকে প্রয়ান করেন। তারপর সকালে উঠেই দৈনন্দিন জীবনের প্রাণহীন রুটিন। এই ভাবেই এত দিন চলছিল। এখন আবার আর একটা উপসর্গ বাড়ল, সেটা হোল সুব্রতর চিন্তা।

সে চিন্তা তাপস বাবুকেও গ্রাস করেছিল। ভদ্রার দেওয়া ঠিকানা-লেখা টুকরো কাগজটা পকেটে নিয়ে পরের দিন সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে ভারতীর বাড়ীতে ভারতীর বাবার সঙ্গে দেখা করে তাপস বাবু প্রথম চমকে ছিলেন, তারপর হতাশায় মুষড়ে পড়লেন। এই সেই ভারতী, এই এদের হালচাল। এই মেয়ে চাকরী নিয়ে

কুচবিহারের কোনো এক স্কুলে গিয়েছে। এরই জন্যে সুব্রত নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে এরই পেছন পেছন ধাওয়া করেছে। তা ছাড়া এ মেয়ে ত যা তা নয়, সাঙ্ঘাতিক মেয়ে, মিথ্যার ঝুড়ি! মনে পড়ল তারই সহপাঠিনী শীলাকে, যাকে সামান্য একটা মিথ্যার ইঙ্গিত দিতেই সে প্রতিবাদ করেছিল। শ্বশুর ওর ওপোর ভার দিয়েছেন পুত্রবধূ নির্বাচন করার জন্য। উনি মনে মনে ভারতীর কথাই ভেবেছিলেন কিন্তু এই কি সেই উপযুক্ত বধূ! হয়ত এর স্বভাব চরিত্রও ন্যক্কারজনক। ইস্, কি ভুলটাই তিনি করেছিলেন! বাস্তবিক, এ সব ব্যাপারে মেয়েদের সত্যিই দিব্যদৃষ্টি আছে, আছে একটা তৃতীয় জ্ঞাননেত্র। প্রথম থেকেই ভদ্রা আপত্তি করেছে। যে কারণেই আপত্তি করুক না কেন, ভদ্রার মূল্যায়নই যথার্থ বলে এখন মনে হচ্ছে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে সে-কথাই তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন। হাসিখুশি নেই, রসিকতা নেই, গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে সব কিছু জানিয়ে শেষে বল্লেন, কি করি বলো ত, ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কি করা যায়? উনি ত আমাকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু আমি কি করি!

ওরা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই নিশ্চিত যে সুবো ভারতীর সঙ্গে কুচবিহারেই চলে গিয়েছে।

অনেক ভেবে তাপস বাবু বল্লেন, আমাদের অফিসে এক ভদ্রলোক আছেন কুচবিহারের লোক, কিন্তু অনেক জুনিয়ার পোস্ট-এ কাজ করে। তার কাছে এ সব কথা বলি কি করে?

ভদ্রা বল্ল, ওখানে মেয়ে স্কুল ক'টা আছে সেটা এখান থেকে জানা যায় না?

তা জানা যেতে পারে, তাপস বাবু উত্তর দিলেন, সেকেণ্ডারী বোর্ডের এক মাঝারি গোছের অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। তিনি আমার প্রাক্তন সহপাঠীর ভগ্নীপতি। কিন্তু স্কুলের লিস্ট নিয়ে কি হবে?

সেই সব স্কুলের হেড মিস্ট্রেসদের চিঠি লেখা যায়। ওখানে আর

ক'টা স্কুলই বা আছে? ধরো পাঁচ সাতটা কিম্বা অতগুলোও না হতে পারে।

তারপর? হেড মিস্ট্রেসরা জবাব দেবেন কেন?

ভেবে নিয়ে ভদ্রা বল্ল, সব কথা খোলাখুলি হেড্ মিস্ট্রেসদের জানিয়ে অনুরোধ করব যে, ভারতী কাজ করছে করুক, সুবোকে যেন ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

তোমার কথা শুনে তারা বসে আছে! চিঠি পেয়ে হেসে ফেলে দেবে! অবজ্ঞাভরে স্বামী উত্তর দিলেন।

তা হলে এক কাজ করলে কেমন হয়, ভারতীর মায়ের জবানিতে যদি লিখি?

লিখতে পারো কিন্তু সে চিঠির জবাব আসবে ওর মায়ের ঠিকানায়, সে চিঠি তুমি পাবে কি করে? তারপর ওর বাপ-মাও যেমন দেখলুম, তারা একবার বলে মেয়ে গেছে মঙ্গলবারে, আবার বলে শুক্কুরবারে, শেষে বলে কে জানে বাপু, মনে পড়ে না। স্পষ্ট মনে হোল, তারা যেন মেয়ের যাবার ব্যাপারটা গোপন রাখতেই চায়, না হলে চাকরী নিয়ে মেয়ে বিদেশে যাচ্চে, মেয়ের বাপ জানে না কোন স্কুলে চাকরী হোল, এ কি হয় নাকি? বিশেষ করে যে মেয়ের বাপ স্কুল মাস্টার। ভদ্রলোক শুনলুম কোন একটা স্কুলে মাস্টারী করে।

ভদ্রা বল্ল, তা হলে যদি কেয়ার অফ্ হেড মিস্ট্রেস দিয়ে ভারতীর নামে আমি এই বলে চিঠি লিখি যে তোমার সঙ্গেই সুবোর বিয়ে আমরা দেব, তুমি যত শীঘ্র পারো ওকে নিয়ে আমার কাছে চলে এস, তা হলে কি হয়?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তাপস বাবু বল্লেন, তা হলে হয় ত কিছু কাজ হতে পারে। ভায়া আমার ঝোঁকের মাথায় ওখানে চলে গিয়ে ওখানকার হালচালে নিশ্চয়ই পস্তাচ্ছে। এই রকম একটা চিঠি পেলে সে-ই জোর করে ঐটেকে নিয়ে চলে আসতে পারে, কিন্তু তারপর?

তারপর কি? ভদ্রা স্বামীর দিকে চেয়ে রইল।

তাপস বাবু বল্লেন, তারপর ঐ জোচ্চুরনীর সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে দেবে ত ?

তা কেন ? সে ভার আমার ওপোর। সুবোকে নিয়ে ওদের বাড়ীটা একবার দেখিয়ে আনলে সুবোই ওটাকে মেরে তাড়াবে। সুবো যা ছেলে তা আমার জানতে বাকী নেই। ওর আসল ব্যাপার বুঝলে সে ওর দিকে চেয়েও দেখবে না।

হয়ত তাই হতে পারে, আবার হয়ত নাও হতে পারে। এ বয়সের আকর্ষণ, সেটা যে কতখানি গভীরে গেছে তা আর এখান থেকে আমরা কি বুঝব বলো ?

শেষে স্থির হোল, সেকেণ্ডারী বোর্ডের অফিস থেকে কুচবিহার ও তার কাছাকাছি যতগুলো মেয়ে স্কুল আছে সেগুলোর নাম ঠিকানা যোগাড় করবে তাপস বাবু এবং ভদ্রা স্বহস্তে চিঠি লিখবে সেই সব ঠিকানায় শিক্ষিকা শ্রীমতী ভারতী সেনের নামে।

সেই রাতেই চিঠির মুসাবিদা করা হয়ে গেল।

অনেক কাটাকুটির পর মাঝারি সাইজের একখানা চিঠি তৈরী করে ভাল প্যাডের কাগজে ভদ্রা লিখতে সুরু করল। একই ভাষা। স্বামী বল্লেন, গোটা ছয়েক কপি করো, তারপর যদি দেখা যায় স্কুলের সংখ্যা আরও বেশী তা হলে আরও গোটা কয়েক কপি করে ফেলো।

পরের দিন সকালেই ঘটক ফোন করলেন জামাইকে। বল্লেন, খবর-টবর কিছু করেছ ?

জামাই বল্লেন, করেছি। কুচবিহারের কয়েকটা জায়গায় চিঠি পাঠাব। আশা করি শীঘ্রই উত্তর পাব।

তোমার চেনা জায়গা ?

অল্প চেনা, তা হলেও মনে হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব।

সে যে কুচবিহারেই আছে তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি ?

জামাই ভারতীর প্রসঙ্গ শ্বশুরের কাছে তুলতে চায় না। আমতা

আমতা করে বল্লেন, চিঠিগুলো আজই পাঠাব। এক হপ্তা দেখি, উত্তর-টুত্তর কি আসে।

ঘটক বল্লেন, পুলিসের মিসিং স্কোয়াডে খবর দিলে কিছু সুবিধে হবে কি? কি মনে করো?

পুলিস আর এ বিষয়ে কি করবে? গ্রোন আপ্ ছেলে—

সেই কথাই আমার এক বন্ধু বল্লেন। তিনি পুলিসের পদস্থ এক অফিসার। তা, আচ্ছা, আমি ভাবছি যদি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই। হয়ত তার মনে কোন অভিমান কিম্বা কোনো ইচ্ছা আছে যেটা না পেয়ে সে এমনই ভাবে আমাকে জব্দ করতে চাইছে।

এ রকম ধারা কোন সন্দেহ আপনি করেন নাকি? সে কি কিছু বলেছিল?

না, তেমন কিছু জোর করে বলে নি, তবে একদিন সে বলছিল, সে ফরেনে যেতে চায়। তাতে আমি বলেছিলুম বি. কম্‌টা পাস কর, তারপর সে ব্যবস্থা করা যাবে। আমার পক্ষে ওকে ফরেনে পাঠানোর অসুবিধা ত কিছুই নেই, কিন্তু এখানকার একটা ছাপ না নিয়ে শুধু শুধু বাইরে গিয়ে কি হবে! তাই এখন ভাবছি, ও কি সেই জন্যে—

তাপস বাবু বল্লেন, এতদিন ত গেল, আরও একটা সপ্তাহ দেখি। মিছিমিছি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে জানাজানি করিয়ে—

হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। ঠিক আছে, তাই দেখ। কিন্তু আর একটা কথা ভেবেছ কি? সে বাড়ী থেকে টাকা পয়সা কিছুই নিয়ে যায় নি। ঘড়ি, ক্যামেরা এই সব নিয়ে গেছে, তার হাতের আংটি দুটোও তার কাছেই আছে বলে মনে হয়, কিন্তু নগদ টাকা সে কিছুই নেয় নি। ওর ঘর এবং ড্রয়ার খুঁজে দেখেছি ওর ব্যাঙ্কের পাস বইটাও এখানে রয়েছে। বইটা আপ-টু-ডেট করিয়েও দেখলুম, গত কয়েক মাসের মধ্যে এক পয়সাও ড্র করেনি। তাহলে বিদেশে গিয়ে ওর চলছে কি করে। যাবার গাড়ীভাড়াই বা পেলে কোথায়। সে ত কিছু উপায় করত না।

তাপস বাবু এধার থেকে বল্লেন, হয়ত কোন বন্ধু-টন্ধু জুটেছে। সেই বন্ধুরাই খরচ চালাচ্ছে। কিম্বা কোথাও থেকে ধার-টার করেছে। সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তু'চার দিন অপেক্ষা করাই ভাল হবে। টাকার টান পড়লে আপনাকে লিখতে সাহস না করলেও সে নিশ্চয়ই আমাকে বা তার দিদিকে জানাবে। এদিকে আমি আজ যাদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি তারাও হয়ত কোন সন্ধান দিতে পারবে।

সেটা বোঝো। যদি মনে করো ও কুচবিহারেই আছে তাহলে আমি আজ কালের মধ্যেই ওখানে যেতে পারি। অসুবিধে ত কিছু নেই। এক ঘণ্টায় কুচবিহার যাওয়া যায়। সকালের ফ্লাইটে গিয়ে বিকেলেই ফিরতে পারি।

তাপসবাবু বল্লেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, যেতে ত আমিও পারি, কিন্তু আগে জানা দরকার কোথায় কোন ঠিকানায় সে আছে, না হলে শুধু শুধু গিয়ে আর ঘোরাঘুরি করে ত লাভ নেই।

মোটের ওপোর আটখানা চিঠি ফেলা হয়েছিল। গয়েরকাটা, ফালাকাটা থেকে সুরু করে আলিপুর তুয়ার পর্যন্ত ঐ গোটা অঞ্চলে আটটা মেয়ে ইস্কুলের খবর পাওয়া গেল। বুদ্ধি করে প্রত্যেক চিঠিই লেখা হোল হেড্ মিস্ট্রেসের নামে। তাতে বড়দি'মণিকে অনুরোধ করা হোল, ভারতী সেন নাম্নী নব-নিযুক্তা কোন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাকে যেন সংলগ্ন চিঠিখানি তিনি দেন। ভারতী রাগ করে চাকরী নিয়ে চলে গেছে, সে জন্য আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন ইত্যাদি। ঐ খামের মধ্যে স্বতন্ত্র খামে ভারতী সেনের নামে যে চিঠি দেওয়া হোল, সেটা সেই প্রথম দিনের মুসাবিদা। চিঠিগুলো দিনরাত খেটে সবই ভদ্রা স্বহস্তে লিখেছিল। এজন্য একটা অভিযোগ পর্যন্ত করেনি।

কিন্তু কোন চিঠিরই কোন জবাব এল না। এক হপ্তা পার হয়ে গেল।

শ্বশুর জামাই-এর রোজই টেলিফোনে কথা হয়। বাড়ীর চাকর

থেকে শুরু করে পাড়ার ও অফিসের সকলেই খবরটা জেনে ফেলেছে এবং এ নিয়ে কানাঘুষা ও মন্তব্যও কম হচ্ছে না।

ঠাকুরমা সরবে কাঁদেন। তাঁর কান্নার বাচনিক অংশে থাকে নিজের ছেলের ওপোর অকথ্য দোষারোপ, সেই রাক্ষসী মায়াবী ডাইনীটাকে অজস্র অভিশাপ। তিনি স্পষ্টই বলেন, এই সব অনাচার ব্যভিচার কোন জ্ঞানবন্ত ছেলে কি সহ্য করতে পারে! নেহাৎ ভদ্র, সভ্য এবং উচ্চ বংশের উপযুক্ত বংশধর হওয়ায় বাপের সঙ্গে কোন রকম অসভ্যতা না করে নিজে মুখ বুজে পাপপুরী ছেড়ে সেই সোনার চাঁদ পথে পথে ঘুরছে। ভালই ত, তোমাদের পথ খোলসা করে দিয়ে গেছে, তোমরা মনের সুখে ফুর্তি করো, ইত্যাদি

ঠাকুরমার কান্নার সঙ্গে খোকার প্রসঙ্গও সোচ্চার হয়। সে ছেলে সাদাসিদে গোছের, এখনকার মতো চালবাজ মিথ্যাবাদী সে নয়। ঐ মাগী তাকে পাগল সাজিয়ে রেখেছিল। কিন্তু চোরের দশ দিন, সাধুর এক দিন। সেই ধরা তাকে পড়তেই হোল এবং ডাগর ছেলে মায়ের উপযুক্ত শাস্তিই দিতে গিয়েছিল। জ্যান্ত পুড়ে ছাই হোলেই সব দিক দিয়ে ভালো হোত, কিন্তু তা ত হোল না, তাই তাকে সোহাগ করে হাসপাতালে পাঠানো হোল। আর অমন ছেলেটাকে চোরের শাস্তি দিয়ে বেঁধে ধরে পাঠানো হোল পাগলা গারদে। এই হোল কলির নিয়ম; একজন চুরি করে, আর একজন চোরের শাস্তি পায়। ঠাকুরমা থুথু ফেলেন। ছি ছি, এ বাড়ীর কখনও ভাল হবে? যাবে, যাবে, সব যাবে, অনাচারের বাড়ী নৈরাচারে যাবে। দেব্‌তা এত পাপ কখনও সহ্য করেন না।

বুড়ী এক নাগাড়ে চিৎকার করে। বিভু ঘটক বিনা প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন। চারু ঝি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। ঠাকুর গ্যাস নিভিয়ে খইনি ডলে। বাদল সামনের পানের দোকানে গিয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, বুড়ীটা মরেও না। বাড়ীতে এই বিপদ, আর বুড়ীটা কি করছে দেখ্‌ না।

পানওয়ালা বলে, ঠাকুরমা যা বলছে তা কি সত্যি ?

বাদল বিরক্ত হয়। বলে, সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, কার কি ? আমাদের বাবুর মতো অত ভাল বাবু আর হবে না। জেঠাইমাও লোক খুব ভালো ছিলেন। সব দিকে সমান নজর। সকলকে কত যত্নআত্তি ; সাধারণ মাইনে-করা ঝি রাঁধুনী দিয়ে এতটা কখনও হয় না। আমি নিজে দেখেছি, ঐ বুড়ো মানুষটাকে জেঠাইমা কি যত্নই-না করত। ঐ ত ওঁর মেজ বৌ, ছোট বৌ সবাই এসে কতদিন ধরে জ্বালিয়ে গেল, কেউ ত পাঁচ মিনিটের জন্যও শ্বাশুড়ীর সেবা যত্ন করেনি। তাদের খালি দেহি দেহি। টাকাতে পয়সাতে খাবারেতে নয়-নেত্য। দিনে রাতে মটর চড়ে আজ চিড়িয়াখানা, কাল থিয়েটার, পরশু সিনেমা, বাবাঃ, সে কি লবাবী ! আবার ঝি না হোলে মেজ গিন্নির বেরোনো হয় না ! বাপের জন্মে ঝি কাকে বলে তা চোখে দেখে নি, এখানে ভাশুরের বাড়ী এসে কি চাল !

পানওয়ালা বাদলের কথা শোনে আর মুখ টিপে হাসে। মাঝে মাঝে তাতিয়ে দেয় আর বলে সে সময় তোর চারীর খুব কষ্ট ছিল বল্ ?

ছিলই ত, বাদল জোর দিয়ে বলে, সে সময় সকলেরই কষ্ট ছিল। বাপ্ রে বাপ্, ঐ পাড়াগেঁয়ে মাগী মিন্সেগুলোর কি হাঁক ডাক ! বাচ্ছাগুলো পর্যন্ত ঠিক যেন সাপের সোলুই। গাছ ভেঙ্গে, বাড়ী ঘর ভেঙ্গে একেবারে তছনছ করে ছেড়েছে। তা সেই সময়—সেই সময় ঠাকুরমা ত বিছানা থেকে উঠতেই পারত না, মুখে মুখে দিনরাত খাবার যুগিয়ে চব্বিশ ঘন্টা সেবাশুশ্রূষা করে খাড়া করে তুলল কে ওঁকে ! ওঁর যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকত তাহলে এই ভাবে উনি তার পেছনে লাগতেন না। আমি জোর করে বলতে পারি, জেঠাইমার সঙ্গে উনি যদি মানুষের মতন ব্যবহার করতেন তা হলে জেঠাইমা এই বাড়ীতে সোনা ফলাতে পারত।

চারুও এখন মনে মনে আফশোষ করে। কেন মরতেই যে পাগলকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলুম ! পাগল ত আমার কোন অনিষ্ট করেনি।

আপন মনেই ঘুরে ফিরে বেড়াত, ইদানিং বাবুর সঙ্গে আপিসে যেত, বাবুর পেছন পেছন বাড়ী ফিরত। বেশ ছিল, ওকে ঐ সব বলে ওটা না দেখালেই হোত। কে জানে বাবা, এমনটা যে হবে তা কি ছাই জানতুম!

পাড়ার গরীব গৃহস্থরা বলে, অত বড় বাড়ী, অমন ভদ্দরলোক, ওদের যে ভেতরে ভেতরে এমন সব কাণ্ড, কে জানে বাবা! ছি ছি, ঠাকুরমা কি সাধে চেঁচায়, সাবেক আমলের লোক, ওঁরা কি এই সব সইতে পারেন? ওর চেয়ে বাবা, আমরা গরীবগুরবো লোক, দিন আনি দিন খাই, আমরা ঢের ভালো আছি। ঘেন্না ঘেন্না, বড় লোকের মাথায় ঝাড়ু মারি!

শিক্ষিত ধনী গৃহস্থরা, বিশেষ করে অবাঙ্গালী প্রতিবেশীরা এবাড়ীতে চেঁচামেচি বেশী হোলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মুখ ফুটে এমন কি নিজেদের মধ্যেও বিশেষ কোন মন্তব্য করে না। তারা যে বিশেষ কিছু বোঝে তাও মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গের রেশ গিয়ে অফিসেও পোঁচেছে। কেরানী বাবুরা হাসাহাসি করে। চিত্তবাবু টাইপিস্ট নিরঞ্জন বাবুকে বলে, বড় সাহেবের কি টেস্ট্ ভাই? শুনেছি সেটা একটা বুড়ী রাঁধুনী, তাকে বাড়ীর মধ্যে এনে উপযুক্ত ছেলের সামনে কি সব কাণ্ড বলো ত! কেন বাবা, বাড়ীর বাইরে নাচিয়ে গাইয়ে কত সব রয়েছে বাবুর বাঁধা। বাইরে বাইরে সেই ত ভাল, বাড়ীর ভেতরে এসব কেন?

নিরঞ্জন বলে, 'যার সঙ্গে যার মজে মন', বুঝলে হে?

তা ত বটে, কিন্তু এ হোল কি জানো, 'আপনে মজিলি রাজা, লঙ্কা মজাইলি' উত্তর দেয় চিত্তবাবু।

বড়বাবু অন্য রকম মনে করেন। তিনি ভাবেন আশ্চর্য! ওঁকে ত আমি আজ দেখছি না। পুরো কুড়িটি বছর ওঁর কাছে রয়েছি। এ রকম দিলখোলা সাচ্চা লোক এখনকার দিনে সচরাচর মেলে না। ওঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে আজ নয়, সে প্রায় দশ বারো বছর হোল।

এত দিনে ওঁর কোন রকম বেচাল দেখলুম না, শেষে কিনা এই বয়সে এমনই এক অভাবনীয় ব্যাপার! বিশ্বাস হয় না। এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। যাক গে যাক, উনি যদি অফিসের কাজে ঢিলেও দেন তা হলেও আমাদের ঢিলে দিলে চলবে না। অফিসটাকে বাঁচিয়ে না রাখলে আমি যাব কোথায়, বুড়ো বয়সে খাব কি?

চারিদিকে এত যে লেবার ট্রাবল হয়েছে এর হাওয়া কিন্তু হাণ্ডা-ঘটক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে এখনও লাগে নি, কখনও লাগবেও না। এই সেই প্রতিষ্ঠান যার শেয়ার ঘটক সাহেব নিজে অগ্রণী হয়ে দশ বছরের পুরাতন সমস্ত কর্মচারীকে দিয়েছেন, বড়বাবুও পেয়েছেন এবং পেয়েছেন আরও বিশেষ কয়েকজন। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রাক্টটা পেলে কোম্পানীর প্রচুর লাভ হবে। বড়বাবু তার ছেলেটাকেও এখানে বসাতে পারবেন; কিন্তু এমন সময় এ কি বিপর্যয়! বড়বাবু মনে মনে খুবই দুঃখ পান। ভবিষ্যতের চিন্তায় মুষড়ে পড়েন, হতাশ হন।

এমনই ভাবে হতাশ হচ্চে নাগপুরে ভারতী ও সুব্রত। দু'খানা করে কাগজ নিতে শুরু করেছে মিঃ সুব্রত ব্যানার্জী ও মিসেস ভারতী ব্যানার্জী। স্টেট্‌স্‌ম্যান ও আনন্দবাজার এই দুটো কাগজ রোজ খুঁটিয়ে দেখে। সুবো দেখে হারানো প্রাপ্তি স্তম্ভগুলো, ভারতী সেটার দিকে এক নজর দেখেই বিশেষভাবে দেখে আইন আদালতের ব্যাপার। প্রফেসার অজিত বোসের কেস্‌ নিশ্চয়ই কাগজে উঠবে। ওদের যদি একবার জামিন দিয়ে ছাড়ে তা হলেই চক্ষুস্থির! ভারতী ভাবে, এমন কি মনে মনে মা কালীর কাছে মানসিকও করে ফেলেছে যে, অজিতরা যেন পাঁচ সাত বছরের মতো আটকে পড়ে। ওর ফাঁসি হওয়াই উচিত, কিন্তু তা ত আর এ ব্যাপারে এখনকার দিনে হয় না, তা ভগবান করুন ও যেন আটক হয়, দীর্ঘদিনের মেয়াদে ও যেন ফাটকের আড়ালে আটক থাকে।

অন্য দিকেও কেমন একটা অসুবিধে দেখা দিয়েছে। কাজ নেই

কর্ম নেই অনির্দিষ্ট ভাবে এক জোড়া তরুণ-তরুণী নাগপুরের মতন শহরে হোটেলে বাস করছে এটা বোধ হয় যেন কারুর কারুর মনে সন্দেহের উদ্রেক করছে। পুরী বা শিমলা, দার্জিলিং হলে এ রকম কোন কথাই উঠতো না, কিন্তু এ হচ্চে নাগপুর। এখানে কেউ বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসে না। তা ছাড়া এখানে এদের কাছে কোনো গেস্ট, কোনো বন্ধু, কোনো আত্মীয় এমন কি একখানা চিঠি পর্যন্ত এত দিনেও একটা এল না। কথায় কথায় হোটেল ম্যানেজার সেদিন লাউঞ্জে বসে এমনই সব প্রসঙ্গ তুলেছিলেন যা সুব্রতর ভালো লাগে নি। সে কোন রকমে দায়সারা গোছের হুঁ-হাঁ দিয়ে সরে এসেছিল। এক বাঙ্গালী দম্পতি এসে দিন চারেক ওদের পাশের ঘরে ছিল। সেই মহিলাটিও ভারতীর সঙ্গে ঘরোয়া কথায় জমাট হবার চেষ্টা করেছিল। ভারতী তাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতীর এমনও মনে হয়েছিল যে, ওরা পার্টির লোকও হতে পারে। তবে সুব্রত বলেছিল, ভদ্রলোক অডিটের কাজে নাগপুরে এসেছেন, তিন-চার দিনের বেশী থাকবেন না। থাকেনও নি, যাবার সময় ভারতীরা তাদের বন্ধুভাবেই বিদায় দিয়েছিল।

ভারতী বল্ল, এক জায়গায় বেশী দিন থেকে কি হবে? চলো, অন্য কোথাও যাওয়া যাক। সুবোর কিন্তু বাজে বাজে ঘুরতে ইচ্ছে হয় না। মাঝে মাঝে সুবোর মনে প্রবল অনুশোচনাও দেখা দেয়। পরীক্ষাটা দেওয়া হোল না! নাই হোক, এখনও ফিরলে হয়ত লেট ফি দিয়েও এ বছরের পরীক্ষায় সে বসতে পারে, কারণ আগের পরীক্ষাগুলোয় তার যা রেজাল্ট আছে তার ফলে সেণ্ট আপ্‌ সে হবেই। সুবো যাকে এত দিন প্রিয়তমা বলে ভেবেছিল, হপ্তার পর হপ্তা ধরে চব্বিশ ঘণ্টার একান্ত সান্নিধ্যে সেই প্রিয়তমা কেমন যেন আটপৌরে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। এরই জন্য পরীক্ষাটা নষ্ট করা এবং একটা বছর এভাবে উড়িয়ে দেওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে। তা ছাড়া বাড়ীর এই গোলমালের সময় তার পক্ষে বাড়ী ছেড়ে আসাটাও বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। বাবা কেমন আছেন কে জানে। বাবার হার্টের অসুখ

হয়েছিল। এখন কিছু সেরেছেন বটে কিন্তু হার্ট ডিজিজের কথা কিছু বলা যায় না। বিশেষ করে সুবোই তাঁর একমাত্র ছেলে। সুবো জানে, বাবা তাকে আপ্রাণ ভালবাসেন। সেই সুবোর জন্য দুশ্চিন্তায় বাবা যে ভেঙ্গে পড়বেন না তাই বা কে বলবে!

এক এক সময় মনে হয়, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষা না করে নিজে থেকেই যদি একটা চিঠি লেখা যায়! সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, ছিঃ, তা হলে আর মুখ দেখানো যাবে না। তার চেয়ে বাবার সকাতর বিজ্ঞাপনের উত্তর হিসেবে চিঠি দেওয়া অনেক ভালো। প্রথম প্রথম টাকার জন্য ভারতীর কাছে নিজেকে ছোট মনে হোত। এখন সেটা শুধু যে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাই নয়, এখন এক নতুন যুক্তিও ওকে পেয়ে বসেছে। ও এখন সজ্ঞানে ভাবতে শিখেছে যে, ভারতী যখন ওকে এই ভাবে নামিয়েছে তখন ওর সমস্ত খরচ দেওয়াটাই ভারতীর কর্তব্য। ভারতী এমন কিছু করছে না যে জন্য ওকে ভারতীর কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হবে। উপরন্তু ওকে ওর সংসার থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসার জন্য ভারতীর উচিত সর্ব বিষয়ে ওর ক্ষতিপূরণ করা।

তা ভারতীও সুবোকে প্রাণপণ সেবা করে। স্নানের পর সুবোর কাপড় কাচা থেকে সুরু করে তার জুতোয় কালি লাগিয়ে দেওয়া, সুবোর বিষণ্ণ ক্ষণগুলিতে নানা ভাবে তাকে উৎসাহ দেওয়া, আদরে আবদারে সুবোকে ভরিয়ে তুলে সিনেমায় টেনে নিয়ে যাওয়া, জোর করে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দশ বিশ মাইল দূরের অখ্যাত মন্দির বা পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক ঢিবি দেখার ব্যবস্থা করা, এইভাবে সর্বরকমে সুবোকে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা সে অহোরাত্রই করে কিন্তু তবুও সে বোঝে, তবুও তার মনে হয় সুব্রত সেই আগের সুব্রত আর নেই। তার ভালবাসা যেন ক্রমশঃই ফুরিয়ে আসছে। ইংরাজীতে যাকে বলে কীপার ও কেপ্ট এবং বাংলায় রক্ষক ও রক্ষিতা, এখানে ঠিক সেই মনোবৃত্তিই অল্পে অল্পে ফুটে উঠছে। এ বিষয়ে পুরুষ ও মহিলায় কোন প্রভেদ নেই বলে

মনে হয়। যে দায়িত্ব নেয় সে দায়িত্ব বহন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, যে পরের স্কন্ধে থাকে সে আপন ভুলে পরের ওপোর থাকাটাই নিজের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে।

সুবো বলে, বাবা না হয় নানা ঝঞ্ঝাটে ভুলে আছেন। তা ছাড়া উপযুক্ত ছেলে দশ বিশ দিন বাইরে গেলে আর কি হবে, সে ত বলে কয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু তোমার বাবাও ত কই কাগজে কোন বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন না। তুমি যেদিন বেরিয়েছ সেই দিন থেকেই ত তাঁরা ব্যস্ত হবেন, অন্ততঃ সেই দিন থেকেই তাঁদের ছট্‌ফট্‌ করা উচিত।

ম্লান হেসে ভারতী বলে, তুমি বাবাকে জানো না। তাঁর বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না।

তোমার মা? তিনি কি তোমার বাবাকে কিছুই বলবেন না?

ভারতী ম্লানমুখে বল্ল, তুমি বাবাকে চেনো না। এমন রাশভারী মানুষ সচরাচর দেখাই যায় না। মায়ের সাধ্য নেই বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার। মা নিশ্চয়ই লুকিয়ে কাঁদে, কিন্তু বাবার সামনে কাঁদার সাহস পর্যন্ত মায়ের নেই।

তোমার দাদু? তিনিও কি তোমার বাবার ভয়ে চুপচাপ থাকবেন?

তিনি হয়ত খবরই পান নি। কে আর খবর দেবে তাঁকে। আর মা যদি এবিষয়ে লিখেও থাকে, তা হলে তিনিও ক্ষেপে লাল হবেন। পুরানো আমলের রক্ষণশীল লোক ত!

আচ্ছা, সেই যে সেই প্রথমবার দক্ষিণেশ্বর থেকে ফেরার সময় তোমাদের কে আত্মীয় পুলিস অফিসারের বাড়ীতে গিয়েছিলে তারা তোমার খবর টের পান নি?

কি জানি? যদি আমাদের বাড়ীতে এসে থাকেন তা হলে হয়ত টের পাবেন, কিম্বা নাও পেতে পারেন। তাঁরা আমাদের আত্মীয় ত! তাঁদের কাছে বাড়ীর মেয়ের এই ভাবে পালিয়ে যাবার কথা কি আর কেউ বলবে?

ভারতীর কথায় সুবোর বিশ্বাস হলেও সে বল্ল,' তোমাদের রক্ষণশীলতা একটু বেশীই বলতে হবে।

ভারতী বল্ল, বাঙ্গালীদের সব বাড়ীতেই এই রকমটা হয় গো। একটা পুরুত ডেকে মন্তর পড়িয়ে ছেড়ে দিলে ধন্য ধন্য ব্যাপার, তা না হলেই গেল গেল রব। বুঝলে?

তা বটে, সুব্রত ঘাড় নাড়ে বলে, সেই মন্তরটা পড়া হয় নি বলেই সব দিক দিয়ে জড়িয়ে পড়ছি। সত্যি ভারতী, সেদিন সিনেমা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল সাহিত্যের এত সব রোমান্স ব্যক্তিগত জীবনে একেবারে মিথ্যা। যেটা ছবিতে, উপন্যাসে বাহবা পায় সেটা বাস্তবের ছিছিক্কারে ধুলোয় লুটোয়।

আবার এও দেখেছি, সেই ধুলোয় লুটনো ছেলেমেয়ে দু'টোকে পিঁড়িতে বসিয়ে মন্তর পড়িয়ে নিলে তারাই আবার সমাজের মধ্যে পাঁচজনের একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়, ভারতী মন্তব্য করে।

তা ত বটেই। তখন তারা ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে এসে গেল। সমাজ মানে কতকগুলো লিখিত এবং অলিখিত আইনের সমষ্টি ত, সুব্রত সায় দেয়, কেতাদুরস্ত না হলেই সমাজ চোখ রাঙায়, কেতা মাফিক হলেই সমাজ কোলে তুলে নেয়।

কিন্তু এর মধ্যেও অনেক ব্যতিক্রম আছে। আমার দিদিমা রাধা-কৃষ্ণের ভক্ত। তাঁর ঠাকুর-ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের নানারূপ ছবি। সেগুলো যে-কোন প্যারিস্ পিকচারকে হার মানাতে পারে। কিন্তু রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সামাজিক সম্বন্ধ কি ছিল বলো ত?

দিদিমাকে এ বিষয়ে জিগেস করো নি?

করেছি। তিনি চটে ওঠেন। বলেন, ঠাকুর দেবতার লীলাখেলা। ও নিয়ে তামাসা করতে নেই। আবার দাদু কি বলেন জানো, মুখ ভেঙিয়ে বলেন, 'দেবতার বেলা নীলে খেলা, পাপ নিকেছে মানুষের বেলা'। ভারতী হাসতে থাকে।

হাসতে হাসতে সুবো বল্ল, দিদিমা তখন কি বলেন?

বলবেন আর কি, রেগে যান। যুক্তি ফুরিয়ে গেলে মানুষ যা করে তিনিও তাই করেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সুবো বলে, সব ত বুঝলুম, কিন্তু এভাবে কত দিন চলবে ?

দেখাই যাক, জলে ত পড়িনি! ভারতী সুবোকে সান্ত্বনা দেয়, সাহস দেয়।

কিন্তু ভারতী মনে মনে ভীত হয়। তার সব চেয়ে ভয় পার্টিকে, কিন্তু সে কথা ত সুবোকে বলা যায় না। ভারতী আপন মনেই চিন্তা করে। সুবো দেখে, ভারতী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

অন্য সময় ভারতী বলে, তোমার বাবার ত ভারতের বাইরে অনেক সব বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে তোমার জানাশোনা নেই ?

বিশেষ নেই, সুবো ম্লান কণ্ঠে বলে। ভাবে, কি অন্যায়ই না সে করেছে! মাঝে মাঝে যাঁরা ওদের বাড়ীতে গেস্ট হয়ে দু'চার দিন কাটিয়ে গেছেন তাদের কাছে ও কোনও দিন ঘেঁষত না। উঃ, কি ভুলটাই-না করেছে! তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাবা কতদিন বলেছেন। কিন্তু ও তাদের ধারে-কাছেও যেত না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলে আজ কি ওর ভাবনা থাকত ?

সেদিন সুবো একাই হোটেল থেকে বেরিয়েছিল। এ রকমটা আজ-কাল মাঝে মাঝেই হয়। ঘরে আর থাকতে পারে না। ভারতীর সঙ্গ আর ভাল লাগে না। একা একা নাগপুরের রাস্তায় লম্বা লম্বা পা ফেলে বেশ খানিকটা হাঁটে। আগে মনে হোত, ভারতীকে একান্তভাবে নিজের কাছে পেলে সে দুনিয়ার সব কিছুই ছাড়তে পারে, এখন মনে হয় কিছুক্ষণ একা একা ঘুরলে মনটা হয়ত ভাল হতে পারে। সে একাই বেরোয়। ভারতী বাধা দেয় না। ভারতীও মাঝে মাঝে একা থাকতে ভালবাসে। তার ভাবতে ভাল লাগে। কি হবে, কি করবে এই সব চিন্তা তার একার। সুবোকে এর অংশ দেওয়া যায় না।

ঘরের দরজায় টুকটুক করে শব্দ হোল। ভারতী বুঝল, হোটেলের

বয় ওকে ডাকছে। দরজা খুলতেই দু'খানা খবরের কাগজ দিয়ে বয়টা সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

পত্রিকাটার পাতা উল্টে ভারতী আগেই দেখল আইন আদালতের সংবাদ। চমকে উঠল। অধ্যাপক জামিনে খালাস। অন্যেরা এখনও আটক রইল। মে মাসের দশ তারিখে ওদের শুনানির দিন পড়েছে।

ভারতীর স্পষ্ট মনে হোল তার মেরুদণ্ড দিয়ে কেমন এক হিমশীতল প্রবাহ যেন ধীরে ধীরে নামছে। সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

পত্রিকার অক্ষরগুলো তার চোখের সামনে একাকার হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে স্টেট্‌স্‌ম্যানটাও খুলল। ঐ একই সংবাদ। নতুন কোন আলোক সে পেল না।

এবার—

যে প্রফেসার তার রক্ষক ছিল, সে এবার ভক্ষক হবে। ঐ ভয়ঙ্কর লোকটির সাংঘাতিক প্রতিহিংসা থেকে ভারতী কি আত্মরক্ষা করতে পারবে! সে এবং তার বিরাট অন্ধ অনুচর বাহিনীর নিষ্ঠুর শাস্তি যে কি ভীষণ মূর্তিতে ওদের ওপোর নেমে আসবে সেটা ভারতীর ভালভাবেই জানা আছে। ওরা ভারতীদের নাগালে পেলে ঐ ছোট্ট পিস্তল ভারতীকে বাঁচাতে পারবে না। এখনও যদি ভারত ছেড়ে পালানো না যায় কিম্বা একেবারে ঘটক বাড়ীর কনে-বৌ সেজে ঐ বৃহৎ বাড়ীর সুরক্ষিত অন্দরে দু'চার বছরের মতো আত্মগোপন করতে না পারে তা হলে ওদের বাঁচার সম্ভাবনা কোথায়? ভারতী ঠিক করলো, সুবোকে সে বলবে, বাবাকে চিঠি লেখো। এভাবে আর থাকা যায় না।

সুবো এসে ঘরে ঢুকল। ভারতীর দিকে নজর দিয়েই সুবোর মনে হোল, ভারতী অসুস্থ। সে বিষয়ে মুখে কিছু না বলে বল্ল, এই যে, কাগজ দিয়ে গেছে। দেখেছ?

দেখেছি।

ওর নিস্প্রাণ উত্তরে সুবো বুঝল, আশাপ্রদ খবর কিছুই নেই।

নিজেকে ভোলবার জন্য সুবো স্টেট্‌স্‌ম্যানটা খুলে চেয়ারে বসল।

চোদ্দ

জামিনে খালাস পাবার পরের দিনেই প্রফেসর অজিত বোস রেখাকে পাঠিয়েছিলেন ভারতীকে ডেকে আনার জন্য। নিজে যান নি, কারণ তিনি জানতেন তাঁর গতিবিধি যত গোপনেই হোক না কেন, পুলিস নিশ্চয়ই নজর রাখবে। কোচিং স্কুলে এলে কেউ কিছু মনে করবে না কারণ এই স্কুলে তিনি পাড়ার ছেলেদের অবৈতনিক শিক্ষা দিয়ে জনহিতকর কাজ করেন এটা সকলেই জানে, এজন্য সরকারী এডও আছে। এখানকার প্রকাশ মুন্সী ছদ্ম নামটা শুধু এখানকার নবাগতদের জন্য, অজিত বোস নামটাই এখানকার কাগজে কলমে আছে। রেখা ফিরে গিয়ে খবর দিল, ভারতী ও-বাড়ীতে নেই। কুচবিহারে কোন এক মেয়ে ইস্কুলে চাকরী নিয়ে চলে গেছে।

অজিত বসুর ভ্রূ কুঞ্চিত হোল। এমন ধারা কথা ত ছিল না। কুচবিহারে কোথায় যেতে পারে?

রেখা বল্ল, ঠিকানা ওরা দিতে পারল না, বল্ল, জানি না। তবে কুচবিহারে যে গেছে সেটা ওর মা বল্লেন। সেখান থেকে এখনও কোন চিঠিপত্র ওঁরা পান নি।

ওর মায়ের কাছে আমার নাম তুমি করেছিলে?

রেখা বল্ল, করেছি। তিনি বল্লেন, মেয়ে চলে গেছে, আপনিও অনেক দিন যান নি। ওদের ভয়ানক অভাবে দিন যাচ্ছে। বাড়ী ভাড়া দূরের কথা, র‍্যাশন পর্যন্ত তুলতে পারছেন না। সেজন্য বিশেষ করে আপনাকে বলতে বল্লেন।

প্রফেসর বোস আশ্বস্ত হলেন। মনে ভাবলেন, তা ঠিক। অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে—।

ঠিক আছে, ওর বাবার সঙ্গে দেখা হোল? প্রফেসার জিজ্ঞাসা করলেন।

না ত। বাবাকে দেখি নি, ছোট ছোট ভাই বোন কয়েকটাকে দেখলুম, রেখার উত্তর।

অজিত বাবু স্কুলে গেলেন বিকালের দিকে, যে স্কুলে উনি সেক্রেটারী এবং ভারতীর বাবা ড্রিল মাস্টার।

হেডমাস্টারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে ড্রিল মাস্টারের কথা তুলতে তিনি বল্লেন, ওঁকে—কই ওঁকে ত বড় একটা দেখি না। একটু থেমে বল্লেন, প্রফেসার বোস, ওঁকে দিয়ে আর চলবে না। এবার ওঁকে ছুটি দিন।

বোস বল্লেন, তা ত বুঝি মাস্টার মশাই কিন্তু মুস্কিল হচ্চে এই যে ওঁর বাড়ীর খবর আমি জানি। স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিলে একটা ফ্যামিলি ডাহা শুকিয়ে মরবে।

কটাই বা টাকা উনি পান,—এতে কি আর সংসার চলে, হেডমাস্টার মন্তব্য করলেন।

অজিত বাবু হাসলেন। বল্লেন, মাংসভাত, ঘিভাত, মুনভাত ভিন্ন ভিন্ন স্টেজ আছে তা ত জানেন। কিন্তু মুনভাতের পরে যে কি তা কি আর মুখ ফুটে বলতে হয়? ওরা এখন মুনভাতেরও নীচে। আপনি তাড়িয়ে দিলে কোথায় দাঁড়াবে বলুন ত? অথচ ওঁর এমন কোন ছেলে মেয়ে নেই যাকে কোন কাজ দিতে পারি।

বড় এক মেয়ে আছে শুনেছি না?

আছে, সে এবারে বি. কম পার্ট টু দেবে। আমি সে জন্মই অপেক্ষা করছি। তার পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তাকে কোন এক জায়গায় ঢুকিয়ে ওঁকে ছেড়ে দেব। আরও দু'তিন মাস আপনাকে সহ্য করতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেজন্ম আমি কিছু বলছি না। নীচু ক্লাসের ড্রিল, সে না হয় বন্ধই রইল? হেডমাস্টার সেক্রেটারীর কথায় সায় দিলেন।

আচ্ছা, উনি কি অনেক দিনই আসেন নি? অজিত বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

ভেবে নিয়ে হেডমাস্টার বল্লেন, কৈ, দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না।

একবার ডেকে পাঠান ত, হরিয়াকে বলুন যেন এখনই ওঁকে ডেকে আনে। এই সব হিসেবপত্র দেখতে আমার সময় লাগবে। এত দিনের হিসেব সব দেখতে হবে ত? তার মধ্যে উনি যেন আসেন।

সেদিন সন্ধ্যের সময় অজিত বাবু ভারতীর বাবার দেখা পেলেন। হেড মাস্টারকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে বল্লেন, ভারতী কোথায়?

সে কুচবিহারে কোন একটা মেয়ে স্কুলে চাকরী পেয়ে চলে গেছে।

কোন স্কুল?

কি জানি, স্কুলের নাম সে বলে নি। সে ত আমার সঙ্গে বেশী কথা-টথা বলত না। আর গেলও খুব তড়ি-ঘড়ি। ভেবেছিলুম গিয়েই চিঠিপত্র দেবে, তখন সব জানতে পারব, কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন খবর সে দিল না।

তারপর স্ত্রীর শিক্ষামত বল্ল, একটা কথা স্যার। বাড়ীতে ওঁয়ারা আপনাকে কিছু খরচের জন্য বলতে বলেছে। গেল সপ্তাহে র‍্যাশন তুলতে পারে নি। এ সপ্তাহে র‍্যাশন না নিলে কার্ডগুলো পচে যাবে।

ছেলে মেয়েরা খাচ্চে কি?

স্ত্রীর শিক্ষামত ভারতীর বাবা বল্ল, সে কথা আর কি বলব স্যার, দু' দিন ধরে ছোলা সেদ্ধ খেয়ে আছি। সবাই তাই খাচ্চে।

পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে অজিত বাবু বল্লেন, এই নিন। পরে যা হোক ব্যবস্থা করব। এখন যান, মেয়ের চিঠি পেলেই আমাকে জানাবেন। হরিয়া বেয়ারার হাতে চিঠিটা দিলেই আমি পেয়ে যাব।

নোট শুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে ভারতীর বাবা বল্ল, যে আজ্ঞা স্যার। চিঠি এলেই হরিয়াকে দিয়ে যাব। আর স্যার, বাড়ী ভাড়াও দু'মাসের বাকী পড়েছে। ওঁয়াদের কাছে শুনলুম, বাড়ীওয়ালার দারোয়ান দু'তিনবার তাগাদা দিয়ে গেছে।

ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা করে দেব। আর শুনুন, স্কুলে বেশী কামাই টামাই করবেন না। হেডমাস্টার মশাই বলছিলেন, তিনি আপনাকে দেখতেই পান না।

কথাগুলো হেডমাস্টারকে দেখেই অজিত বাবু বলেছিলেন। হেড-মাস্টার ঘরে ঢুকে বল্লেন, বোর্ডের এই কটা চিঠিরও আপনি ছিলেন না বলে কোন জবাব দেওয়া হয় নি। এইগুলো একবার দেখবেন।

হেডমাস্টার ও সেক্রেটারী দু'জনকেই নমস্কার জানিয়ে ড্রিল মাস্টার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী গিয়ে অজিত একখানা চিঠি লেখালো একটা ছেলেকে দিয়ে। দু'লাইনের চিঠি। চিঠিখানা পাঠালো কুচবিহারে একজনের নামে। ভারতীর ব্যাপারটা ওর জানা দরকার। সে কি এধারের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চাকুরীই করবে? কি চাকরী, কত মাইনে, কি তার প্রস্পেক্ট! চলবে না, ভারতীকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। ভারতীর মতো মেয়েকে উনি কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। সেই মনোহারী দোকানদার ভারতীর খবর অজিতকে দিয়েছিল। হয়ত ভারতী হতাশ হয়ে, কিম্বা ভয়ে পালিয়েছে। অজিতের হাসি এল। এতেই এত ভয়। এই ত সবে সুরু। এখনও অনেক বাকী। অনেক বিপদ, অনেক মৃত্যু, কে যে কোথায় যাবে তার ঠিক-ঠিকানাই থাকবে না।

তিনদিন পরেই কুচবিহার থেকে চিঠি এল। সেই সঙ্গে এল একজন বড়দিদিমণিকে লেখা ভদ্রার এক চিঠি এবং খাম-ছেঁড়া অবস্থায় ভারতী সেনকে লেখা ভদ্রার চিঠি। অজিত বোসের রগের শিরা ফুলে উঠল। এতদূর!

এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভারতী কলকাতা ছেড়ে পালাবার সাহস এবং খরচ কোথা থেকে পেয়েছে। মেয়েমানুষ জাতটাকে বিশ্বাস করতে নেই। আচ্ছাঃ, এর ব্যবস্থা হবে।

সেইদিনই বিকালে একটি অচেনা ছেলে ঘঠক বাড়ীর দরজায় গিয়েছিল সুব্রতকে খোঁজ করতে। একটা চাকর বেরিয়ে এল। ছেলেটি

চাকরকে জিজ্ঞাসা করতেই চাকরটা বল্ল, দাদাবাবু বোধ হয় কাল ফিরবেন। গত কাল তাঁর টেলিগ্রাম এসেছে, বাবুও ট্রাঙ্ক কলে তাকে কাল সকালের প্লেনেই চলে আসার জন্য বলেছেন।

কোথায় আছেন এখন?

নাগপুরে।

হঠাৎ নাগপুরে কেন?

কি জানি, কি কাজ ছিল, বাদল উত্তর দিয়েছিল।

তিনি একাই গেছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে কাল কিম্বা পরশু এলে দেখা হবে?

হ্যাঁ। পরশু আসবেন, নিশ্চিৎ দেখা পাবেন। তিনি এলে কি বলব? আপনার নাম কি?

বোলো আমি তার কলেজ থেকে আসছি। আমরা একসঙ্গে পড়ি।

নাম?

নিশিকান্ত বসু।

ছেলেটি চলে গেল। বাদল ভাবতে লাগল, নিশিকান্ত বসু? এ নাম কখনো শুনিও নি, একে কোনো দিন দেখিও নি।

এদিকে বাড়ীতে সকলেরই আনন্দ। সকলে আর কে, ঝি-চাকরের সংসার, ঝি চাকরেরই আনন্দ। বাবুর আনন্দ এত বেশী হয়েছে যে বাদলকেও তিনি না বলে থাকতে পারেন নি। সেই থেকে সবাই শুনেছে। ঠাকুরমাও শুনেছেন, শুনে গুম হয়ে আছেন। খবরটা চাকরের কাছে শুনতে হোল! নিজের ছেলে মায়ের কাছে যায়ও না, কথাও বলে না।

খবর শুনেছে ভদ্রা, শুনেছে তাপসবাবু। স্টেট্‌স্‌ম্যানে পরশু বি. ঘটকের অনুরোধটা ছাপা হয়েছিল। পরশুই সন্ধ্যার সময় এল টেলিগ্রাম। তাতে হোটেলের ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। পরশু রাতেই বাবু ট্রাঙ্ক করলেন। কি একটা ব্যাপার হয়েছে বাদলরা প্রথমে বুঝতে

পারে নি, কিন্তু কিছু একটা হয়েছে। কাল সকালে জামাইবাবু গাড়ী নিয়ে একাই এসেছিলেন। বোধ হয় অফিসে যাবার আগে এ বাড়ী ঘুরে গেলেন। হাসিমুখে এসেছিলেন, গম্ভীর ভাবে ঘাড় গুঁজে বেরিয়ে গেলেন। বাবুর কিন্তু ভারী ফুর্তি। এমন কি বাদলকে পর্যন্ত ডেকে দাদাবাবুর ফিরে আসার খবরটা দিয়েছেন। বাদলও নেচে উঠেছে, কিন্তু সব সত্বেও কেমন যেন একটা জিনিস অনুক্ত রয়েছে। বুদ্ধিমান চাকর অনুমান করে, কিন্তু সেটা যে ঠিক কি তা ধরতে পারে না।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল সাড়ে দশটায় বাবু গাড়ী নিয়ে বেরুলেন, অন্য দিনের চেয়ে কিছু দেরিতে। বেরোবার আগে বাদলকে বল্লেন, সুবোর ঘরটা ঝাড়িয়ে মুছিয়ে ঠিক করে রাখবি। আমি এয়ার পোর্টে যাচ্ছি। সুবো এবং ওর সঙ্গে একটি মেয়েও আসবে। ওদের দুজনের ভাত রাখতে বলবি ঠাকুরকে। এয়ার পোর্ট থেকে ফেরার সময় আমি আমার অফিসে নেমে যাব। ওদের নিয়ে বৈজু আসবে। সব ব্যবস্থা গুছিয়ে করবি। দেখিস, সেই মেয়েটির যেন কোন অসুবিধা বা অযত্ন না হয়।

বাদল ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। তারপর চারুকে নিয়ে প্রবল উৎসাহে দাদাবাবুর ঘর সাফ করতে লেগে গেল।

চারু বল্ল, যেমন বাবু তেমন ছেলে! যা বুঝ্‌ছি, ঐ মেয়েটার জন্যই দাদাবাবু পালিয়েছিল।

শুখনা ঝাড়ন দিয়ে আলমারি মুছতে মুছতে বাদল বল্ল, কি করে বুঝলি?

চোখ কান থাকলেই বোঝা যায় রে! যা বলছি তাই নিজ্জস্, তুই দেখে নিস্।

তা হলে কি নাগপুর থেকে কোনো নাগপুরীয়াকে নিয়ে আসছে? বাদল সন্দেহ প্রকাশ করে।

হতে পারে। কিম্বা সেখানেও ত বাঙ্গালীরা থাকে। চারু স্তোক দেয়।

কিন্তু বিয়েই যদি হয় তা হলে ত আমরা বড্ড ফাঁকিতে পড়ে গেলুম রে! দাদাবাবুর বিয়েতে আমোদ আহ্লাদ হবে, তুই নতুন কাপড় পরে গিন্নেপনা করবি—

দরকার নেই বাবা অত ঝামেলায়। এক গাদা লোক আসবে, গতরের ওপোর দিয়ে মই-মাড়ান হবে, আবার দেশ থেকে সেগুলো যদি আসে—

আসবেই। বিয়ে বাড়ীতে আসবে না? কি বলিস তুই! তবে এও বলি, সে-দেশ থেকে যদি রেজেস্টারী বিয়েও করে আসে তাহলেও বাবু এখানে অম্নি অম্নি ছাড়বেন না। পাড়ায় বন্ধুবান্ধব না থাকলেও আপিসের লোকদের সকলকেই বলতে হবে। ওঁর যত বড় বড় লোক-দের সঙ্গে ওঠা-বসা। তাদেরই বা বাদ দেবেন কি করে? তুই হাড় কুঁড়ে, তোর গতরের ওপোর মই-মাড়ান হবেই, এটা জেনে রাখিস্।

তা হোক, তাতে আমি পিছপা নই, কেবল দেশ থেকে সেই ভূত-শাঁকচুন্নীগুলো না এলেই হোল।

তাও হবে না, তারা সকলের আগে আসবে এবং এক মাসের মধ্যে এখান থেকে নড়বে না। তখন দেখবি, কেমন মজা!

আহা রে, জেঠাইমাটা এসব দেখতে পেল না! সেই পাগলা ছেলেটাও—

থাম্ থাম, আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। তাদের এই হাল্টা কে করল রে? একটা কথা তোর পেটে যদি থাকে! সেদিন তোকে মজা করে দেখিয়ে যে কী ভুলটাই করেছি তা আর কি বলব! এর পরে দেখিস, কোন্ শালা বা তোকে কোনো গোপন কথা বলে।

বাদলের মুখের দিকে করুণভাবে চেয়ে বাল্তির জলে ন্যাতাখানা কাচতে কাচতে চারু বল্ল, কেন মরতেই যে পাগ্লাটাকে বলতে গেলুম! আর তাও বলি, ঐ অমন ছেলে, যে সাত চড়ে রা কাড়ে না, সে যে এমন ভাবে ক্ষেপে যাবে তা আমি ভাবতেই পারি নি। তবু যা হোক জেঠাইমা ওঘরের জানলা বন্ধ করে নিজের ঘরের জানলা খুলে এক

রকম সামলে নিয়েছিল, কিন্তু ছেলেটাই ত যত নষ্টের গোড়া। এখন পাগলা গারদে পচে মর! যেমন বদ বুদ্ধি তেমনি ফল ভোগ কর!

পাগল বলেই অমনটা করল রে! বুদ্ধিমান হোলে কিছুই করত না, বরং দম দিয়ে চুপি চুপি বেশ কিছু বাগাবার চেষ্টা করত। আর তাতে বাবু আপত্তিও করতেন না। বাবু ত আর কেপ্পন না।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চারু বল্ল, মাইরি বলছি বাদ্‌লা, আমি কিন্তু এখনও বুঝি না, ঐ বুড়ীটার ভেতর বাবু কি এমন পেয়েছে যে ওর জন্য এত নিন্দে, এত অপমান, যে-মায়ের কথায় বাবু উঠত বসত সেই মায়ের সঙ্গে কথা বন্ধ, এত টান্ আসে কোত্থেকে?

তা ত বটেই, মুখ ভেংচে ব্যঙ্গ করে বাদল বল্ল, এমন সোনার চাঁদ চারুকে ছেড়ে বাবু যে কেন ঐ বুড়ীটার জন্য—

থাম্ বলছি, ভাল হবে না। নোড়া মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেব, অসভ্য বেয়াক্কিলে মিন্সে—

বাদল হাসতে লাগল। বল্ল, সত্যি কথা বল্লেই রাগ হয় রে—

থাম্ থাম, তোর মত আমি নই, বারোঘাঁটা কুকুর কোথাকার—

এই,—ঠাকুরমা আসছে, ফিস্ ফিস্ করে বাদল চারুকে সাবধান করে দিল।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দেওয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে ঠাকুরমা এদিকেই আসছিলেন।

চারু, চারু কোথা রে, ঠাকুরমার ডাক শোনা গেল।

সুবোর ঘর থেকে বেরিয়ে মিষ্টি করে চারু উত্তর দিল, কেন ঠাকুরমা—

ও ঘরে কি করছিস্?

এই যে, পরিষ্কার করছি। জানেন ঠাকুরমা, এই ক'দিনেই ঘরটায় যা ধুলো পড়েছিল।

তা ত পড়বেই। আমার ঘর রোজ ঝাড়ামোছা হয় তাতেই মুঠো মুঠো ধুলো বেরোয়, আর এ ঘর ত ধরো আজ কতদিন ধরে বন্ধই পড়ে

রয়েছে। আর দেখ্‌না কেন, ফাল্গুন মাস ত শেষ হতে চল্ল, বিষ্টি বাদলা হলে তবু ধুলোটা একটু মরতো।

হ্যাঁ ঠাকুরমা, যা বলেছেন। তা আপনি এখুনি উঠলেন কেন ঠাকুরমা? আর একটু ঘুমিয়ে নিন।

আর ঘুম! ঘুম কি আমার আছে রে? আহার নিদ্রা সবই আমার ঘুচিয়ে দিয়েছে। অত বড় ছেলেটা, বিভুব ঘরের একটা মাত্তর ছেলে, কোথায় যে সে ঘুরছে তার ঠিকই নেই—

আর ত ভাবনা নেই ঠাকুরমা, বাদল বল্ল, হয়ত এতক্ষণে দাদাবাবু দমদমে পৌঁছে গেছেন। দমদমে নামার পর মাত্র এক ঘণ্টা কিম্বা তাও নয়। বাবু নিজে গাড়ী নিয়ে গেছেন দাদাবাবুকে আনতে।

তাই যাক, তাই যাক; সুমতি হোক। না হলে নিজের ছেলেকে শুদ্ধ ভাসিয়ে দিয়ে কি যে সব বেলেল্লাপনা করে, ছি ছি, ঘেন্না ঘেন্না! তা ও কখন আসবে বল্লি?

একটার মধ্যে ঠিক এসে যাবে। আপনি ভাববেন না ঠাকুরমা, শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

একটার মধ্যে। ঠাকুরমা নিজের মনেই উচ্চারণ করলেন। এখন কটা?

এখন সাড়ে এগারটা, বাদল উত্তর দিল।

ও। তাহলে সাড়ে এগারটার পর বারোটা, তারপর একটা। এখনও তোমার গিয়ে ধরো দেড় ঘণ্টা। ওঃ, কতদিন যে ছেলেটাকে দেখিনি। তা হ্যাঁরে, নাগপুর ত শুনেছি ভাল জায়গা। ঐ সব পশ্চিমে ত লোকেরা হাওয়া বদল করতে যায়। তা হ্যাঁরে, ওর চেহারা-টেহারা বেশ ফিরেছে বলেই মনে হয়। কি বলিস্‌।

নিশ্চয়ই ঠাকুরমা, নিশ্চয়ই ফিরেছে। দেখবেন, ওকে হয়ত চিনতেই পারবেন না, বাদল আশ্বাস দিল।

ফোক্‌লা মুখে হেসে ঠাকুরমা বল্লেন, কি যে বলিস্‌ তুই, তোর একটা

কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই এক মাসে ওর এমন চেহারা হবে যে আমি চিন্‌তেই পারব না। কি রে? তুই হাসালি আমাকে।

শোনেন কেন ঠাকুরমা, বাদলাটার ঐ রকমই বুদ্ধি, হাঁদারাম কোথাকার, বাদলের দিকে চোরা চাউনি দিয়ে চারু-ঝি ঠাকুরমার কথায় সায় দিল।

টং করে দোতলার দালানের ঘড়িতে সাড়ে এগারটা বাজল। বাদল বল্ল, সাড়ে এগারটা বাজল ঠাকুরমা। বাবুর কাছে শুনেছি সাড়ে এগারটার সময় নাগপুরের হাওয়াই জাহাজ কলকাতায় নামবে।

ওঃ, দিনে দিনে কি যে হোল! বাবার কাছে শুনেছি, প্রথম যখন হরিপালে রেলগাড়ী হয়েছিল তখন, তা বাবা বলতো তাঁরা তখন ছেলে-মানুষ, তাদের সারাটা দিনই ঐ রেলের লাইনের ধারে কাটত। আর রেলও তখন ধরো এখনকার মত এত ছিল না। সেই সকাল বেলা দশ ঘড়ির সময় একটা যেত আবার সেটাই বিকালে ফিরত। সেই গাড়ী দেখার জন্য বাবারা সারা দিন ঐ লাইনের ধারে ধারে থাকত।

আপনার বাপের বাড়ী বুঝি হরিপালে ছিল ঠাকুরমা? চারু সব জেনে শুনেও নতুন করে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁরে, তা তোকে কি একথা বলিনি আমি? বলেছি, সকলকেই বলেছি। তোকেও নিশ্চয় বলেছি। আচ্ছা ভুলো মন ত তোর! কিচ্ছু মনে রাখিস্‌ না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠাকুরমা, আপনি বলেছেন। আপনি যখন বলেছেন তখন আমিও সেখানে ছিলুম, আমার মনে আছে, কিন্তু চারুর মনে নেই। ওর মাথায় ঠাকুরমা একদম গোবর, ও কিচ্ছু মনে রাখতে পারে না। বাদল চারুর দিকে চেয়ে চেয়ে ঠাকুরমাকে বলেছিল।

তুই থাম, বাজে ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করিস নি, চারু বাদলকে ঝঙ্কার দেয়।

ঠাকুরমা হাসেন। বলেন, হ্যাঁরে বাদলা, তোর বোধ হয় ঐরকম বোন আছে বাড়ীতে?

আছে ঠাকুরমা। বাড়ীতে নয়, শ্বশুরবাড়ীতে।

বুঝতে পেরেছি। সেই বোনের স্বাদ তুই চারুকে দিয়ে মেটাচ্ছিস্। পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো দুটোতে খালি খুনসুড়ি করিস, ঠাকুরমা স্মিতহাস্যে মন্তব্য করেন।

দেখুন-না ঠাকুরমা, ও খালি আমার পেছনে লাগে। আমাকে না জ্বালালে ওর খিদে হয় না। চারু অভিযোগ করল।

গম্ভীর হবার চেষ্টা করে ঠাকুরমা বল্লেন, না রে বাদলা, ওরকম করিস নি। চারু আমার বড় ভালো মেয়ে রে! ও না থাকলে আমার যে কি হোত—

আর আমি না থাকলে? বাদল অভিমান ভরে প্রশ্ন করে।

তুই আর আমার কি করিস? তুই ত বাবুর কাজই করিস, আর সংসারের কাজের মধ্যে করিস্ শুধু বাজারটা।

ঠাকুরমার কথা শেষ হতে না হতেই চারু বল্ল, শুনলি ত, শোন, তুই ঠাকুরমার কোন কাজ করিস না, কেবল বাইরে বাইরে ফোঁপর-দালালি করে বেড়াস। হুঁ হুঁ বাবা, ঠাকুরমার কাছে চালাকি নয়। পুরানো আমলের পাকা লোক, ফাঁকি দেবার জো নেই, ওঁর চোখে সব পড়ে।

আমি কিছু করি না ঠাকুরমা? আমি ফাঁকি দিয়ে বেড়াই? বাবু আমায় বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেয়? বাদল কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে।

না না, ফাঁকি দিবি কেন? তা কি আর হয় রে? তবে আমি বলছিলুম কি, আমার কাজ আর কি আছে যে তুই করবি? আমার-যা সামান্য কাজ তা ঐ চারুই করে।

তাই বলুন ঠাকুরমা, তাই বলুন, আর আপনার আদরের চারুকে ধমকে দিন, ও যেন যখন তখন সকলের কাছে আমার নিন্দে করে না বেড়ায়। আপনার আদরে আদরে দিন দিন আস্পদ্দা ওর বেড়েই চলেছে। অতি বাড় ভাল নয় চারু, মনে রাখবি।

দেখছেন, দেখছেন ঠাকুরমা, ছোঁড়া আপনার সামনেই কি রকম বলছে আমাকে—

আঃ, তোরা থাম্ ত। রাতদিন দু'টোতে ঝগড়া করে মরছে। তোদের কাজ হোল? ঠাকুরমা দু'জনকেই ধমক দিলেন।

আমি ত কাজ করছি, ও আমার পেছনে লাগছে কেন, বাচ্ছা মেয়ের মতো সুর ধরে চারু ঠাকুরমার কাছে নালিশ করল।

আপনিই বলুন ঠাকুরমা, আমি ওর পেছনে কোথায় লাগলুম। ও-ই ত আমার নামে আপনার কাছে যা তা লাগাচ্ছে।

না, না, ও সব লাগান-ভাঙ্গান ভাল নয় রে। ও কি? বাচ্ছাদের মত কোৎলাকুৎলি করা! না বাবা, আমি এখানে থাকলে তোদের ঝগড়া মিটবে না। আমি যাই। একটু শুই গে। সুবো এলেই আমাকে ডেকে দিস, বুঝলি?

হ্যাঁ ঠাকুরমা, আমি ডেকে দেব, চারু ও বাদল দু'জনেই একসঙ্গে একই উত্তর দিল।

নিজের ঘরের দিকে ফিরতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমা বল্লেন, দুগ্গা, দুগ্গা, দু'জনের এক রা, চোর-চুর্নী ভাঙ্গে বেড়া। দুগ্গা বলো, দুগ্গা শ্রীহরি।

সেটা কি ঠাকুরমা, চারু ছোট্ট খুকির মতো প্রশ্ন করল।

ওমা, এটা জানিস না! এ আমার খুড়িমার কথা রে, মানে খুড়-শাশুড়ীর। তিনি বলতেন, যদি দু'জনে-একসঙ্গে একই কথা বলে ফেলে তাহলে সেই রাত্তিরে বাড়ীতে চোর পড়ে। সে জন্যই তিনি এরকম হোলে দুগ্গা নাম করতেন; আরও সব কি কি তুকতাক করতেন, সে সব আমার ঠিক মনে নেই। সেকালের লোক তারা সব, কত কি জানতো রে, আমরা আর কি ছাই জানি!

তবুও ঠাকুরমা আপনি যা জানেন আমরা তার কতটুকু জানি? আমরা শুধু শূয়োর-পেটে খাই আর ঘুমুই। চারু ঠাকুরমার মন-রাখা কথা বলেছিল।

সে আর এখনকার দিনে কে বোঝে বল্? এই তুই বল্লি, আর আমি শুনলুম। বাস্, ফুরিয়ে গেল। এখনকার ছেলেদের

এসব বলতে গেলে তারা হেসে উড়িয়ে দেয়, ঠাকুরমা সখেদে বলেছিলেন।

আপনি শুয়ে পড়ুন তো ঠাকুরমা। ওদের আসতে এখনও দেরি আছে। এলেই আপনাকে ডেকে দেব, বাদল যেন এখান থেকে ঠাকুরমাকে বিদায় করতেই চায়।

ঠাকুরমা বল্লেন, তাই যাই। বিড়্ বিড়্ করে বল্লেন, শুয়েও ঘুম হোল না, দু'চক্ষু এক করতে পারলুম না। এখন শুলেই কি আর ঘুম হবে, তবে ঐ যাকে বলে বিছানায় পড়ে থাকা। বলতে বলতে ঠাকুরমা দেওয়াল ধরে ধরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঠাকুরমা নিজের ঘরে ঢুকে যেতেই বাদল বল্ল, মিছামিছি বুড়ো মানুষটাকে আজেবাজে কথা বলে আটকে রাখিস কেন? আচ্ছা হয়েছিস্ তুই!

কেমন জব্দ! একলা পেলে তুই যেন সাপের পাঁচ পা দেখিস্। চারু জিভ্ ভেংচে বাদলাকে টিট্‌কিরি দিল।

ঘর মোছা হয়ে গেল ত?

হ্যাঁ। কি করতে হবে এবার? হুকুম করো দেব্‌তা। চারু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

যাঃ, তুই বড্ড ফাজিল হয়ে গেছিস্। চল্, দরজাটা বন্ধ করে নীচে যাই।

আর বন্ধ করতে হবে না। ওরা ত এখুনি আসবে! মেঝেটা শুকিয়ে যাক, দরজা খোলা থাক।

বাদল ও চারু নীচে নেমে গেল।

ঠাকুরের রান্না তখনও চলছিল। মাছ, মাংস দু'রকমই হচ্ছিল। এত দিন পরে দাদাবাবু আসছেন, বাবু অবশ্য কিছু বলেন নি, বাদল নিজে থেকেই এই ব্যবস্থা করেছে।

ফোন বাজল। বাদল দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরল। ফোনের ওধার থেকে ভদ্রা বল্ল, কে রে, বাদল নাকি?

হ্যাঁ দিদিমণি।

সুবো এসেছে ?

না দিদিমণি।

এলেই আমাকে ডাকবি   আমার নম্বর মনে আছে ত ?

আছে দিদিমণি।

বল্ ত নম্বরটা।

বাদল নম্বরটা উচ্চারণ করতেই ভদ্রা বল্ল, ঠিক আছে। এলেই আমাকে ডাকবি, ভুলিস নি যেন। আমি এই ফোনের কাছেই রইলুম।

আচ্ছা দিদিমণি।

ভদ্রা ফোন ছেড়ে দিল।

নীচের দালানে বড় ঘড়িতে টং করে সাড়ে বারোটা বাজল। বাদল ঘড়ির দিকে চেয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরালো। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্ল, ঠাকুরভাই, তোমার মাংস যে এখনও ফোঁস ফোঁস করছে। দেরি কত ? ওদের আসার সময় হোল কিন্তু।

গ্যাসের উনুনে প্রেসার কুকারে মাংস ফুটছিল। সেই প্রেসার কুকারের শব্দটাকেই বাদল বলে মাংস ফোঁস ফোঁস করছে।

ঠাকুর বলল, বাস্, আর দেরি নেই। সমস্তই হয়ে গেছে। এবার গ্যাস নিভিয়ে দেব।

ওরা সকলেই দাদাবাবুর আসার অপেক্ষা করছে। শুধু দাদাবাবু নয়, একটি মেয়েও আসবে। সেই মেয়েটি যে ঐ দেশ থেকে দাদাবাবুর বিয়ে-করে-আনা বউ সে বিষয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে বারবার আলাপ ক'রে এখন আর কারুর কোন সন্দেহ নেই। এবার শুধু চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলেই হোল। কি রকম মেয়ে, বাঙ্গালী কি মেমসাহেব কিম্বা অন্য কিছু এ নিয়ে বাদলের অনেক সন্দেহ। চারু ওর পুরানো মনিব-বাড়ীর কথা তুলল। সেখানকার দাদাবাবু বিলেত থেকে মেম

নিয়ে এসেছিল। সেই মেমকে নিয়ে সে বাড়ীতে কি হুল্লোড়! চারু রসিয়ে রসিয়ে গল্প সুরু করল। শ্রোতা ছিল বাদল আর ঠাকুর।

চারু, চারু, বাদল—

যাই ঠাকুরমা।

ঠাকুরমার চীৎকারটা কেমন যেন আর্তকণ্ঠে। এ ভাবে ত ঠাকুরমা কখনও ডাকেন না। এক দৌড়ে বাদল ওপোরে গিয়ে দেখে ঠাকুরমা নিজের বিছানায় বসে ঊর্ধ্বমুখে পাখার দিকে দেখছেন। পেছন পেছন চারুও এসে পড়েছে।

কি হয়েছে ঠাকুরমা, বাদল ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

ভূঁ-ভূঁই-ভূঁইকম্প হোল নাকি রে?

না ত! ভূঁই-কম্প ত হয় নি!

কি জানি, আমার যেন মনে হোল। আমার খাটখানা হড়্‌হড়্ করে নড়ে উঠল। চোখ বুজে শুয়েছিলুম। চোখ চেয়েই দেখি, চড়্ চড়্ করে ঐ দেয়ালখানা ফেটে গেল, তারপর ভাল করে দেখি, কিছু নয়। পাখাটাও ত দুলছে না। তোরা কিছু টের পেয়েছিস্ কি?

না ঠাকুরমা, আমরা ত নীচে ছিলুম। ভূমিকম্প-টম্প কিছুই ত হয় নি, বাদল উত্তর দিল।

হ্যাঁ বাবা, তাই ত এখন দেখছি। দিন দুপুরে জেগে জেগে এমন ধারা স্বপ্ন দেখলুম! কে জানে বাবা, বরাতে কি আছে! দুগ্গা, দুগ্গা, গোবিন্দ, গোবিন্দ। তিনি বলতেন, দুঃস্বপ্ন দেখলে গোবিন্দর নাম নিতে হয়। উঃ, কি ভয়টাই যে হয়েছিল!

হয়ত আপনার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, বাদল বলে।

চারু বল্ল, দুব্বল শরীল ত! নিন ঠাকুরমা, শুয়ে পড়ুন। জল-টল কিছু খাবেন?

দে আধ গেলাস। দুগ্গা, দুগ্গা—

জল খেয়ে মুখ মুছে ঠাকুরমা বল্লেন, ওরা এল?

না ঠাকুরমা, এখনও আসে নি। এলেই আপনাকে খবর দেব। বাদল উত্তর দিল।

ঠাকুরমা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন। বল্লেন, চারু এইখানে থাক্, আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে। বাদল বাইরে গিয়ে দেখ্‌গে যা, গাড়ী আসছে কি না।

বাদল ঘরের বাইরে চলে গেল। চারু-ঝি বিরসমনে ঘরের ভেতরেই রয়ে গেল। নীচের অমন জমাটী আড্ডাটা মাঠে মারা গেল।

একটার পরেও সুবোরা এল না। এল এক ফোন। বাদল ধরতেই ওধার থেকে বাবু বল্লেন, ওরা পৌঁচেছে ত? ওদের খাওয়া-দাওয়া হোল?

বাদল বল্ল, আজ্ঞে না, ওঁরা ত এখনও আসেন নি। আমরা সেই তখন থেকে অপেক্ষা করছি।

সে কি রে? ঘটক সাহেবের বিস্মিত কণ্ঠস্বর। বারোটা কুড়িতে আমি অফিসের দরজায় নেমে ওদের ছেড়ে দিয়েছি। এখন ত প্রায় দেড়টা। এখনও পৌঁছায় নি?

না ত, বাদল উত্তর দিল।

এক ঘণ্টা হোতে চল্ল, কি ব্যাপার রে! দুপুরেই এত ট্রাফিক জ্যাম! না, তাও ত সম্ভব নয়। তাহলে কি গাড়ীর কোন ট্রাবল্ হোল! ফোন্‌টা হাতে রেখেই বাবু যেন স্বগতোক্তি করছিলেন, বাদল এধার থেকে শুনতে পাচ্ছিল। তারপর ফোনটা কেটে গেল।

বাদলও বিস্মিত হোল। আপিস থেকে যোধপুর পার্ক ঠিক আধ ঘণ্টা লাগে, সে জায়গায় একঘণ্টা হয়ে গেল, কি ব্যাপার!

কোন এ্যাকসিডেণ্ট হয় নি ত, বাদল ভাবল। পরক্ষণেই মনে হোল, বৈজু পাকা ড্রাইভার, এই এতদিন ধরে সে এ বাড়ীতে রয়েছে, গাড়ীতে কখনও একটা আঁচড়ও লাগে নি। কিন্তু এত দেরির কারণ কি? কি হোতে পারে? সে মনে মনে তোলাপাড়া করতে লাগল।

ঠাকুর বল্ল, কোন্ ফোন্ কিয়া?

বাদল বল্ল, বাবু। আপিস থেকে ফোন করছেন।

ওরা এল না?

কি জানি, তাই ত ভাবছি। বাবু একঘণ্টা আগে আপিসে নেমে ওদের ছেড়ে দিয়েছেন। ওরা গেল কোথায়?

আরও আধ ঘণ্টা পরে ফের টেলিফোন। বাদল ধরতেই বাবু বল্লেন, গেছে ওরা?

না বাবু।

মুস্কিল। বাবুর স্বরে উৎকণ্ঠা। বাবু ফোন ছেড়ে দিলেন।

এর পরেই আর একটা ফোন। বাদল দৌড়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবল, এবার নিশ্চয়ই দিদিমণি। ফোন তুলে বল্ল, হ্যালো—

ওধার থেকে অচেনা স্বর,—গম্ভীর কণ্ঠে বলছে, এটা কি মিঃ বি. ঘটকের বাড়ী?

হ্যাঁ স্যার, বাদল উত্তর দিল।

এত নাম্বার এ্যামবাসাডর গাড়ী কি মিঃ ঘটকের?

হ্যাঁ স্যার। আপনি কে?

আমি টালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বলছি। এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গাড়ীটা আনোয়ার শা রোডের মোড়ে পড়ে আছে। আপনারা ওটার ব্যবস্থা করুন।

এ্যাকসিডেন্ট! বাদল সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ড্রাইভার নেই? বাবুরা?

ওদের হস্‌পিটালে পাঠানো হয়েছে। আপনারা রসা রোড আনোয়ার শা রোডের জাংশানে চলে আসুন। নমস্কার।

ফোন কেটে গেল।

বাদলের মত চালাক-চতুর ওস্তাদ লোকও ফোন-হাতে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

ঠাকুর এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে। বাদলের মুখ দেখে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এটাই সে অনুমান করেছে, কিন্তু কি তা বোঝে নি। আস্তে আস্তে বল্ল, কেয়া হুয়া বাদলা ভাই?

ঠাকুরের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বাদল ফোন ঘোরাল বাবুর

আপিসে। ওধার থেকে সাড়া পেয়ে বল্ল, আমি বড় সাহেবের বাড়ী থেকে বলছি, তাঁকে দিন।

তিনি এইমাত্র অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। আপনি কে?

আমি বাদল, সাহেবের খানসামা।

বড় বাবু অর্থাৎ রমেন বাবু বল্লেন, জানি জানি, চিন্‌তে পেরেছি। কিন্তু কি ব্যাপার হে? সাহেবের গাড়ী এল না, তিনি ট্যাক্সি আনিয়ে বেরুলেন, কি হয়েছে বলো ত?

গাড়ীতে এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ড্রাইভার-টাইভার সব হাসপাতালে গেছে।

কোথায়? কখন? রমেন বাবুর উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

এই কিছুক্ষণ আগে, আনোয়ার শা রসা রোডের মোড়ে।

কি করে হোল?

জানি না স্যার। আমি ছেড়ে দিচ্ছি। সাহেব এলেই বলবেন।

ফোন ছেড়ে বাদল ভাবল, বাবু ত বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই। তাহলে দিদিমণিকে জানাই। জামাইবাবু এসে যদি কিছু করতে পারে।

ফোন পেয়েই ভদ্রা আঁৎকে উঠল। বল্ল, তুমি ওখানেই চলে যাও বাদল। আমি তোমার জামাইবাবুকে এখনই ফোন করে ওখানে যেতে বলছি। ওদের কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেছে জানো?

না দিদিমণি, থানা থেকে শুধু বল্ল, হাসপাতালে নিয়ে গেছে, কোন হাসপাতালে কিছু বল্ল না।

ভদ্রা ফোন ছেড়ে দিল।

দু'এক কথায় ঠাকুরকে বিপদটা বুঝিয়ে গায়ের ওপোর জামাটা গলিয়েই খরচের টাকা যে কটা ছিল পকেটে ফেলে বাদল বেরিয়ে পড়ল। বল্ল, ঠাকুরমাকে কিছু বলিস নি। শুনলে হাঁউমাউ করবে।

ঠাকুর গালে হাত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রান্নাঘরে নানা রকম খাদ্য থরে থরে সাজানো। কিন্তু খাদক কোথায়?

বাদল যখন বাস থেকে নামল তখনও আনোয়ার শা রসা রোডের মোড়ে বেশ ভিড় ছিল। কৌতূহলী জনতা, পুলিশ, টালিগঞ্জগামী ট্রাম লাইন বন্ধ হওয়ায় পেছন-পেছন দাঁড়িয়ে যাওয়া ট্রামের সারি, বাস, লরী, রিকশা, টেম্পো, বিরাট ভিড়। সরু রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম।

ভিড় ঠেলে বাদল গাড়ীর কাছে এসে দেখল বাবুর গাড়ীর পেছন দিকটা একেবারে থেঁৎলে পেছনের সীটের ওপোর ঢুকে এসেছে। গাড়ীখানা ওপাশে কাৎ হয়ে পড়েছে। এপাশের দরজাখানা ভাঙ্গা, কে যেন কেটে ভেঙ্গে দরজাখানা ছিঁড়ে নিয়েছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে শুনল, এই গাড়ীটা একখানা ট্রামকে পাশ কাটাবার জন্য যখন খুব আস্তে বাঁ দিক দিয়ে যাচ্ছিল তখন এক লরী এসে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মেরে গাড়ীটাকে ঐ ভাবে থেঁৎলে দিয়েই বাঁয়ে আনোয়ার সা রোডে ঘুরেই সবেগে পালিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা লরীর ড্রাইভারটা বোধ হয় মাতাল ছিল। এ্যাকসিডেন্টের পরেই মার খাবার ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে!

বাবুরা কোথায়? বাদল ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

এক ছোকরা বল্ল, গাড়ীর এই দরজাখানা ভেঙ্গে তবে ত বাবুদের বার করা হোল। আপনাদের এক আত্মীয় এসে আমাদের দিয়ে এই দরজা ভাঙ্গিয়ে ওদের বার করিয়েছিল।

আমাদের আত্মীয়? এর মধ্যে কে এলেন? বাদল আপন মনেই কথাগুলো বলে ফেল্ল।

আপনাকে খবর দিয়েছে কে? সেই ছোকরা প্রশ্ন করল।

আমি খবর পেয়েছি পুলিস থেকে!

একটা ছোট খাটো ভিড় বাদলকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পানওয়ালার দোকান থেকে আর একটি ছেলে লাফিয়ে নেমে বাদলের কাছে এসে বল্ল, এ গাড়ী আপনাদের?

বাদল বল্ল, হ্যাঁ।

তা হলে দেখুন গে, ওঁদের নিয়ে অন্য গাড়ী বোধ হয় এতক্ষণে বাড়ী পৌঁছে গেছে।

কোন গাড়ী? এরই মধ্যে কে এলো? পরক্ষণেই বাদল ভাবল তবে কি জামাইবাবু—

সেই ছেলেটি বল্ল, এই গাড়ীটা ভেঙ্গে পড়ার পরেই পেছন পেছন আর একটা গাড়ী আসছিল। যাবার রাস্তা না পেয়ে সে গাড়ী থেকে বাবু নামলেন। তিনিই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। সে গাড়ীতে আর কেউ ছিল না। তিনি আপনাদের আত্মীয়। নেমেই ব্যাপার দেখে হতভম্ব হলেন। তারপর হৈ চৈ করে আমাদের দিয়ে এ গাড়ীর এই দরজাখানা ভাঙ্গিয়ে বাবুকে আর তার বউকে গাড়ি থেকে নামালেন। বউটির খুব বেশী চোট্ লেগেছিল, জ্ঞান ছিল না। বাবুর জ্ঞান ছিল। বাবুর সঙ্গে ঐ বাবুর খুব জানাশোনা। তিনি বউটিকে কোলে করে নিজের গাড়ীতে তুলে পেছনের সীটে শুইয়ে দিলেন। বাবুকেও ধরে ধরে নিজের গাড়ীতে বসালেন। তারপর আমাদের বল্লেন, জিনিসপত্র থাকুক, তোমরা ভাই ড্রাইভারের মুখে চোখে জল-টল দাও, আমি এদের ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ী পৌঁছে দি'। বাড়ী গিয়েই আমাদের লোক পাঠিয়ে দেব। তা আপনার সঙ্গে ওঁদের দেখা হয় নি?

না ত, বাদল উত্তর দিল, ওরা ত এখনও বাড়ীতে যায় নি!

তা হলে আপনি খবর পেলেন কোথা থেকে?

পুলিসের ফোন পেয়ে আসছি। ড্রাইভার কোথা?

পুলিস থেকেই ড্রাইভারকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিসের জীপেই নিয়ে গেছে ঐ বাঙ্গুর হাসপাতালে, ছেলেটি মুখ তুলে বাঙ্গুর হাসপাতালের দিকটা দেখিয়ে দিল।

ঘামতে ঘামতে বি. ঘটক এসে হাজির হলেন। বল্লেন, বাদল এসেছিস! ওরা কোথায়?

বাদল যা শুনেছিল তাই বল্ল।

তিনি বল্লেন, তাহলে কেউ ওদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছে?

আমি যখন পুলিসের ফোন পেয়ে আপনাকে আর দিদিমণিকে ফোন করে বাড়ী থেকে বেরুলুম তখনও পর্যন্ত ওঁরা কেউ যান নি।

দেখ্ ত, দেখ্ ত, দোকান থেকে ফোন কর ত, ওরা গেছে কি না?

শিখ্ ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘটকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল সে কি খাড়া থাকবে।

তার দিকে চেয়েই ঘটক বল্লেন, থাকো।

সেই গাড়ীতেই ঘটক অফিস থেকে এতটা এসেছেন। ট্রাফিক জ্যামের জন্য সেই গাড়ী টালিগঞ্জ ফাঁড়ির ওপাশে আটকে যেতে মিঃ ঘটক এতটা পথ প্রায় দৌড়েই এসেছেন, তাকে তার ভাড়াটা পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। শিখ্ ড্রাইভার বাবুর কাছে কাছেই রইল।

বাদল দৌড়ে এসে বল্ল, না বাবু, ওঁরা কেউই বাড়ীতে যান নি, ঠাকুর বল্ল।

তাহলে? হতভম্বের মতো বি. ঘটক এদিক ওদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখতে লাগলেন।

এসে গেলেন তাপস বাবু, এলেন রমেন বাবু। পায়ে পায়ে সকলেই টালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানকার অফিসার বল্ল, আপনাদের কে আত্মীয় ওদের নিয়ে গেছে তা আমরা দেখি নি। আমাদের টি. পি যে ছিল সে বল্ল আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলে ঐ লোকটি আপনার পুত্র-পুত্রবধূকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে বলে গেছেন ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। দেরী হওয়ায় আমরা আপনার গাড়ীর নম্বর দেখে বেলতলা থেকে আপনার ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিয়ে আপনার বাড়ীতে ফোন করেছি। খোঁজ করে দেখুন, আপনাদের লোকই কেউ ওদের নিয়ে গেছে।

ট্যাক্সিওয়ালা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তাপস বাবু তার দিকে চেয়ে শ্বশুরকে বল্লেন, একে ছেড়ে দেব? আমার গাড়ী ত রয়েছে।

ও হ্যাঁ, তোমার কত হয়েছে?

সে দৌড়ে গিয়ে মিটার দেখে এসে বল্ল সাত রুপিয়া ষাট্ পয়সা।

তাপস বাবু পকেট থেকে দশ টাকার নোট একটা বার করে দিলেন। ফেরৎ টাকা পয়সা না দেখেই পকেটে পুরলেন।

এর পর ফাঁড়ির সাহায্যে কতকগুলো ফোন করা হোল বিভিন্ন হাসপাতালে কিন্তু কোথাও কোন খবর পাওয়া গেল না। ওরা সকলেই মুষড়ে পড়লেন।

ঘটক বল্লেন, সব শুনে যা মনে হচ্ছে বউমার কোনো ভাই বোধ হয় নিয়ে গেছে। বউমার বাড়ী সুবোর সঙ্গে ট্রাঙ্ক ফোনের কথায় শুনেছিলুম সাদার্ন এভিনিউ-এ।

তাপসবাবু বলতে গিয়েও প্রথমটা থেমে গেলেন। পরে বল্লেন, আমি যতদূর জানি,—পুনরায় থেমে গেলেন। থানা অফিসার সামনেই রয়েছেন।

তাপসবাবুর কথায় কান না দিয়েই থানা অফিসার বল্লেন, গাড়ীটার কি করবেন। ব্রেক ডাউনকে ফোন করব ?

ও হ্যাঁ, করুন, ঘটক উত্তর দিলেন।

বাদল তাপস বাবুর কানে কানে বল্ল, বৈজুর খবরটা নিলে হয় না, বাঙ্গুর হাসপাতালে। কেমন আছে সে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাপস বাবু থানা অফিসারকে বলতেই তিনি বাঙ্গুরকে ডায়াল করলেন।

এর পর সকলেই তাপস বাবুর গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। ঘটকের নির্দেশ মত রমেন বাবু অফিসে ফিরে গেলেন।

বাড়ী ফিরে ইজি চেয়ারে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লেন মিঃ ঘটক। উপায়ান্তর না পেয়ে তাপস বাবু ফোন করলেন ভদ্রাকে। বল্লেন, গণেশকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে এসো। শীলাকে বলে এস, আমাদের বাড়ী ফেরার আগে যদি রিনি স্কুল থেকে ফেরে তাহলে তাকে যেন শীলারা দেখাশোনা করে।

যে ভদ্রা ছাড়া তাপস বাবুর বুদ্ধিশুদ্ধি খোলে না, সেই ভদ্রাও এসে গেল। এল গণেশ।

ভদ্রা এসে হাটে হাঁড়ি ভাঙল। বল্ল, বাবা, সে মেয়ে অত্যন্ত মিথ্যুক এবং জোচ্চোর। তার বাড়ী মোটেই সাদার্ন এভিনিউ-এ নয়। স্বামীকে সম্বোধন করে বল্ল, বল না, কি দেখে এসেছ বাবাকে বলো।

সব শুনে মিঃ ঘটক জলে পড়লেন। বল্লেন, তা ত হোল, কিন্তু অত যত্ন করে যে নিয়ে গেল সে কি উদ্দেশ্যে নিতে পারে। ওর জিনিসপত্রে তারা হাত দেয় নি, সুটকেসটা পর্যন্ত গাড়ীতে পড়ে আছে। তাহলে কিসের লোভে ওদের নিয়ে গেল!

বাদল বল্ল, দাদাবাবুর ক্যামেরাটা পর্যন্ত গাড়ীর ভিতর পড়ে ছিল, আমি দেখেছি।

মিঃ ঘটক বল্লেন, তাই ত বলছি, কিসের লোভে কে ওদের নিয়ে গেল!

কিছুক্ষণ ভেবে বৃদ্ধ ঘটক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফোনে গিয়ে পর পর তিন চারটে ফোন করলেন। প্রত্যেকের সঙ্গেই সংক্ষেপে কথা হোল। শেষে হতাশ হয়ে ফোন ছাড়লেন। বল্লেন, নাঃ, হোল না।

কি? তাপস বাবু প্রশ্ন করলেন।

ঘটক বল্লেন, আমার পরিচিত এবং সুবোকে ভাল ভাবে চেনে এমন কয়েকজনকে ডাকলুম যদি তারা ওদের নিয়ে গিয়ে থাকে এই ভেবে। কিন্তু না, ওরা কেউই কিছু জানে না।

তাপস বাবু প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না; পরে বল্লেন, চেনা লোক হলে তাঁরাই ফোন করে আমাদের জানাতেন।

তা বটে, ঘটক সায় দিলেন।

শেষে স্থির হোল এ বিষয়ে পুলিসের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাপস বাবু বল্লেন, আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমি বাদলকে নিয়ে লালবাজারে যাই।

বাদলকে কেন, আমিই যাচ্ছি, ঘটক ওঠবার উপক্রম করেন।

জামাই বল্লেন, আপনি বসুন, আমি গেলেই হবে। তবে বাদল প্রথম ওখানে গেছে, স্থানীয় লোকের কথাবার্তা আগে ওই শুনেছে, সেজন্যই ওকে নিয়ে যাব। আপনি বেশী ঘোরাঘুরি করবেন না।

আপনার হার্টের ট্রাবল ছিল, এ অবস্থায় আপনাকে ঘোরাতে চাই না। ভদ্রা আপনার কাছে থাকুক, আমরা যাই।

তাপসবাবু বাদলকে নিয়ে নিজের গাড়ীতে বেরিয়ে গেলেন। প্রফেসার অজিত বসুও টালিগঞ্জের বাড়ী থেকে ডাক্তারের রেডক্রশ মার্কা গাড়ীতে বেরিয়ে গেলেন। তাপস বাবু দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত, অজিত বাবু সাফল্যে লঘুপক্ষ।

মেয়েদের আদৌ বিশ্বাস করতে নেই, কথাটা আর একবার অজিত বাবু মনে করলেন। ঐ ভারতী কোথায় ছিল, আর অজিত বাবু আজ তাকে কোথায় তুলেছেন। অজিত বাবুর সমূহ বিপদে ঐ ভারতীর এই কাজ। এর শাস্তি দিতেই হবে, না হলে পার্টি নষ্ট হবে, যা কিনা অজিত বাবু প্রাণ থাকতেও হতে দিতে পারেন না। তা ছাড়া ঐ প্রসাদকে উপযুক্ত পুরস্কারও দিতে হবে।

প্রসাদ ছেলেটা বাস্তবিকই চমৎকার। হবে নাই বা কেন? বড় ঘরের ছেলে, মেডিকেল কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, যেমন চেহারা তেমনই চালচলন। ওই নিজে স্বেচ্ছায় এ বিষয়ের সমস্ত ভার অজিত বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল।

এতটা যে হয়েছে তা প্রথমে অজিত বাবু কল্পনাও করেন নি। টাকার টানাটানির জন্য সেদিন সন্ধ্যায় মঙ্গলার কাছ থেকে জেনে নিয়ে ছদ্ম-বেশে রাত্রে গিয়েছিল ভারতীদের বাড়ীতে। দরজায় দাঁড়িয়ে মুখের দাড়ী গোঁফ এবং মাথার পরচুল খুলে ভারতীর মাকে ডেকে রাত্তিরটা ভারতীর ঘরেই রয়ে গেল। এভাবে অনেক রাত্রিই সে ও-ঘরে কাটিয়েছে। অবশ্য ভারতী তখন থাকত। এবার একা একাই ও-ঘরে শুয়ে রইল। মাঝরাতে হ্যারিকেনের আলোয় তক্তপোষের তলাকার ট্রাঙ্ক খুলতে গিয়ে ট্রাঙ্কের গা-চাবিটা খোলা দেখে প্রফেসার বোস নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ভেবেছিলেন, সে রাত্রের তাড়াহুড়ায় হয়ত গা-চাবিটা তিনি লাগান নি। এজন্য নিজেকে অপরাধীও ভেবেছিলেন। ট্রাঙ্ক খুলেও ছোট পিস্তলটা যে নেই তা তাঁর নজরে পড়েনি।

বড়গুলো সমস্তই যথাযথ সাজানো আছে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু চম্‌কে উঠলেন তখনই, যখন দেখ্‌লেন নোটের প্যাকেট একটাও নেই। সবগুলো নামিয়ে ভাল করে দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। এর পর দেখলেন, ছোট পিস্তলটা নেই, ওর কার্তুজও নেই। তারপর হ্যারিকেনের আলোয় দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ ঐভাবেই বসে রইলেন, ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে দুটো তালাই ঠিকভাবে লাগিয়ে বিছানাটা পূর্বের মত সাজিয়ে ঘড়ি দেখলেন রাত আড়াইটা। বাকী রাত শুয়ে শুয়ে ভাবিলেন, এর পর কি করা উচিত।

পরের দিন সকালেই প্রসাদের প্রার্থনামত এই কাজের ভার তাকে দিয়েছিলেন। এখন দেখছেন উপযুক্ত হাতেই ভার দেওয়া হয়েছিল।

এই প্রসাদই নিশিকান্ত বসু সেজে খবর এনেছিল যে তারা নাগপুর থেকে প্লেনে আসছে। ভারতী ও সুব্রতর বিবরণ দিয়ে একখানা এ্যামবাসাডর গাড়ীর নম্বর প্লেট বদলে অজিত প্রসাদকে পাঠিয়েছিল এয়ার পোর্টে, সেই সঙ্গে রেডি রেখেছিল ওদের পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী জলিল মহম্মদকে। জলিল লরী নিয়ে যে ভাবে কাজ করবে সেটা অজিত বাবুই প্লান করে দিয়েছিলেন এবং আজ তিনি এতখানি সাফল্যের জন্য নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। ঠিক যেখানে এ্যাক্‌সিডেণ্ট করা উচিত সেইখানেই এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়ে জলিল মহম্মদ উধাও হোল এবং প্রসাদ তার গাড়ীতে ওদের দু'জনকে নিয়ে সরে এল। প্রসাদকে বলা হয়েছিল ওদের জিনিসপত্রও তুলে আনতে, কারণ পিস্তলটা অজিত খোয়াতে রাজী ছিল না। টাকাটাও যতখানি সম্ভব উদ্ধার হওয়া দরকার ছিল। প্রসাদ হাসতে হাসতে বল্ল, বাক্স-টাক্স কিছুই আর নিলুম না অজিতদা, কারণ মিস্‌ সেনকে তুলে আনার সময় হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখলুম ওর পেটের এক ধারে রয়েছে পিস্তল এবং অন্যধারে স্পষ্ট বুঝলুম নোটের বাণ্ডিল। কাজেই বাক্সটা ফেলে রেখে বোনাফাইডিস্‌ দেখিয়ে চলে এসেছি।

পিস্তল ও টাকাটা হস্তগত ক'রে অজিত ওর দিকে হাসিমুখ তুলে

ওকে বাহাবা দিয়েছিল, বলেছিল, পার্টি তোমার এই ভ্যালুয়েবল্ সারভিস্ মনে রাখবে। প্রসাদও অজিতকে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

সেদিন বিকালে ওদের তিনজনের মিটিং ছিল। পার্টির নিয়মে যারা যে কাজে থাকে মাত্র তারাই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কাজ করে। এই ব্যাপারে মিটিং-এ বসলেন অজিত, প্রসাদ ও ডাক্তার। ডাক্তার বল্লেন, সুব্রতবাবুর বিশেষ কিছুই হয় নি, সামান্য কিছু ক্রুয়িজ হয়েছে আর পেয়েছেন একটু শক্। তা এ্যাক্সিডেন্টের ঘণ্টাখানেক পরেই উনি সহজভাবে কথাবার্তা বলেছেন, ওদের কাহিনীও কিছু কিছু বলেছেন। আমার বিশ্বাস উনি কাল সকালের মধ্যেই পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে ভারতী দেবীর জ্ঞান এ বেলাও হয় নি, কখন হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। ওঁর মাথায় এবং ঘাড়ে যে আঘাত লেগেছে সেটা তখনই ফেটাল হতে পারত। তবে এখনও যখন আছেন তখন মনে হয় সেরেই উঠবেন কিন্তু বেশ কিছু সময় লাগবে।

অজিত বল্লে, মিস সেনকে সারিয়ে তোলার জন্য যতটা পারেন চেষ্টা করুন, ওকে আমাদের বিশেষ দরকার।

অজিতের মুখের দিকে চেয়ে মৃদুহাস্যে ডাক্তার বল্লেন, দ্যাট ইজ আওয়ার মিশন প্রফেসার। একটু থেমে বল্লেন, এক সময় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কয়েকজন মৃতপ্রায় আহত সৈনিকের ব্যাপারে তাঁর ডাক্তারকে বলেছিলেন, ওদের নিয়ে টানাটানির দরকার নেই, ওদের শেষ করে দিন। তাতে ডাক্তার বলেছিল, killing may be politicians' profession but saving is doctors' mission.

ওরা তিনজনেই হেসেছিল, কিন্তু অজিত হাসতে হাসতেই ভাবছিল, ডাক্তার এ গল্প এখানে বল্লে কেন? তবে কি ডাক্তার—

পরামর্শ বৈঠকে ডাক্তারের কাজ শেষ হতেই অজিতবাবু সবিনয়ে ডাক্তারকে বিদায় দিলেন। বল্লেন, থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর, আমরা আপনার মূল্যবান সময়ের ওপোর আর এন্‌ক্রোচ্ করতে চাই না।

ডাক্তার ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন, বুঝেছিলেন এর পরেও তাঁর উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়।

ওরা দু'জনে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করেছিল। প্রফেসার বল্লেন, মিঃ ঘটককে তুমি না আনলেও পারতে। মানে ওখানে ওকে না নিলে অসুবিধে হোত ঠিকই, তবে মধ্যে ওকে কোন নিরিবিলি জায়গায় ফেলে দিলেই পারতে।

তা পারতুম, কিন্তু আমার এও মনে হয়েছিল যে আপনি ওর কথা কিছু বলেন নি। ওকে যদি ছেড়ে দিতেই হয় তা হলে পরে আপনিও ছেড়ে দিতে পারেন।

তা পারি, কিন্তু বোঝো ত, কলকাতা সহরের পথঘাট সব জানে ও, আমাদের এখানকার যেটুকু দেখে যাবে তাতে আমাদের ক্ষতি করতে পারে। এখানে না আনাই ভাল ছিল।

প্রসাদ গুম্ হয়ে গেল। নিজের ভুলটা শোধরাবার জন্য বল্ল, ঠিক আছে, ওকে শেষ করে দিলেই হয়।

মুখখানায় বিরক্তি ফুটিয়ে প্রফেসার বল্লেন, বিনা কারণে এ সব করা উচিত নয়। তবে যখন এসেই পড়েছে তখন পার্টির স্বার্থে কিছু একটা করতেই হবে।

আচ্ছা অজিতদা, প্রসাদ যেন নতুন একটা কারণ খুঁজে পেয়েছে। সে বল্ল, অজিতদা, ওর অপরাধ নেই বলছেন কি করে? ও-ই ত ভারতীকে কিড্ন্যাপ করেছিল!

তাতে কি? ও ত পার্টির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে করে নি। এ্যাজ এ্যান ইয়ং ম্যান ও তার ফিয়াঁসেকে নিয়ে সরেছিল। এখনও পর্যন্ত ও জানেও না যে ভারতী পার্টি করে। ও জানে, সে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। তা ছাড়া ভারতীর খরচেই সে গেছে। টাকার যোগাড় সে করতেই পারে নি। সে হিসেবে বলতে পারো, ভারতীই ওকে কিড্ন্যাপ করেছে।

এ সব কথা কে বল্ল আপনাকে?

হাসতে হাসতে অজিত বল্ল, ও-ই বলেছে। ডাক্তারই কথাপ্রসঙ্গে ওর কাছ থেকে এই সব খবর নিয়েছেন। ওর ধারণা তোমার সঙ্গেই ভারতীর বাবা ভারতীর বিয়ের ঠিক করেছিলেন। এতেই বুঝছ, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কি রকম! হাউ সিলি!

একটু থেমে অজিত বল্ল, একবার ভেবেছিলুম, ছেলেটাকে দলে টেনে নেব, কিন্তু ওর কথায় মনে হয়, ও একেবারে অচল মাল। বড় লোকের আদুরে ছেলে যা হয়ে থাকে।

সে কথা বলবেন না অজিতদা, বাবার টাকা থাকলেই ছেলে গোবর-গণেশ হয় না। ক্ষুন্নকণ্ঠে প্রসাদ প্রতিবাদ করে।

প্রেজেণ্ট কম্পানি এক্সেপ্টেড্, কিছু মনে কোরো না প্রসাদ। অজিত নিজেকে সংশোধন করল।

প্রসাদ বল্ল, অজিতদা, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। বড় লোকের ছেলে যখন হাতের মধ্যে এসেই গেছে এবং ওকে দিয়ে কোন কাজই যখন আমাদের হবে না, তখন ওর ধনী বাবার কাছ থেকে ভাল রকম র‍্যানসম্ নিয়ে ওকে ছাড়লে কেমন হয়?

কি দরকার? সে রকম অর্থাভাব ত আমাদের হয় নি। তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে অযথা রিস্ক নিলে আমাদের মূল উদ্দেশ্যের ক্ষতি হবে।

ওকে ছাড়লেও সেই রিস্ক আমাদের নিতে হচ্চে। ওকে যদি না ছাড়েন তা হলে অবশ্য কোন রিস্ক হয় না। প্রসাদ মন্তব্য করে।

অজিত বাবু নীরব। প্রসাদ কাজের ছেলে, কিন্তু সাধারণ ক্যাডার নয়, লীডার হবার যোগ্যতা ওর আছে।

কি বলেন, এ্যাম আই নট্ রাইট্? প্রসাদ প্রশ্ন করে।

এখন না, পরে বলব। অজিত বাবু প্রসাদকে থামিয়ে দেন।

সেদিন প্রসাদ সম্বন্ধে অজিতকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল। প্রসাদ কাজের ছেলে ঠিকই, কিন্তু সে যে কত দিন অজিতের বশীভূত থাকবে সে বিষয়ে অজিতের ঘোরতর সন্দেহ। সে বড়লোকের ছেলে। কলকাতা সহরে তার বাবার বিরাট প্রপার্টি, তার অনেকখানিই পৈতৃক,

কিছুটা তার বাবার স্বোপার্জিত। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার বাবা কৃপণ এবং রক্ষণশীল। প্রসাদ বাবার বড় ছেলে এবং মেধাবী ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্কলারশিপ পেয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। বাবা তার পড়ার জন্য যথেষ্ট খরচ করতেন কিন্তু ছেলে পাছে বিপথে যায় এই ভয়ে নগদ টাকা ছেলের হাতে দিতেন না, তার পোষাক-আসাকও দিতেন অত্যন্ত সাধারণভাবে। এতে প্রসাদের মনে জমত ক্ষোভ কিন্তু বাবার ভয়ে প্রতিবাদ সে করত না। কলেজের বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করত, সে নীরবে গুমরে থাকত, বাবার ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হোত। তারপর বিষয়বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝল, তার বাবা তার কাকাদের ঠকিয়ে ঠাকুরদার সম্পত্তির অধিকাংশই নিজে আত্মসাৎ করেছেন, কাকাদের সঙ্গে বর্তমানে তার বাবার কোন সম্বন্ধও নেই। তার বাবা ইচ্ছে করলেই গাড়ী কিনতে পারেন কিন্তু কেনেন না। তিনি বলেন, গাড়ী কিনবে প্রফেসানাল লোকেরা, তুমি পাস করে বেরুলে গাড়ী কিনে দেব কারণ ডাক্তার, উকীল এদের গাড়ী দরকার, এই গাড়ী দেখিয়ে তাদের ফি বাড়বে, গাড়ীর খরচ গাড়ীই উপার্জ্জন করবে কিন্তু তিনি গাড়ী কিনলে তাঁর শুধু খরচই বাড়বে। বাড়ীওয়ালা গাড়ী কিনলে ভাড়াটে এক পয়সাও বেশী ভাড়া দেবে না, মর্টগেজর এক পয়সাও বেশী সুদ দেবে না, বরং পাড়ার ছেলেরা অল্প চাঁদায় তুষ্ট হবে না। কাজেই গাড়ী তিনি কিনবেন না, বরং বাড়তি টাকায় হাইকোর্টের সেল্ থেকে সস্তায় বাড়ী কিনবেন, সুযোগমত বাড়ী এবং শেয়ার কিনে বেশী দামে বেচবেন। প্রসাদ দেখত, বাবা প্রতি বছর মোটা টাকা ওয়েলথ্ ট্যাক্স দেন কিন্তু সপ্তাহে এক দিনের বেশী দু'দিন মাংস কেনেন না। কাকীমার অসুখে কাকা খরচের জ্বালায় বিব্রত হয়েছেন শোনা সত্ত্বেও বাবা নীরব। শেষ পর্যন্ত প্রসাদ টের পেল যে বাবা ওর বিয়ের জন্য ধনী কন্যার সন্ধান করছেন। সে শুনল, এক ঘটক নাকি সম্বন্ধ এনেছে একটি মেয়ের, যে লেখা-পড়ায় অষ্টরম্ভা, দেখতেও কুৎসিত কিন্তু কয়েক লক্ষ টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। প্রসাদ একেবারে ফেটে পড়ল। সে তার

মায়ের কাছে খোলাখুলি আপত্তি জানালো যদিও সে জানত, বাবার ওপোর মায়ের প্রভাব তেমন কিছুই নেই।

এ বিষয়ে বাবার সঙ্গেও একদিন কথা হোল। সেটা বেশী দিন পূর্বের কথা নয়। মাত্র কয়েকমাস আগে। অগ্রহায়ণের গোড়াতেই বাবা এই বিয়ের দিন স্থির করেছিলেন। প্রসাদ বলেছিল, টাকাটাই কি সব? বাবা বলেছিলেন, সব না হোলেও নাইন্‌টি পারসেণ্ট; বলেছিলেন, বউ থাকবে ঘরে। আমরা ত আজকালকার মতো আপ্‌স্টার্ট নই যে বউ নিয়ে সভা সমিতিতে ঘুরব। নাচিয়ে গাইয়ে পটের বিবি বউ দিয়ে আমাদের কি হবে, তার চেয়ে বনেদি বাড়ী থেকে মা-লক্ষ্মীকে ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। উপদেশের ভঙ্গীতে বলেছিলেন, দিন-কাল কি রকম হচ্ছে তা ত দেখছিস; পাস করার পর কবে কি উপার্জন হবে তার ঠিক নেই, তাই বলছি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি। বাপের একমাত্র মেয়ে, বাপের বয়স হয়েছে, মেয়ের মা'টাও চির-রুগ্ন, ওর ভাই বোন আর কিছু হবার কোন রকম সম্ভাবনা নেই, এ অবস্থায় সমস্ত সম্পত্তিই তোর হাতে আসবে। এখন এই বিয়ের সময় নগদ দেবে ত্রিশ হাজার টাকা, গয়না জিনিসপত্র তাও কোন-না দশ পনের হাজার টাকার হবে, আদর যত্ন যা পাবি তা আমিও কখনও পাইনি; এই বিয়েয় অমত করিস্‌ নি।

সে দিন প্রসাদ বাবার সামনেই মুখ ফুটে বলেছিল, আমাদের ত টাকা-পয়সার অভাব নেই বাবা, আরও চাট্টি বেশী টাকা নিয়ে বেশী বেশী সরকারী টেক্স গুনে কি হবে?

বাবা বলেছিলেন, বলিস্‌ কি রে, টাকা-পয়সা এমন আর কি দেখছিস্‌ আমার? তাও বলি, আমার যা আছে তা আমারই আছে, আমার একার চলছে, তোদের চার ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হোলে কে কতটুকু আর পাবি? তারপর ছুটো আইবুড়ো বোন তোর রয়েছে। তাদের বিয়ের খরচ আছে, তিনটে ছেলের পড়ার খরচ, কত ধানে কত চাল তুই কি বুঝবি রে?

প্রসাদ সত্যই ধান চালের হিসাব বোঝে নি। সে অজিত বোসের দলে এসে ভিড়েছিল। বিয়ে সে করে নি, উল্টে এমন সব বোল্‌চাল্‌ দিয়েছিল যে বাবা তাকে ইদানিং ভয় করতেই সুরু করেছেন। সে জোর করে বাবার কাছ থেকে দু'শো একশ' টাকাও হাত খরচের নামে আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে যে, বাবা তাকে রীতিমত ভয় করছেন। প্রসাদ মনে মনে পুলকিত হয়েছে। বাবার সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে জয়লাভ করে শিক্ষিত ছেলে প্রসাদ বুঝেছে, ধনী বৃদ্ধদের সাজানো তাসের ঘর তারুণ্যের এক ধাক্কায় সহজেই ভূমিসাৎ হয়। এক মাসের ওপোর হোল সে পড়াশোনা একদম ছেড়ে দিয়ে পার্টির কাজে মন প্রাণ সমর্পণ করেছে।

এই অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই তার মন থেকে শ্রদ্ধা, মায়া, মূল্যবোধ সমস্তই চলে গেছে। পার্টির নেতা ও কর্মীদের কাছে সে হামেশাই বলে, মানুষের সব চেয়ে বড়ো শত্রু মোহ। এই মোহ একটা দু'টো নয়, বৃদ্ধশাসিত সমাজ স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থে প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড মোহজাল তৈরি করে সমস্ত উজ্জ্বল তারুণ্যকে সর্ব বিষয়ে আচ্ছন্ন রাখে, নিষ্ক্রিয় করে। ধর্মের ভয়, ভবিষ্যতের ভয়, অকল্যাণের ভয় নানা রকম অমূলক ভয় দেখিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থসর্ব্বস্ব বৃদ্ধের দল। নামকরা লেখক, কবি, বৈজ্ঞানিক সকলেই এই সর্বনাশা মোহজাল সৃষ্টি ক'রে এবং যতক্ষণ না উঠ্‌তি যৌবন বুড়িয়ে কুঁকড়ে আসে ততক্ষণ তাদের ওপোর ছেঁদো কথার মিথ্যা বুকনী, মন-গড়া যুক্তি, অচল শাস্ত্র এবং অনুস্বর বিসর্গর দুর্গন্ধ ভিজে কাঁথা চাপিয়ে তাদের সমস্ত আগুন নিভিয়ে নিজেদের নিরাপদ করার চেষ্টা করে। এই কার্যে ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য থেকে সুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, নেতাজী, গান্ধীজী কেউই কম যান না। এদের এই তথাকথিত আদর্শের ভড়কীতে সমস্ত প্রচলিত অনাচার, সমাজ সম্মত অত্যাচার চিনিমোড়া কুইনাইনের মতো সকলেই মুখ বুজে মেনে নেয়, সহ্য করে।

প্রসাদ বলে, শ্রদ্ধা করা? সুনাম দেওয়া? মারো ঝাড়ু ও সবের মাথায়। আমার বাবাকেও বহু লোক ভক্তি শ্রদ্ধা করে কিন্তু বাবার ভেতরের কথা ত কেউ জানে না। জানলেও মুখ বুজে থাকে। ঐ যে see no evil, hear no evil, speak no evil,—ও সব কি উপদেশ? ও উপদেশ কে নেয় জানো, ও উপদেশ নেয় বাঁদরে, সে জন্যই বাঁদরের মূর্তিতে, বাঁদরের ছবিতে ঐ সব বচনামৃত লেখা থাকে। এমন ধারা একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে আমার বড় মামার টেবিলে। তিনিও ত এক দিগ্‌গজ ব্যক্তি। বাবার মতো অতোখানি হাড়-কিপ্টে না হলেও নিজের কোলে ঝোল টানতে তিনিও কম যান না। বাবা সেই কালোবাজারীর নাম দিয়েছে ব্ল্যাক প্রিন্স। প্রসাদ শুনেছে, সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল থেকেই বড় মামা কালো বাজারে লাখ লাখ টাকা উপায় করেছেন। তার কালোবাজারী কারবার এখনও চলছে। সেই মামাও বৃহৎ ব্যক্তি, কিন্তু তার ভেতরের ব্যবহার, প্রসাদের মতে, নক্কারজনক। সেই মামা ওর বাবাকে বলে 'কাউন্ট অসিমোস্কি'। প্রসাদের বাবার নাম অসীমকৃষ্ণ। সেই থেকে শালা নাম দিয়েছে অসিমোস্কি। বহু সম্পত্তির মালিক বলে কাউন্ট বিশেষণে বিশেষিত করেছে। প্রসাদ দেখে, বাবা ও মামার মধ্যে মৌখিক ভাব আছে প্রচুর কিন্তু মনে মনে দু'জনেই দু'জনকে ঈর্ষা করে এবং সেই ঈর্ষা থেকে ঘৃণাও দু'জনের মনের মধ্যে জমে আছে কম নয়। বাবার মতে মামা 'ব্ল্যাক প্রিন্স', মামার মতে বাবা 'কাউন্ট অসিমোস্কি'।

এই সব থেকেই প্রসাদের ধারণা হতে সুরু হয়েছিল যে সমাজের ওপোর তলায় যারা রয়েছে তাদের সকলেরই এক সত্তা। তারা মিটিং-কা-কাপড়া পরে বাইরে লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করে, তাই লোকে বাহবা দেয়। তাদের আসল মূর্তি বাইরের লোকেরা যেদিন টের পাবে সেদিন তাদের মুণ্ডুগুলো রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে যেমন গিয়েছে ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, চীনে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নামে কোথাও কারুর কাছে কোনো রকম নিন্দাবাদের গুজব শুনলে প্রসাদ আগ্রহে

সেগুলো শোনে ও বিশ্বাস করে, গান্ধীজীর নামে বিরুদ্ধবাদীরা কানা-ঘুষোয় যা বলে সেটাই সে অভ্রান্ত বলে মনে করে এবং সেই সবই সে বন্ধুমহলে প্রচার করে তৃপ্তি পায়। শিক্ষিত ছাত্রমহলে এই সব গুজব ছড়িয়ে একাধিকবার সে অপমানিত হয়েছে, কিন্তু এমনই একটা দল সে এখন পেয়ে গেছে যে-দল এই সব কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ। প্রসাদ খুশি হোল, উল্লাসে ফেটে পড়ল, স্বহস্তে ঐ সব মনীষীদের মর্মর মূর্তিতে আলকাতরা মাখিয়ে দলের ছেলেদের দিয়ে ঐ সব মূর্তি ভেঙ্গে-চুরে ওদের পরিকল্পিত পন্থায় দেশের কাজে নেমে পড়ল। বল্ল, এই ভাবেই আমরা সত্যকে প্রকাশ করব, এই ভাবেই জনগণের মোহমুক্তি ঘটিয়ে তরুণদের প্রকৃত শিক্ষা দেব।

অজিত বোস সমস্তই জানেন। এতটা উগ্র উন্মত্ততা প্রফেসারের ভালো লাগে না, আন্তরিকভাবে এই সব পাগলামির সমর্থন তিনি করেন না, কিন্তু উপায় কি? যে তাল-বেতালকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে তাকে রোখবার ক্ষমতা অজিতদের হাতে আর ছিল না; অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের দাবীতে সায় দিতে হোত, দল রাখতে ওঁরাও হিমসিম খাচ্ছিলেন। অনেক অনেক অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য হচ্ছিলেন পার্টির উপর তলার কর্তারা।

সেই সঙ্গে অজিত বোসের মনের গভীরে একটা বড় গোছের ভয়ও দেখা দিচ্ছিল। মুখে তিনি যতই বলুন না কেন, আমাদের পার্টিতে কেউ বড়ো নেই, আমরা সবাই সমান, আজ আমি লীডার, কাল তুমি লীডার, যে যেমন কাজ করবে সে তেমনই অধিকার পাবে, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি কর্তৃত্ব ছাড়তে ত চানই না, বরং আরও, আরও বেশী সংখ্যক লোকের ওপোর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যই তাঁর আকুলি-বিকুলি। প্রসাদ যেদিন মুখ ফুটে বলেছিল, সিনিয়রিটির মোহ না ভাঙলে কল-কারখানায়, অফিসে, ল্যাবরেটরীতে অশান্তি ঘুচবে না, একজন দশ বছর কাজ করছে এই অধিকারে তার চেয়েও কৃতী নবাগতকে তার অধীনেই পড়ে থাকতে হবে কেন, সেদিন অজিত বাবুও চমকে

উঠেছিলেন। প্রসাদ বলেছিল, এই যে আপনি আমার চেয়ে কয়েক বছর আগে জন্মেছেন এতে আপনার কোন কৃতিত্ব নেই। আপনার মূল্যায়ন আপনার বর্তমান কর্মশক্তি দিয়ে। কোন কালে কি করেছেন সেই গল্প শুনে আমাদের বর্তমানটা চলবে না, উপস্থিত কি শক্তি আপনার আছে তাই দিয়ে বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে আপনার স্থান নির্ণয় হবে। সেই কর্মশক্তি যদি একটা স্কুলের ছেলের আপনার চেয়েও বেশী থাকে তাহলে সেই ছেলেটাকেই আপনার মেনে চলতে হবে, কমরেড্, কথাটার এই হচ্ছে প্রকৃত তাৎপর্য। সেদিন প্রফেসার বসু প্রসাদের কথায় সায় দিয়েছিলেন বটে কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গনেছিলেন। সেদিন থেকে তাকে আর সহযোগী বলে ভাবতে পারেন নি, প্রতিযোগী বলেই ভেবেছিলেন এবং শক্ত শক্ত কাজগুলো তাকে দিয়ে করিয়ে একদিন নিঃশব্দে তাকে সরিয়ে দেবার কথাও ভেবেছিলেন। সেদিন অজিত বসুর মানসপটে ইতিহাসের একটা শিক্ষা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। সাহাজাদা খুরম বড় ভাই খসরুকে অন্ধ করিয়ে শেষে হত্যা করেছিল কিন্তু সেই খুরম বাদশা হয়ে স্বয়ং বৃদ্ধ বয়সে নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে বন্দী হয়েছিলেন; নিজের সব চেয়ে প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্রের ছিন্নমুণ্ড ঐ কনিষ্ঠ-পুত্রের কাছ থেকেই উপহার পেয়েছিলেন। রুশিয়া নামক সাম্যবাদী দেশে ওপোর মহলের নেতাদের মধ্যে এ রকম ভাবে প্রতিযোগীদের পথ থেকে হটিয়ে দেবার কাহিনী একটা দুটো নয়, অজস্র। অজিত বাবুর এক একবার মনে হয়, তবে কি তাঁরা আবার সেই জাঙ্গল্ ল-কেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করছেন। সেই মাৎস্যন্যায়, যেখানে ছেলে বাপকে মানবে না, সিনিয়রকে জুনিয়ার অপমান করবে, হাতে ধরে আজ যাকে শেখালুম কাল সেই শিষ্যের গুরুমারা বিদ্যে হবে! অজিত বাবু যত দিন জুনিয়ার ছিলেন তত দিন এ সব চিন্তা তাঁর মনেও আসে নি কিন্তু যেমনই তাঁর কাছে একজন উপযুক্ত জুনিয়ারের আবির্ভাব হোল তখনই অজিত বাবুর চিন্তাধারা এই সব নতুন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল।

তিনি স্থির করলেন, পার্টির আসল শক্তি যে রসদ সেই রসদ

অর্থাৎ টাকার যোগান কোথা থেকে আসছে সেটা প্রসাদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে, ঐ মিশনারী-বেশী সাহেবের সঙ্গে প্রসাদের যাতে কোন রকম যোগাযোগ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে; অস্ত্রের আমদানী উৎস প্রসাদ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় এবং সেই সঙ্গে সব চেয়ে কঠোর ও বিপজ্জনক কাজের ভার ঐ প্রসাদকেই দিতে হবে যার ফলে সে হয়ত কোনোদিন নিজে থেকেই ফেঁসে গিয়ে অজিতকে নিষ্কৃতি দেবে। তাও যদি না হয় তাহলে পরে যা হোক দেখা যাবে।

প্রসাদ বলে, অজিতদা, একটা খবর পেয়েছি, বেশ কিছু স্মল আর্মস্ বসিরহাট বর্ডারে পাওয়া যেতে পারে। বেশী দাম নয়, পিস্ একশ' টাকা হিসেবে।

কে দেবে? কতগুলো?

কম নয়, দেড়শো'র মতন। ওদের ট্রান্সপোর্টে দশ মাইল ভেতরে এনে ডেলিভারী দিলে পার্ পিস আরও পঁচিশ বেশী দিতে হবে। আমার মনে হয় সেটাই ভাল, সব রিস্ক্ তাদের, আমরা দশ মাইল ভেতরে বসে নগদ দাম দিয়ে ডেলিভারী নেব।

কে বলেছে এ কথা?

সে আমি বলতে পারবো না অজিতদা, আমি প্রমিস্-বাউণ্ড। এটা আপনি আমার ওপোর ভার দিন। বিশ্বাস করে টাকাটা আমার হাতে ছাড়ুন,— আমি আপনার ভারতী সেন নই।

ছেলেটা হাল্কা হাসি হাসতে লাগল।

অন্য সময় এই খবর পেলে অজিত বাবু নেচে উঠতেন, কিন্তু আজ প্রসাদের দেওয়া এ রকম একটা প্রস্তাবে তিনি ভীত হলেন, ক্ষুণ্ণ হলেন ওর কথায়। অজিতকেও সোর্স জানাতে ছেলেটার আপত্তি। মনে মনে বল্লেন, নম্বর ওয়ান স্কাউণ্ড্রেল, নম্বর ওয়ান ট্রেটার।

মুখে বল্লেন, দেড়শ পিস একশ পঁচিশ দরে? রাউণ্ডস্ দেবে না?

দেবে, নেক্সট লটে। দশ হাজার রাউণ্ড ওদের হাতে আছে।

দেড়শ পিস্ সবই এক সাইজের ?

হ্যাঁ অজিতদা, এক বোর, এক মেকার, একই মডেল।

কি ভাবে আস্‌বে ?

চার পাঁচ লরী খড় আসবে বর্ডারের ওদিক থেকে। তারই মধ্যে ওরা পাঠাবে। আমি বলেছি, বসিরহাটে খড়ের সঙ্গে ওগুলোর ডেলিভারী নেবে মণ্ডলরা, বিষ্ণু বাবুর ছেলে নারাণ মণ্ডল সমস্ত ব্যবস্থা করবে।

এতদূর! আমাকে না জানিয়ে তলে তলে এতদূর এগিয়েছে! অজিত বাবু মনে মনে কথাগুলো বলেছিলেন। মুখে আগ্রহ দেখিয়ে সুচিন্তিতভাবে বল্লেন, প্রস্তাব ত খুবই লোভনীয় হে, কিন্তু টাকা যে অনেক! দেড়শ পিস একশ পঁচিশ দরে হোল তোমার আঠার হাজার সাড়ে সাতশ,—তারপর রাউণ্ডসের দাম কত ?

সেও ধরুন দশ হাজারে কোন-না হাজার পাঁচেক টাকা।

তবে ? চিন্তা এবং আগ্রহ ছুটোই নিজের দৃষ্টিতে ফুটিয়ে প্রফেসার বল্লেন, কবে চাই ?

আগামী কুড়ি তারিখের মধ্যে।

মানে দশ দিনের মধ্যে। প্রফেসার বল্লেন, ডীল্‌টা খুবই সুবিধার বটে, কিন্তু টাকার যোগাড় যে নেই! দেখি কি করা যায়।

কিন্তু আমি যে ওদের কথা দিয়ে ফেলেছি! কথার খেলাপ হলে ভবিষ্যতে কোন সাহায্যই ওদের কাছে আর পাবো না, প্রসাদের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

সে ত আমিও বুঝি প্রসাদ, কিন্তু হাতে আমার বিশেষ কিছুই নেই। কাল সকালে যোগাযোগ করে দেখি—

চিন্তিত মুখে প্রসাদ চলে গেল। অজিত বাবু সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলেন, মালগুলো নেওয়া অবশ্য খুবই দরকার কিন্তু এতে যে প্রসাদ আরও তিলিয়ে উঠবে, তার কি ? বসিরহাটের নারাণ মণ্ডলকে ডেকে পাঠাব না কি ? কিন্তু সে ত হয় না, পার্টির নিয়ম নয় এই ভাবে অন্যের কাজে নাক গলানো। এতে নারাণ যাবে বিগড়ে, আর—

কি কুক্ষণেই নারাণের সঙ্গে প্রসাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম! নাঃ, প্রসাদটা বড্ড বেড়েছে। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া শুরু করেছে! ওর কি উচিত ছিল না, এত বড় একটা ব্যাপারে নারাণকে আমার কাছে এনে একসঙ্গে বসে কথা বলা। স্বাধীন ভাবে এত বড় একটা কাজ করার অধিকার ত ওকে দেওয়া হয় নি।

কিন্তু এ সব কথা জোর করে প্রসাদকে বলার সাহস প্রফেসার বোস পাচ্ছিলেন না। ওটাকে হাতে রাখাই দরকার, কিন্তু হাতের চেয়ে আম যে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। এর পর যখন সে একেবারেই প্রফেসারকে হুট-আউট করে দেবে! শেষে মনে মনে ঠিক করলেন, টাকা ওকে কোনো মতেই দেওয়া হবে না। বেশ কায়দা করে ছেলেটাকে নিরস্ত করতে হবে।

পরের দিনে সেই কথাই প্রফেসার বলেছিলেন প্রসাদকে।

প্রসাদ স্থির ভাবে শুনেছিল। বোধ হয় যেন এই কথাই শুনবে বলে তৈরি হয়ে এসেছিল। শান্ত কণ্ঠে বল্ল, তাহলে ঐ টাকাটা উপায় করার ভার দিন আমার ওপোর।

কি করে? কোথায় পাবে? বাড়ী থেকে আনবে?

না অজিতদা, বাড়ীর ওপোর চাপ এখন দেব না। এখনও বাড়ী থেকেই যাতায়াত করছি। তা ছাড়া বাড়ীরটা হাতের পাঁচ থাকুক। আমি বলি কি, মিঃ ঘটকের বাবার কাছ থেকে র‍্যান্‌সম্ আদায় করি।

না, সেটা ভাল নয়, প্রফেসার বোসের কাটা জবাব।

কেন ভাল নয়? যে দেশের লোকের গড় আয় বছরে দু'শো আটষট্টি টাকা সে দেশের একজন যদি বছর-বছর লাখ-লাখ টাকা উপার্জন করে তা হলে বলতে হবে সে লোক রক্ত-চোষা। রক্তশোষী মশা-ছারপোকাদের মারতে যদি আপত্তি না থাকে তা হলে ঐ সব ধনীদের—। তা ছাড়া আমি ত মারতে চাচ্চি না। আমাদেরই বুক থেকে যে রক্ত ওরা শোষণ করেছে সেই রক্তের কিছু অংশ দেশের জন্য আমরা বার করে নিচ্চি। এতে দোষ কোথায়?

দোষের কথা হচ্চে না প্রসাদ, অজিত বাবু গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্লেন, এ হচ্চে স্ট্র্যাটেজীর কথা। টাকা আমার হাতে এ সময়ে না থাকলেও টাকা আমাদের দলের হাতে আছে, সে টাকা কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এ অবস্থায় এমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে পার্টির যদি কোন ক্ষতি হয়, কিম্বা ধরো এই ম্যাটারে যদি তোমার মতো একজন পার্টি-জুয়েলকে কিছুদিনের জন্যও জড়িয়ে পড়তে হয় তা হলে সেই ক্ষতি পূরণ করবে কে? ওর মধ্যে যেও না।

পার্টি-জুয়েল কথাটা অজিত বাবু ইচ্ছে করেই বলেছিলেন। ওটা ওঁর মন-রাখা কথা, কিন্তু ওতে ফল তেমন হোল না, কারণ কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রসাদ বল্ল, ঠিক আছে। আপনিই ব্যবস্থা করুন, তবে আর একবার বলছি অজিতদা, সময়মতন টাকাটা না পেলে বসির-হাটের সমস্ত সাপোর্ট আমরা হারাব, বিশেষ করে মণ্ডল বাড়ীতে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।

এই বলেই প্রসাদ চলে গিয়াছিল। ওর যাবার ভঙ্গীতে যে উদ্ধত বিরোধী ভাবটা ফুটে উঠেছিল সেটা প্রফেসার লক্ষ্য করে বিশেষ ভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন। শেষে ভাবলেন, না, ওকে আর বাড়তে দেওয়া কোন মতেই উচিত হবে না। ছেলেটা প্রশংসাতেও ভেজে না। সাঙ্ঘাতিক!

কিন্তু কি করা যায়? তবে কি সুব্রত ঘটককে চুপিসাড়ে ছেড়ে দেব, পরে বলব পালিয়েছে? সে কাজটা অবশ্য ভাল হবে না, কিন্তু যে করেই হোক প্রসাদের টাকা পাবার পথ বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া ভারতীদের বাড়ীতে যেগুলো পড়ে আছে সেগুলো—

ভেবে চিন্তে অজিত ঠিক করল, ওগুলো আর ওখানে রেখে দরকার নেই। ও বাড়ীর কাজ ফুরিয়েছে। একসঙ্গে অতগুলো জিনিস রাখাও ঠিক নয়। অথচ এখানেও ওগুলো রাখা যায় না। অজিতের মাথার ওপোর খাঁড়া ঝুলছে। ছাব্বিশ তারিখে ওর দিন। যদিও জামিনে আছে এবং কলেজের অধ্যাপক হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট খাতির করে পি আর

বণ্ড দিয়েছেন তা হলেও কোথা থেকে কে কি সাক্ষ্য দেবে, যারা আটক আছে তারা পুলিসের মারের চোটে কি বলে বসবে তার ঠিক নেই। সে যাই হোক, ওগুলোকে ওখান থেকে সরাতেই হবে। কয়েকটা ডাক্তারের বাড়ীতে রাখা যায়, বাকীগুলো কয়েকটা সেণ্টারে একটা একটা করে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। মঙ্গলাকে দিয়ে ওগুলো আনিয়ে নিতে হবে। এ জন্য ভারতীর মাকে খরচ বলে মঙ্গলার হাত দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও পাঠাতে হবে, কিন্তু এতগুলো টাকা ভারতী কি করল? কম নয়, পুরো পাঁচ হাজার টাকা। সুব্রত স্বীকার করেছে যে ভারতীই ওকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল, তা থেকে ও খরচ করেছে মাত্র ন'শ, চার হাজার একশ' ওর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। ভারতীর কোমরের গেঁজে থেকে পাওয়া গেছে ছ'হাজার, তা হলে বাকী পাঁচ হাজার কোথায় গেল! মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে ওটাকে জিজ্ঞাসা করা যেত, কিন্তু চার দিন হয়ে গেল এখনও ওর হুঁস হোল না। আদৌ হবে কি না কে জানে! ঐ টাকাটা নিশ্চয়ই কোথাও সরিয়েছে ও। মাকে দেয় নি, দিলে তাদের অত অভাব থাকত না। টাকা আর সিফিলিস, এ দু'টো কখনও চাপা থাকে না, ফুটে বেরুবেই। সাত পাঁচ ভেবে অজিত বাবু সেই দিনেই মঙ্গলা ও রিক্সাওয়ালাকে পাঠাল সেই বাক্স আর বিছানা ফিরিয়ে আনতে।

পরের দিনেই প্রসাদ এল। বল্ল, অজিতদা, আমার ব্যবস্থা কিছু হোল?

স্পর্ধা দেখো ছেলেটার! অজিত বাবু মনে মনে বলেছিলেন। ছেলেটা বলে কিনা আমার ব্যবস্থা কিছু হোল? 'আমার', 'আমাদের' নয়। উনি যেন নিজেই সব? এখনই এই!

নিজেকে সামলে নিয়ে অজিত বাবু বল্লেন, না ভাই, কিছু হয় নি এখনও, তবে আশা আমি ছাড়ি নি। আরও দু'এক দিন সবুর করতে হবে।

এই চিঠিটা দেখুন ত, ছাড়তে পারি কি না। জি পি ও থেকে পোস্ট করতে চাই।

চিঠিটা হাতে নিয়ে অজিত বাবু দেখলেন। পরিষ্কার কাগজে টাইপ করা চিঠি, বি. ঘটকের নামে লেখা। লিখছে সুব্রত ঘটক। ছেলে বাপকে জানাচ্ছে যে, সে ভাল আছে, কিন্তু এক লক্ষ টাকা নগদ না পেলে তার জীবন-সংশয়। আগামী ষোল তারিখে হাজারখানা একশ টাকার নোট একটা ছোট প্যাকেটে ভরে রেড্ রোডের অমুক পয়েণ্টে ফেলে গেলে সাতেবো তারিখে সে মুক্তি পাবে, না হলে তার জীবনের আশা নেই। এই খবর পুলিশে জানানো হলে তার অবধারিত মৃত্যু, কারণ যে দলেব হাতে সে পড়েছে তাদের জাল ছড়ানো আছে সর্ব স্তরে। পুলিসে জানানো মাত্রই তারা টেব পাবে, ইত্যাদি।

চিঠিখানা মন দিয়ে পড়ে অজিত বল্ল, কোন মেশিনে টাইপ করা হয়েছে? এর টি অক্ষরটা মাথার দিকে ক্ষয়ে গেছে।

প্রসাদ বল্ল, এ কাগজটা পাঠানো হবে না। আপনি এ্যাপ্রুভ করলে এটাই সুব্রতকে দিয়ে হাতে লিখিয়ে পাঠাব।

আট-ঘাট বেঁধেই চলতে জানে, মনে মনে বলেছিলেন অজিত বাবু। মুখে বল্লেন, ঠিক আছে কিন্তু—

কিন্তু কি অজিতদা?

'কিন্তু' আছে দুটো, অজিত বাবু বল্লেন,—প্রথমত টাকাটা রেড রোড থেকে কলেক্ট করবে কে, আর দ্বিতীয়ত সুব্রতকে কি সত্যিই ছাড়া হবে?

প্রসাদ জোর দিয়ে বল্ল, কলেক্ট করব আমি, তবে ওকে ছাড়া হবে কি হবে না, সে আপনি ঠিক করবেন। ছাড়া না হোলে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য আপনি টাকা যখন পাবেন তখন এক লাখ টাকার একটা প্যাকেট ইচ্ছে করলে ফেরৎও পাঠাতে পারেন।

সে অবস্থায় ফেরৎ দিতে কে যাবে?

আমি যাব, সগর্বে উত্তর দিল প্রসাদ।

ঠিক আছে, পাঠাও চিঠি, কিন্তু যদি কোথাও কোন রকম বানচাল হয় তাহলে সব কিছু গোপন রাখতে পারবে ত?

নিশ্চয়ই।

কি বলবে?

বলব, বাবার কাছে টাকা পাই না, অথচ আমার টাকার দরকার, তাই যেম্‌নি খবর পেলুম সুব্রত বাবু বাড়ীতে এমনই একটা চিঠি লিখেছেন তখনই স্থির করলুম ঐ টাকা আমি ঐ সময় রেড রোড থেকে কুড়িয়ে নেব। তাই কুড়িয়ে নিতে এসেছি। আবার ফেরৎ দেবার সময় ধরা পড়লে বলব, ক'দিন থেকে বিবেকের দংশনে অতিষ্ঠ হয়ে ফেরৎ দিতে যাচ্ছি। ধরা পড়লে বাবা নিশ্চয়ই ভালো কাউন্সিল লাগাবেন। সেই কাউন্সিল বলবে, বড় ঘরের ভাল ছেলে, ছোট কাজ করার চেষ্টা করলেও করতে পারে না। হয়ত বেকসুর খালাসও হতে পারে।

তা ত বুঝলুম, কিন্তু যখন প্রশ্ন হবে, সুব্রত বাবু এ রকম একটা চিঠি লিখেছেন, তুমি জানলে কি করে, তখন কি উত্তর দেবে?

হাসিমুখে প্রসাদ বল্ল, তাও ভেবে রেখেছি অজিতদা। বলব, মিঃ বি. ঘটক তাঁর জামাইকে এই চিঠির কথা ফোনে বল্‌ছিলেন। ক্রশ-কানেক্‌শন হয়ে আমার বাড়ীর ফোন থেকেই খবরটা পেয়েছিলুম।

কবে? কখন?

সেটা বুঝে-সুঝে ভেবে নেব। চিঠিটা পাঠাবার পরে ঐ সব তারিখ ঠিক করে রাখব।

ছোকরায় এলেম্ আছে, মনে মনে ভাবলেন প্রফেসার অজিত। পার্টির ছেলে এই রকম এলেমদার হোলে পার্টি লীডার খুসি হন, অজিত বাবুও হতেন, কিন্তু যেদিন থেকে প্রসাদকে প্রতিযোগী ভাবতে সুরু করেছেন সেদিন থেকে প্রসাদের কোন কৃতিত্বই সহ্য করতে পারছিলেন না। যে নেতা সব সময় সকলের কাছেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে থাকেন তিনি পার্টির জন্য নিজের সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় হাসিমুখে

ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেই তিনিই আজ তাঁরই উপযুক্ত সাগরেদের কৃতিত্বে নিজের কর্তৃত্ব হারাবার আশঙ্কায় পার্টির সমূহ ক্ষতি করেও সাগরেদের বিরুদ্ধে হিংস্র হওয়াটা অন্যায় বলে মনে করলেন না। কর্মীর কর্মকুশলতা কি নেতার মনে হীনমন্যতার সূচনা করেছে! অবশ্য একথা ঠিক যে, এখনও পর্যন্ত প্রসাদের আচরণে বিদ্রোহের কোন আভাস নেই; হয়ত প্রসাদ অধ্যাপকের ক্ষতি করার কথাও ভাবছে না, কিন্তু কর্মী সম্বন্ধে নেতার মনে সন্দেহ ঢুকেছে। এই সন্দেহ-দাম্পত্যজীবন থেকে আরম্ভ করে সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে পারস্পরিক সম্বন্ধকে বিষিয়ে তোলে। ধুরন্ধর অজিত বাবু বোধ হয় সেই ভুলই করেছেন। তাঁর সন্দিগ্ধ মন কৃতী সহকর্মীকে শেষ পর্যন্ত শত্রুতেই পরিণত করছে!

(পনের)

ক'দিন পরে নার্সিং হোমে গিয়ে বি ঘটকের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন সেট্ব্যাক্ করেছে। অনুপমা শুয়ে আছে ঘুমের মতো হয়ে। হোমের ডাক্তার বল্লেন, এটা আজ সকাল থেকেই হয়েছে, কোমাটিক স্টেজ। আপনি ক'দিন আসেন নি। আজ দুপুরেও আপনাকে ফোনে পেলুম না। আমি নিজে থেকেই ডাঃ চ্যাটার্জীকে কিছু আগে কল্ দিয়েছি। তিনি পাঁচটার সময় আসবেন। বসুন, তাঁর সঙ্গে কনসাল্ট করব, বিশেষ দরকার।

ঘটক বসলেন এবং ডাঃ চাটার্জীও এলেন। রোগী দেখে ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদি সব কিছুই পরীক্ষার ফিরিস্তি দিলেন এবং সেই সঙ্গে আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে খবর দিতেও বল্লেন। ডাক্তার চলে যাবার পর ডাক্তারের ফি, পরীক্ষাদির খরচ এবং নার্সিং হোমের এক সপ্তাহের চার্জ সর্বসমেত সাড়ে আটশো টাকার এক চেক লিখে মিঃ ঘটক ওখান থেকেই ফোন করলেন লুম্বিনী পার্কে। সেখানেও নতুন কোন খবর নেই। যথাপূর্বং। সেই সঙ্গে আগামী মাসের চার্জ এবং চিকিৎসা বাবদ খরচগুলো সত্বর পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ তারা জানিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে গিয়ে তাদেরও একটা মাঝারি গোছের চেক দিতে হয়েছিল। খোকার সঙ্গে দেখা করতে সাহস পান নি, কারণ এর আগে যেদিন গিয়েছিলেন সেদিন খোকার সঙ্গে দেখা করতেই সে অস্বাভাবিক রকম ক্ষেপে গিয়েছিল। ওখানকার ডাক্তাররা বলেছিলেন, আপনার অ্যাপিয়ারেন্সটা ওর কাছে প্রোভোকেটিভ্। বেশ কিছুকাল ওর সঙ্গে দেখা না করাই পেসেন্টের পক্ষে ভাল। ইচ্ছে হয় আড়াল থেকে দেখতে পারেন, সামনে যাবেন

না। লুকিয়ে ঘুষ দেবার মতই মিঃ বি ঘটক তাঁর লুকানো ছেলের জন্য লুকিয়ে ঘুষ দিলেন। লুকানো স্ত্রীর জন্য লুকিয়ে বাড়ীও কিনেছেন।

অবসাদ, বিরক্তি ও হতাশা নিয়ে সেই সন্ধ্যায় ট্যাক্সিতে ঘটক বাড়ী ফিরলেন। নিজের গাড়ী তাঁর এখনও মেরামত হয়ে ফেরে নি, তাঁর প্রিয় ড্রাইভার বৈজুও বাঙ্গুর হাসপাতালে পড়ে আছে। তার দৈনন্দিন খোঁজ খবর নেবার ভার দিয়েছেন বাদলের ওপোর। ঘটক সাহেব কালই শুনেছেন বৈজু সেরে উঠছে, হয়ত দু'এক দিনের মধ্যেই বাড়ী আসতে পারবে। এই একটিমাত্র সংবাদই আশাপ্রদ, মন্দের ভালো।

সুবোটার কি হোল কোনও খবরই নেই। তাপস তার যথাসাধ্য করছে। পুলিসের সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগাযোগ ছাড়াও সে পরশু থেকে প্রাইভেট ডিটেক্টিভের সন্ধানে আছে। এ রকম দু'জনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে কিন্তু কাউকেই তার পছন্দ হয় নি। আর প্রাইভেট ডিটেক্টিভ করবেই বা কি? ঘটক সাহেব কোথাও কোনো আলো দেখতে পাচ্ছেন না।

নিয়মিত কাজগুলো সেরে রাত্রি আটটা নাগাদ মিঃ ঘটক বাড়ীর অফিস ঘরে বসলেন চিঠিপত্র দেখতে। আজকের ডাকে খান পাঁচেক চিঠি এসেছে। মিঃ ঘটকের স্থায়ী নির্দেশমতো বাদল প্রতিদিনের সমস্ত চিঠি যথারীতি চিঠির ট্রেতে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখেছিল। ঘটক সাহেব পেপার ওয়েট সরিয়ে চিঠিগুলো হাতে নিয়ে খোলবার আগে সবগুলো খামে চোখ বুলোতে গিয়ে একখানা খাম দেখেই চমকে উঠলেন। তাঁর হাত কাঁপতে লাগল। খামের ওপোর সুবোর হাতের লেখায় তাঁরই নাম ঠিকানা! কি ভাবে কত তাড়াতাড়ি যে খামটা ছিঁড়েছিলেন তা তাঁর মনেও পড়ে না। ছিঁড়েই কাগজটা চোখের সামনে ধরে এক নিশ্বাসে আগাগোড়া পড়ে ফেল্লেন। তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ তিনি নিজেই শুনতে পেলেন। চোখ অন্ধকার হয়ে এল। চেয়ারের পেছনে মাথাটা ঠেকিয়ে নির্জীবের মতো বসে রইলেন। কখন যে চিঠিখানা হাত থেকে খসে

কোলের ওপোর পড়েছে তা তিনি বুঝতেও পারলেন না। ব্যবসাসূত্রে হাজারো রকম জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন বহুবার; কিন্তু এ অবস্থা তাঁর কোনো দিনও হয় নি, আজ কি এখনই তাঁর হার্ট ফেল করবে! এ পর্যন্ত তিনি সজ্ঞানেই ভেবেছিলেন, তারপর সমস্ত অন্ধকার।

বাদলের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। ঘঠক বল্লেন, উঁ।

কাছে দাঁড়িয়ে বাদল বল্ল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

ঘটক ওর দিকে চেয়েছিলেন, উদাস শূন্য দৃষ্টি। বাদল পুনরায় প্রশ্ন করে।

জোর করে নিজের অবসাদ ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাত পা থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। ঠোঁট, জিভ, গলা সমস্ত শুকিয়ে কাঠ। বল্লেন, একটু জল দে।

জল খেয়ে বড় গোছের নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসে এদিক ওদিক চেয়ে নিজেই হুম্‌ড়ি খেয়ে চেয়ারের তলা থেকে চিঠিখানা তুলে বাদলকে বল্লেন, এ চিঠি কখন এল?

বাদল বল্ল, এটা, মানে—

টেবিলের ওপোর পড়ে-থাকা খামটা দেখিয়ে বাদল প্রশ্ন করে, এইটার কথা বলছেন?

করুণকণ্ঠে ঘটক বল্লেন, হ্যাঁ।

আজ দুপুরেই এসেছে। বেলা তিনটের ডাকে। এই পাঁচখানাই পিয়ন একসঙ্গে দিয়ে গেছে।

ঘটককে নীরব দেখে বাদল বল্ল, কোন খারাপ খবর আছে না কি? দাদাবাবুর কোন খবর, কিম্বা দেশের—

আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে ঘটক বল্লেন, না, কিছু না।

খামটা হাতে নিয়ে ডাকঘরের ছাপটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন মিঃ ঘটক।

পরদার ওপাশে কারা যেন দাঁড়িয়েছিল। তাদের পা দেখে ঘটক বল্লেন, ওখানে কে?

বাদল বল্ল, ঠাকুর বোধ হয়। আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।

আমি আজ কিছু খাব না, তোরা খেয়ে নি গে যা।

কেন? আপনার,—ডাক্তারকে ফোন্ করব? ভীতকণ্ঠে বাদলের প্রশ্ন।

না রে না। তুই যা। ঘটক সাহেব সোজা ও সহজ হয়ে বসলেন।

তা হলে আজ খাবেন না কেন? ধীরে ধীরে বাদল বলেছিল।

না। যা বলছি তাই শোন্, ঘটকের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ও উত্তেজনা, তুই যা।

কিছুটা পিছু হটেই বাদল ঘব থেকে বেরিয়ে এল। পর্দার বাইরে ছিল ঠাকুর ও চাকু। ওরা দু'জনেই ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

জানি না, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বাদল উত্তর দিল। সে ভাবছিল, বাবু কোনো দিনই কড়া কথা বলেন না, আর আজ কি এমন হোল যে এই ভাবে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। তাব ওপোর চারিটাও বাইরে থেকে তার এই হেনস্তাটা স্বচক্ষে দেখল।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বাদল ভাবল, সে ত অন্যায় কিছু করে নি। তা হলে যত নষ্টের গোড়া ঐ চিঠিটা। কার চিঠি, কে লিখল, কি আছে ওতে? বাদল মনে মনেই ভাবতে লাগল।

এর পরেই বাদল শুনতে পেল বাবুর কণ্ঠস্বর। বলছেন, হ্যাঁ, ভাল আছি। তাপসকে দে। বাদল বুঝল, বাবু জামাইকে ফোন করছেন। সে উৎকর্ণ হোল।

বাবু বল্লেন, তাপস, তুমি কি এখন আসতে পারবে? অসুবিধে হয় ত বলো, আমি যেতে পারি।

তারপরই বল্লেন, ফোনে হবে না, ব্যাপারটা জটিল ও জরুরী।

কিছু পরে বল্লেন, রাত্রেই কথা বলতে চাই। আমিই যাচ্ছি।

আবার বল্লেন, আচ্ছা, কিন্তু একলা আসবে, আর কাউকে এনো না।

ফোন ছেড়ে দিলেন, সে শব্দও বাদল বাইরে থেকে পেল।

পরক্ষণেই বাবুর ঘরের ঘণ্টা বাজল। বাদল গিয়ে ঘরে ঢুকল।

বাবু বল্লেন, বাদল, গেটে চাবি দিয়েছিস্ ?

না, এইবার দেব।

দিস্ নি, তাপস আসবে। বাইরে থাকিস্।

এখন এই রাত্রে ?

হ্যাঁ, এলেই এঘরে নিয়ে আসবি। এখন যা।

দিদিমণি জামাইদার খাবার বন্দোবস্ত,—থেমে থেমে বাদল প্রশ্ন করেছিল।

না, ঘটক উত্তর দিলেন। পরে বল্লেন, তাপস একা আসবে, তার জন্যে রাখতে পারিস কিছু।

বাদল ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জামাই বাবু এলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে শ্বশুর জামাই অনেকক্ষণ ঘরে রইলেন। বাদল, ঠাকুর, চারু সকলেই কানাকানি করেছিল। এ রকমটা কখনও হয় না। ঘরের দরজায় পরদাই ঝোলে কিন্তু এ ভাবে দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে হুড়কো দেওয়া কখনও হয় না। কোন লোককে নিয়েই বাবু দরজা বন্ধ করে পরামর্শ করেন না। আজকের ব্যাপারটা কি—

ঠাকুর, চাকর, ঝি ওরা কানাকানিই করে, কেউ কিছু বোঝে না।

জামাই বাবু ঘর থেকে বেরুতেই বাদল তার কাছে গিয়ে বলেছিল, দিদি, রিনি, ওরা কেমন আছেন জামাইদা ?

ভাল, জামাই বাবু সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন।

আপনার খাবার দি ?

না, খেয়ে এসেছি, বলেই তাপস বাইরের দিকে এগিয়ে পড়ল।

বাদল জামাই বাবুর সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল। জামাই বাবু একটিও কথা না বোলে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাদল দাঁড়িয়ে রইল।

ঘটক সাহেব ধীর গতিতে ওপোরে উঠে নিজের ঘরে গেলেন। ঠাকুরমা চাকুর কাছে জামাইয়ের আসার খবরটা পেয়েছিলেন। তিনি বাইরেই ছিলেন। ছেলের ঘরের দরজায় এসে মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, বিভু।

মা ও ছেলের বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। ঘরের ভেতর থেকেই ছেলে বল্ল, কি ?

কি হয়েছে রে ? এত রাত্তিরে তাপস এল, আবার এখনই চলে গেল, আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না, ওদের কোন বিপদ আপদ—

না না, সে সব কিছু নয়।

সুবোর কোন খবর পেলি ?

না। তুমি শোও গে যাও। আমি দরজা বন্ধ করছি।

বিভু ঘটক চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা বন্ধ করলেন।

ঠাকুরমা নিজের কপালে হাত দিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সব শুনে ভদ্রা বল্ল, তুমি যেন নিজে থেকে কিছু করতে যেও না। এ এক ভয়ানক জীবন মরণ সমস্যা। কি হবে তার ঠিক নেই, শেষে যেন তোমার ওপোর কোন দোষ না পড়ে।

তাপস বাবু ভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, তোমারই বাপ ভাইয়ের ব্যাপার, আমার কিছু নয়। তুমি কি চাও না, এর একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করি ?

কি করবে ?

কিঞ্চিৎ গরম হয়েই তাপস বাবু বল্লেন, আমি যা চাই তা ত তোমরা করতে দেবে না। আমি চাই ঐ চিঠি পুলিশের বড় কর্তার হাতে দিয়ে বজ্জাতদের গ্যাংকে গ্যাং পাকড়াও করাতে। দেশে কি আইন কানুন কিছু নেই ? আমরা কি গুণ্ডাদের হুকুমমতো চলার জন্যই স্বাধীনতা পেয়েছি।

স্ত্রী বল্ল, ঐ সব খবরাখবরের ফলে সুবোর কোনো অনিষ্ট হোলে কি কৈফিয়ৎ দেবে তুমি ? তুমি ত বাবাকে বলেছ তোমার কথা।

তিনি রাজী হন নি। এর পর তোমার নিজে থেকে করার মতো আর কিছু নেই। তিনি যা চান, তিনি যা বলবেন, সেই রকম কাজ করবে। তাঁকে তাঁর বিপদে সাহায্য করবে, উপদেশ দেবে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই করবে না।

তাপস বাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন, এই জন্যই গুণ্ডারা আস্কারা পায়। তোমাদের উচিত গুণ্ডাদের হাতে আরও মার খাওয়া।

পরের দিন সকালে রিনিকে স্কুলে পাঠিয়ে তাপস বাবুর গাড়ীতেই ভদ্রা এল বাবার কাছে। তাপস বাবু শ্বশুরের কাছে আর একবার নিজের মত প্রকাশ করতেই মিঃ ঘটক ক্ষেপে উঠলেন। বল্লেন, টাকাটাই কি বড়ো হোল হে, ছেলেটার জীবন কিছু নয়? ঐ একটা মাত্র ছেলে, ওর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমি পারি না। তোমরা ও রকম কথা ভাবতে পারো, আমি পারি না। আজ যদি ওর মা থাকত তা হলে সেও পারত না।

ভদ্রা ঘাড় হেঁট করে রইল। তাপস বাবু কথা না বাড়িয়ে অফিসে চলে গেলেন।

তাঁর মনে হোল, সত্যিই ত! বিষয়ী ব্যবসাদার শ্বশুর হয়ত ভাবতে পারেন, একমাত্র শ্যালকের মৃত্যু ভগ্নীপতির পক্ষে লাভজনকই বটে।

ফোনে টাইম এনগেজ করে মিঃ ঘটক এলেন বানারসী দাস আগরওয়ালার গদিতে। এ ছাড়া তাঁর অন্য গতি ছিল না। কাল সারারাত ধরে অনেক ভেবে এটাই তিনি সাব্যস্ত করেছিলেন।

বৃদ্ধ আগরওয়ালা ঘটকের বহুদিনের পরিচিত। সেই হাণ্ডার আমল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আগরওয়ালার লেনদেন। কারবারে হঠাৎ পাঁচ দশ হাজার টাকার দরকার পড়লে আগরওয়ালার কাছে পাওয়া যায়। আই-ও-ইউ, হুণ্ডী, পোস্ট ডেটেড্ চেক, হ্যাণ্ড নোট, ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী এই রকমের বিভিন্ন কাগজে হাণ্ডা এবং হাণ্ডার পরে ঘটকও ওঁর কাছে বহু বার ধার করেছেন এবং যথাসময়ে শোধ দিয়ে এতকাল ধরে নিজেদের ক্রেডিট বাড়িয়েছেন।

এবার আশী হাজার টাকার প্রস্তাব শুনে আগরওয়ালা চোখ কপালে তুললেন। আগ্রওয়ালার কেমন যেন সন্দেহও হোল। বল্লেন, মিঃ ঘটক, জানতে পারি কি এত টাকার দরকার হঠাৎ কি জন্য পড়ল?

ঘটক বলেন, বিজনেসের ব্যাপারে হঠাৎ এই দরকারটা বড্ড জরুরী হয়ে পড়েছে।

তা ত বুঝছি স্যার, না হোলে আর আমার কাছে আসবেন কেন? আজকাল ব্যাঙ্ক-লোনটা ইজি হওয়ায় আমাদের এই কারবার ত প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। তা আপনার ব্যাঙ্ক কি বলে?

এত সর্ট টাইমে ওরা দিতে পারবে বলে মনে হয় না, সে জন্যই ওদিকে যাই নি। সোজাসুজি আপনার কাছেই চলে এলুম।

কারবারে নতুন কোনো ডিপার্ট খুলছেন না কি?

জোর করে ঈষৎ হাসি টেনে ঘটক বল্লেন, এখন আমি কিছুই বলতে পারব না মিঃ আগরওয়াল। ষোল তারিখের পরে সব বলবো।

ট্রেড সিক্রেট, এ্যাঁ, তা বাবুজী, আপনাদের ট্রেডে মাথা গলাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তা ছাড়া আমাকে দিয়ে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না এটা মনে রাখবেন।

জিভ্ কেটে মাড়োয়ারী কায়দায় ঘটক বল্লেন, ছো ছো, আপনার কাছে আমার কোন সিক্রেট নেই, কিন্তু জানেন ত, দেওয়ালেরও কান আছে। তাই একেবারে স্পিক টি নট। ঘটক সাহেব টেনে টেনে হাসতে লাগলেন।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলল অনেকক্ষণ। শেষে স্থির হোল যোধপুর পার্কের বাড়ী বন্ধক রেখে আগরওয়ালা দেবে পঞ্চাশ হাজার, দু'খানা ভিন্ন তারিখের হুণ্ডীতে বিশ হাজার, হ্যাণ্ড নোটে দশ হাজার এবং আই ও ইউয়ে পাঁচ হাজার। এই ভাবে পঁচাশী হাজারের দলিল করিয়ে আশী হাজার টাকা নগদ দেবেন, পাঁচ হাজার থাকবে আগর-ওয়ালার সেলামী, ইংরাজীতে যাকে বলে ক্যাপিট্যালিস্টস্ কমিশন। বি ঘটক রাজী হয়ে মনে মনে ভাবলেন, এখান থেকে হোল আশী আর

আমার ব্ল্যাক মানি আছে বিশ। ওঃ, ছেলেটা যে আমার কি সর্বনাশই করল। ওর বড় মায়ের বাড়ী কেনায় হোয়াইট মানি সবই শেষ করে দিয়েছি। এখনও বাকি আছে gift tax, দানকর।

আবার এক নতুন ফ্যাঁসাদ! তিন দিনে মর্টগেজ ডীড্ হয় না। এ কথা বল্লেন আগরওয়ালার উকীল, যাকে গদীতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বল্লেন, মাত্র কলকাতার সম্পত্তি একুইটেবল্ মর্টগেজে টাইটেল ডীড ডিপোজিট করে হোতে পারে, কিন্তু যোধপুর পার্কের সম্পত্তি ঐ ভাবে বন্ধক রাখা যায় না।

এত সব মিঃ ঘটক জানতেন না। বাড়ী তিনি এর আগে কোন দিনই বন্ধক রাখেন নি। শেষে আগরওয়ালার চাপে উকীল বাবু রাজী হলেন; বাড়তি কস্ট্ পাঁচ শো টাকা পেলে তিনি এক দিনে সব রকম সার্চ কম্প্লিট ক'রে পরের দিনেই ডীড্ তৈরি ক'রে ষোল তারিখে দু'টোর আগে রেজিস্ট্রেশনের কাজ শেষ করাবেন। অন্যগুলো অর্থাৎ হুণ্ডী, হ্যাণ্ড নোট, আই ও ইউ ঐগুলোর জন্য কোন রেজেস্ট্রি লাগে না। অতএব ওগুলোকে নিয়ে কোন ভাবনা নেই। ও সব ইমানের ওপোর চলে, অর্থাৎ অধিকাংশই কালো টাকা। আগরওয়ালার নীরব হাসির নিগূঢ় তাৎপর্য ঝানু ব্যবসাদার ঘটক বোঝেন। ওরা দুজনেই দু'জনকে শ্রদ্ধা করেন।

ষোল তারিখ সকাল সাতটায় ঘটক তাঁর নিজের ঘরে বসে ফোন পেলেন। অচেনা কণ্ঠস্বর, শুরু করল গুড্ মর্ণিং দিয়ে।

ঘটকও বল্লেন, গুড্ মর্ণিং।

আজ রাত্রি আটটার সময় রেড্ রোডে যাচ্ছেন ত?

ঘটক থমকে গেলেন। এতটা তিনি কল্পনা করেন নি। বল্লেন, আপনি কে? কে কথা কইছেন?

কোন উত্তর নেই। আধ মিনিট পরে ওধার থেকে শব্দ এল, সে ইয়েস অর নো।

ঘটক বল্লেন, ইয়েস্। তাঁর গলার স্বরটা কেঁপে উঠেছিল।

থ্যাঙক ইউ মিঃ ঘটক, জাস্ট এট এইট পি এম। ফোন কেটে গেল।

হঠাৎ ঘটকের রক্ত গরম হোল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান ডবল নাইনকে ডায়াল করলেন।

ও পাশে বাজতেই লাগল। কেউই ধরে না।

রিসিভারটা কানে রেখেই ঘটক ভাবলেন, এই মাত্র কত নম্বর থেকে ওঁকে রিং করেছে সেটা কি ওয়ান ডবল্ নাইন বলতে পারবে না? দেখাই যাক্।

ও পাশে বেজেই যাচ্ছে। ঘটকের সম্বিৎ ফিরল। ভাবলেন, যদিও ওরা বলতে পারে তা হলেই বা কি হবে। সে নম্বর নিয়ে আমি করব কি? নিজে যাব? পুলিসকে জানাব? না বাবা, ও সবে দরকার নেই। টাকা যায় যাক, ছেলেটা ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক।

ফোনটা নামিয়ে রাখলেন মিঃ ঘটক।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুড়ো বয়সে নিঃস্ব হলুম। কারবারের অবস্থা খারাপ। হাত একেবারে খালি হয়ে গেল। সংসার খরচ চালিয়ে এই টাকাটা যে কত দিনে মেক্ আপ্ করব তার ঠিক নেই!

নিজে নিজেই মনকে প্রবোধ দিয়ে ভাবলেন, যাক। নিঃস্ব অবস্থা থেকেই সুরু করেছিলুম। সব দিয়ে থুয়ে এখনও ত কিছু রইল। ছেলেটা আগে ঘরে আসুক।

আবার ফোন। ভয়ে ভয়ে ফোনটা ধরলেন। হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এবার পরিচিত গলা। তাপস ডাকছে। বল্ল, আজ কি আমার করার মত কিছু আছে?

নাঃ, তুমি আর কি করবে।

সন্ধ্যের সময় যাচ্ছেন? ব্যবস্থা হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমি কি সঙ্গে যাব?

না, একাই যাব।

একটু কথা বলুন।

ভদ্রা ফোন ধরল। বল্ল, একা যাওয়া কি ভাল হবে বাবা? ট্যাক্সিতে অতগুলো—

গাড়ী কাল পেয়ে গেছি রে। গাড়ী নিয়েই যাব।

বৈজু চালাবে?

না, সে বাড়ী ফিরলেও ঠিক সুস্থ হয় নি। তাকে এখনও গাড়ী চালাতে দিই নি। গাড়ী নিয়ে আমিই যাব।

আর কাউকে সঙ্গে নেবে না? একা যাবে?

হ্যাঁ, তুই এখন ছেড়ে দে, পরে ভেবে চিন্তে যা হয় জানাব। কিছু মনে করিস নি। ঘটক সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন।

মর্টগেজের ঝামেলা চুকিয়ে চিঠির নির্দেশমত এক লক্ষ টাকার প্যাকেট তৈরি করে দু'তিনবার টেলিফোনে হাত দিয়ে এবং হাত নামিয়ে শেষ পর্যন্ত বেলা পাঁচটা নাগাদ বি ঘটক জামাইয়ের অফিসে ফোন করলেন। জামাইয়ের গলা শুনে বল্লেন, অফিস থেকে কখন বেরুবে?

এই পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই। কেন? কিছু দরকার আছে?

না, তেমন কিছু নয়, তবে যদি আসতে পারতে তা হোলে—

ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আপনি ক'টা অব্দি বাড়ীতে আছেন?

আমি বেরুব সাতটার পর, ঘটকের গলায় কেমন যেন ক্ষীণ করুণ স্বর।

আমি ছ'টার পরেই যাচ্ছি।

আচ্ছা, তাই এসো।

ছ'টা দশ নাগাদ ভদ্রা ও রিনিকে নিয়ে তাপস বাবু এসেছিলেন। শ্বশুরের মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত হলেন। শ্বশুরকে দু'দিন আগে যা দেখেছিলেন তার তুলনায় উনি অনেক বেশী বুড়ো হয়ে গেছেন। ভদ্রা বল্ল, বাবার কি শরীর খারাপ নাকি?

ঘটক মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বল্লেন, না।

ভদ্রা বল্ল, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না বাবা। সেই হার্ট স্পেশা-লিস্টকে একবার কল্ দিলে হয় না ?

দরকার বুঝলে দেব, নিস্তেজ নিরুত্তাপ কণ্ঠে ঘটক উত্তর দিলেন।

তারপর নড়ে চড়ে বসে বল্লেন, তুই মায়ের কাছে যা। তাপসের সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে আমার।

না, আমি থাকব এখানে। আমি কি কেউ নই বাবা ?

বাবা মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন। করুণ ঘোলাটে দুই চোখ। মুখে কিছু বল্লেন না। দুঃখে ও সহানুভূতিতে ভদ্রা বিগলিত হোল। একবার ভাবল, ঘর থেকে চলেই যাই। পরক্ষণেই মনে হোল, না, বাবার এই বিপদে এখানে থেকে সময়মত বুদ্ধি দিয়ে যদি এতটুকুও উপকার করতে পারি সে জন্য এখানে থাকাই আমার উচিত। নিজের বুদ্ধির ওপোর ভদ্রার আস্থা আছে। সেই আস্থা এত বছর ধরে তাপস বাবুই বাড়িয়ে তুলেছেন।

ঠিক হোল, ঘটক একা যাবেন না, তাপসবাবু সঙ্গে থাকবেন। বাদলকেও সঙ্গে নেবার জন্য ভদ্রা বলেছিল কিন্তু ঘটক সে প্রস্তাব একেবারেই নাকচ করে দিলেন। এ বিষয়ে আর কেউ জানুক সেটা ঘটক আদৌ চান না। ভদ্রা কিন্তু স্বামীকে বাবার সঙ্গে একলাটি ছাড়তে আদৌ রাজী নয়। বাদলটা শক্ত সমর্থ আছে, তাকেও সঙ্গে নেওয়া উচিত। কি যে হবে তা ত কিছুই জানা নেই !

ভদ্রার মনে হচ্চে নানা রকম আশঙ্কা। আবার কেউ ইচ্ছে করে কোনো রকম এ্যাকসিডেন্ট যে ঘটাবে না তারই বা ঠিক কি। রাত্রি আটটার সময় রেড রোডের ঐ জায়গায় কোনো লোক থাকে না। মাঝে মাঝে এক একখানা গাড়ী তীরবেগে চলে যায়। প্রায়েই শোনা যায় ঐ অঞ্চলে গাড়ী আটক করে ঘড়ি, ব্যাগ, গয়না এই সব ছিনতাই হয়। ভাবতে ভাবতে ভদ্রার গলা শুকিয়ে আসে। অথচ যেতেই হবে। ভাইয়ের জীবন বাঁচাতে স্বামী এবং বাবাকে ছাড়তেই হবে।

বাদলকে সঙ্গে নিতে ওদের হু'জনের কেউই রাজী নয়। ভদ্রা বল্ল, বাবা, আমি যাব।

তুই? ঘটক চমকে উঠলেন, তুই গিয়ে কি করবি?

তাপস বাবু হেসে উঠলেন। বল্লেন, কোন ভয় নেই, ন'টার মধ্যেই ফিরে আসব।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভদ্রা বল্ল, কোন্ গাড়ীতে যাওয়া হবে?

আমার গাড়ীতে। ও-গাড়ী আগের থেকেও ভাল হয়ে গেছে, ঘটক আশ্বাস দিলেন!

তা হলে এক কাজ করব বাবা? বৈজু দেখলুম সেরেই উঠেছে। আমি যদি বৈজু আর বাদলকে নিয়ে আমাদের গাড়ীতে তোমাদের ফলো করি তা হলে কি ভালো হবে না?

কি লাভ? চোখ কুঁচকে বাবা প্রশ্ন করলেন।

পেছন থেকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না।

আর তোকে যদি আক্রমণ করে?

আমাকে আর চিনছে কে?

শেষে তাপস বাবু বল্লেন, মন্দ নয়। আপনার গাড়ী ওরা জানে। ঐ গাড়ীতেই ওরা ধাক্কা দিয়ে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে, কিন্তু আমার গাড়ী ওরা চেনে না। কেউ যদি আপনার গাড়ী ফলো করে তা হলে ওরা পেছন থেকে দেখতে পাবে। ওদের বলে রাখা যায় যে, সে ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের হর্ণ বাজিয়ে সাবধান করে দেবে। আইডিয়াটা মন্দ নয়।

কিন্তু বৈজুকেও ওরা চেনে, নিশ্চয়ই চেনে। বৈজুকে তোমার গাড়ীখানা চালাতে দেখলে—। মিঃ ঘটক প্রশ্ন করেন।

তা বটে, তাপসবাবু চিন্তিত হলেন। শেষে বল্লেন, এক কাজ করুন, আপনার গাড়ী বৈজুই চালিয়ে নিয়ে যাক। ঐ গাড়ীর পেছনের সিটে আপনি থাকবেন। ঐ যে পয়েণ্টে, মানে কোন্ খানটায় যেন বলেছে—?

ট্রাম-ক্রশিং ফোর্ট উইলিয়ম গেটের জংশন থেকে উত্তরে যেতে বাঁ-হাতের দশম ল্যাম্প-পোস্ট ছেড়ে একাদশ ল্যাম্প-পোস্টের আধাআধি গিয়ে বাঁ দিকের ঘাসের ওপোর প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, মিঃ ঘটক উত্তর দিলেন।

বেশ, ঐখানে আপনি পেছনের সিট থেকেই প্যাকেটটা ফেলবেন। গাড়ী থামাবার দরকার নেই, স্পিড কমালেই হবে। আমরা আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ গজ পেছনেই থাকব। প্যাকেটটা ফেলেই সোজা চলে যাবেন। নেতাজী স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে রেড্ রোড দিয়েও ফেরা যায়, কিম্বা না হয় চৌরঙ্গী দিয়ে—তাপস বাবু ইতস্তত করতে লাগলেন।

ভদ্রা বল্ল, আবার রেড রোড্ কেন, চৌরঙ্গী দিয়েই ফেরা হবে।

ঘটক বল্লেন, না, রেড রোড্ দিয়েই ফিরব। ফেরার সময় যদি কিছু নজরে পড়ে—

নজরে পড়লে কি হবে? ভদ্রা সশঙ্কে প্রশ্ন করল।

ঘটক বল্লেন, প্যাকেটটা ফেলার পর আর কোন ভয় আমাদের নেই। ওরা যা চেয়েছে তা পেয়ে গেলে—

ঘটক থেমে গেলেন। তাপসবাবু ধীরে ধীরে বল্লেন, ভদ্রা যা বলছে আমার মনে হয় সেটাই ঠিক, কারণ দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। কি দরকার ওখান দিয়ে ফেরার। করতে যখন কিছুই পারবো না তখন মিছিমিছি—

ম্লান কণ্ঠে ঘটক বল্লেন, তা ঠিক, তবে কিনা প্যাকেটটা ওরা ঠিকমত কলেক্ট করল, কি অন্য কেউ—। মানে অনেক লোফার বাউণ্ডুলে ভিখারী ঐ সব জায়গায় থাকে ত। প্যাকেটটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরণের কেউ যদি ওটা পেয়ে যায়—

ঢ্যাট ইজ্ দেয়ার লুক আউট, ঐ টাইমে ওদের লোক ঐ পয়েন্টে ঠিকই গার্ড দেবে।

ঘটক বল্লেন, তা দেবে, তবে কি না—

তাপস বাবু বল্লেন, সেই জন্যেই বলছি, ওখান দিয়ে না ফেরাই ভাল। ওখানে আমাদের আবার দেখলে ওরা ভাববে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি।

ঘটক বল্লেন, আচ্ছা। তা হলে চৌরঙ্গী দিয়েই ফেরা যাবে।

ঘটক ঘড়ি দেখলেন, পৌনে সাতটা। ধীরে ধীরে বল্লেন, সবই গেল। বাইরে থেকে সবাই ভাবে আমি বিরাট ধনী কিন্তু আমি যে কি, তা একমাত্র আমিই জানি। এই টাকাটার জন্যে দেনায় গলা পর্যন্ত ডুবে গেলুম।

তাপসবাবু নীরব। ভদ্রা বল্ল, যাকগে বাবা, ও সব ভেবে মন খারাপ করে এখন আর কি হবে? সুবো ফিরে আসুক, অফিস ঠিক থাকুক, এই ক্ষতি শিগ্‌গিরই পূরণ হয়ে যাবে।

নারে ভদ্রা, দিনকাল আর সে রকম নেই। ব্যবসা বাণিজ্য সব দিকেই মন্দা, তার ওপোর গভর্ণমেন্টের ট্যাক্স, চারদিক দিয়ে এমনই জড়িয়ে পড়ছি যে এই ধাকা সামলে আবার খাড়া হয়ে ওঠা খুব শক্ত!

তাপস বাবু ভদ্রার দিকে চেয়ে কি যেন ইঙ্গিত করলেন। ভদ্রা বুঝল। বল্ল, বাবা, বেরোবার আগে একটু কফি দেব?

না, ও সব আর ভাল লাগছে না।

ভদ্রা স্বামীর দিকে চাইল।

স্বামী বল্লেন, তবে থাক, উনি খেলে করতে পারতে। একার জন্যে—

তা হলে বলো একটু করতে, ঘঠক মেয়েকে বল্লেন।

ভদ্রা উঠে গেল।

তাপস বাবুর মনে হোল, এমনটা তাঁর কখনও হয় না। তাঁর নিজের ত কোনো বিপদই নেই, তবুও এ রকম গলা জিভ সব শুকিয়ে আসছে কেন!

কফি খেয়ে সাতটার পরেই ওরা বেরুলেন। বৈজুর গাড়ীতে মিঃ ঘটক, তাপস বাবুর গাড়ীতে তাপসবাবুর পাশে ভদ্রা, পেছনের সীটে

বাদলী। রিনিও যাবার জন্য বায়না ধরেছিল। তাকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে ঠাকুরমার কাছে রেখে এল ভদ্রা। ঠাকুরমাকে বল্ল, সুবোর সন্ধানে এক ভদ্রলোকের কাছে পরামর্শ করার জন্য যাচ্ছি। রাত্রি দশটার মধ্যেই ফিরব। আগেও ফিরতে পারি।

ঠাকুরমা পাছে ভাবেন, সে জন্য ভদ্রা সময়টা বাড়িয়ে বলেছিল। ঠাকুরমা বল্লেন, দেখ দিদি, তোমরা চেষ্টা করে দেখ, যদি ছেলেটার সন্ধান পাও। আমার মন কিন্তু ভয়ানক খারাপ হচ্ছে। সেই যে সেদিন দিন-দুপুরে পষ্ট মনে হোল ভূঁইকম্প হচ্ছে,—আঙ্গুল দিয়ে ছাদের একটা কোন্ দেখিয়ে বল্লেন, স্বচক্ষে দেখলুম ঐখানটা চড়্ চড়্ করে ফেটে গেল, সেই থেকে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। দিন দুপুরে জেগে জেগে এ রকম স্বপ্ন!

কথাটা ভদ্রা আগেই শুনেছিল। ঠাকুরমার কাছেও শুনেছে, ঝি চাকরদের কাছেও শুনেছে। ভদ্রা মনে মনে বিস্মিত হয়েছে, স্বামীকেও বলেছে। স্বামী বল্লেন, সময়টা কিন্তু একই। ঠিক যে সময়ে এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এবং সুবোকে ওরা তুলে নিয়ে পালিয়েছে, ঠিক সেই সময়েই ঠাকুরমা ভয় পেয়েছেন। স্ট্রেঞ্জ কয়েন্‌সিডেন্স। এতেই বলতে ইচ্ছে হয়, দেয়ার আর মেনি থিংস্ ইন হেভেন এণ্ড আর্থ দ্যাট আর নট ড্রেম্প্ট অফ ইন ফিলজফি। আজ ঠাকুরমাকে সাহস দেবার জন্য ভদ্রা বল্ল, ওটা কিছু নয় ঠাকুরমা। তুমি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছ। তোমার হয়ত মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

কি জানি কি হয়েছিল। এখন ভালোয় ভালোয় সুবোটা ফিরলে তবে ত বুঝি।

নিশ্চয়ই ফিরবে ঠাকুরমা, কোন ভয় নেই। আজ এই এখন যেখানে যাওয়া হচ্ছে এর পর তুমি দেখে নিও ঠাকুরমা, কাল পরশুর মধ্যেই সুবো ফিরে আসবে।

ভগবান করুন তাই যেন হয়, ঠাকুরমা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

রিনি কোন কথা বলেনি; এব র যেন বিষয়টার গুরুত্ব বুঝে ঐ বাচ্ছা মেয়েটা নীরবে একবার মায়ের দিকে একবার ঠাকুরমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল।

ওরা বেরিয়ে গেল। ঠাকুরমা ওপোরের গাড়ী-বারাণ্ডা থেকে বল্লেন, দুগগা দুগগা, দুগগা শিহরি।

শব্দটা ঘটকের কানে যেতে তিনিও পেছনের সীটে বসে সঙ্গোপনে দু'হাত কপালে তুলে মনে মনে বলেছিলেন দুর্গা শ্রীহরি। এটা তিনি গত কয়েক মাসের মধ্যে করেন নি, করতে যেন ভুলেই গিয়েছিলেন।

শ্বশুরের গাড়ীখানা ট্রাম লাইন পার হয়ে রেড্ রোড ধরল। তাপস বাবুও ট্রাম লাইন পার হলেন। দক্ষিণ থেকে উত্তরে আর কোনো গাড়ীই আসে না, উত্তর থেকে দক্ষিণমুখে অনেকগুলোই যাচ্ছে। পেছনের সীটে বাদল আছে একা। তাকে ভদ্রা বলেছে পেছন দিক নজর রাখতে। সে পা গুটিয়ে পেছনের সীটে পেছন দিকে মুখ করে বসেছে। সে দেখছে পেছনে কোন গাড়ীই নেই।

রাস্তায় পদচারী একজনও নেই। এ অঞ্চলে এ সময়ে পদচারী কেউই তেমন থাকে না। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট-রুল হবার পূর্বে কলকাতার লোকেরা এমনই আতঙ্কিত হয়েছিল যে সন্ধ্যার পরে জনবহুল রাস্তাও ফাঁকা হয়ে যেত, ময়দানের মধ্যবর্তী এ সব রাস্তার প্রশ্নই ওঠে না। এ সময়ে পদচারী না থাকাই স্বাভাবিক।

ওদের পাশ দিয়ে একখানা স্কুটার তীরবেগে চলে গেল। যাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ঘটক যাচ্ছিলেন ধীর গতিতে। ফোর্ট উইলিয়ম গেটটা বাঁয়ে ছেড়ে ল্যাম্প-পোস্ট গুনে যেতে হবে। দশম পোস্ট ছেড়ে একাদশ পোস্টের পূর্বেই প্যাকেটটা ফেলতে হবে।

মাত্র কুড়ি কিলোমিটার স্পীডে গাড়ীটা যাচ্ছিল। তাপসবাবু ওঁর স্পীডোমিটার দেখে অস্বস্তি বোধ করলেন। দু'খানা গাড়ী এই ফাঁকা রাস্তায় যাট সোত্তর গজ আগু-পিছু এত কম স্পীডে যাওয়া অন্য গাড়ী থেকে যে কেউ দেখবে তারই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ

করে যাদের উদ্দেশ্যে ওরা যাচ্ছে তারা এটা নিশ্চয়ই নজর করবে। তাপস বাবু ক্লাচ ছেড়ে ক্লাচে চাপ দিয়ে হঠাৎ ব্রেক করে গিয়ার টেনে এমন সব অভিনয় সুরু করলেন যেন তাঁর গাড়ীতে এঞ্জিন ট্রাবল্ হয়েছে। সভীত অস্ফুট কণ্ঠে ভদ্রা বল্ল, ও কি?

কিছু নয়, অত্যধিক নীরবে তাপসবাবু উত্তর দিলেন।

বাদলও সামনে ফিরে ভয়ে ভয়ে দেখেছিল। এই সময় এখানে গাড়ী বেগ,ড়ালেই চক্ষুস্থির। কোথাও কোন লোক নেই। বাঁ দিকের ঘাসের ওপোর একটা ভিখারী বা কোনো যুগল তরুণতরুণী পর্যন্ত কেউ কোথাও নেই। ভদ্রা মনে মনে গুনছিল। ন'খানা ল্যাম্প-পোস্ট পার হয়ে গেল। বাবার গাড়ীখানা দশম পোস্ট পার হোল। তার পরেই হঠাৎ একখানা বইয়ের মতো সেই লাখ টাকার প্যাকেটটা দু'টো ল্যাম্প-পোস্টের মাঝামাঝি জায়গায় আলো আঁধারীতে ঘাসের ওপোর ঠিকরে গিয়ে পড়ল। টাকাটা ফেলেই যথাপূর্ব গতিতে ঘটকের গাড়ী এগিয়ে চল্ল। ঘটক পেছনের সীটে বসেছিলেন, তাপসবাবু এক নজরে দেখলেন, শ্বশুর নিজের গাড়ী থেকে বাঁ দিকের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন। তাপসবাবু বাঁ দিকে চাইলেন। ভদ্রাও সেই দিকে চেয়েছিল। জনপ্রাণী কেউই নজরে পড়ল না, আরও কিছু এগিয়ে সেই বিশেষ পয়েন্টে এসে তাপসবাবু ও ভদ্রা দু'জনেই দেখল সাদা কাগজ জড়ানো মোড়কটা ঘাসের ওপোর পড়েই আছে।

তাপসবাবুর ইচ্ছে হোল গাড়ীটা থামান, কিন্তু থামালেন না। তেমনই ধীর গতিতে এঞ্জিন ট্রাবলের অভিনয় করতে করতে এগিয়ে চল্লেন। একাদশ পোস্ট পার হবার পর বাদল পেছন থেকে অস্ফুট কণ্ঠে বল্ল, চোরটাকে দেখলেন?

ভদ্রা বল্ল, হুঁ।

তাপস বাবু কিছুই দেখতে পাননি। হঠাৎ গাড়ীর সাইলেন্সার পাইপে একটা শব্দ করিয়ে গাড়ী যেন ঠিক হয়ে গেছে এই ভাব দেখিয়ে স্পীড দিয়ে শ্বশুরের গাড়ীর পাশ দিয়ে ওভারটেক করে

বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় ভদ্রা হাত নেড়ে বৈজুকে ইসারা করল স্পীড দিয়ে ওদের ফলো করতে। বৈজুও গাড়ীতে স্পীড দিল।

হোল না কিছুই, কিন্তু এতেই সকলের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। সকলেরই ভেতরের জামাগুলো ঘামে ভিজে গিয়েছিল। শুকনো গলায় কোনমতে চেষ্টা করে বাদল তাপস বাবু ও ভদ্রা ছ'জনের মাঝ বরাবর নিজের মুখখানা এগিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্ল, চোরটা একখানা সাইকেল নিয়ে এসেছিল। দেখেছেন?

ওরা কেউ কোন উত্তর দেয় নি।

নেতাজী স্ট্যাচু পার হয়ে চৌরঙ্গীর দিকে মোড় ঘুরে চৌরঙ্গী রোডে পড়ার পূর্বেই বাদল ডাকল, দাদাবাবু—

ভদ্রা পেছন ফিরতেই বাদল বল্ল, বৈজু থামল কেন?

ওরাও দেখল বৈজুর গাড়ী থেমে গেছে।

তাপস বাবুও গাড়ী থামালেন।

রাস্তায় তেমন কোন ভিড় নেই। ফুটপাথে সামান্য কিছু লোক, রাস্তায় খান ছ'য়েক বাস, ট্যাক্সি, কিছু ফেরীওয়ালা, রাজপথের চেহারা যথারীতি। হঠাৎ এখানে গাড়ী থামানোর সঙ্গত কারণ ওরা খুঁজে পেলেন না। দেখা গেল, বৈজু গাড়ী থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলেছে।

বাদলও তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে বাবুর গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। ভদ্রা গাড়ীর দরজা খুলে ঐ দিকেই চেয়ে রইল।

পরক্ষণেই বল্ল, কি একটা হয়েছে, বাদল ডাকছে, বলেই ভদ্রা গাড়ী থেকে নেমে ঐ দিকে প্রায় যেন ছুটে চল্ল।

তাপস বাবু গাড়ীর জানলাগুলো তুলে গাড়ী লক্ করে দ্রুতপদে এগিয়ে ও-গাড়ীর কাছে গিয়ে দেখেন, বৈজু বাদল ভদ্রা তিনজনে ঘটককে টানাটানি করে পেছনের সীটের নী-স্পেশ থেকে সীটের ওপোর তোলার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই সামলে তুলতে পারছে না। ঘটকের মুখ দিয়ে গোঙানির শব্দ।

দৌড়ে ওপাশে গিয়ে ওদিকের দরজা খুলে তাপস বাবু শ্বশুরের মাথার তলায় হাত দিয়ে চার জনে টানাটানি করে পেছনের সীটে ঘটককে কোন মতে শোয়াতে পারল। পাঁচ-সাতজন লোক ইতিমধ্যেই গাড়ীখানা ঘিরে ফেলেছিল।

কৌতুহলী জনতাকে ঠেলে সরিয়ে এক কনস্টেবল এল, কেয়া হুয়া।

তাপস বাবু প্রমাদ গণলেন। মুখে বল্লেন, কুছ নেই, বেমারী আদমী।

ভিড়ের ভেতর কে যেন বল্ল, দারু পিয়া?

দুই তরুণ বাঙ্গালী ব্যঙ্গের সুরে বল্ল, মদ গিলে মরেছে রে, আবার কি! চল্ চল্।

অন্য একজন ভদ্রাকে লক্ষ্য করে বল্ল, বেড়ে মাল মাইরী, খাসা বাগিয়েছে।

ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে ভদ্রা বাবার সংজ্ঞাহীন মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে বাদলকে বল্ল, নীচে বোস্, আবার না পড়ে যান। তাপসকে বল্ল, ডাক্তার দাসের চেম্বারে চলো, তিনি ন'টা অব্দি চেম্বারে থাকেন। বৈজুকে বল্ল, গাড়ী চালাও।

গাড়ীতে স্টার্ট দিতেই কৌতুহলী জনতার অবশিষ্ট অংশ দু'পাশে সরে গেল।

দোতলার চেম্বার থেকে নীচে নেমে গাড়ীতে এসে ডাক্তার দাস সংজ্ঞাহীন রোগীকে পরীক্ষা করে রোগের ইতিহাস শুনে বল্লেন, এখানে নামিয়ে কোন লাভ নেই। একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে দি'। যতদূর মনে হচ্ছে স্ট্রোক। কোথায় রাখবেন? বাড়ীতে, না নার্সিং হোমে? পি জি-তেও দিতে পারেন।

ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হোল তাপস বাবুদের হাউসিং এস্টেটের কাছাকাছি সাউথ পয়েন্ট নার্সিং হোমে রাখা যায়। ডাঃ দাসও ঐ নার্সিং হোম পছন্দ করলেন। চিকিৎসা তিনিই করবেন।

ইঞ্জেকশানের পর ওরা সকলেই সাউথ পয়েন্টে গিয়ে উপস্থিত হোল।

ষোল

পরের দিনই ঘটকের জ্ঞান হয়েছিল। বেলা তখন আন্দাজ তিনটে। মাইনে করা নার্স ছাড়াও ভদ্রা নিজে দুপুর থেকে বাবার কাছেই বসে ছিল। সহজ ভাবে নড়া-চড়া করতেই ভদ্রা ডাকল, বাবা।

উঁ।

ঘুম ভাঙ্গল? ভদ্রা যথাসম্ভব সহজ ভাবে প্রশ্ন করেছিল।

হুঁ, ঘটক উত্তর দিলেন।

ভদ্রা ইসারায় নার্সকে বল্ল ডাক্তারকে জানাতে।

ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকলেন। নার্সিং হোম-এর ডাক্তার। ভদ্রা তার কাছে সরে গিয়ে চুপি চুপি বল্ল, জ্ঞান হয়েছে, ডাকতে সাড়া দিয়েছেন।

ডাক্তার সেই ভাবেই চুপিসাড়ে বল্লেন, ঠিক আছে। ডাকাডাকি করবেন না, সহজভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞান হোক।

এখন ত আউট অফ্ ডেঞ্জার? কি বলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নো ওয়ারি।

ডাক্তার পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকালে এলেন তাপস বাবু, এলেন ডাক্তার দাস, বাড়ী থেকে বাদল এল। ঘটক ঘুমের মতো হয়ে আছেন। মেয়ে ডাকলে সাড়া দেন, ইঞ্জেকশানের সময় নড়ে ওঠেন, এই পর্যন্ত।

বাদল এক সময়ে বল্ল, ঠাকুরমা অস্থির হচ্চেন, আসতে চাইছেন। কি করব?

তাপসবাবু ভদ্রার দিকে চাইলেন। ভদ্রা বল্ল, ঠাকুরমাকে তুই এ সব বলতে গেলি কেন?

অমন যে বাদল সেও যেন বোকা হয়ে গেছে। বল্ল, খালি গাড়ী ফিরতেই ঠাকুরমা ডাকলেন, আর আমিও বলে ফেল্লুম।

মাঠের কথাও বলেছিস্?

না, তা বলি নি। শুধু বাবুর শরীর খারাপের কথাটাই বলেছি।

বল্লেই পারতিস, বাবা আমাদের বাড়ীতে আছেন, বিরক্তভাবে ভদ্রা যেন বাদলকে ধমকই দিয়েছিল।

তাপস বাবু বল্লেন, বলে যখন ফেলেইছে তখন আর বকাবকি করে কি হবে। ঠাকুরমাকে এখানে আনবে কি না তাই বলো।

ভদ্রা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে উত্তর দিল, ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা কর। আমি আর কি বলব।

ডাঃ দাস বল্লেন, ওঁর ইমিজিয়েট ভয় কিছু নেই। প্রেসারটা এখনও হাই, হার্টটাও ড্যামেজড্, তবুও আমার বিশ্বাস, ওঁকে সারিয়ে বাড়ী পাঠাতে পারব। এ অবস্থায় বুড়ো মাকে মিছিমিছি টানাটানি করে কি লাভ? তারপর তিনি যদি এখানে এসে ডাকাডাকি, কান্নাকাটি সুরু করেন তা হলে সেটা পেসেন্টের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

তবে থাক, ভদ্রা নির্দেশ দিল।

দাস বল্লেন, একটা কথা বলে রাখি। ওঁর ভাল রকম জ্ঞান হবার পরে এমন কিছু করবেন না, যাতে ওঁর কোন রকম উত্তেজনা হয়। দুঃখ দুর্ভাবনা এগুলো ওঁর পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, খুব বেশী আনন্দ বা হঠাৎ স্ফূর্তি এগুলোও সমান ক্ষতিকর, এটা মনে রাখবেন। পিস্‌ফুল, নর্মাল রেস্ট, এটাই ওঁর দরকার।

পরের দিন ঘটকের সহজ জ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি যে নার্সিং হোম-এ এসেছেন সেটাও তিনি বুঝেছেন। পুরানো কথা সবই মনে পড়েছে। ভদ্রাকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, সুবো এসেছে?

এই ভয়টাই ভদ্রা ও তাপস বাবু দু'জনেই করেছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া হবে তাও ঠিক করা ছিল। ভদ্রা ঠোঁটের কোণে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

কেমন আছে?

ভালই আছে বাবা।

ওর ওপোর কোন রকম—

না বাবা, ওর কোন কষ্ট হয় নি। তারা আটকে রাখলেও ওকে খুব যত্নে রেখেছিল। ওর খাওয়া থাকায় কোন কষ্ট দেয় নি।

ওর বউ? সেই মেয়েটা?

তাকে তারা ছাড়ে নি। না ছেড়ে ভালই হয়েছে। আমার মনে হয় সেই মেয়েটাই যত নষ্টের মূল।

ও কি বলে?

ও-ও তাই বলছে। এমন কি, ও বলছে, সেই মেয়েটা এলে ও তাকে বাড়ী ঢুকতে দেবে না।

তাই বুঝি? ঘটকের শান্ত স্থির মুখে তৃপ্তিসূচক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বল্লেন, সুবো কি এখানে এসেছিল?

হ্যাঁ বাবা, আজ দুপুরে এসেছিল।

আমায় ডাকলি না কেন?

মুখের ওপোর ফের হাসি ফুটিয়ে ভদ্রা বল্ল, ওকে ত জান, কি রকম লাজুক ছেলে, আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে এসেছিল যে আমি তোমাকে ডাকব না।

কেন?

ও বলে, বাবার সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না। বাইরে থেকে রোজ দেখে আসব কিন্তু ঘরে ঢুকব না।

এ ভাবে কত দিন চলবে?

ও বলে, বাবা সেরে উঠুন, সেরে উঠে আমায় জুতো মারবেন, তারপর আমি বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

পাগল! ঘটক চোখ বুজলেন, তৃপ্তির চোখ বোজা।

সেই বিকালেই অফিস থেকে কয়েকজন এসেছিলেন। বড় বাবু খাটের পাশে দাঁড়াতেই ঘটক বল্লেন, কাজকর্ম কি রকম চলছে? ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের টেণ্ডারখানার ব্যাপারে কিছু হোল?

বড় বাবু বল্লেন, হ্যাঁ, ও সব নিয়ে আদৌ চিন্তা করবেন না। আমি ওর সব ঠিক করে নিয়েছি। আপনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন।

রাও-এর সঙ্গে দেখা না করলে কিছুই হবে না, জানেন ত ?

জানি স্যার। আমি দেখা করে বলে এসেছি আপনি নার্সিং হোমে আছেন, সেরে উঠলেই দেখা করবেন।

কি বল্ল সে ?

বল্ল ঠিক আছে। পুরানো রিলায়েবল্ পার্টি, কোন অসুবিধা হবে না।

এই কথা বল্লে ?

হ্যাঁ স্যার।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ঘটক বল্লেন, আপনি অভিজ্ঞ লোক, আপনাকে বলার কিছুই নেই। কেয়ারফুলি কাজকর্ম করবেন। আমার বোধ হয় অফিস যেতে আরও কয়েকদিন লাগবে। একটু থেমে বল্লেন, কি জানি, এক হপ্তার আগে এরাই বোধ হয় ছাড়বে না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি রেস্ট নিন, কোন রকম ভাবনা চিন্তা করবেন না, সমস্ত ম্যানেজ করে নেব।

সে রাত্রে তাপস বাবু ও ভদ্রা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল কিন্তু ভোর সাড়ে পাঁচটায় টেলিফোনের ঘণ্টা শুনে আঁৎকে উঠলেন। মশারি ঠেলে বেরুতে বেরুতে ভাবলেন, এত ভোরে কে ডাকবে ? নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। নির্ঘাৎ নার্সিং হোম থেকেই ডাকছে।

হ্যালো।

আমি বাদল বলছি দাদাবাবু, এখন কি একবার আসতে পারবেন ?

কেন বল্ ত ? ব্যাপার কি ?

সে বলতে পারব না দাদাবাবু, বড্ড দরকার।

কি হয়েছে বল্-না, তাপসবাবু ধমকে উঠলেন।

ভদ্রা ওঁর পাশে এসে বল্ল, কে ? কে ডাকছে ?

বাদল।

দেখি, আমায় দাও। ফোন নিয়ে ভদ্রা বল্ল, কি হয়েছে রে ?

সে বলতে পারব না দিদিমণি। আপনারা এখনই আসুন।

ঠাকুরমা ? ঠাকুরমার কিছু হয়েছে ? ভদ্রার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

না দিদিমণি, আপনারা আসুন। আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

ফোন কেটে গেল। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সুবোকে যারা লুকিয়ে রেখেছে তাদের পক্ষ থেকে কোন হামলা হোল, না কি ? কি হোল ?

তাড়াতাড়ি প্যাণ্টে পা গলাতে গলাতে তাপসবাবু বল্লেন, গণেশটা উঠেছে ? ডাকো ত।

ঘরের দরজা খুলে ভদ্রা গণেশকে ডেকে ঘরে এসে কাপড় বদলাবার উপক্রম করতেই গণেশ দরজার সামনে এল। তাপস বাবু বল্লেন, গ্যারেজটা খোল্।

ভদ্রা বল্ল, আমরা বেরুচ্ছি। রিনি এখনও ঘুমুচ্ছে। ওকে ডাকিস্ নি। ও উঠলে চা জলখাবার দিবি, আর বলবি আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব। রান্নাবাড়া যা করিস তাই করবি। আর এই টাকাটা রাখ, রিনি কিছু খেতে চাইলে এনে দিস্।

তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না কি ?

যাব বই কি। কি হয়েছে কিছুই ত বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রার পরে মনে হয়েছিল, না এলেই ভালো হোত। এ আমি কি দেখলুম !

ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বাদল বল্ল, ভোরে উঠে যেমন দরজা খুলি সেই ভাবে দরজা খুলেই দেখি, গাড়ী-বারাণ্ডার তলায় এই বড় ট্রাঙ্কটা বসানো রয়েছে। কোথা থেকে কে এই ট্রাঙ্ক নিয়ে এল কিছুই বুঝলুম না। গেটে যেমন তালা লাগানো থাকে তেমনই লাগানো ছিল। তারপর ট্রাঙ্কটায় হাত দিয়ে টানতেই খুলে গেল। প্রথমে দেখি মোটা মোটা কাগজ। হাত দিয়ে কাগজগুলো তুলতেই এই।

হাউ হাউ করে বাদল কেঁদে উঠল।

ভদ্রা আগে থেকেই কাঁদছিল। তাপস বাবুর চোখ দু'টো জলে ভরে

উঠল। তবুও তিনি ট্রাঙ্কটার দিকে খুঁটিয়ে দেখলেন। কতকগুলো ফুল সাইজ ব্লটিং কাগজ নতুন ট্রাঙ্কের তলায় পেতে তার ওপোর রাখা হয়েছে দু'টি সদ্য কাটা মানুষের মাথা। একটি সুব্রতর, অপরটি এক স্ত্রীলোকের। দুটি মাথা পাশাপাশি রাখা। ও দুটোর ওপোরেও কতকগুলো ব্লটিং চাপা দেওয়া ছিল, যেগুলো বাদল খুলে ট্রাঙ্কের বাইরে ফেলেছে। কাগজগুলোয় জমাট রক্তের ছোপ।

সকলেই স্তম্ভিত, সকলেই কাঁদছে। বৈজু, ঠাকুর এবং চারু ওরাও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া কেউ কোথাও নেই। তাপস বাবু ভদ্রার দিকে চেয়ে বল্লেন, এটা কার বলো ত?

চিন্‌লে না, ভারতী সেন, সিক্ত অস্ফুট কণ্ঠে ভদ্রা উত্তর দিল।

ঠিক জানো?

জানব না? এই ত সেদিন আমাদের ঘরে' সারা বিকেল কাটিয়ে গেল।

চুপ, তাপস বাবু থামিয়ে দিলেন। বাদলের দিকে চেয়ে বল্লেন, থানায় খবর দিয়েছিস?

না।

এক্ষুনি খবর দিতে হবে।

অফিস ঘরে ঢুকেই তাপস বাবু ফোন ধরলেন।

সামনের হল্‌টায় দুটো বিছানা পাতা ছিল। ফোন সেরে তাপস বাবু বেরিয়ে এসে বল্লেন, এখানে কারা ছিল?

ঠাকুর ও বৈজু, বাদল উত্তর দিল।

কেন? ওদের ঘরে ওরা থাকে না?

বাদল বল্ল, ক'দিন আগে বাবু বলেছিলেন, নীচে কেউ থাকে না সেটা ভাল নয়। তোরা তিনজনে নীচে থাকবি, আর চারু ওপোরে মায়ের কাছে থাকবে। সেই থেকে আমরা আর কেউই বাইরে থাকি না।

তোর বিছানা কোথায়?

সলজ্জমুখে বাদল বল্ল, আমি ঐ জেঠাইমা যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে থাকি।

ঠাকুরমা উঠেছেন? চারুর দিকে চেয়ে তাপস বাবু প্রশ্ন করলেন।

বোধ হয় এখনও ওঠেন নি, চারু উত্তর দিল।

তুমি কখন নীচে নেমে এসেছ?

এই একটু আগে।

দরজা খুলল কে?

বাদল।

তুমি এসে কি দেখ্‌লে?

আমি এসে বাদলকে ডাকলুম। আমিই রোজ ভোর বেলা উঠে ওদের ডাকি। তারপর বাদল দরজা খোলে, চারু উত্তর দিল।

চাবি কার কাছে থাকে?

বাদলের কাছে। চাবি-টাবি সব নিয়ে বাদল ঐ ঘরে দরজা দিয়ে ঘুমোয়।

শোনো, তোমরা সবাই শুনে রাখো, পুলিশ এখনই আসছে। তারা এসে নানা রকম কথা জিজ্ঞাসা করবে। তোমরা যে যা দেখেছ, যা করেছ, সব কথা স্পষ্ট ভাষায় চট্‌পট্ উত্তর দেবে। বাদল যে আমাদের সঙ্গে সেদিন ময়দানে গিয়েছিলে, সেখানে যা যা হয়েছিল, যা জানো, ওরা জিজ্ঞাসা করলে সমস্ত বলবে। কোনো কথা লুকোবার চেষ্টা করবে না, কোন রকম চালাকি করবে না। বুঝলে?

বাদলের সঙ্গে ওরা সকলেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

হল্‌ঘরে বাঘছাল মোড়া টেবিলটার পাশে একখানা চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন তাপস বাবু। মনে তাঁর অপার চিন্তা।

চারি, চারি কোথায় রে?

ঠাকুরমার ডাক নীচে থেকেই শোনা গেল। চারু ওপরে গেল। তাপস বাবু স্ত্রীকে বল্লেন, যাবে না ওপরে?

ভদ্রা বল্ল, না, এখন থাক।

পুলিশ এল। সব কথা শুনল। সকলের জবানবন্দী নিল। রাস্তা, বাগান, পাঁচিল, গাড়ী-বারাণ্ডার যেখানে ট্রাঙ্কটা রয়েছে সেই জায়গা সব তন্ন তন্ন করে দেখে ওরা সকলেই বুঝল, দু'জন লোক এসেছিল। দু'জনেরই পায়ে ছিল রবার-সোল জুতো। বাগানের থেঁৎলানো গাছগুলো দেখে মনে হয় সেখান দিয়েই লোহার রেলিং টপ্‌কে দু'জন লোক ঐ ট্রাঙ্ক নিয়ে বাগানে নেমেছে, এই পাশ দিয়ে এসে ট্রাঙ্কটা এইখানে রেখে আবার ঐখান দিয়েই পাঁচিল টপ্‌কে বেরিয়ে গেছে। পুলিশ তাপসকে বল্ল, এই জায়গায় কেউ যেন না যায়, এখানকার ফটো ইত্যাদি নিতে হবে। ইতিমধ্যে ঠিকে মালীটাও এসেছিল। তাকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস বল্ল, মালীকে আজ বাগানের কোন কিছুতে হাত দিতে দেবেন না। তারপর সুব্রতর হাতের লেখা চিঠি যেখানা তাপসবাবু শ্বশুরের টেবিল থেকে খুঁজে বার করে পুলিশ অফিসারকে দিয়েছিলেন, সেটাকে তিনি সযত্নে ফাইলের মধ্যে রাখলেন।

হঠাৎ সবাই দেখল, ঠাকুরমা দেওয়াল ধরে ধরে থপ্‌ থপ্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

এই ভয়টাই ভদ্রা এতক্ষণ করছিল।

সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমা বল্লেন, কি—কি হয়েছে রে ?

ও কিছু নয় ঠাকুরমা, তুমি আবার নীচে এলে কেন ? ভদ্রা এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরমার হাত ধরল।

কিছু নয়। তা হলে তোরা এই সকাল বেলা এসেছিস কেন ? ওপোর থেকে দেখি, দরজার সামনে বড় গাড়ী, পাহারওলা, লোকজন উঁকিঝুঁকি মারছে, তারপর দেখি নাতজামাইয়ের গাড়ী রয়েছে ভেতরে, কি হয়েছে তোরা ত আমায় কিছুই বলিস নি—

আপনার মনে এই ছিল, আপনি ত আমায় কিছু বলেন নি, চোখ পাকিয়ে প্রসাদ প্রফেসার অজিতকে সেই দিন বিকালেই চ্যালেঞ্জ করেছিল।

আমার মনে কিছুই ছিল না প্রসাদ, পার্টির ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা সব কগ্-হুইল, পার্টি যেমন চালায় আমরা সেই ভাবেই চলি। তুমি এখন যাও ভাই, তুমি উত্তেজিত, পরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। স্মিতমুখে কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে প্রফেসার আত্মতৃপ্তিতে প্রশান্ত। শক্তিশালী ফলোয়ারকে এই ভাবেই রাবিং দিয়ে স্মুথ করতে হয়।

প্রসাদ গেল না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তোমাকে পঁচিশ হাজার দিয়েছি, টাকাটা নিয়ে আজই বসিরহাটে রওনা দাও। আজ উনিশ তারিখ, কাল ভোর থেকেই মণ্ডল বাড়ীতে তোমার উপস্থিত থাকা উচিত।

আমি যাব না। বাকী পঁচাত্তর হাজার দিন। ঘটকবাড়ীর টাকাটা আজ রাতেই পৌঁছে দিতে চাই। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব, প্রসাদের স্পষ্ট উক্তি।

প্রফেসার অজিত মৃদু হাসলেন। প্রবীণের ভঙ্গীতে বল্লেন, ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল মাই বয়, এই ত আমাদের কাজের সুরু। এ রকম ছোট খাটো ব্যাপারে আপসেট হতে নেই।

ছোটো ব্যাপার! এটা ছোটো হোল? প্রসাদ গর্জে উঠল।

হোলো না? ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, চীনে লাখ লাখ লোক মরেছে, তুমি এই একটা দু'টোয় এত বিচলিত হোচ্ছ? ছি ছি, ইয়ং ম্যান, তোমার নার্ভ আমি আরও স্ট্রং বলে ভেবেছিলুম,—ব্যঙ্গ এবং ভালবাসা, সহানুভূতি ও অন্তরঙ্গতায় মেশানো সেই মৃদু তিরস্কার।

অজিতদা, আপনি কি মনে করেন ঐ দুটো মৃত্যুতে আমি বিচলিত হয়েছি? একেবারেই না। নট্ ইন দি লীস্ট। কিন্তু এ আমরা কি করলুম! আমরা ডিমাণ্ড করলুম, ওঁরা আমাদের ডিমাণ্ড পূরণ করলেন। কোন রকম বেইমানি করেন নি, অথচ ওঁদের যা কনেক্‌শানস, তাতে ওঁরা একটু চেষ্টা করলেই আমাদের বিপদে ফেলতে পারতেন। দু'খানা গাড়ী পর পর আসায় আমারও সেই সন্দেহ

হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝলুম, ওদের কোনো বদ্ মৎলব ছিল না। ওরা ক্লীন, বেইমান হলুম আমরা, এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

লুক টু ইয়োর প্রজেক্ট, নট্ টু প্রসেস্, অজিত বাবু উপদেশ দিলেন; কার্যপ্রণালী যাই হোক, উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হোল। আমাদের এখনই, কাল ভোরেই টাকা চাই, সেই টাকা তুমি এমন একজন ধনীর কাছ থেকে নিয়েছ যাকে চিঠি দেওয়া মাত্রই তিনি নগদ লাখ টাকা দিতে পারেন। অর্থাৎ এই টাকাটা তাঁর কাছে বেকার পড়ে ছিল, তিনি পার্টির কাজে, দেশের বৃহত্তম মঙ্গলের জন্য চাঁদা দিয়েছেন, আমরা নিয়েছি। অন্য দিকে তাঁর ছেলেকে আমরা ছাড়তে পারি না। সে আমাদের মেম্বার না হোলেও ভারতীর কাছে থেকে আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র নিশ্চয়ই জেনেছে। তাকে ছাড়া মানে নিজেদের কাজ স্বেচ্ছায় পণ্ড করা, পার্টি ট্রীজন—

তবে যে সেদিন বলেছিলেন ওটাকে গাড়ী থেকে ফেলে দিলেই পারতে! ওটাকে আনতে গেলে কেন?

ঢোক গিলে অজিত বল্ল, সেদিনের স্ট্র্যাটেজী তাই ছিল, আজ সিচুয়েশন বদলে গেছে। পরক্ষণেই বল্লেন, এসব নিয়ে আজ আর তর্ক করার সময় নেই ভাই, তুমি আজই বসিরহাটে চলে যাও। ওগুলোর ব্যবস্থা করে ফিরে এসো, তারপর তোমার সঙ্গে এই ম্যাটারে আলোচনা করা যাবে। আর হ্যাঁ, শুধু নারাণ নয়, নারাণের বাড়ীর আশ্রিত ঐ মকবুলকেও আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। আচ্ছা ভাই, বায় বায়।

অধ্যাপক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্ষুন্ন ক্ষুব্ধ প্রসাদ শিথিল পদে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে ভাবল, লাখ টাকার পুরো প্যাকেটটা সেই রাত্রেই প্রফেসারের হাতে না দিলেই ছিল ভাল। এমনটা যে করবে তা কি ঘুণাক্ষরেও জানতুম!

বসিরহাট যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে প্রসাদ নিজের বাড়ীতেই ফিরে গেল। ইদানিং তার ব্যবহারে বাড়ীর সকলেই এমন উত্যক্ত যে

তার খোঁজ তার বাবা ত রাখেনই না, মা-ও বড় একটা নেন না। মেডিকেলের সেই ফার্স্ট ইয়ারে এ্যানাটমি পড়ার সময় থেকে মড়ার হাড় নিয়ে নিজের ঘরে রাখার পর থেকেই সে নীচের ঘরে নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে ছিল। সে ঘরে বড় কেউ ঢুকত না। আজকাল বাবা তার ওপোর বিরক্ত হওয়ায় সে বাড়ী থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচের ঘরে বাইরের লোকের মতোই থাকে। তবে বাড়ী ফিরলে এখনও সে খেতে পায়, নীচের ঘরে সে ঘুমুতেও পায়, এই পর্যন্ত, কিন্তু সে কখন বাড়ী ফিরছে, ফিরল কি না, সে খবরটাও বাড়ীর লোক কেউ নেয় না। এতে প্রসাদ মনে মনে এতদিন খুশিই ছিল। ভাবত এই রক্ষণশীল, কৃপণ, ভীরু প্রকৃতির সংসারে নতুন যুগের নতুন হাওয়া সে নিজের একক চেষ্টায় সফল ভাবেই বইয়েছে। প্রসাদ দম্ভভরে ভাবত, এটা তার অপূর্ব কৃতিত্ব কিন্তু আজ যথারীতি নীরবে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে নৈশ আহার শেষ করে নিজের বিছানাটা হাত দিয়ে ঝেড়ে মশারি ফেলতে ফেলতে হঠাৎ তার মনে হোল, সে যা করছে এটাই কি ঠিক ? কি করছে, কার জন্য করছে, কেন করছে ?

দরজা সে বন্ধ করল বটে কিন্তু বিছানায় ঢুকতে ইচ্ছে হোল না। সিগারেট ধরিয়ে নিজের চেয়ারে বসল। গত তিন মাস ধরে যে কাজ সে করেছে সেই কাজের হিসাব নিকাশ দরকার। এই দলে কি থাকা আর উচিত ?

আত্মবিশ্বাসী প্রসাদের মনে যে অনেকখানি দম্ভ এবং অহমিকা আছে তা প্রসাদ নিজেও ভাল ভাবেই জানে। এতে সে বরাবরই আত্মগৌরব লাভ করে। যখন সে বাবার দেওয়া সস্তা দামের খাকী সার্ট ও ফুট-পাথের রেডিমেড প্যান্ট পরত তখনও সে মিতব্যয়িতায় আত্মপ্রসাদ লাভ করত। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের ভাল পোষাক দেখে নাক সেঁটকাত। তাদের বাবুয়ানিকে 'ফোতো কাপ্তেনী' বলে নিন্দা করত। টেলার-মেড্ ম্যান, ফপারী, এই সমস্ত শব্দে তাদের বিড়ম্বিত করত। যে কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলে সেটা তার পক্ষে

মর্মান্তিক হোত। হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্কলারশিপ পাবার পর তার কৃপণ বাবা পর্যন্ত যখন আত্মীয় স্বজনদের ভোজ দেবার জন্য আয়োজন করেছিলেন তখন সে নিজে নিদারুণ প্রতিবাদ ক'রে সেই উৎসব বন্ধ করে ছিল। বলেছিল, এ কি একটা উৎসবের ব্যাপার! আমার ওপোরে আরও কতজন রয়েছে, ছিঃ। বাবাকে বলেছিল, প্রি-মেডিকেল পরীক্ষায় আমি নিশ্চয়ই প্রথম স্থান অধিকার করব, তখন তুমি উৎসব কোরো, এখন নয়। প্রথম স্থান না পাওয়ার জন্য কোনো রকম উৎসবই সে করতে দেয় নি।

টেবিলের ওপোর মোটা মোটা বইগুলো দেখতে দেখতে প্রসাদের চোখে জল এল। এখন সে কোথায় এবং তার সেই সব উচ্চ সংকল্পই বা কোথায়!

নিজের হাতের গুলির দিকে তার নজর পড়ল। মনে পড়ল জ্ঞান দত্তকে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ঠিক পরেই জ্ঞান দত্তর ওয়েট লিফ্‌টিং দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। তার পেশীবহুল নগ্ন বপু প্রসাদকে আকর্ষণ করেছিল। পরের দিন থেকেই সে ব্যায়াম সুরু করে। দু'বছর ধরে প্রতি অপরাহ্ণে নিয়মিত ব্যায়াম করে সে তার নিজের ফেদার ওয়েট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হতে না পেরে দুঃখ পেয়েছিল। সেবার সে পেয়েছিল দ্বিতীয় স্থান। চ্যাম্পিয়নের তুলনায় সে তিন কিলো কম তুলেছিল। তাদের ক্লাবের ট্রেণার বলেছিলেন, নেক্‌স্‌ট্‌ ইয়ারে চ্যাম্পিয়ান হতে পারবে কিন্তু তার আশঙ্কা ছিল পরবর্তী বৎসরে সে হয়ত আর ফেদার ওয়েট গ্রুপে থাকবে না। পরের বছরে তার আশঙ্কাই সত্য হয়েছিল এবং সেবারে সে গত বছরের তুলনায় সাঁইত্রিশ কিলো বেশী তুলেও তার গ্রুপে প্রথম হোতে পারল না, এমন কি দ্বিতীয়ও নয়। সেবারে সে মাত্র চার কিলোর জন্য তৃতীয় হয়ে গেল। তার সেই বছরের সেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন তার চেয়ে পাঁচ কিলো বেশী তুলে প্রথম স্থান অধিকার করল। ব্যায়াম করায় প্রসাদের ঘেন্না হয়ে গেল। বাড়ীর ওপোর রাগ হোল। ডিম, মাংস, ফল, দুধ যে পরিমাণ খাওয়া উচিত বলে

প্রসাদ মনে করে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাবা তা দেন না। বলেন, একজনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা যায় না, সেটা খারাপ দেখায়। বাবা প্রয়োজন বোঝে না, নিয়মটাই বোঝে। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে থাকলে ঐ সকলের মতোই সমান হতে হয়; সব থেকে সেরা হতে গেলে রসদটাও যে সব থেকে সেরা হওয়া চাই সেটাই এরা বোঝে না। বাবার কার্পণ্যে প্রসাদের ঘৃণা হয়েছিল।

মেডিকেলের ফাস্ট ইয়ারে ওরা কলেজ থেকে গিয়েছিল এক এক্সকারশানে। বাবা প্রথমতঃ কিছুতেই ছাড়তে রাজী হন নি। বাবার সঙ্গে অনেক বকাবকি করে শেষ পর্যন্ত প্রসাদ বাবাকে রাজী করিয়েছিল। সেইবারেই প্রসাদ বুঝেছিল যে বাবাকে তাঁর মতের বিরুদ্ধেও রাজী করানো যায়। কিন্তু রাজী করিয়ে কি হোল? কলেজের এক নবীন অধ্যাপকের সঙ্গে ওরা বারো জন ছাত্র এক সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে প্রসাদ দেখল, সে 'বিলো এ্যাভারেজ'। পোষাকে, চালচলনে, হাত-খরচায় এবং অবসর সময়ের টেবল্‌-টকে সর্বত্রই প্রসাদ ব্যাক-ডেটেড্‌। তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া মিতব্যয়িতার মূল্য এদের কাছে আদৌ নেই। এরা উপহাস করে। সেই ট্রিপেই প্রসাদ সেই তরুণ অধ্যাপকের কাছে নতুন একটা কথা শিখেছিল, জেনারেশন গ্যাপ। তিনি বলেছিলেন, প্রসাদ, আর্‌লি টইন্‌টিয়েথ সেঞ্চুরীর আইডিয়া লেট্‌ টইন্‌টিয়েথ সেঞ্চুরীতে চলে না; ডিপেন্‌ডেন্ট কান্ট্রির ভাবধারা ইন্‌ডিপেণ্ডেন্ট কান্ট্রিতে অচল। সেই থেকে প্রসাদ বাবাকে শুধু ঘৃণাই নয়, করুণা, অবজ্ঞা এই সব করে' নিজের উন্নতির পথে বাবাকে প্রধান বাধা বলে মনে করতে সুরু করেছে।

তবুও এপর্যন্ত লেখাপড়াটা ঠিক মতোই চালিয়ে এসেছে কিন্তু কি কুক্ষণেই যে পার্টির সংস্রবে এল সেটাই প্রসাদ আজকের নিভৃত রাত্রে নিজের চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল।

প্রথম প্রথম এদের সংস্রবে এসে কী এক অভূতপূর্ব উৎসাহ, প্রচণ্ড উত্তেজনা! যে সব বই ওরা পড়তে দিয়েছিল সেগুলোয় প্রসাদ এক

নতুন জগতের আলো দেখেছিল। সেই নতুন জগৎ সৃষ্টি করার পদ্ধতি, নতুন কর্মপ্রণালী, পুরনো পচা সমাজকে যারা ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়েছিল তাদের ইতিহাস, তাদের কার্যধারা, এই সব পড়ে পড়ে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। ওর কেবলই মনে হতে লাগল আমি পারি, আমি পারবই। সবাই যখন এই মহৎ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছে তখন আমার নিজের কাজ, নিজের পড়াশুনা নিজের উন্নতি নিয়ে থাকাটা নিতান্তই ঘৃণ্য এক স্বার্থপরতা। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা কবিতার লাইনও মনে মনে আওড়াল। সকলকে নিয়ে যে বাঁচে না, সে বাঁচতেই জানে না। এই যে বাবা টাকার কাঁড়ি নিয়ে বসে আছে আর কাকীমা, যে প্রসাদকে এত ভালবাসে, সে টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরছে, এই পাপ, এই গ্লানি পুঁজীবাদী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। দোকানে দোকানে অসংখ্য খাবার, নানাবিধ পরিধেয় থরে থরে সাজানো, অথচ সেই সব দোকানের সামনে বভুক্ষু উলঙ্গের দল ক্ষুধায় ও শীতে কাতর। এর উপযুক্ত প্রতিবিধান পুঁজীবাদী সমাজের নেই, যাদের আছে তারাই অনুকরণযোগ্য। সেই পথ দিয়েই আমাদের চলতে হবে, সমগ্র দেশকে চালাতে হবে, আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের, এই সবুজ তরুণ কচি ও কাঁচারা যদি অথর্ব বুড়োদের মতো নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ আঁকড়ে দিন কাটায় তা হলে দেশের হবে কি? এই নির্মম কঠিন আপাতঃ-অসম্ভব কাজ যে সফল সার্থক করবে সে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে! পাস করে ভাল চাকরী পেয়ে অথবা প্র্যাকটিস জমিয়ে নিজের সুখী জীবন নিয়ে আশে পাশে কতই ত রয়েছে! এদের পরিণাম কি? ঐ বাবা, মামা, ভগ্নীপতি প্রত্যেকেই টাকার পাহাড়ে বসে আছে। ঐ বস্তাপচা, গতানুগতিক, হ্যাকনিড্ জীবন—ছি ছি, ঝাড়ু মারো, ঝাড়ু মারো ওদের মাথায়। রুশো, কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুঙ্, হোচিমিন এই সব মহামনীষী কর্মবীর দরিদ্র-বন্ধুদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও 'সুধাসাগরের তীরে বসি কেন পান করে সবে হলাহল'?

তিন চার মাস আগে এমনই ভেবেছিল চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র প্রসাদ, যার বাড়ীতে কোন অভাব নেই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যার ছিল না কোন হতাশা। সে সময়ে সে স্থির করেছিল এই কাজ করতে হবে ওদেরই। যাদের পেটে ভাত নেই, মগজে বিদ্যে নেই, তারা করবে এই কাজ। রাম কহো, তারা বড় জোর ওদের তল্পী-বাহক হতে পারে, কিন্তু নেতৃত্ব দেবে ওরা। ওর পার্টিও প্রথম প্রথম ওর কথায় ষোল আনা সায় দিয়েছিল। ঐ প্রফেসার অজিত বোস, উনি এক শিক্ষিত নাম-করা প্রফেসার হওয়া সত্ত্বেও নিজের কেস্ থেকে সিগারেট নিয়ে ওকে দিয়েছেন, নিজের লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছেন, এই ভাবেই প্রসাদের আত্মাদর আরও স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কম্রেড শব্দটাকে প্রসাদ ভালবেসেছে, ছোট বড় উচ্চ নীচ সকলেই সমান, সকলে সমান ভাবে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কাজ করবে, এই অখণ্ড কর্ম-ক্ষেত্রে এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে? ইকোয়ালিটি নয়, ইকোয়াল অপরচুনিটি, মৌখিক ফ্রেটারনিটি নয়, কমন্ কিচেন, লিবার্টির আইডিয়া মাত্র নয়, প্রেসিডেন্ট থেকে ওয়ার্কার পর্যন্ত সকলেরই সমান কমরেড-শিপ্, এই হচ্চে পৃথিবীর আদর্শ। বাবার কথাটা মনে করে অবজ্ঞার হাসি হাসত সে। বাবা বলেন, Poverty is a sin and the poor a sinner। এটা নাকি বেকনের কথা। প্রসাদ ভাবে, এ কথা যে বলেছে সে শুধু বেকন নয়, সে হ্যাম্ বেকন।

তবুও যেন প্রসাদের মনে একটু দ্বিধা ছিল। সে ছিল বরাবরই নাম-যশের প্রত্যাশী, সেরা হওয়াই ছিল তার একমাত্র কাম্য। তার বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তারীতে, বিশেষ ক'রে সে কল্পনা করত যে, সার্জারীতে সে বিশ্ববিখ্যাত হবে; পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব চেয়ে শক্ত অপারেশন করার আহ্বানে তাকে দ্রুতগামী প্লেনের যাত্রী হয়ে অনবরতই ছুটতে হবে। পার্টির কাজে লেগে পড়লে তার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ক্ষুণ্ণ হবে এই আশঙ্কার আভাসমাত্র পেয়েই প্রফেসর বন্ধু যেন অন্তর্যামির মতোই বলেছিলেন, প্রসাদ, তুমি হয়তো মনে

করতে পারো যে এই কাজে এলে তোমার ভবিষ্যৎ ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু মনে রেখো, রাজনীতি যে যশ দেয় তা সর্বকালিক ও সর্বব্যাপী, এবং অন্য সমস্ত যশই সাময়িক ও স্বল্পবিস্তার। রবীন্দ্রনাথকে অশিক্ষিত বাঙ্গালীরা পর্যন্ত জানে না, পরমহংসদেবকে মানে না এমন লোকের অভাব নেই, কিন্তু গান্ধীকে, নেতাজীকে, লেনিনকে, হিটলারকে পৃথিবীর সকলেই জানে। মনে রেখো প্রসাদ, নাম যশের প্রকৃষ্ট পথ পলিটিক্স, বিশেষ করে বিপ্লববাদ। গান্ধীবাদী অহিংসপন্থী ভারত সরকার পর্যন্ত নেতাজী, বাঘা যতীন, ক্ষুদিরামের স্ট্যাচু বসাতে বাধ্য হয়েছে, তাম্রপত্র ও পেন্সনের দ্বারা প্রাক্তন বিপ্লবীদের স্বীকৃতি দিয়ে কৃতার্থ বোধ করছে। বুঝলে প্রসাদ—

প্রসাদ উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, ঠিক, ঠিক কথা অজিতদা, প্রকৃত বিপ্লবীকে অবজ্ঞায় চাপা দিয়ে কখনও রাখা যায় না—

প্রফেসার আর কিছু না বলে নীরবে হৃদয়-জয়ের হাসি হেসেছিলেন।

তখন থেকেই প্রসাদের মনের সকল দ্বিধা কেটে গিয়েছিল, অথচ ভারত সরকারের কর্মকর্ত্তারা বুঝতেও পারেন নি যে তাঁদের দেওয়া প্রাক্তন বিপ্লবীদের সম্মানসূচক তাম্রপত্র বর্ত্তমানের কিশোরবয়স্ক প্রসাদদের কি এক ভয়ঙ্করী প্রেরণায় সর্বনাশের ধ্বংসপথে অমোঘ শক্তিতে আকর্ষণ করল। শ্লথগতি বৃদ্ধ এক পথচারীর জন্য অদূরদর্শী বাস্‌-ড্রাইভার এমনই ভাবে স্টিয়ারিং ঘোরালো যে বাসভর্তি যাত্রী সমেত গোটা বাসখানা হাইওয়ের পাশের খানায় পড়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি,—খবরের কাগজে এই ধরণের খবর প্রায়ই বেরোয়। স্টিয়ারিং ঘোরাবার আগে গাড়ীর তথা রাষ্ট্রের ড্রাইভারদের পাশের খানাখন্দ এবং কোনটায় বেশী বিপদের আশঙ্কা সেটা বিচার করা নিতান্তই প্রয়োজন।

এই ভাবেই প্রসাদের ষ্টিয়ারিং ঘুরেছিল। তার মনে পড়ে, সে নিজের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি পার্টির কাজে লেগে গেল এবং দিন কয়েকের মধ্যেই এমন কয়েক-জনের সাক্ষাৎ সে পেল যাদের অন্তরঙ্গ

হোতে আদৌ সময় লাগল না। কলেজের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও যে সম্মান, যে স্বীকৃতি সে বন্ধুমহলে পায় নি, তার চেয়েও ঢের বেশী বাহবা সে পেতে লাগল পার্টির পুরানো কর্মীদের কাছে। বেচারী তখনও টের পায়নি যে এটাই ওদের পার্টির পলিসি। সে বুঝতে পারে নি যে পার্টিতে যাকে সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে ভাবছে তার সহজ মুখখানা মুখোসের মধ্যেই গোপন আছে; এমন কি পার্টির দুই তরুণী কর্মী দীপ্তি ও সুলতা, যারা প্রসাদদা বলতে অজ্ঞান, তারা যে এই ভাবে পার্টির নবাগত উজ্জ্বল সদস্যদের কাছে 'অজ্ঞান হবার জন্যই' পার্টিতে স্থান পেয়েছে তাও সে কল্পনা করে নি। আজ এই নির্জন নৈশ আত্মসমীক্ষায় তার জ্ঞাননেত্র কি সহসাই খুলে গেল! তবে কি পার্টি একটা ছেলে-ধরার ফাঁদ, এক ঘৃণিত আড়কাটির দল, কয়েকজন স্বার্থপর নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ী মিথ্যা প্রবঞ্চণায় ওকে ভুলিয়ে নাচিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে?

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসাদ চমকে উঠল। ও যে ঠিক জেনেশুনে আত্মসমীক্ষার গবেষণাতেই এটা আবিষ্কার করল তা নয়, হঠাৎ ওর মনে এই কথাটা যেন উদয় হোল। স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই মনে হোল, আমাদের কর্মীদের সম্বন্ধে নানা রকম ডিসিপ্লিন, পার্টি-ম্যাণ্ডেট, কিন্তু অজিতদার নিজের বেলায় সে সবের কোন বালাই নেই। আমাদের কাছে টাকা-কড়ির সঠিক হিসেব চাই, অজিতদা নিজে কি কারুর কাছে হিসেব দেয়? যে রাত্রে ঘটকদের লাখ টাকা আনার জন্য প্রসাদ ময়দানে গিয়েছিল সে রাত্রে একখানি মাত্র সাইকেল সম্বল করে একাই ওকে যেতে হয়েছিল। অজিতদা একটা পিস্তলও ওকে সঙ্গে নিতে দেয় নি। বলেছিল, ধরা পড়লে বলবে আমি সাইকেল প্র্যাক্টিস করতে এসেছি, প্রকৃতির আহ্বানে কাছাকাছি কোন ইউ-রিন্যাল না থাকায় অন্ধকারে ঝোপের কাছে গিয়েছি, সাইকেলে কোন তালা না থাকায় সেটাও নিজের কাছে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়েছি, হঠাৎ চলতি গাড়ী থেকে প্যাকেট পড়ায় প্রথমে চমকে উঠি, তারপর

নোংরা-টোংরা নয় দেখে হাতে তুলে নিয়েছি। প্রসাদ বলেছিল, আরও দু'জন ছেলে দিয়ে একটা গাড়ী ওখানে পাঠালে ভাল হয়। দু'চার জন পুলিশও যদি ধরার চেষ্টা করে তা হলে ঐ গাড়ী তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে। কিছু হাতিয়ার থাকলে ওরা ছোটখাট দলের মওড়াও নিতে পারবে। অজিতদা কোন কথাই শোনেন নি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন ওর প্রস্তাব, কিন্তু নিজে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসে সমস্ত টাকা গুনে সবটুকু নিঃশেষে নিয়ে গেছেন! আজ পঁচিশ হাজার দিয়ে কালকের পৌনে-উনিশ এবং দশ হাজার রাউণ্ডের জন্য যা দিতে হবে সমস্ত দিতে বলে পরে হিসেব দিতে বলেছেন। এতেও তার সন্দেহ যায় নি। এর ওপোর মকবুলকে ডাকতে বলেছেন, কারণ মকবুল ছেলেটা নারাণের চাইতেও অজিতদার বেশী বিশ্বাসী।

কতকগুলো সিগারেট শেষ হবার পরেও আর একটা ধরিয়ে প্রসাদ ভাবল, সব কিছুই সহ্য করতে পারি, কিন্তু এ কি বেইমানি! আমি লাখ টাকা এনেই বলেছিলুম কাল সকালে মিঃ ঘটককে চোখ বেঁধে অথবা অজ্ঞান করে বাড়ী পাঠিয়ে দেব, তখন তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। তারপর দু'দিন ধরে কিছুই করলেন না। আমাকে উপরি-উপরি ফরমাস করে নানা কাজে ঘোরাতে লাগলেন, আর আজ দুপুরে হঠাৎ অন্য লোকের কাছে শুনলুম এই ব্যাপার! কেন, কাজটা করার আগে আমার মতটাও কি নেওয়া দরকার মনে করলেন না! টাকাটা আনার পরামর্শে আমি ওদের মিটিং-এ থাকতে পারি, আর এ সময়ে আমাকে এত গোপন করা কেন! বিপদের সময় আমি, ঝুঁকির সময় আমি, আর সেই আমাকেই শেষ পর্যন্ত ভাঁওতা!

রাগ এবং বিরক্তি দমন করার জন্য সিগারেটের বাকী অংশটা ছাই-দানে গুঁজে এক গেলাস জল খেয়ে আলো নিভিয়ে প্রসাদ মশারিতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ঘুম তার নেই।

মশারির ভেতর ঘুমহীন অবস্থায় অধ্যাপক অজিত বসুও সেই রাত্রে ভাবছিলেন, এই ভাবে আরও কিছু ব্রেন ওয়াশিং পেলে ওয়ার্কার

হিসেবে ছোকরা সিন্‌সিয়ারই হবে। পার্টিনেতা প্রফেসার বসু জঙ্গী বিভাগের সাধারণ টমিকে ট্রেনিং পিরিয়ডে 'রাবিং দিয়ে রাউণ্ডেড' করার প্রচলিত প্রণালীকে সকলের উপর সমানে প্রযোজ্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন কিন্তু এখানেই তাঁর মস্ত ভুল হয়েছিল। কাঁচা লোহা 'রাবিং-এ রাউণ্ডেড' হয় ঠিকই, কিন্তু কাঁচা লোহার ভিড়ের ভেতর ইস্পাতের টুকরো যদি থাকে এবং সেই ইস্পাতকে যদি লোহারই সঙ্গে বেহিসেবী 'রাবিং' দেওয়া হয় তাহলে ইস্পাতখণ্ড 'স্মুথ' না হয়ে মারাত্মক রকম চোখা হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ধুরন্ধর নেতা হলেও ব্যক্তিগত কর্তৃত্বকে নিরাপদ রাখার উগ্র আকাঙ্খায় অন্ধ হয়ে এই সহজ সত্যকে না দেখে নিজের ভ্রান্ত কৃতিত্বে তৃপ্ত হয়ে ঘুমোবার মতো সাময়িক আত্মপ্রসাদ সে রাত্রে লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু পরাজিত প্রসাদের সে রাত্রে ঘুম হয় নি। তার মনে চলছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। নিজের দাঁত দিয়ে নিজের হাত দুটো কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি কি ওঁর ক্রীতদাস! সেই প্রাচীন যুগের প্রভু ও ক্রীতদাস সম্পর্কটা কি এই ভাবেই চুপিসাড়ে পার্টির সুড়ঙ্গ পথে নতুন করে অনুপ্রবেশ করছে! তাহলে ঐ যে অন্য রকম কথা সব শোনা যায়, যেগুলোকে বুর্জোয়াদের মিথ্যা প্রোপাগ্যাণ্ডা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়, সেইগুলোই কি সত্য! কমরেড শব্দটা কি এদের কাছে কথার কথা, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটাই কি আসলে প্রবল? মনে পড়ল পুরানো একটা কথা। সেই যে এক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে গেছেন, Power corrupts and absolute power corrupts absolutely, এদের মধ্যে কি সেইটেই এসেছে! মুখে এরা গণতন্ত্র বল্লেও 'গণ' কি এদের গণনার বাইরে? এই ত দেখলুম, আমাকে এরা আমলই দিল না, আমার কথার কোন মূল্যই রইল না। ঐ ভারতী সেনের সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম, ও ছিল দলের সেরা এক মহিলা কর্মী। ও কেন এই ভাবে দল ছেড়ে গিয়েছিল? নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছিল যে জন্য তাকে এই কাজ করতে হয়েছে। তার কোন কথা না শুনে সেই অসুস্থ মেয়েটাকে

এই রকম নির্মমভাবে হত্যা করল কেন? তা হলে ত ওকেও ওরা যে কোনো দিন এই ভাবে শেষ করবে।

Nasty, brutish and short-এর দল সব!

প্রসাদের মাথাটা এমনই গরম হয়ে গিয়েছিল যে সারা রাত্রে সে তার চোখ ছু'টো বুজতেই পারল না। যে পার্টির জন্য সে তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে সকল রকম বিপদকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই পার্টিতে সে এক তুচ্ছ কগ্‌-হুইল! কথাটা আজই অজিতদা উচ্চারণ করেছে। কিন্তু অজিতদা নিজে কগ্‌-হুইল নয়? তবে কি তিনিই ফ্লাই হুইল? এই কি তাঁর কমরেড্‌শিপ? তিনিই মালিক, ওরা সব মালিকের খাঁচায় বন্দী মুর্গি, মালিকের ছুরীর অপেক্ষায় খাঁচার মধ্যে ঘোরাফেরা করে! অসহ্য, অসহ্য এই জীবন! অন্যেরা যা বলে সেটাই বোধ হয় ঠিক। রাশিয়া থেকে বহু লোক পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয়ের জন্য ছট্‌ফট্‌ করে কেন সেটা এবার বুঝতে পারছি। বার্লিনের বৈদ্যুতিক বেড়া টপকে পালাবার চেষ্টায় যত লোক মরেছে তারা সকলেই পূব থেকে পশ্চিমে আসছিল, পশ্চিম থেকে পূবে যাবার চেষ্টা কেউ করে নি। আমাকেও দল ছেড়ে পালাতে হবে। সময় থাকতে পালালে মনে হয় এ বছরের পরীক্ষাটাও দিতে পারব।

এই সিদ্ধান্তের পর কেমন যেন চোখ ছুটো জড়িয়ে এসেছিল। প্রসাদ ঘুমিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হোল মণ্ডলদের কথা দেওয়া আছে। এদিকে যাই কিছু হোক না কেন, কথার দাম ওকে রাখতেই হবে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠেই জামা প্যাণ্ট বদলে প্রসাদ বেরিয়ে পড়ল বসিরহাটের উদ্দেশ্যে। বাড়ীতে এক বাটি চা-ও জুটল না, কারণ ও যখন বেরুল তখনও এ বাড়ীর ঘুম ভাঙ্গে নি। তবে এতেও সে অভ্যস্ত। ভোরবেলার হাসপাতাল ডিউটিতে যাবার সময় এইভাবেই ওকে যেতে হোত।

বেলা দেড়টার মধ্যেই বসিরহাটের কাজ শেষ। সুচারুভাবেই সে পর্ব চুকে ছিল। দেড়শ পিস্‌ মাল ঠিকই এসেছে, ভালো কোয়ালিটি,

কার্তুজ আসবে তিন দিনের মধ্যে। এখনই দশ হাজার দিতে ওরা পারবে না, দু'হাজার দেবে, সে জন্য ওরা দাবী করছে চার হাজার টাকা। সে জিনিসও খড়ের গাড়ীতে লুকিয়ে এনে মণ্ডলবাড়ীতে ডেলিভারী দেবে। আজ ওরা নমুনা স্বরূপ এক বাক্স কার্তুজ এনেছিল। সেই বাক্স ও নমুনা হিসাবে একটা মাত্র পিস্তল নিয়ে প্রসাদ সেদিন বিকালেই বসিরহাট থেকে বাস-এ কলকাতায় ফিরল। সঙ্গে রইল মকবুল। নারাণ আসতে পারল না। বল্ল, এগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রাখতে হবে, যেগুলো আসছে সেগুলোর জন্যও তৈরী হতে হবে। ওগুলো সব এসে গেলে তারপর একদিন গিয়ে বোস বাবুর সঙ্গে দেখা করব। দিন চারেক পরে যাব।

পাবলিক বাসের এক প্রান্তে মকবুল অন্য প্রান্তে প্রসাদ সম্পূর্ণ অচেনার মতই বসেছিল।

সন্ধ্যার সময় অজিতদাকে যথাস্থানেই পাওয়া গেল। রিপোর্ট পেয়ে নমুনা দেখে অজিতদা খুশি হলেন, ওদের প্রাণখোলা ধন্যবাদ দিলেন, বাহবা দিলেন, দু'জনকে যে পরিমাণ খাওয়ালেন তার দাম কুড়ি টাকার কম নয়।

প্রসাদ বল্ল, এত খাবার কি হবে অজিতদা?

প্রফেসার বল্লেন, খাও খাও, সারাদিন ত এমনি এমনি কেটেছে।

না অজিতদা, নারাণবাবুর বাড়ীতে ভাত আর পুকুরের মাছ প্রচুর খাইয়েছে।

তা হোক, তোমরা এই বয়সে খাবে না ত খাবে কবে? অজিতদার কথায় প্রবীণ গৃহকর্তার মেজাজী সহানুভূতি। এটাও প্রসাদের ভাল লাগল না। Boss-ইয়তি সহ্য করতে সে পারে না, কিন্তু মুখে কোন প্রতিবাদ সে করল না। সে বুঝেছে, এই সব তুচ্ছ প্রতিবাদ অর্থহীন।

মকবুল মুখ বুজে খেয়ে গেল।

শেষে নিজের সিগারেট কেস্ খুলে দিলেন প্রফেসার অজিত বোস। এটা প্রসাদের ভাল লাগল, কিন্তু সে এটাও দেখল যে মকবুলকে

সিগারেট দেওয়া হোল না, অথচ মকবুল সিগারেট খায়। প্রসাদ মকবুলকে সিগারেট খেতে দেখেছে।

ওঠার সময় প্রসাদ বল্ল, অজিতদা, ওটা আমাকে দিন।

কেন?

আমার কাছে একটা থাকা দরকার।

দরকার যখন হবে তখন নিশ্চয়ই দেব।

কেন? আমাকে আপনার বিশ্বাস হয় না? প্রসাদের প্রশ্নে বেসুরো এক দাবী!

অজিতদা হেসে উঠলেন। কি যে বলো তুমি! দেড়শ পিস-এ বিশ্বাস করে এক পিস-এ অবিশ্বাস, এটাই তোমার বুদ্ধিতে এলো!

তবে দিচ্ছেন না কেন?

ঝুটমুট্ এমন একটা জিনিস ক্যারি করার ঝক্কি তুমি নেবে কেন? হঠাৎ যদি ফেঁসে যাও তা হলে কৈফিয়ৎ কি দেবে? বাজে রিস্ক নিও না।

আপনার কাছে সব সময় থাকে না?

সব সময় নয়, দরকার মত থাকে।

আমিও দরকার মতো নেব।

নিশ্চয়ই। তা ত নেবেই। আমার কাছেই ত রইল।

আপনিই ত বলেন অজিতদা, এক জায়গায় সব রাখতে নেই, তা হলে আমার কাছেও একটা থাকুক।

প্রসাদের স্পষ্ট দাবী অজিত বাবু অনুভব করলেন। একটু ভেবে নিয়ে বল্লেন, রাখবে, তা হলে রাখো, কিন্তু খুব কেয়ারফুলি রাখবে!

নমুনাস্বরূপ নিয়ে আসা জিনিসটা অজিত প্রসাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

প্রসাদ হাতে নিয়ে বল্ল, গোটা বারো কার্টিজ দিন।

বারোটা?

ছ-ঘরা যে।

নাও। অনিচ্ছাসত্বেও বাক্সটা এগিয়ে দিলেন প্রফেসার বোস।

প্রসাদ ছটা ভরে নিয়ে বাকী ছটা পকেটে রাখল।

জিনিসটা গুছিয়ে রেখে প্রসাদ বল্ল, আমাদের সেই আলোচনাটা কি এখন হবে?

পরে। প্রফেসার ইঙ্গিতে মকবুলের দিকে চাইলেন।

আচ্ছা। তা হলে এখন উঠি অজিতদা?

ঠিক আছে। আজ তুমি ক্লান্ত আছ। বাড়ী যাও, বিশ্রাম করো গে। আর হ্যাঁ, যদি অন্য কোথাও সুবিধে করতে না পারি তাহলে মকবুলকে তোমার কাছেই পাঠাব রাত্রি দশটা নাগাদ। তোমার ঘরে ওকে ঘুমুতে দিও।

রাত্রি দশটা? ঠিক আছে। ও যেন গিয়ে আমার খোঁজ করে এবং নিজের নাম বলে—। প্রসাদ অজিতের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে থেমে গেল।

কি নাম বলবে হে, প্রফেসার হাসতে লাগলেন মকবুলের দিকে চেয়ে চেয়ে।

প্রসাদ বল্ল, যে কোন একটা হিন্দু নাম। মুসলমানী নাম বল্লে বাড়ীতে গোলমাল হবে।

ঠিক আছে, ও বলবে মহেন্দ্র। মনে রেখো মকবুল, প্রসাদের বাড়ীতে তোমার নাম মহেন্দ্র লাল রায়, প্রফেসার নির্দেশ দিলেন।

মকবুল অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় তার নতুন নামটা স্বীকার করেই নিল।

সে রাত্রে মহেন্দ্রলাল রায় প্রসাদের ঘরেই ছিল। কিন্তু মহেন্দ্র ও বাড়ীতে যাবার আগে প্রসাদের মনে কেমন একটা অমূলক সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল। জিনিসটা ওকে দেবার পরে অজিতদা মকবুলকে ওর বাড়ীতে রাত্রিবাসের প্রস্তাব করেছিলেন, আগে নয়। কেন? অথচ প্রসাদ জানে মকবুলদের থাকার উপযুক্ত নিরাপদ স্থান ভালই আছে। তা হলে কেন নাম ভাঁড়িয়ে ওর বাড়ীতে মকবুলকে পাঠানো হচ্ছে?

ভেবে চিন্তে প্রসাদ ক্লান্তি সত্ত্বেও টপ্ করে উঠে জিনিসগুলো ছাতের চিলেঘরে পুরনো প্যাকিং বাক্সে কতকগুলো অব্যবহার্য ছেঁড়া জুতো এবং অন্যান্য অনেক আবর্জনার তলায় রেখে এল। সে জানে চিলে-কোঠায় কেউই বড় একটা আসে না। রাত্রে কেউ যে আসবে না সে বিষয়ে প্রসাদের কোনই সন্দেহ নেই।

রাত দশটায় মকবুল যেতে প্রসাদ ওকে নিজের ঘরে এনে তার সামনেই নিজের বিছানা থেকে একটা তোষক নামিয়ে তার ওপোর চাদর না দিয়েই একটা পাশের বালিশ ফেলে দিল। পাশ বালিশটাই মাথায় দিয়ে মকবুল শোবে। একটা মশারিও বার করে দিল।

আলো নিভিয়ে দু'জনেই শুয়ে পড়ল।

মকবুল কথা কয় কম, খুবই কম, কিন্তু সে অজিতের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সে আজ এক বছরের ওপোর পার্টিতে কাজ করছে। মকবুলকে যারা চেনে তারা সবাই জানে তাকে হাঁদা বলে। একেবারে বাম-হাঁদা। বয়স তিরিশের ওপোর। গুছিয়ে একটা কথাও সে মিথ্যা বলতে পারে না। নিজের মনেই নিজে থাকে। প্রফেসার অজিতও তাকে কথা-টথা বলতে একেবারেই নিষেধ করে দিয়েছেন। অজিত-বাবুর হুকুম সে মুখ বুজে তামিল করে, যেখানে যা দেখে এবং শোনে সবটুকুই যথাযথ নারায়ণকে ও অজিতকে বলে। এজন্য অজিত বাবু তার দেখা পেলেই তাকে ভাল রকম খেতে দেন। সে পেটুক, খেতে 'খুব ভালবাসে।

প্রসাদের ঘরে শুয়ে সেই মকবুলের নীরব বুকে আজ লেগেছে এক প্রবল জোয়ার। নিজের মধ্যেই নিজে আজ মকবুল একেবারে ভেসে গেছে। ভাসতে ভাসতে চলে গেছে তার নিজের বাল্যাবস্থায়।

ঠাকুরদা বাঁশ কেটে চেঁচে চেঁচে বাখারি তৈয়ারী করছে, শিশু মকবুল যোগান দিচ্চে। মকবুলের মা ছোট্ট খাট্টো মানুষটি, হাঁটুর ওপোর কাপড়, খালি পা, মাথায় ও গায়ে ন'হাত কাপড়ের বেড় দিয়ে গোবর চটকে মাঠের ওপোর ঘুঁটে দিচ্ছে, মকবুলের বাবা বাবুদের

বাড়ী কৃষাণের কাজে চলে গেছে। জমি জায়গা ওদের কিছুই ছিল না। কোন রকমে আধপেটা খেয়ে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ওদের দিন গুজরান হোত। ঠাকুরদা ঝুড়ি, চুপড়ি, পাখীর খাঁচা এই সব তৈরী করে হাটে বিক্রী করত, বাবা বাবুদের বাড়ী জন খাটত, মা গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিয়ে, পরের বাড়ী ধান ভেনে, পুকুর থেকে গুগলি, শামুক, শাক এই সব সংগ্রহ করে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নাগাদ পাতার জ্বাল দিয়ে ভাত রান্না করত। সেই ভাত বিকালে ও রাত্রে খাওয়া হোত। জল-দেওয়া ভাত পরের দিন সকালেও চলত। গোটা কতক হাঁসও ওদের ছিল কিন্তু ডিম ওরা খেতে পেত না। ঠাকুরদা সব ডিম এক সঙ্গে জমিয়ে হাটবারে হাটে গিয়ে নিজের তৈরী ঝুড়ি চুপড়ির সঙ্গে ডিমও বিক্রী ক'রে সেই পয়সায় সর্ষের তেল, নুন, এই সব গৃহস্থালীর জিনিস কিনে আনত। লড়াইয়ের বাজারে লোকে যখন খেতে না পেয়ে সহর-কলকাতায় ভিক্ষে করতে গিয়েছিল তখনও ওরা নিজের ভিটেয় কোনমতে একবেলা খেয়ে দিন কাটিয়েছে। ঠাকুরদা বলত, যে কোন উপায়ে লড়াইয়ের দিনগুলো কাটাতে পারলেই সুখের দিন আবার ফিরে আসবে। আগের লড়াইয়েও এই রকম হয়েছিল।

মকবুলের মনে পড়ে সেই লড়াইও শেষ হয়ে এসেছিল কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের সংসারও শেষ হয়েছিল; সেদিনের সে কথাও মকবুলের স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিন সন্ধ্যের আগে আলিভাই এসে ওর ঠাকুরদার দাওয়ায় বসেছিল। বলেছিল, মহিন্দির, দিনকাল বড়. খারাপ হচ্ছি রে। ছানা:পোনাদের মতিগতি বুঝতে লারছি।

আলিভাইকে ওর স্পষ্ট মনে আছে। পুরো নাম এম্‌জাদ আলি। ঠাকুরদার বয়স চার কুড়ি পুরো হয় নি, আলিভাই বলত তিন মাস আগে আমার চার কুড়ি উৎরে গেছে। সেই আলিভাই ঠাকুরদার হুঁকো থেকে কল্কিটা তুলে নিয়ে হাতের মধ্যে রেখে টানতে টানতে

বলেছিল, সহর থেকে ভাই-বেরাদর এসে এখানকার ছানাপোনাদের কাণে যে কি ফুস্‌মন্তর দিতিছে কিছুই বুঝতে লারছি।

ত্বই বুড়োকে সেদিনের পাঁচু, একালের মকবুল, খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে দেখেছিল।

এর পর এক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে পাঁচু দেখেছিল, বিরাট এক তাণ্ডব কাণ্ড। বড় বড় মশাল, ধারাল টাঙ্গি, এক রাশ লোক, সকলেই অচেনা,—প্রথমে পাঁচু ভেবেছিল ডাকাত পড়েছে। সেই যে ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনত ডাকাতের, সেই ডাকাতই বোধ হয় পড়েছে। কিন্তু পাঁচু ভাবতে পারল না, ডাকাত ওদের বাড়ীতে আসবে কেন। ডাকাত পড়লে মণ্ডল বাড়ীতে পড়তে পারে যাদের ধানের গোলা, তেজারতি কারবার, হাটে একখানা কাপড়ের দোকান, খানদানি ঘর, সেখানে ডাকাতরা যেতে পারে কিন্তু ওদের বাড়ী কেন? কোন কিছু ভাবার আগেই সেই মশালের আলোয় পাঁচু দেখল ওর সাজোয়ান বাবার ঘাড়ে পড়ল টাঙ্গির কোপ। বাবার হাতের লাঠিখানা ছিট্‌কে পড়ে গেল। ধুলোয় হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাবা, ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল সমস্ত দেহটা, শুকনো ধুলো রক্তে ভিজে কাদা হয়ে গেল। ও কিছু করার আগেই দু'জন লোক ওর হাত দুটো পেছনে ঘুরিয়ে এঁটে বাঁধল। ওর মা, যে ঘোম্‌টা ছাড়া পরপুরুষের সামনে বেরোয় না, সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওকে রক্ষা করতে। তাকেও সেই ভাবেই ওরা বেঁধে ফেলল। ওর কানে এল বন্দুকের শব্দ। ও বুঝল, মণ্ডলবাড়ী থেকে বন্দুক ছুঁড়ছে। তারপর সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল।

পরের দিন, কিম্বা আরও দু'দিন পরে ওর ঠিক মনে নেই, দূর গাঁয়ের এক মসজিদে নিয়ে মহিন্দির ডোমের নাতি পাঁচু ডোমকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করে ওর নতুন নাম দেওয়া হয় মকবুল। ওর মাকেও মুসলমান করা হয়েছিল এবং তারপর—তারপরের কথা ভাবতেও ওর কষ্ট হয়, ওর মাকে নিকা করেছিল যমদূতের মতো একটা লোক। তার এক মুখ দাড়ি, ছাঁটা গোঁফ, লাল ভাঁটার মত চোখ, ওর মা অঝোরে

কেঁদেছিল। তারা ওর মাকে বোরখা মুড়ে কোথায় যে নিয়ে গেল তা আর মকবুল কোন দিনও জানল না।

এর পর কবে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, কবে বাংলা দেশ ভাগাভাগি হয়েছিল সে সব খবর পাঁচু এর ওর কাছ থেকে শুনলেও তেমন কিছু বোঝে নি। ওর ঠাকুরদা যে কোথায় গেল, কি হোল, তাও পাঁচু টের পায় নি। ও লুকিয়ে কাঁদত আর ওর নতুন মনিব রহিমুল্লার গরু ছাগল হাঁস মুরগী পালন করত। এ সময় ওর একমাত্র বন্ধু ছিল লালী। লালী সারাদিন ওর সঙ্গে থাকত, ওরই সঙ্গে খেত আর রাতে গোয়াল ঘরের বাইরে উঁচু একটা ঢিবির ওপোর লালীকে বুকে জড়িয়ে চট্ পেতে সেখানেই ঘুমুত মকবুল। একবার, সে অনেক পরে, প্রায় দু'তিনটে কি চারটে শীত কেটে যাবার পর পাঁচু যখন বেশ একটু বড় হয়েছিল তখন রহিমুল্লার ছেলের কাছে বেদম মার খেয়ে ক্ষোভে দুঃখে ওদের মুলুক ছেড়ে নিজের পুরনো জায়গায় পালিয়ে আসে। তখনও লালী ওকে ছাড়ে নি। ও তাকে ছাড়াতে চেয়েছিল কিন্তু সে ওর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল।

দেশে ফিরে মকবুলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হোল নারাণের। মণ্ডলবাড়ীর নারাণকে পাঁচু ডোম ছেলেবেলা থেকেই নারাণ খুড়ো বলে ডাকত। ধর্ম ঠাকুরের ঢিবির কাছে রুক্ষকেশ ছিন্নবাস পাঁচুকে দেখে নারাণ বহু কষ্টে চিনেছিল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথাও বলেছিল; বলেছিল, আর সেখানে ফিরে যেতে হবে না, তুই আমার কাছে থাকবি চল। আমাদের কাজকর্ম করবি, নিজের দেশে-গাঁয়ে থাকবি, কেন মিথ্যে পাকিস্তানে পরের গোলামী করে মরছিস্।

সেই থেকেই পরাধীন যুগের পাঁচু, স্বাধীন যুগের মকবুল সর্বস্ব হারিয়ে মণ্ডলবাড়ীতে পেট-ভাতায় কাজ করে। ঠাকুর্দার পুরনো ভিটের পোড়ো ডাঙ্গাতে একখানা মাটীর ঘরও তুলেছে। লালী মরে গেলেও লালীর বাচ্ছাকাচ্ছায় মকবুলের ঘর সরগরম। দো-আঁশলা

লালীর লোমওয়ালা মদ্দা বাচ্ছা যেটা নারাণ খুড়োর ছেলে যত্ন করে পুষেছিল সেটা যখন গত সালে মরে গেল তখন মকবুল আত্মীয় বিয়োগের দুঃখ পেয়েছিল কারণ বয়স ওর দেড় কুড়ি পার হয়ে গেলেও কোন আত্মীয় ওর ঘরে আজও পর্যন্ত কেউ আসে নি। নারাণ খুড়োর কথায় মকবুল বলেছিল, হিঁদুই যখন হোতে পারব না তখন যা আছি এমনিই থাকি। মরে গেলে ভাগাড়ে টেনে ফেলে দিও, চিল শকুনে ভোজ খেয়ে পেট ভরাবে। মিছামিছি বিয়ে করে কি লাভ, খাওয়াব কি!

সেই নারাণ মণ্ডলই এখন মণ্ডলবাড়ীর সর্বেসর্বা। নারাণ খুড়োর বাবা বিষ্টু ঠাকুরদা রাতদিন বাড়ীর রোয়াকে বসে মালা জপ করে, সংসারের কোন কিছুই দেখে না। বলে, সারাটা জীবনভোর দেখলুম ত অনেকই! তোর ঠাকুর্দা মহিন্দির ডোমের থেঁৎলানো দেহটাও সেদিন দেখেছিলুম, আর নতুন কিছু দেখার ইচ্ছে আমার নেই। এখন ভালয় ভালয় বিদেয় নিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।

ওদের কাছেই মকবুল শুনেছিল ওর ঠাকুর্দা মহেন্দ্র ডোমের শেষ পরিণতি। আজ সেই মহেন্দ্র নামটাই কলকাতার অজিত বাবুর মুখে ওর নিজের নতুন নাম হিসেবে শুনে ওই সব পুরনো কথাই ওর সাদা-সিধে মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। ঠাকুরদা ছিল মহিন্দির ডোম, ও হোল মহিন্দির লাল রায়। ওর ঠাকুর্দা মহিন্দির, ওর প্রিয় কুকুর লালী, ওর ভালবাসার দুই পাত্র পাত্রী মিলে মিশে একাকার হয়ে ওর মধ্যে এসে ওর নাম হোল মহিন্দিরলাল। ওঃ, ভগবানের কি খেলা, এইটেই মকবুল তখন থেকে ভাবছিল। ভাবছিল, কি আনন্দ! ওরা আমার মধ্যেই আবার ফিরে এল এবং তার চেয়েও বড় আনন্দ, মকবুল আজ এতদিন পরে এত বড় এক হিন্দু বাড়ীতে হিন্দু হয়ে ফিরে এসেছে। হিন্দু হওয়ার কি সুখ তা ও জানে না, মুসলমান যে ভাল নয় সেটাই ওর আবাল্যের সংস্কার। মণ্ডলরা ওকে ভালবাসে, বিষ্টু ঠাকুরদা ওর সঙ্গে অনেক কথা বলে, কিন্তু তবুও ওকে দাওয়ায় উঠতে

দেয় না। আগে দিত, ওর মনে আছে, এখন দেয় না। ও জানে, হিঁদুদের দাওয়ায় ওকে উঠতে নেই, কারণ ও মোচরমান হয়ে গেছে, কিন্তু কলকাতার হালচাল সেই প্রথমবার ও যখন কলকাতায় এসেছিল তখনই দেখে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ঐ যে অত বড় অজিত বাবু, ঐ অজিত বাবু কত সব ভাল ভাল খাবার নিজের ঘরে বসে ওকে খাইয়েছে, উপদেশ দিয়ে বুঝিয়েছে কোনও কথা কাউকে বলিস নি, কিন্তু যেখানে যা দেখবি, যা শুনবি একমাত্র আমাকে বলবি। ক'মাস আগে সেবার যখন অজিত বাবু মণ্ডলবাড়ী গিয়েছিল তখন ওকে ঐ মর্মেই মা-কালীর ছবি ছুঁইয়ে 'কিরে' করিয়ে নিয়েছিল যে প্রাণ গেলেও কোন কথা ও কাউকে বলবে না ; কিন্তু আজকে ওর কি হবে, ও কি করবে ? আজ যে অজিত বাবু গোপনে একটা কথা ওকে বলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে পুরো এক প্যাকেট সিগারেট এবং গোটা একটা দেশলাই দিয়ে এখানে পাঠাল' সে কথাটা এই বাবুকে না বলে ও থাকে কি করে! এত বড় একটা বাবু, ওকে মোচরমান জেনেও ওর সঙ্গে এক সঙ্গে বসে খেতে একটুও আপত্তি করলে না। ভালবেসে হিঁদু সাজিয়ে নিজের ঘরে শুধু জায়গা দেওয়া নয়, নিজের বিছানা, বালিশ, মশারি দিয়ে যত্ন করে ওর বিছানা করে দিল। এই রকম বিছানা সারা জীবনেও মকবুল কখনও পেয়েছে বলে মনে হয় না, অথচ বাবুর ঘরে বাবুর দেওয়া বিছানায় শুয়ে সেই বাবুর সঙ্গে বেইমানী করা, বিশ্ব-ঘাতুকী করা কি ঠিক হবে ? তা ছাড়া এই বাবুও ত ওদেরই স্বদেশী দলের লোক। একে যদি বলে কয়ে কাজটা হাঁসিল করা যায় তা হলে তার চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে। সারা বিকেল বাস-এ চড়ে এতটা পথ আসার সমস্ত হয়রানী সত্ত্বেও মকবুলের ঘুম আসে না। আপন মনেই এই সব তোলাপাড়া করে কিন্তু প্রসাদকে কিছুই বলা এখন সম্ভব নয়। সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তার সুসুপ্তির আভাস নিজের ভূমিশয্যায় জেগে-থাকা মকবুলেরও কর্ণগোচর হচ্চে।

ভোর হতেই প্রসাদের ঘুম ভাঙ্গল। প্রসাদের ইচ্ছা, বাড়ীর অন্ত

কেউ ওঠার আগেই সে মকবুলকে ছেড়ে দেয়। আবার ভেবেছিল অন্য কেউ উঠলেই বা। কাল যখন মকবুল এসেছে তখন যখন শান্তির মা ওকে দেখেছে তখন আজ সকালে ওকে দেখলেই বা ক্ষতি কি! কিন্তু রাত্রে মকবুলকে দেখলেও বুড়ী ঝি তেমন কিছু বুঝতে পারে নি। শার্ট ও কাপড় পরা একটা লোক দাদাবাবুর ঘরে শুয়েছে। নিশ্চয়ই দাদাবাবুর বন্ধু, হয়ত বা কলেজেরই কেউ হবে। কিন্তু আজ সকালে ওর চেহারাটা দিনের আলোয় অন্যেরা যখন দেখবে তখন স্পষ্টই বুঝবে, ঐ চেহারার লোক ওর সহপাঠী অথবা বন্ধু হোতেই পারে না। প্রসাদ তখন বাড়ীর লোকের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে, কাজেই প্রসাদ মনে মনে স্থির করল, মকবুলকে প্রথমে বিদায় করবে, তারপর ছাতের চিলে কোঠা থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে আনবে। একতলার ঘর থেকে কাউকে না জানিয়ে চুপিসাড়ে বিদায় করার কোন অসুবিধেই নেই, কাবণ সদর দরজার চাবি নীচেই থাকে। সেটাও প্রসাদের জন্যই। হস্‌পিটালে মর্ণিং ডিউটিতে যাবার বা নাইট ডিউটি সেরে বাড়ী ফেরার জন্য চাবি ঐ ঝিয়ের কাছেই থাকে। ভাগ্যিস এই রকম বেয়াড়া সব হস্‌পিটাল ডিউটি ছিল তাই প্রসাদের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোন সময়ে আসা এবং যাওয়ার জন্য কোন রকম কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। না হলে এতেই খুব মুস্কিল হোত।

প্রসাদ ডাকল, মকবুল, ঘুম ভাঙল?

মকবুল বল্ল, আইজ্ঞা।

রাত্রে ঘুম হয়েছিল?

আইজ্ঞা।

তাহলে এখন যাবে কোথায়? দেশে ফিরবে নাকি?

মকবুল ভাবছে, সে কথাটা প্রসাদ বাবুকে কি ভাবে বলা যায়। প্রসাদ ভাবছে, ও কোন উত্তর দিচ্ছে না কেন?

প্রসাদ আবার বল্ল, সকালে কোথাও যাবার কথা আছে?

সে বল্লে, আইজ্ঞা।

কোথায় ?

বোস বাবুর কাছে যাবার বরাৎ আছে।

তারপর ?

তেনা যা বলবেন সেই মতো যাতি হবে। কথাগুলো মুখে সে বল্ল বটে কিন্তু মনে মনে ভাবতেই লাগল।

প্রসাদ ওর মনের দ্বন্দ্ব কিছুই বুঝল না, তবে এটা তার মনে হোল যে আজও যদি অজিতদা ওকে এখানেই পাঠায় তা হলে অসুবিধে হবে। তাই বল্ল, শোন মকবুল, তুমি এখন তাহলে বোস বাবুর কাছে যাও কিন্তু আজ আর এখানে এসো না, কারণ আমি আজ বেরুব। আমার কলেজ আছে। রাত্রেও হাস্‌পাতালে ডিউটি দিতে হবে, কাজেই রাত্রেও আমাকে বাড়ীতে পাবে না। বুঝলে ত ? বোস বাবুকে কথাটা বোলো।

আইজ্ঞা।

যা বলার তা বলা হোল না। নীচের কলতলায় সকালের কাজ সেরে মকবুল যখন বেরিয়ে গেল তখন এবাড়ীর বুড়ী ঝি ছাড়া আর কেউই তাকে দেখল না। প্রসাদ মকবুলের সঙ্গে বাইরে গিয়ে চায়ের দোকানে তাকে ভাল রকম খাইয়ে দিল। সে ভাবল, লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। খাওয়ালে যে খুশি থাকে তার জন্য দুশ্চিন্তা নেই।

চায়ের দোকানে বসেও মকবুল কয়েকবার কথাটা বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু বলার কোন সুযোগ সে করতে পারে নি।

অজিত বাবু অসন্তুষ্ট হলেন। বল্লেন, খুঁজে তুমি কোথাও পেলে না ? ঐ ঘরেই ত থাকবে। ও জিনিস কি অন্য কোথাও রাখে ?

মকবুল চুপ করে রইল।

প্রফেসর বল্লেন, ঠিক আছে। আজ রাত্রেও ওখানে থাকবে। ভাল করে খুঁজে দেখবে। ওটা আমার চাই।

মকবুলের মনে হোল বলে, চাই ত ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলেই পারেন, কিন্তু কারুর মুখের ওপোর কোনও কথা বলে, সেই সাহস ওর নেই। প্রথম কৈশোরে ঠাকুর্দার অমানুষিক মৃত্যু, মায়ের ঘৃণিত পরিণতি

এবং উঠ্‌তি বয়সের তিন চারটে বছর রহিমুল্লাদের নিষ্ঠুর মনিবিয়ানীর তাঁবেদারী তাকে যেন বোবা করে দিয়েছে। তার মনোবৃত্তি অনেকটা পোষা জন্তুর মত হয়ে গেছে। অতএব অজিতকে ঐ সব কিছুই বলা হোল না, শুধু বল্ল, আজ তেনা যেতে বারণ করিছেন, বলিছেন হাস-পাতালে যাবেন, রাতেও বাড়ী থাকবেন না।

অজিত বাবু ভ্রূকুটী করলেন। বল্লেন, তুমি যে কাল রাতে খোঁজা-খুঁজি করেছিলে সেটা কি ঐ বাবু টের পেয়েছেন?

মকবুল ঘাবড়ে গেল। শেষে বল্ল, না।

তোমার ওপোর বাবু কি চটেছে?

না ত, সকালে আমাকে দোকানে এনে যত্ন করে খাওয়ালেন। কথাটা সাগ্রহে উল্লেখ করল মকবুল।

তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে অজিত বাবু বল্লেন, ঠিক আছে, তুমি তা হলে আজ দেশে যাও। তিন দিন পরে আবার খড়ের চালান আসবে। সব দিকে নজর টজর রেখো। বুঝলে? কিছু খাবে এখন?

মকবুল নীরব।

একখানা দশ টাকার নোট ওর দিকে এগিয়ে ধরে প্রফেসর বল্লেন, আজ তোমার সঙ্গে যাবার সময় নেই ভাই, তুমি দোকান থেকে যা ইচ্ছে খেয়ে নিয়ে দেশে যাও। পরে আবার দেখা হবে। কেমন?

মকবুল নোটখানা নিল।

আরও কিছু দেব? প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘাড় নেড়ে মকবুল বল্ল, আইজ্ঞা না।

সে যে এ কথাই বলবে তা অজিত বাবু জানতেন। এটাও জান-তেন যে যদি প্রশ্নের ভাষায় তিনি বলতেন, আর কি দেব হে, তাহলে ঐ মকবুলই বলত, দেন, যা ভাল বোঝেন। লোকটা বলে, ওর বয়স দেড় কুড়ির ওপোর, কিন্তু ব্যবহারে কেমন যেন ইডিয়ট। ওর এক-মাত্র গুণ যে ও মিথ্যে বলে না। চুপচাপ সব কিছু দেখে, মনে রাখে, এবং যাকে জানাবার তাকে ছাড়া আর কাউকে প্রাণ গেলেও বলে না,

বলতে পারে না। হয়ত বলার চেষ্টা করলেও বলার উপযুক্ত ভাষা বা সাহস পায় না। পার্টিতে ঐ রকম অস্বাভাবিক লোকেরও প্রয়োজন আছে। ও রকম পশুর মত বিশ্বাসী মানুষ সত্যই দুর্লভ।

সেদিন বিকালেই অজিতের সঙ্গে প্রসাদের দেখা হোল। আজ দেখা করার ইচ্ছা প্রসাদের ছিল না কিন্তু সে নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারল না। কে যেন জোর করে প্রসাদকে ঠেলতে ঠেলতে প্রফেসারের গোপন কেন্দ্রে নিয়ে এল।

অজিত বাবু চমকে উঠেই হাসিমুখে প্রসাদকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বল্লেন, কি হে, আজ না কি তুমি হাসপাতাল নিয়ে ব্যস্ত থাকবে?

কে বল্ল?

মকবুলের কাছে শুনলুম।

হ্যাঁ। এই ত কলেজ থেকেই আসছি। সোজা এখানেই চলে এলুম।

রাতেও বাড়ী থাকবে না?

না। হস্‌পিট্যালে নাইট ডিউটি দিয়েছে।

বেশ। তা আর সব খবর-টবর কি? নতুন কিছু খবর আছে নাকি?

না অজিত দা, নতুন আর কিছুই নেই, কিন্তু আমার সেই—

তোমার কি?

মিঃ ঘটকের দেনাটা—

ও, সে জন্য তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, নেক্স্‌ট্‌ উইকে শোধ দিও। আর হ্যাঁ, দিন কতক কলেজ কামাই করতে পারবে?

কেন? কোথাও যেতে হবে?

হ্যাঁ। ওখানে অনেকগুলো কেস্‌ এসেছে। ওরা দুজনে পেরে উঠছে না। আমি ভাবছি তুমি কাল সকালেই চলে যাও।

কোথাকার কেস্‌ এলো? কোথাও কিছু হয়েছে বলে ত শুনি নি।

সে জানি না। অনেকগুলো এসেছে, তাদের এ্যাটেণ্ড করতে হবে। যাবার সময় কয়েকটা ওষুধও নিয়ে যাবে। ওখানে শর্ট পড়েছে।

পুরুলিয়া ত ?

হ্যাঁ। কাল ভোরে এসপ্ল্যানেড্ বাস্ স্ট্যাণ্ডে আমাদের রিক্সায় ছু'বাক্স ওষুধ পাঠাব। সেই বাক্স ছুটো নিয়ে চলে যেও।

আচ্ছা অজিতদা, আমাদের সেই পঞ্চু কেমন আছে ?

তেমনিই আছে।

আমি বলি কি অজিতদা, ওকেও আমাদের বেস্-এ পাঠিয়ে দিন, না হলে এখানে ঐভাবে থাকলে মারা যাবে।

তা ত বুঝি ভাই, কিন্তু পাঠাই কি করে ? অজিত বাবু ভাবতে লাগলেন।

কেন ? আমাদের ফিয়াটে। আমি ওকে কোনো রকমে নিয়ে যেতে পারব, প্রসাদের সাগ্রহ উত্তর।

তা হলে পরে পাঠাতে হবে। এখন যা শুনছি, বেস্ আমাদের ওভার-ফুল, পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে প্রফেসার উত্তর দিলেন।

আচ্ছা অজিতদা, এতগুলো কেস কি বেহার থেকে এল ? ঐ সীতাপুর এরিয়ায় পুলিসের সঙ্গে যে ফাইটটা হয়েছে তারই কেস্ ?

হতে পারে। বিরক্ত গম্ভীর কণ্ঠে অধ্যাপক বল্লেন, কি, কোথায়, কেন এসব কৌতূহল আমাদের কাছে টাবুড্, তা জানো ত। ও রকম প্রশ্ন আমিও কাউকে করি না।

কিন্তু যারা চার্জে থাকবে তাদের ত জানা দরকার ?

তারা জানে। যার যতটুকু চার্জ সে ততটুকুই জানবে। তোমার চার্জ হোল ছু'বাক্স ওষুধ নিয়ে কাল সকালের বাস্-এ পুরুলিয়া যাবে, সেখানে তারা যে ক'দিন থাকতে বলে থাকবে, চিকিৎসায় তাদের সাহায্য করবে। তোমার কাজ চুকে গেলে ফিরে আসবে। কোনো কিছু প্রশ্ন করা, কোন রকম কৌতূহল এ আমাদের সাজে না।

আচ্ছা অজিতদা, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার কাছে এই বিকেলে এলুম তাই আমাকে কাল ভোরে যাবার ভার দিচ্ছেন। যদি না আসতুম তা হলে কে যেত ?

তুমিই যেতে। গম্ভীর সহাস্যমুখে অজিতবাবু বল্লেন, আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে হাসপাতালে কন্‌টাক্ট করতুম।

প্রসাদ ভাবছে, হয়ত তা নয়। ঘটকদের দেনা শোধের প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই ওকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেন হঠাৎ মনে পড়ল এইভাবে প্রসাদ বল্ল, পঞ্চুর কি করবেন? পরশু দেখে সন্দেহ হোল, গ্যাংগ্রীন সেট্ করছে। জ্বরটাও খুব বেশী, সেপ্‌টিক ফিভার। তবে ছেলেটার স্ট্যামিনা আছে। রেগুলার ড্রেসিং, নার্সিং পেলে ঠিক সেরে উঠবে, কিন্তু এখানে যে ভাবে পড়ে আছে তাতে ও টিকবে বলে মনে হয় না।

তা ত বুঝি, কিন্তু করি কি, ভাবতে ভাবতেই অজিত বাবু বলেছিলেন, এখানকার কোনও হস্‌পিট্যালেও ত দেওয়া যায় না, নানা রকম প্রশ্ন উঠবে, কাজেই—

তাই ত বলছি, কাল সকালে আমার সঙ্গে গাড়ী করে পাঠিয়ে দিন, প্রসাদ আর একবার দাবী করল।

সম্ভব নয়। বল্লুম ত ওভার-ফুল।

কিছুটা রুষ্ট হয়ে প্রসাদ বল্ল, অজিতদা, ওভার-ফুল হয়েছে বোধ হয় পরশু থেকে। খবরের কাগজ পড়ে যা অনুমান করছি সেটাই যদি সত্য হয় তা হলে বাইশ তারিখ রাত্তিরে ফাইট্‌টা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তেইশ তারিখ সকাল থেকে ওভার-ফুল হোতে পারে; কিন্তু আমি ওকে ওখানে পাঠাবার কথা বল্‌ছি আঠারো তারিখ থেকেই। সতেরো তারিখে ওর এ্যাকসিডেন্ট্ হোল, আঠারো তারিখ সকালে আমাকে ওখানে পাঠালেন। সেই দিনেই আমি আপনাকে বলেছিলুম। তখনও ত আপনি আমার কথায় কান দেন নি!

দেখ প্রসাদ, প্রবীণের ভঙ্গীতে অজিতবাবু বল্লেন, তোমাকে যেটুকু কাজের ভার দেওয়া হয় তুমি মনে কর সেইটাই সব; কিন্তু যাদের সমস্ত জিনিস দেখতে হয় তাদের অবশ্যই গুরুত্ব বুঝে প্রায়রিটি দিতে হবে।

তা ত বটেই এবং সেটা যিনি সুষ্ঠুভাবে দিতে পারেন তিনিই

প্রকৃত লীডার। এটা আপনি পারেন বলেই আপনি আমার লীডার। এতে আমি কোন প্রতিবাদ করছি না, তবে ডাক্তার হিসেবে বল্‌ছি ঐ ছেলেটা, ও-ও ত আমাদের পার্টির, পার্টির কাজেই ও জখম হয়েছে, ওর জীবনেরও মূল্য আছে ; তা ছাড়া ওকে উপযুক্ত সেবা-যত্ন করলে পার্টির অন্য কর্মীদের মনেও পার্টির ওপোর অতিরিক্ত আস্থা আসবে, তাই পার্টি কর্মী হিসেবে, ওর ডাক্তার হিসেবে আমি আপনার কাছে এই দাবীটা জানাচ্ছি।

অজিত বাবু ধীর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বল্লেন, সবই ত বুঝি ভাই, কিন্তু উপায় নেই। তোমার এই দাবীটা খুবই উপযুক্ত, কিন্তু অন্য অনেক বাধার জন্যই ওকে আমি সেখানে পাঠাতে পারছি না। না হলে কি একথা তোমাকে মুখ ফুটে বলতে হোত ? তোমার অজিতদার নজরে কি এটা পড়ে নি ভেবেছ ?

প্রসাদ চুপ করে রইল। অজিত বাবু প্রসাদকে ঠাণ্ডা করার জন্যই বল্লেন, ওর ব্যবস্থা এখানেই করব, ভাল ব্যবস্থাই করব, ও ত আমাদের পর নয়।

প্রসঙ্গ বদলে প্রসাদ বল্ল, আচ্ছা অজিতদা, আমাদের পুরানো ব্যাপারটা এবার বলুন, ঘটক বাড়ীর ব্যবস্থা কবে হবে ? আমি শুনেছি মিঃ বি. ঘটক নাকি ভীষণ অসুস্থ। তিনি এখন বাড়ীতে নেই। তাঁকে নার্সিং হোমে পাঠানো হয়েছে।

তাই নাকি ? কি হোল তাঁর ? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন প্রফেসার বোস।

ঠিক জানি না। কবে গেছেন, কি অসুখ তাও জানি না তবে মনে হয় আপনার ঐ অমানুষিক পার্সেলটা পেয়ে উনি স্ট্যাণ্ড্ করতে পারেন নি। ওতেই বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

স্যাড্, অজিত বাবু আপন মনেই স্বগতোক্তি করলেন।

কিছু মনে করবেন না অজিতদা, 'স্যাড' কথাটা আপনার মুখে শোভা পায় না।

প্রফেসার প্রসাদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে রইলেন। প্রসাদ ওঁর চাউনিতে প্রথমটা ঘাবড়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বল্ল, সুব্রতকে নিয়ে আপনি যা খুশি করলেন, কিন্তু বৃদ্ধ লোককে চরম আঘাত দিয়ে কি লাভ হোল আপনার? তিনি আমাদের কোনও অনিষ্ট করেন নি, করবার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি।

গম্ভীর কণ্ঠে প্রফেসার বল্লেন, তোমার ট্রেনিংটা দেখছি এখনও কম্‌প্লিট হয় নি। তুমি জানো, পার্টির মধ্যে এই রকম দোষারোপ করা যায় না। বিশেষ করে যাকে তুমি লীডার মনে করো তার সম্বন্ধে, তার কাজ নিয়ে এ আলোচনা অমার্জনীয় অপরাধ।

আপনার কোনও নিন্দা ত বাইরে কোথাও করি নি অজিতদা। এখানে আর কেউ নেই। এখানেও যদি আপনাকে আমার মনে যা হচ্ছে তা না বলি তা হলে বলব কোথায়? পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে প্রসাদ কথাগুলো দমক দিয়েই বলেছিল।

এ রকম জিনিস ভাববে না। এ কথা মনে আসবে কেন? অধ্যাপকের রাগতঃ স্বর।

মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক মনে সব কথাই আসে অজিতদা। এ সব প্রশ্নের উত্তর আপনি দিবেন না ত দেবে কে? কথাগুলো বিনীতভাবেই প্রসাদ বলতে চেয়েছিল, কিন্তু অজিতের কানে যেন ঠেকল এক উদ্ধত ভঙ্গী।

যাক, ও সব আলোচনা থাক। এখন তুমি যেতে পার। কাল সকাল ছ'টায় এস্‌প্লানেডের বাস গুমটিতে থাকবে। দু'বাক্স ওযুধ নিয়ে দীপ্তি ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওখানে নার্সেরও দরকার। সে নার্সিং-এর জন্য যাবে। খরচের টাকা তারই হাতে পাঠাব।

দীপ্তি! দীপ্তি মেয়েটা ফাইন, লাভ্‌লি, ওয়াণ্ডারফুল। তার নামটা শোনা মাত্রই কেমন একটা শান্তির আমেজ এল প্রসাদের ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অন্তরে।

সে উঠল। বল্ল, তা হলে ক'দিন আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না ?

বোধ হয় নয়। ফেরার সময় দীপ্তিকে সঙ্গে নিয়েই ফিরো।

তা হলে আজকের মতো গুড নাইট অজিতদা।

গুডনাইট প্রসাদ ভাই।

বাস-এ ড্রাইভারের ঠিক পিছনের ছুটো রিজার্ভ সীটে প্রসাদ ও দীপ্তি পাশাপাশি বসেছিল। ঘন্টা বাজিয়ে গাড়ীটা স্টার্ট দিল।

চুপিসাড়ে প্রসাদ বল্ল, এতদিন ছিলেন কোথায় ? কল্‌কাতায়, না বাইরে ?

ওর দিকে ফিরে দীপ্তিও তেমনি অস্ফুট কণ্ঠে বল্ল, সেম্ কোয়েশ্চন আমিও করতে পারি, তবে একটু বেশী। আপনি কোথায় কিসে ব্যস্ত ছিলেন তাও জানি এবং এও ভেবেছি আপনি হয়ত ভুলেই গেছেন।

ইস্, আপনাব অনুমানটি চমৎকার! বুদ্ধির তারিফ করি।

আরও কাছে মুখ নিয়ে কানে কানে বল্ল, ভুলে যাবার চেষ্টা এ পক্ষের ছিল না, অপর পক্ষের থাকলেও থাকতে পারে।

দীপ্তি পেছন দিকে চেয়ে দেখল। ঠিক ওদের পেছনে ছু'জন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার নিজেদের কারবারের কথায় মশগুল হয়ে উঠেছে। বাসখানা তখন হর্ণ দিয়ে ছুটছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাই নি, প্রসাদ চুপিসাড়ে দীপ্তিকে স্মরণ করিয়ে দিল।

আমিও পাই নি, দীপ্তি উত্তর দিল।

আমার প্রশ্ন আগে, উত্তরটা আমার আগে পাওয়া উচিত।

হাসিমাখা মুখখানা ওর দিকে ঘুরিয়ে দীপ্তি বল্ল, আপনি হস্‌পিট্যাল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, আমি ছিলুম আমার পরীক্ষা নিয়ে। খবর সবই পাই স্যার।

তাই বুঝি ? তা ম্যাডামের পরীক্ষাটা কেমন হোল ?

সো সো। খবরটা না বেরোন পর্যন্ত কিছু বলা উচিত নয়।

কি পরীক্ষা ?

এখন বলব না, রেজাল্ট বেরুলে শুনবেন। আচ্ছা আপনি চিরুনি এনেছেন?

এনেছি। দেব?

না, এখন চাই না। মানে শেষ মুহূর্তে চিরুনিটা ড্রেসিং টেবিলে ফেলে এসেছি।

আহা রে, চুক্ চুক্।

দুষ্টু। দীপ্তি প্রসাদের হাতে খোঁচা মারল।

ভিড় কাটিয়ে গাড়ীখানা ফাঁকা রাস্তায় স্পীড দিয়ে ছুটছে।

জানালা দিয়ে রোদ্দুর এসে দীপ্তির মুখের উপর পড়ল। দীপ্তি নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে গগল্‌স্ বার করে পরল। প্রসাদ ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

সকালে খাওয়া দাওয়া কি হয়েছে, প্রসাদ প্রশ্ন করে।

ওমলেট, টোস্ট, কফি, নিজের ঘরে তৈরী করে।

হোস্টেলে?

হ্যাঁ।

হোস্টেলে কি বলে ছুটি নিলেন?

বাড়ী যাবার নামে।

এর মধ্যে বাড়ী থেকে যদি কেউ আসেন?

সে ভয় নেই। ক'দিন আর বাইরে থাকব?

পশমী স্কার্ফটা দীপ্তির গা থেকে প্রায় খুলে এসে ছিল। সেটাকে পুরো খুলে দীপ্তি বল্ল, ধরুন ত, এটা ভাঁজ করি, বলেই নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা প্রসাদের কোলের ওপোর রাখল। তারপর নিজেই স্কার্ফখানা ভাঁজ করে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা কাঁধে ঝোলাবার সাইড ব্যাগটা তুলে তার মধ্যে স্কার্ফটা পুরে দিল। ভ্যানিটি ব্যাগটা কোলে নিয়ে প্রসাদ বসে বসে দেখছিল, সেই সঙ্গে দীপ্তির সাময়িক স্পর্শে স্নিগ্ধ পুলক ভোগ করছিল। দীপ্তি তার সাইড ব্যাগটা পুনশ্চ পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে স্থির হয়ে বসল। তার দৃষ্টি রইল সামনের দিকে।

প্রসাদ বল্ল, এটা কি আমাকে প্রেজেন্ট করলেন ?

হাসিমুখ ঘুরিয়ে দীপ্তি বল্ল, করলুম, যদি ওটা হাতে নিয়ে আপনি কলেজে, হস্‌পিটালে, বাড়ীতে সর্বত্র যেতে রাজী থাকেন তা হলে ওটা আপনারই।

শুধু এটা কেন মিস্ চ্যাটার্জী, এর মালিককে শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে সর্বত্র যেতে পারি। এই যেমন যাচ্চি।

ইস্, কনুই দিয়ে প্রসাদের পাঁজরায় খোঁচা দিল দীপ্তি।

প্রসাদ এবার প্রতিশোধ নিল নিজের ডান হাত দিয়ে দীপ্তির বাঁ হাঁটুতে চিমটি কেটে।

উঃ। দীপ্তির মুখে অস্ফুট শব্দ, হাউ নটি !

ইট ছুঁড়লে পাটকেল আসে, এভ্রি অ্যাকশান হ্যাজ ইটস্ রি-অ্যাকশান।

ধন্যবাদ নিউটন সাহেব। বাঁ হাত দিয়ে প্রসাদের হাঁটুতে চাপ দিয়ে দীপ্তি বল্ল, লক্ষ্মী হয়ে বোসো।

বসে বসে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন কর, প্রসাদ দীপ্তির কথায় যোগ দিল।

সেই সঙ্গে পারো ত কবিতা লেখ, দীপ্তির উত্তর! উত্তর দিয়েই দীপ্তি হেসে ফেলল, বল্ল, ছিঃ, লোকে কি ভাববে ?

যা ভাবা উচিত, অম্লানবদনে প্রসাদ উত্তর দিল।

লজ্জার বালাই নেই ! দীপ্তির মন্তব্য।

সেই জন্যই ত একজন নীল চশমায় চক্ষু-লজ্জাকে ধামা চাপা দিয়েছে, প্রসাদ টিপ্পনী কাটে।

দীপ্তি নীরব। গাড়ীখানা সবেগে ছুটে চলেছে। অনেক আগে এক সার বয়েল গাড়ী রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে দেখে ড্রাইভার ঘন ঘন হর্ণ দিতে লাগল। প্রসাদ দীপ্তির উরুতে চাপ দিয়ে বল্ল, টাঙ্ ডাউন স্ট্রাইক নাকি ? জিহ্বা ধর্মঘট !

যান, বাজে বাজে কথা, মানে-মাত্রা নেই।

আপনি বুঝি মানের বই পড়তে ভালবাসেন ?

হ্যাঁ, বাসি। মুখ ঘুরিয়ে কৃত্রিম কোপ প্রকাশের ভঙ্গীতে দীপ্তি হেসে ফেলল। তারপর জোর করে প্রসাদের হাতখানা টেনে নিজের হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

এইভাবে কিছুক্ষণের নীরব ঘন সান্নিধ্যে একজোড়া তরুণ বুভুক্ষু মন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

পুরুলিয়ার পথ। পাব্লিক বাস্ ছুটছে তীরবেগে। সামনে ড্রাইভারের মাথার পাশ দিয়ে উইণ্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্চে পিচের রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে গাছ, কোথাও সাজানো শ্রেণীবদ্ধ বিশাল গাছ খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে রাস্তার অনেক ওপোর দিয়ে শাখাবাহু বাড়িয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, আবার কোথাও বা দু'পাশে টিনের চালা, মেটে বাড়ী, পুকুর, বাগান, ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ীদের ইতস্ততঃ আনাগোনা। চায়ের দোকান, মুদিখানা, ময়রার দোকান, টিউব কল, রাস্তার পাশে কোথাও বসেছে গ্রাম্য বাজার, সেখানে লরী, বয়েল গাড়ী, সাইকেল রিক্সার ভিড়। ঘৎ ঘৎ শব্দে ধান-কল চলছে। বাস্ থামছে, যাত্রীরা ওঠা নামা করছে, ভিখারী ভিক্ষা চাইছে, আবার কোথাও বা দু'পাশে ঘন গাছ, গাছের পর গাছ, লোকালয় বলতে কিছুই নেই অথচ ফরেস্ট বল্লেও বোধ হয় যেন বাড়িয়ে বলা হয়। পায়ের তলায় চলতি বাসের একটানা শব্দ, জানালা দিয়ে হু হু হাওয়ায় দীপ্তির শ্যাম্পু করা শুকনো চুল ইতস্তত উড়ছে, কাঁধের আঁচলটা খসে পড়েছে কোলের ওপোর ; সেই আঁচলের তলায় দীপ্তির নরম হাত, তার পাঁচটা আঙ্গুল প্রসাদের বাঁ হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের সঙ্গে সুতোয় সুতোয় পাক খেয়ে একেবারে জট পাকিয়ে গেছে। ব্যাক্‌রেস্টের গা দিয়ে প্রসাদের ডান হাতটা দীপ্তির কোমর জড়িয়ে ওদিকে চলে গেছে সঙ্গোপনে অন্য সব যাত্রীদের অগোচরে। সেখানে একজোড়া তরুণ চর্মের অবাধ মিলন। ব্লাউজ যেখানে নামে নি এবং কাপড় যেখানে ওঠে নি সেখানেই সেই কটিচর্মকে বেষ্টন করেছে

হাত কাটা বুশ সার্ট পরিহিত প্রসাদের নিরাবরণ দক্ষিণ বাহু। বাস্-এর কম্পনে ওরা দু'জনেই নড়ছিল, তবে ওদের দেহ এবং হৃদয় উভয়ের স্পন্দনের মধ্যে কোনটা অধিক স্পন্দিত সে হিসেব ওদের দু'জনের কেউ কি করেছিল ?

সত্যি, কি সুন্দর, দেখ দেখ, দীপ্তি নীচু গলায় প্রসাদকে বলেছিল।

কুমারীর সিঁথির ন্যায় কালো পিচের রাস্তা দিগন্ত পর্যন্ত সরলরেখায় বিস্তৃত, আর দু'পাশে ঘনশ্যাম উদ্ভিদ, বড় বড় গাছ, গাড়ীখানি তীরবেগে সিঁথিপথ অতিক্রম করছে। মেঘশূন্য আকাশের প্রখর কিরণ দু'পাশের বড় গাছের আলিঙ্গিত আচ্ছাদন ভেদ করে শুষ্ক জনহীন পথের ওপোর নামতে পারে নি। প্রসাদ বল্ল, ঠিক যেন গাছের টানেল, আমরা যেন ছায়া-সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

প্রসাদের ডান গালে দীপ্তির বাঁ গালটা হঠাৎ ঠেকে গেল। সেটা বাস্-এর ঝাঁকুনীতে, না অন্য কোন ঝাঁকুনীর ফলে? দীপ্তির নীল গগল্স্টা খসে পড়ল। চট করে ডান হাত দিয়ে সেটা ধরে দীপ্তি প্রায় যেন প্রসাদের কানে কানেই বল্ল, এই যাত্রা যেন শেষ না হয়। তার চোখের পাতা ও ভ্রূযুগলের ঘনকৃষ্ণ রোম পুলকে ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়েছিল। প্রসাদ তার ডান হাতটায় আরও একটু জোর দিয়ে দীপ্তিকে আরও নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করল। দীপ্তিও সেই আকর্ষণে সাড়া দিল। অল্প নড়ে চড়ে আরও কিছু সরে এল প্রসাদের দিকে। ওদের দু'খানা দেহের দু'টো পাশ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। পুরুলিয়াগামী পাব্লিক বাস্ তখন পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পীডে বাঁকুড়ার দিকে একটানা ছুটে চলেছে।

বেলা দুটোর পর বাসখানা থামল। বাঁকুড়া টাউন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওরা দু'জনে নেমেছিল। দীপ্তি গগল্সটা পরে লীলায়িত ছন্দে পায়ের শ্লীপার টান্তে টান্তে বড় একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকল প্রসাদকে অনুসরণ করে। দোকানদার গরম রসগোল্লা কাঁচা শালপাতার ঠোঙ্গায় টেবিলের ওপোর দিয়ে গেল। পেট ভরে দু'জনে রসগোল্লা

খেল কম নয়। সাড়ে পাঁচ টাকার বিল হোল। কাঁচাগোল্লা সন্দেশের তালও নিল আড়াই সের। দীপ্তি বল্ল, ওয়ার্কার আছে মোট দশজন, এতেই হয়ে যাবে। সন্দেশের চ্যাংড়াটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে কমলা লেবু নিল, আপেল নিল, কচি শসা নিল, আরও সব কি কি কিনে মাঝারী একটা ঝুড়ি ভর্তি করে বাসে উঠল। প্রসাদ জানে বাসের যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওদের বাস্ থেকে নামতে হবে।

ছোট একটা স্টপে এসে ওরা নামল। মালপত্র অনেক। দুটো তোরঙ্গয় ভর্তি ওষুধ, ফলের ঝুড়ি, খাবারের চ্যাংড়া, একটা প্লাসটিকের বাল্তি তার মধ্যে একটা এনামেলের গামলা, দু'জনের দুই সাইড ব্যাগ। সমস্ত নামিয়ে ওরা দেখল একখানা ঝড়ঝড়ে মোটর গাড়ী গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়ীর ড্রাইভার গাড়ীর বনেট্ খুলে বোধ হয় যেন গাড়ীটা মেরামত করছিল। আরও দু'জন প্যাসেঞ্জার সেখানে নেমেছিল। দেহাতী গোছের লোক। দীপ্তি ও প্রসাদ দু'জনেই তাদের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। তারা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি কাঁধে ফেলে ডানদিকের রাস্তায় হেঁটে চলে গেল।

প্রসাদ গিয়ে মোটরের ড্রাইভারকে বল্ল, ভাড়া যাবে?

চিৎকার করেই বলেছিল। ড্রাইভার বল্ল, দেখি, গাড়ীটা ঠিক করতে পারলে যাব।

কি হোল গাড়ীতে, প্রসাদ ড্রাইভারের পাশে এসে দাঁড়াল। মৃদু কণ্ঠে বল্ল, এসে গেছি।

ততোধিক মৃদুকণ্ঠে ড্রাইভার বল্ল, হাতটা ধুয়ে আসি।

টিউব কলে হাত ধুয়ে ড্রাইভার ও প্রসাদ হাতাহাতি করে মালগুলো তুলে গাড়ীতে স্টার্ট দিল। ড্রাইভার রাস্তার বাঁ দিকের মেটে পথে গাড়ী নিয়ে নামল।

অনেকক্ষণ মেটে রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে গাড়ীখানা ফের বাস-রাস্তা পার হয়ে ডান দিকের পথ ধরল। কিছুটা গিয়েই গাড়ী ঢুকল এমন

একটা জায়গায় যেটাকে জঙ্গল বল্লেও অন্যায় হয় না। চাপ চাপ শুকনো পাতার ওপোর দিয়ে উঁচু নীচু খানাখন্দ পার হয়ে এক বড় গাছের তলায় গাড়ীটা দাঁড়িয়ে দু'বার হর্ণ দিয়ে পরম স্বস্তিতে ড্রাইভার বিড়ি ধরাল।

মিনিট দশেক একেবারে শুন্‌সান, কোথাও কোন লোকালয় আছে বলে কেউ সন্দেহই করতে পারে না। গাছের মাথায় মাথায় হাওয়ার মৃদু মর্মর, অজানা পাখীর শব্দ এখান ওখান থেকে কানে আসে, এক-টানা ঝিঁঝিঁর ডাক, কিন্তু ধারে-কাছে একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। প্রসাদ ঘড়ি দেখল পৌনে চারটে।

হঠাৎ গাছ-গাছালির ভেতর থেকে দু'টি গেঁয়ো লোক বেরিয়ে এল। সাঁওতাল বলেই প্রসাদের মনে হোল। ওরা এসেই নমস্কার করে বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর পেছনের লাগেজ বক্স খুলে তোরঙ্গ দু'টো দু'জনে তুলে নিল। ও দু'টো দু'জনে মাথায় নিয়ে একজন হাতে নিল প্লাসটিকের বালতি আর একজনের হাতে রইল ফলের ঝুড়ি। একটি মাত্র কথাও উচ্চারণ না করে ওরা সেই ঘন বনের ভেতর ঢুকে পড়ল। ওদের পেছনে পেছনে চলল প্রসাদ ও দীপ্তি। প্রসাদের হাতে ছিল সন্দেশের চ্যাংড়া, কাঁধে সাইড ব্যাগ। ড্রাইভার একটা নমস্কার পর্যন্ত করল না, গাড়ীতে স্টার্টও দিল না, ভাড়াও চাইল না, কেবল আর একটা বিড়ি নিয়ে ধীরে সুস্থে ধরিয়েছিল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা হেঁটে নিজের শাড়ী সামলাতে সামলাতে শ্রান্ত বিপর্যস্ত হয়ে ওরা যখন পার্টির বেস্ হস্‌পিট্যালে এসে পৌঁছাল তখন এক' গেঞ্জি-গায়ে গৌরবর্ণ তরুণ ছোকরা দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানাতে জানাতে এগিয়ে এসে বল্লেন, এত দেরি? বাস্ ত শুনলুম ঠিক সময়েই এসেছে।

আমরা উল্‌টো দিক দিয়ে এসেছি। সোজা রাস্তায় দু'জন প্যাসে-ঞ্জার পায়ে হেঁটে এগিয়েছিল, প্রসাদ উত্তর দিল।

ও, আচ্ছা আচ্ছা, তা আর কোন অসুবিধে ত হয়নি?

না।

গাছতলায় ক্যাম্পের চেয়ারে বসে প্রসাদ বল্ল, এটার ব্যবস্থা করুন। এটা কিন্তু আপনাদের, পেসেন্টদের নয়।

ফর্ ইম্‌পেসেন্টস্ ওনলি? ওরে—

একটি মেয়ে এল। চ্যাংড়াটা হাতে নিয়ে দীপ্তির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্ল, তুমিই বুঝি দীপ্তি, না ভাই?

দীপ্তি বল্ল, হ্যাঁ।

এসো এসো, মেয়েটি এক হাতে চ্যাংড়া অপর হাতে দীপ্তির হাত ধরে বড় একটা গাছের গোড়া ঘুরে অদৃশ্য হোল।

এই হোল পার্টির বেস্ হস্‌পিট্যাল। মাস দেড়েক আগে প্রসাদ এখানে একবার এসেছিল। সেবারেও অনেক ওষুধ-পত্র সাজ-সরঞ্জাম এনেছিল। ঐ ট্যাক্সিই তাকে আজকের মতো এনেছিল। গেঞ্জি-গায়ে ডাক্তার ছেলেটি তার আগে থেকেই এখানে পোস্টেড রয়েছে। সেই ছেলেটি ডাক্তারী পাশ করেছে কি না তা প্রসাদ এখনও জানে না; কিন্তু এটা সে দেখেছে যে সার্জারীতে তার হাত বেশ ভাল। সেবারে প্রসাদ এসে তিন দিন থেকে সুশান্ত ভট্টাচার্যের কাজে এবং ব্যবহারে সুশান্তকে শ্রদ্ধাই করেছে। প্রসাদের মনে হয়েছে, সুশান্তর ইন্-চার্জ হবার যোগ্যতা আছে।

সেই বিকেল থেকেই ওরা কাজে লেগে গেল। দীপ্তিও নার্সিং-এর কাজে হাত লাগাতে বাধ্য হোল কিন্তু বোঝা গেল ঐ কাজে সে আদৌ পোক্ত নয়।

সন্ধ্যার পর দীপ্তি রীতিমতো মুস্কিলে পড়লো। এখানে আলোর নিদারুণ অভাব। যে কটা হ্যারিকেন আছে সেগুলোতেও ব্ল্যাক আউটের ব্যবস্থা। চিমনির গায়ে এমনভাবে কালো রং লাগানো যার ফলে হ্যারিকেনের আলোটা নীচের দিকেই পড়ে, পাশে বা দূরে যায় না। তা ছাড়া ঘর-টরও এখানে তেমন নেই। পেসেন্ট আছে তেষট্টি জন, খড়ের চালা যেটুকু আছে তাতে বড় জোর চল্লিশ জনকে

শোয়ান যায়। দিনের বেলা অধিকাংশ পেসেণ্টই বাইরে গাছতলায় থাকে। একখানি ঘর আছে সুশান্তের নিজস্ব, খড়ের দেওয়াল খড়ের চাল। সেই ঘরে একটা দরজাও আছে কিন্তু জানলা বলে কিছুই নেই। সে ঘরে কেউই যায় না, প্রসাদও যায় নি। আন্দাজে বোঝে ঐ ঘরেই হাসপাতালের প্রধান ভঁাড়ার। দামী যন্ত্রপাতি এবং ওষুধ সবই ঐ ঘরে। ওদের নিয়ে আসা বাক্স দুটো ঐ ঘরেই চলে গেল। বাল্‌তি ও গামলাটা গেল অপারেশন থিয়েটারে। বড় চালাখানার এক পাশে গেঁও মিস্ত্রীর তৈরী কাঠের টেবিল পেতে তৈরী হয়েছে অপারেশন থিয়েটার। সেই থিয়েটার ঘেরা আছে কাপড়ের পর্দা দিয়ে। তা ছাড়া আছে ওদের অনেক কিছুই। অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে ড্রিপ দেবার ষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত, অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই নেই। সব চেয়ে বড়ো কথা সুশান্ত এবং তারই এক সহকর্মী এই দুই ডাক্তার, জনা দুই কম্পাউণ্ডার, চার জন মহিলা নার্স, একজন পাচক এবং আর একজন লোক, সে যে কি নয় তার ঠিক নেই, এই দশ জনই কলকাতার কাছাকাছি স্থান থেকে এসেছেন এবং দু'জন ঝাড়ুদার ও মেথর আছে এদেশী সাঁওতালী। লোহার খাট ছিল আটখানা, সেগুলো দেওয়া হয় সেই সব রোগীদের যাদের বিশেষ বিশেষ পশ্চারে রাখা দরকার। কাউকে 'দ' করে রাখতে হবে, কারুর ভগ্ন উরুর জন্য পাখানা টান করে ঝুলিয়ে দিতে হবে, ক্লোরোফর্ম করে অপারেশনের পর জ্ঞান ফেরাবার জন্য কারুর উর্ব্বাঙ্গ নীচু করে শোয়াতে হবে এই সব রোগীরাই ঐ আটখানা খাট দরকার মত ভাগাভাগি করে পেত, বাকীরা মেঝেয় খড় বিছিয়ে তার ওপোর সতরঞ্চি, কম্বল বা চেটাই পেতে থাকত। গেল বারেই প্রসাদ দেখেছিল সুশান্তবাবু নিজে চেটাই পেতে খড়ের বালিশ-মাথায়, তুলোর কম্বল-গায়ে জানুয়ারী মাসের প্রবল শীতে রাত কাটাচ্ছেন। সেবার রাত্রে সুশান্তর সঙ্গেই ওর শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল, এবার কোথায় হবে তা জানা নেই। রোগী এত এবং তাদের জন্য কাজও এত জমে রয়েছে যে রাত্রে আদৌ শোবার সময় মিলবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।

কিন্তু এত কষ্ট সত্ত্বেও দশজন কর্মী যা আছে তারা সকলেই আনন্দে আছে, সকলেই প্রাণ দিয়ে খাটছে। এইখানেই সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে এই সব অবৈতনিক লুকানো হাসপাতালের প্রভেদ। সেবারেই প্রসাদ ভেবেছিল এই প্রভেদটা কি করে হয়? প্রসাদের মনে হয়েছিল এখানকার তুলনায় হাজার গুণ আরামে থেকেও মেডিকেল কলেজের কর্মীরা খুশিও নয়, সুখীও নয়। ঐ প্রসাদই সেখানে পান থেকে চুন খসলে চটে ওঠে কিন্তু এখানে এই কদাহার ও সর্ব রকম অসুবিধা সত্ত্বেও গত বারে পুরো তিন দিন অফুরন্ত উৎসাহে দৈনিক আঠারো বিশ ঘণ্টা একটানা ডিউটী সে দিয়েছে। ঐ মেয়েগুলো পর্যন্ত মুখ বুজে ছোট বড় সমস্ত কাজ বিনা দ্বিধায় করে যায়। ঐ সুশান্তবাবু বা দ্বিতীয় ডাক্তার জয়ন্তবাবু দরকার পড়লে স্বহস্তে মেথরের কাজও করেন। এটা প্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছে। প্রসাদও সেবারে রোগীর এমন সব পরিচর্যা করেছে যা কলিকাতার হাসপাতাল ভাবতেও পারে না। সেখানে একজনও ঐ কাজ করতে বাধ্য হোলে গোটা হাসপাতালে স্ট্রাইক হয়ে যায়। প্রসাদের মজা লাগে এই ভেবে যে, একই মানুষ বিশেষ অবস্থায় কি ভাবে বদলে যায়। ঐ 'পরম-বাবু' দীপ্তি সারা দিন বাস্ ঠেঙ্গিয়ে জঙ্গলের এতটা পথ এই-ভাবে হেঁটে এসে আলুসেদ্ধ, ডাল ও ভাত খেয়ে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত টিম্‌টিমে আলোয় যে রকম একটানা কাজ করে চলেছে, রোগীদের নোংরা তুলো পর্যন্ত যে রকম নির্বিকার চিত্তে দু'হাত দিয়ে ঘাঁটছে, এটা স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত। পার্টি এবং পার্টির কাজকে, পার্টির উদ্দেশ্যকে কতখানি ভালবাসলে রাজশক্তির প্রচণ্ড ভয়কে উপেক্ষা করে, মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন' দিয়ে এই ভাবে আত্মবলি দিতে পারে। বরং উল্টো বলা হোল। এই কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে হয় না। এ যেন জীবনের পরমতম আনন্দ, এ যেন এক মহান্ উৎসব। এ যেন এক ঈপ্সিত ভোগ!

তা ভোগই ওদের সে রাত্রে হয়েছিল। রাত একটা নাগাদ সমস্ত রোগীর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা শেষ করে সুশান্ত ডাক্তার ওদের দু'জনকে

ছুটি দিলেন এবং সেই সঙ্গে দিলেন একখানা পাতার চেটাই ও লম্বা গোছের খড়-পোরা বালিশ। বল্লেন, এবার ভাই হেল্প ইয়োর-সেল্‌ভ্‌স্‌। তোমরা দু'টিতে ঐখানে গিয়ে শুয়ে পড়গে। দু'টো বিছানা দিতে পারলুম না বলে কিছু মনে কোরো না। আমার স্টকে আর কিছু নেই।

আপনার? আপনি শোবেন না?

পরে। আজকের নাইট ডিউটি আমিই দেব, হাসিমুখে সুশান্ত ডাক্তার উত্তর দিয়েছিলেন।

সেদিন একখানি চেটাইয়ে খড়ের বালিশটিমাত্র সম্বল করে ধনীপুত্র প্রসাদ ও সুন্দরী দীপ্তি দু'জনে একত্রে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

দীপ্তি বল্ল, প্রসাদদা, বলেই জিভ কেটে বল্ল হ্যাঁগো, এই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে জন্তু জানোয়ার আসে যদি।

প্রসাদ ওর কথা বলাটা লক্ষ্য করেও আন্তরিক উত্তেজনা চেপে সহজভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ধীরে সুস্থে বলেছিল, সে রকম ভয় নিশ্চয়ই নেই। থাকলে কি এই ভাবে এরা থাকতে পারে!

কিন্তু কারবলিকের গন্ধ পাচ্ছ?

পাচ্ছি। হয়ত কারবলিক ছড়াবার দরকার আছে তাই ছড়িয়েছে। তা হলেই বোঝো, যে ভয় তুমি পাচ্ছ সে ভয় নেই। থাকলেও কারবলিকে সে ভয় দূর হয়েছে।

বাস-এও ওরা আপনি-আপনি করে কথা বলেছে কিন্তু আপনিটা কখন তুমি হয়ে গেছে তা ওরা দু'জনের কেউই স্মরণ করতে পারে না। তার ওপোর দীপ্তির হ্যাঁগো বলাটা প্রসাদ কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

বালিশের দুই প্রান্তে দুজনে মাথা দিয়ে শুয়ে প্রসাদ বল্ল, এই কি আমাদের কি বলে সেই ফুলশয্যা!

চুপ্‌, দীপ্তি অস্ফুটে ধমক দেয়।

তুমি কি বলেছ বল ত?

কেন?

এভাবে একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা এরা করল তাই বলছি।

যা বল্লে শোভা পায় তাই বলেছি, তোমার মত লাজ লজ্জার মাথা ত একেবারে খাইনি।

মানে?

মানে পরে শুনো, এখন ঘুমোও।

ও, তুমি বুঝি বলেছ আমরা বিবাহিত। প্রসাদের একটা হাত দীপ্তিকে বেষ্টন করে। দীপ্তি নীরব।

কাকে বল্লে?

বীথিকে, উত্তর দেয় দীপ্তি।

কিন্তু তোমার ত সিঁন্দুর নেই।

মুখ ঘুরিয়ে দীপ্তি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বল্ল, সেই কথাই বীথি পাক-চক্রে বলেছিল।

তুমি কি বল্লে?

বল্লুম, আমি খ্রীস্টান, ও হিন্দু।

তাই নাকি? আমি ত জানতুম না, প্রসাদ হাসতে লাগল।

জেনে দরকার নেই। ঘুমোও ত।

জায়গাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবুও যেটুকু হাওয়া ছিল তাতে মাঝে মাঝে একটু আধটু ধুলো যে ওড়ে নি তা নয়। খোলা আকাশের তলায় মাটীর ওপোর শুতে ওরা দুজনের কেউই অভ্যস্থ নয়। চোখ চাইলেই উঁচু উঁচু ডালপাতার ফাঁক দিয়ে অনেকখানি আকাশ একসঙ্গে নজরে পড়ে। দীপ্তি ওকে ঘুমুতে নির্দেশ দিলেও নিজে ঘুমুতে পারে নি। কিছুক্ষণ পরে বল্ল, ঘুমিয়েছ?

প্রসাদ বল্ল, হ্যাঁ, একেবারে অঘোরে, ডীপ স্লীপ।

দীপ্তি হাসল। বল্ল, একটা জিনিস দেখেছ, মশা এখানে একেবারে নেই, কোনও পোকামাকড়ও দেখছি না।

একটা পোকা আছে, ধেড়ে পোকা, হাতের চাপ দিয়ে প্রসাদ ইঙ্গিত করল।

যাঃ। খালি দুষ্টুমি।

এমন রাত কি আর হবে?

আজ তোমার নাইট ডিউটি নেই?

আছে। ডিউটি দেব?

এই, খবরদার। চুপচাপ থাকো। প্রসাদের হাতখানা সরিয়ে দীপ্তি উঠে বসল।

কি হোল? উঠছ কেন?

চাদরটা বার করি। শেষ রাতে বেশ ঠাণ্ডা হবে।

সাইড ব্যাগটা দীপ্তি নিজের কাছেই রেখেছিল। জিপ্ টেনে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সেই অন্ধকারেই স্কার্ফটা টেনে বার করল। তারপরও ব্যাগটা হাতড়াতে লাগল।

আকাশের আলোয় প্রসাদ দেখ্‌ছিল। বল্ল, কি খুঁজছ?

টর্চটাও বার করে রাখি।

দরকার নেই, আমার আছে। নিজের ঘাড়ের তলা থেকে ছোট্ট টর্চটা টেনে নিয়ে দীপ্তির হাতে দিয়ে প্রসাদ বল্ল, এই ত রয়েছে। তুমি রাখো।

দীপ্তি টর্চ জ্বেলে হাতের ঘড়ি দেখল।

ক'টা?

সওয়া এক।

আলো নিভিয়ে দু'জনের মাথার মাঝখানে সেটাকে রেখে দীপ্তি বল্ল, এইখানে রইল। দরকার হলে নিও।

প্রসাদ দীপ্তিকে টেনে শুইয়ে দিল। বল্ল, চার ঘণ্টা পরেই উঠতে হবে। জানুয়ারীতেও দেখে গেছি এরা পাঁচটার পরে কেউ বিছানায় থাকে না।

দীপ্তি স্কার্ফখানা গুছিয়ে গায়ে দিল।

প্রসাদ বল্ল, সব কিছু ভাগ করে ভোগ করাই কমরেডশিপ, বলেই স্কার্ফের এ পাশের অংশটা টেনে কিছুটা নিজের গায়ে দেয়।

ছিঃ, মুখে এমন গন্ধ। কটা সিগ্রেট খেয়েছ?

গুনে গুনে খাইনি। এবার থেকে গুন্‌ব।

প্যাকেটগুলো ফেলে দেব, মুখ সরিয়ে দীপ্তি রাগ দেখাল।

একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়াল কিছুটা দূরে ডেকে উঠল। দু'হাত দিয়ে প্রসাদকে আঁকড়ে ধরে দীপ্তি বল্ল, ও কি? কিসের শব্দ?

শেয়াল। শেয়াল প্রহরে প্রহরে ডাকে শোন নি?

না। তা ওরা যদি এখানে আসে?

আসবে না। মানুষের কাছে ওরা ঘেঁষে না। ভয় নেই?

দীপ্তি হাত সরিয়ে নিল।

প্রসাদ বল্ল, শেয়ালগুলো ভাগ্যিস ডেকেছিল।

কেন গো?

কেন বুঝলে না? ওরা ডেকেছিল বলেই ত! আমি চাই, ওরা অনবরত ডাকুক।

যাঃ, অত হ্যাংলামি কেন?

দূরে পাতার ওপোর দিয়ে কে যেন হেঁটে গেল।

কে? অস্ফুট কণ্ঠে দীপ্তি জিজ্ঞাসা করে।

ঘাড় তুলে অন্ধকারেই যথাসম্ভব দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে প্রসাদ দেখে দেখে বল্ল, বোধ হয় নাইট্‌ গার্ড।

কে গার্ড দেয়? তুমি ওদের চেনো?

সবাইকে কি আর চিনি? সেবারে দেখেছি এখানকার স্থানীয় ওয়ার্কাররা তীর-ধনুক নিয়ে সারা রাত নিঃশব্দে পাহারা দেয়।

তাহলে জন্তু জানোয়ারের ভয় নিশ্চয়ই আছে, দীপ্তি মন্তব্য করে।

ঈষৎ হেসে প্রসাদ বলে, জন্তুর চেয়ে মানুষকে বেশী ভয়।

মানুষ? কে মানুষ?

বুঝে দেখ। যে ভয়ে বাস্‌ স্টপ থেকে আসার সময় সোজা রাস্তায় না গিয়ে গাড়ীখানা ঘুরে এল উল্টো দিক দিয়ে।

দীপ্তি নীরবে মাথা নাড়ল। দীপ্তির ঘাড়ের তলা দিয়ে প্রসাদের যে

হাতখানা প্রসারিত ছিল সেই হাতের ওপোর দীপ্তির মাথা নাড়াটা প্রসাদের স্পর্শগোচর হোল।

হ্যাঁ গো; ক'দিন থাকতে হবে এখানে, দীপ্তি এক সময় প্রশ্ন করে।

কেন, ভাল লাগছে না?

না, তা কেন, তবুও জানতে ইচ্ছে হয় ত।

সেটা জেনো ডাঃ ভট্টাচার্যের কাছে। ওঁর দরকারেই আমরা এসেছি।

দীপ্তি নীরব।

কিছু পরে প্রসাদ বলে, এখানে আসার অর্ডার তোমার ওপোর কখন গেল?

দীপ্তি ভেবে চিন্তে বল্ল, কাল সন্ধ্যার পরে।

কে বল্ল?

আমার এক বন্ধু এসে-আমাকে নিয়ে গেল অজিতদার কাছে। অজিতদাই তখন বল্লেন। টাকা-কড়ি, বাসের রিজার্ভেশন টিকিট সমস্ত দিয়ে এখানকার জন্য ফল খাবার যা নিতে হবে সব বলেছিলেন।

আমি সঙ্গে যাব তাও তখন শুনেছিলে?

শুনেছিলুম বলেই ত এলুম, না হলে আসার ইচ্ছে ছিল না। দীপ্তি নিজের মুখখানা প্রসাদের গলার কাছে গুঁজে দিয়ে নিজের মেকি লজ্জা নিবারণ করেছিল। প্রসাদ ওকে আদর জানাচ্ছিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবছিল অজিতদার কাণ্ডটা। নিশ্চয়ই আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে ভুলিয়ে রাখার কারসাজি। শয়তান কোথাকার!

ভারতী সেন নামে পার্টির কোন মেয়েকে তুমি জান? প্রসাদ প্রশ্ন করে।

ভারতী! হ্যাঁ ওর নাম শুনেছি, দেখাও যেন হয়েছে ওর সঙ্গে।

কবে? কতদিন আগে?

সে প্রায় ধরো গিয়ে মাস দু'য়েক কি আরও আগে হবে। কেন গো? এ কথা কেন?

প্রসাদের মনে হোল ভারতীর কথা ও দীপ্তিকে বলে, কিন্তু বল্লে না, চেপে গেল।

কই বল্লে না? দীপ্তি অনুযোগ করে।

না, বলব আর কি, এমনি জিজ্ঞেস করলুম।

তোমার সঙ্গে ভারতীর খুব ভাব বুঝি? তারই বোধ হয় এখানে আসার কথা ছিল?

না না, তা নয়। তুমি যে আমার সঙ্গে আসবে সে কথাই অজিতদা আমাকে বলেছিলেন। সে জন্যেই ত এলুম, না হোলে কি আসতুম না কি?

মেয়েটা যেন গলে গেল!

হাওয়াটা আরও জোরে বইতে লাগল। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। দু'জনে আরও ঘন হয়ে একখানি ছোট স্কার্ফে যথাসম্ভব নিজেদের আচ্ছাদিত করল।

ভোরের হাওয়ায় প্রথম যখন প্রসাদের সম্বিৎ এল তখন দেখল দীপ্তি অঘোরে ঘুমুচ্ছে এবং ওদের ওপোর স্কার্ফ ছাড়া আরও একটা ভারী গোছের কি যেন রয়েছে। তাড়াতাড়ি বালিশ হাতড়ে টর্চ জ্বেলে প্রসাদ দেখল একখানা কালো রঙের তুলোর কম্বল ওদের দু'জনের ওপোর চাপা দেওয়া রয়েছে। প্রসাদ বুঝল রাত্রে কোনও সময় কেউ এটাকে তাদের ওপোর দিয়ে গেছে। দিয়েছে তাই রক্ষে, না হলে এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ওর মনে হোল, এটা নিশ্চয়ই সুশান্তদার কাজ। একটু লজ্জাও পেল, পরক্ষণেই ভাবল, লজ্জা কিসের? দীপ্তি ত বুদ্ধি করে বলেই রেখেছে।

সকাল থেকেই আবার কাজ। কাজের ওপোর কাজ। তেষট্টি জনের মধ্যে পঞ্চান্ন জনই একেবারে শয্যাশায়ী। কয়েকজনের ভাল জ্ঞানও নেই। তাদের পরিষ্কার করা, খাওয়ান, ওষুধ ইঞ্জেক্‌শান দেওয়া, চার্ট লেখা, সমস্তই হাঁসপাতালের নিয়মে করতে হয়। তফাৎ এই যে হাসপাতালের টিকিটে নাম থাকে, এখানে নাম নেই, নম্বর আছে।

কাজের লোক মাত্র আটজন, ন'জনও বলা যায়। কিন্তু নবম ব্যক্তি কখনও রান্না ঘরের হেল্পার, কখনও কাপড়-চোপড় কাচে, কখনও বা রোগীর মাথায় জল ঢালে। তা ছাড়া রোগীদের মধ্যে তু'জন খাড়া হয়ে উঠেছে। তু'জনেরই একটা একটা হাত এখনও প্লাসটার করা অবস্থায় শ্লিং-এ ঝোলানো আছে। তা সত্ত্বেও তারা তাদের সুস্থ হাত দিয়ে অন্য রোগীদের সাহায্য করছে। আজ সকালে রোগীরা সকলেই বেশ খুশি। তাদের বরাদ্দ প্রাতরাশের ওপোর আজ তারা এক এক টুকরো ফল পেয়েছে। সেই ফল, যা প্রসাদরা গতকাল বাঁকুড়া থেকে এনেছিল।

অপারেশন করে বুলেট বার করা হয়েছিল এমন এক রোগীর ব্যাণ্ডেজ খুলে সুশান্তদা যখন ড্রেস করছিলেন তখন সেই নবম ব্যক্তিটি দ্রুতপদে এসে ডাক্তারকে কি যেন বল্ল। ডাক্তার বল্লেন, প্রসাদ, এ্যাটেণ্ড করো, আমি আসছি। ডাক্তার প্রায় দৌড়ে নিজের সেই খড় দিয়ে ঘেরা গোপন ঘরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এসে প্রসাদের বাঁধা ব্যাণ্ডেজটা দেখে খুশি হয়ে অন্য রোগীকে এ্যাটেণ্ড করতে লাগলেন। প্রসাদ থাকতে পারল না, বল্ল, কি ব্যাপার, দৌড়ে গেলেন! কোনো—

ডাক্তার বল্লেন, ও কিছু নয়। এম্‌নি।

এতেই প্রসাদ বিরক্ত হয়। জিজ্ঞাসা করলে কেউ কিছু বলে না। এটা সে অবশ্যই জানে যে যে-কাজে তারা নেমেছে তাতে গোপনীয়তা অবশ্যই দরকার কিন্তু তা হলেও ওর কাছে এ রকম লুকোচুরি, এত চাপাচাপির কি প্রয়োজন? একটা সিরিয়াস উণ্ড খুলে অর্ধেক কাজ করে কোন ডাক্তারের সেখান থেকে সরে যাওয়া চিকিৎসা-বিধানে অমার্জনীয় অপরাধ। সেই কাজই উনি করলেন অথচ মুখে বল্লেন, এম্‌নি। তাও যদি বুঝতুম অন্য কোন মোর-সিরিয়াস্ রোগীকে ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন দিতে গেলেন তা হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু তা নয়, নিজের জানলাহীন ঘরের মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বেরুলেন। ঐ ঘরে কোন রোগী যে নেই এটা সকলেই জানে, তা হলে ও-ঘরে এত

জরুরী কাজ কি থাকতে পারে! ঘর থেকে বেরুবার সময় খালি হাতেই এলেন, কোনো জরুরী জিনিস যে আনতে গিয়েছিলেন তাও নয়। তবে এটা কি?

ভাবতে ভাবতে প্রসাদের মনে হোল ও ঘরে কি আছে জানতে হবে। ডাক্তার নিজে ঐ ঘরে থাকে কিন্তু গত বারে প্রসাদ যখন এসেছিল তখন প্রথম রাত্রে ডাক্তার ওকে নিজের কাছে নিয়ে ঘুমুলেও ও-ঘরে নয়, বড় চালাটার এক ধারে দুটো পাশাপাশি বিছানা পেতে ওরা দু'জনে ছিল। তখন অবশ্য রোগীর সংখ্যা ছিল পনের যোল জন। সকলেই চালা ঘরে ছিল। সে রাত্রে ডাক্তারের ঘরে কে ছিল প্রসাদ জানে না। পরের রাত্রে ডাক্তার নিজের ঘরে ছিল, একাই ছিল। সেদিনও প্রসাদ ছিল পূর্বদিনের জায়গায়, একলা!

ঐ ঘরের রহস্য প্রসাদকে ভাবিয়ে তুল্‌ল। কিন্তু ভাব্‌বার সময় কৈ। কাজের পর কাজ, অফুরন্ত কাজ ওদের সকলের সবটুকু সময় ভরিয়ে রেখেছে।

বেলা দশটা নাগাদ বাজার এল। অনেকখানি মাংস, কতকগুলো ডিম, কয়েক ঝুড়ি আনাজ, তরি তরিকারি এবং এক কলসী দুধ; মাছ নেই।

এর পর এক সময় দীপ্তি বল্ল, ডান হাতের ব্যাপারটা আজ ভালই হবে, কি বলো?

সে গুড়ে বালি। ও আমি গেল বারেই দেখে গেছি।

কেন?

ওর সবটাই রোগীদের।

তাই নাকি? তা ভালো! আহা, ওরা ত পার্টির জন্যই ভুগছে!

তা ত বটেই।

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজে ওদের পাতে এক টুকরো হিসেবে মাংস পড়েছিল। ডিম ওরা পায় নি, দুধ ত নয়ই। ওদের চা হোত গুঁড়ো দুধে।

ত্নপুরে কিছু সময় সকলে মিলে এক সঙ্গে বিশ্রাম করেছিল গাছতলার ছায়ায় বসে। সে সময় তুই ডাক্তার সুশান্তর ঘরে গিযে দরজা বন্ধ কবেছিলেন। সে দিকে চেয়ে চেয়ে প্রসাদের আর একবার মনে হোল, ঘরটায় আছে কি ?

এক সময় কথায় কথায় বীথিকে জিজ্ঞাসাও করেছিল। বীথি বলেছিল, ওটাই ত স্টোর। কি আছে, কি চাই, এই সব হিসেব ওঁরা ঐ ঘরে বসেই কবেন।

উত্তরটা প্রসাদেব মনঃপুত হয় নি। হতে পাবে স্টোব কিন্তু স্টোবই শুধু নয়, তাব চেয়েও বেশী কিছু আছে ঐ ঘবে। ও ঘরে ডাক্তাবেব দৌড়ে যাবার কারণ কি ?

সেদিন সন্ধ্যায় একজন পেসেণ্টেব ছুটি হোল। একেবাবে ছুটি। চিরকালান ছুটি। বিকেল থেকেই তু'জন ডাক্তার ওকে নিয়ে অনেক চেষ্টা কবেছেন, প্রসাদও সঙ্গে ছিল, কিন্তু কিছুই হোল না। ডাক্তাররা রোগীকে ছেড়ে উঠে এলেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য বল্লেন, কাল থেকেই ওর কনডিশান খারাপ হচ্ছিল। ব্লাড দিলে হয়ত বাঁচত কিন্তু ওর গ্রুপের ব্লাড আমাদের স্টকে নেই।

প্রসাদ বল্ল, আমি যে সাপ্লাই এনেছিলুম তাতেও ছিল না ?

না। ডাক্তার বল্লেন, আমি খবর দিয়েছিলুম কিন্তু 'ও' গ্রুপের ব্লাড তাঁরা পাঠান নি। ঐ রক্তটা চট্ করে কোথাও মেলে না।

এটা প্রসাদেরও জানা আছে। ঐ বিশেষ শ্রেণীর রক্ত সত্যই তুর্লভ।

মনটা সকলেরই খারাপ হয়ে গেল। কেবল পাশের রোগীটি আপন মনেই বলেছিল, বেঁচে গেল!

তার উচ্চারিত শব্দ তু'টি ওদের কয়েকজনের কানে গিয়েছিল। শুনেও কেউ কোন মন্তব্য করে নি।

রাতের অন্ধকারে দলের সেই নবম ব্যক্তি এবং একজন কম্পাউণ্ডার মৃতকে ধরাধরি করে বাইরে আনল। তারপর একখানা বাঁশের সঙ্গে

দেহটাকে বেঁধে কাঁধে নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে গেল অন্য কম্পাউণ্ডার এবং একজন সাঁওতাল কর্মী। দ্বিতীয় কম্পাউণ্ডারের হাতে ছিল প্রায়-অন্ধকার হ্যারিকেন এবং সাঁওতালের হাতে ছিল বেল্‌চা ও কোদাল। প্রসাদ সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। ডাক্তার কড়া ভাবে নিষেধ করলেন।

ওরা চলে গেল।

প্রসাদ বুঝল ওকে কবর দেওয়া হবে, আগুনে পোড়ানো হবে না।

এই প্রসঙ্গে দীপ্তি সেই রাত্রেই এক সময় বলেছিল, সবাই ত হিন্দু, না পুড়িয়ে বেচারীকে কবর দেবে কেন?

প্রসাদ বিজ্ঞের মত বলেছিল, পোড়ানোর যে অনেক হ্যাঙ্গাম। বড় ভয় ধোঁয়ার এবং আগুনের শিখার। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যে দিনের বেলায় ধোঁয়া এবং রাত্রে আলো দেখা যায়, বুঝছ-না এরা হ্যারিকেন-গুলোয় পর্যন্ত কালি মাখিয়ে ব্ল্যাক আউট করে রেখেছে। এদের নাইট গার্ডের হাতেও টর্চ থাকে না।

কিন্তু আমাদের কাছে যে টর্চ আছে?

বেশীক্ষণ জ্বাললেই আপত্তি করবে। তুমি জানো, এখানে ক্যামেরা পর্যন্ত আনতে দেয় না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। গতবারে যখন এসেছিলুম তখন আমার ছিল একটা ক্যামেরা। সুশান্তদা ক্যামেরাটা নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন। ফেরার সময় সেটাকে আমার বাক্সর মধ্যে ভরিয়ে চাবি বন্ধ করিয়ে আমাকে লোক সঙ্গে দিয়ে মোটর পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। ঐ মোটর আমাকে বাস্‌ স্টপ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল, যেমন আমরা এখানে আসার সময় দেখেছিলে। আমাকে বাস্‌-এ উঠিয়ে বিদায় দিয়ে তবে তার ছুটি।

ঐ ড্রাইভার তাহলে পার্টির লোক?

নিশ্চয়। ঐ যে গাড়ীর বনেট খুলে মেরামত করার ভাণ করছিল, ওটাও তার অভিনয়। যদিই মনে কর অন্য কোনো যাত্রী ওখানে নেমে

ভাড়া করতে চাইত তাহলে ও বলত, গাড়ী খারাপ, কি করে যাব তবে একটা কথা, এখানে ট্যাক্সি চড়ার যাত্রী বড় কেউ নামে না।

আচ্ছা, মনে কর, বাসে যদি কোন যাত্রী কেউ জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছেন, কিম্বা যদি কোন ছদ্মবেশী পুলিস সন্দেহ করে যে এত সব বাক্স নিয়ে এই জঙ্গলে এরা কোথায় নামছে তাহলে কি হবে?

তাহলে কি বলতে হবে, অজিতদা তোমাকে শিখিয়ে দেন নি?

না ত।

তাহলে ধরা পড়লে কি বলতে?

সে তুমি জানো। আমি আসছি তোমার সঙ্গে।

প্রসাদ নীরবে ভাবতে লাগল। দীপ্তি বল্ল সত্যি, কেউ জেরা করলে কি উত্তর আছে বল—না, শিখে রাখি।

প্রসাদ বল্ল, উত্তর ভাল রকমই আছে। শুনেছি এখান থেকে পাঁচ ছ'মাইল দূরে একটা ক্রিশ্চিয়ান মিশন আছে। সেখানকার লোকেরা বাস-এ এসে ঐখানেই নামে। তারাও ট্যাক্সি ভাড়া করে। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলে পুরানো আমলের কয়েকটা জমিদার বাড়ীও আছে। সেখানেও কলকাতা থেকে কেউ কেউ আউটিং করতে আসে। সে জন্যে আমাদের মতো কোন বাবু-যাত্রী এখানে নামলে সহজে সন্দেহ করার কিছু নেই।

তুমি সেখানে গিয়েছিলে?

না। এখান থেকে কোথাও যাবার নিয়ম নেই। এখানেই আসবে, এখান থেকেই চলে যাবে।

ব্যস্? তবে তুমি জানলে কি করে?

ঐ যে বল্লুম, শুনেছি। গত বারে যখন এসেছিলুম তখন অজিতদা সঙ্গে ছিলেন। তিনিই বলেছিলেন।

এটা কতদিন হয়েছে?

তা জানি না। একটু থেমে বল্ল, গত বারে যখন এসেছিলুম তখন এত আয়োজন ছিল না। এখন দেখছি সাজ সরঞ্জাম অনেক হয়েছে।

সেবারে দেখেছিলুম, মাত্র দু'খানা লোহার খাট, এখন দেখছি আটখানা। এখন যেন ফুল ফ্লেজেড্ ক্যাম্প হস্‌পিট্যাল।

এ হাসপাতাল কি অজিতদা'রই তৈরী ?

তা ঠিক জানি না। তবে মনে হয় অজিতদার কর্তৃত্বই এখানে যোল আনা।

তাই মনে হয়। আপন মনেই কথাগুলো উচ্চারণ ক'রে দীপ্তি নিজের আঁচলখানা দেখতে দেখতে বল্ল, অজিতদা খুব ভাল লোক, তাই না ? কি মনে হয় বলো ত।

প্রসাদ প্রথমে উত্তর দেয় নি। পরে বল্ল, তোমার কি মনে হয় ?

ভালো বলেই ত দেখি।

থিংস্ আর নট্ হোয়াট দে সীম, বুঝলে ?

কি রকম ?

থাক, ও আলোচনায় দরকার নেই।

কেন গো ? আমাকেও বলবে না ?

দেয়ালেরও কান আছে।

এখানে কোন দেওয়াল নেই।

সে জন্যই ত আরও ভয়।

দীপ্তি ক্ষুণ্ণ হোল। একটু পরে বল্ল, এইভাবে পার্টি করে আমাদের কি লাভ ? তাছাড়া যদি ধরা পড়ে যাই—

তাহলেই জীবন শেষ, দীপ্তির কথাটা প্রসাদই সমাপ্ত করল।

তাহলে আছি কেন ? তুমিও ত আছ ? দীপ্তি প্রসাদের মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়েছিল।

প্রসাদ নিরুত্তর।

কি গো, বল্লে না ?

বলার কিছু নেই।

কেন ? তোমার কি আর ভালো লাগছে না ?

প্রসাদ নীরব। পরে বল্ল, তোমার কেমন লাগছে বলো।

থ্রিলিং। তাছাড়া এত লোক রয়েছে তাই বেশ লাগে।

কি রকম লাগে?

যেন মনে হয় আমরা এক নতুন রাজ্য চালাচ্ছি। একটা গোপন রাজ্য, তার নিজস্ব সৈন্য সামন্ত, নিজস্ব আইন কানুন, সব কিছুই নিজস্ব।

আর তুমি সেই রাজ্যের রাণী?

হেসে ফেলে দীপ্তি বল্ল, না না, আমি রাণী হব কেন? আমি আমি, আমি সেই রাজ্যের একজন, একজন—

কগ্ হুইল। কি বলো? প্রসাদের মুখে অবজ্ঞার হাসি।

কগ্ হুইল! সে আবার কি? কগ্ হুইল কি গো?

কগ্ হুইল জানো না? কগ্ হোল যন্ত্রের সেই সমস্ত ছোট চাকা যা নিজের চেষ্টায় চলতেও পারে না, থামতেও পারে না। যন্ত্র চল্‌লে সেগুলো চলে, থামলে থামে, অথচ সেই চাকা না থাকলেও যন্ত্র চলে না।

অ। তাই বুঝি? তা, তা ধরো না কেন আমরা ঠিক তাই।

তোমরা—মানে মেয়েরা হয়ত তাই মনে করতে পারো। পুরুষদের মধ্যেও যাদের আত্মবিশ্বাস কম তারা হয়ত এই অবস্থায় মানিয়ে নেয়, কিন্তু সবাই তা পারে না।

তোমার বুঝি ভাল লাগছে না?

বলে আর কি হবে, ম্লান মুখে প্রসাদ উত্তর দেয়। এমন সব ঘটনা ঘটে—প্রসাদ থেমে গেল।

কি ঘটনা? বলো না গো। বলবে না?

প্রসাদ বল্ল, বলার কিছু নেই।

তবু?

শুনবে? একান্তই যদি শুনতে চাও তাহলে শোনো, কিন্তু কথাগুলো যেন আর কারুর কানে না ওঠে। নেহাৎ তোমাকেই বলছি।

পাগল! তোমার কথা কি আর কাউকে বলতে পারি?

রাত্রির অন্ধকারে দু'জনের নিভৃত আলাপ চলছিল। প্রসাদ

তার ভালবাসার পাত্রীকে ভারতী ও সুব্রতর কাহিনী সংক্ষেপে বলে গেল। এক লাখ টাকা দেবার পরেও কি রকম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাদের ছিন্নমুণ্ড বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে সেই বৃদ্ধকে বিনা কারণে মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত কথাই প্রসাদ বলেছিল। সব শুনে দীপ্তি শিউরে উঠল। প্রসাদের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিল, তুমি এর কোন ব্যবস্থা করবে না?

কি করব?

কিছু ভাবো নি?

ভেবে কি হবে? উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি কোনো দিন নিতে পারি তখন সে কথা বলব। মিছামিছি গোটা কতক গালভরা কথা বলে আসর গরম করে লাভ কি?

দীপ্তি যেন কি ভাবল। শেষে বল্ল, আমার কথা শুনবে? আমি বলি কি, কিছুই তুমি করতে পারবে না। তোমার আমার কোন ক্ষমতা নেই, সেক্ষেত্রে ঝুটমুট খোঁচাখুঁচি করে নিজেদের বিপদ টেনে আনা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

প্রসাদ দৃঢ়ভাবে বলেছিল, না, বুদ্ধিমানের কাজ নয় তা ঠিকই। কিন্তু সেই রকম স্বার্থবুদ্ধিই যদি আমার থাকবে তাহলে এই দলে কাজ করতে আসব কেন?

কি করবে?

যেমন আর পাঁচজনে করে। ছাত্র হিসেবে আমি ভালই ছিলুম। পাশ আমি ঠিকই করতুম। তারপর বড় চাকরী পাওয়া কিম্বা নিজে ডিস্‌পেন্সারী দিয়ে প্র্যাকটিস্ জমানো সবই পারতুম। সুপারিশ বা টাকার অভাব আমার হোত না।

তবে পার্টিতে এলে কেন?

ঐ যে বল্লুম, স্বার্থবুদ্ধি তেমন কিছু ছিল না বোলে। দেশের অভাব অভিযোগ, চতুর্দিকের দুর্দশা, এই সব দেখে দেখে দুনিয়াটা আমার কাছে তেতো হয়ে গিয়েছিল। চলতি ব্যবস্থায় দেশের দুঃখ ঘুচল

না। সিকি শতাব্দীর স্বাধীনতা ভোগ করার পরেও কর্তারা দেশের দুর্ভোগ ঘোচাতে পারলেন না, অথচ এদিকে এঁরা বল্লেন, এই পথেই সকলের দুঃখু ঘুচবে। তাই এদের সঙ্গে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লুম কিন্তু এখানেও—

প্রসাদ থেমে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য মনে হোল, এত কথা একে বলা কি ঠিক হচ্ছে!

কিন্তু পরক্ষণেই দীপ্তির অবাধ সান্নিধ্যে সন্দেহের রেশটা মুছে গেল। এদিকে দীপ্তিও সরলকণ্ঠে বল্ল, এখানে কি? এঁরাও কি কিছু করতে পারবেন না বলে মনে হচ্ছে?

সেই রকম সন্দেহই ত হয়। যাদের কথার ঠিক নেই, সেই সব নেতার ওপোর কি সাহসে নির্ভর করি বলতে পার?

তাহলে কি পার্টি ছেড়েই দেবে?

ছাড়তে ত চাই, কিন্তু যতদূর জানি, এদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি নেই।

আমিও তাই শুনেছি, দীপ্তি বল্ল, এখানে আসা খুব সহজ, বেরোনো যায় না।

হ্যাঁ। ভাবতে ভাবতে প্রসাদ বল্ল, তার অবশ্য কারণও আছে। এখানে যারাই কাজ করে তারা এত সব গোপনীয়তা সত্ত্বেও এমন কিছু জেনে ফেলে যে, তারা ইচ্ছে করলেই পার্টিকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। সে জন্যই এরা কাউকে ছাড়তে পারে না। আমার কি মনে হয় জানো, আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, লুকোচুরি করে খুন খারাপীর পথে ত্রাসের সৃষ্টি করা যায়, কোনও ভাল কাজ করা যায় না।

কিন্তু যে সব দেশ ধনীদের শোষণ থেকে মুক্ত হয়েছে তারা ত এই ভাবেই হয়েছে।

তা হয়ত হয়েছে, কিম্বা হয়েছে কিনা তাও জানি না। সে দেশে ত যাই নি, তাদের সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি সে সবই শোনা-কথা। সেই শোনা-কথার ভেতরেও এত রকম উলটো পাল্টা সব শোনা যায় যে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তাই বা বলি কেমন করে। তাদের

বিরুদ্ধে যে সব কথা শোনা যায় সেগুলোকে তারা বলে শত্রুদের প্রোপাগ্যাণ্ডা, কিন্তু তাদেরটাই যে মিথ্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা নয় তারই বা প্রমাণ কি ?

একটা দেশ মিথ্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা দিয়ে এতদিন চালাতে পারে, এত উন্নতি করতে পারে ? এ কি হয় ?

কেন হবে না ? মনে কর, সে দেশের কর্তারা এক তরফা মিথ্যে বলে চলেছেন, প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি কারুর নেই,উপায়ও নেই। এই আমাদের ছোট্ট দলের মধ্যেই দেখ, অজিতদা যা করছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের বলার বা করার কিছুই নেই। আমরাই যদি গোটা দেশের পুরো কর্তৃত্ব পাই তাহলে এইটেই বজায় থাকবে। ফলে, ওপোরের গোটা কয়েক লোকই হবে মনিব, বাকী আমরা সব ক্রীতদাসের মতন চাট্টি চাট্টি খাব আর মনিবের হুকুম তামিল করব। এদিক ওদিক করলেই কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প, না হয়ত এলিমিনেশন, খতম।

আমরাও ত মনিব হয়ে বসতে পারি।

পারি, কিন্তু সেই পারার জন্মই কি পার্টি তৈরী হয়েছিল ? আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমরা সব সমান হব, ছোট বড় কেউ থাকব না। মুখে বলব সবাই কমরেড, আর মনে ভাবব কবে আমি নেতা হয়ে সকলকে দাবিয়ে নিজের কব্জায় বাঁধব, এরকম ডুপ্লিসিটিকে আমি ঘেন্না করি। তাহলে এখন যাঁরা কত্তা হয়ে রয়েছেন তাঁদের অপরাধ কি ? এ রাজ্যে আমাদের স্বাধীন খবরের কাগজ রয়েছে, আমরা আমাদের ইচ্ছেমত দল তৈরী করতে পারছি, আর সব চেয়ে বড়ো সুযোগ রয়েছে পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ লোকের ভোটে আমরা ইচ্ছেমত শাসনভার যে কোন দলের ওপোর দিতে পারি।

ওরা কি সে রকম পারে না ?

না। আমার বিশ্বাস ওদের সেই মানসিক স্বাধীনতা পর্যন্ত নেই।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। শেষে প্রসাদ বল্ল, চলো, এবার ওঠা

যাক। আজ আমাদের ডিউটি। দেরি হোলে হয়ত সুশান্তদা রিপোর্ট পাঠাবে, ওরা কাজ করতে আসেনি, এসেছিল হনিমুন করতে।

এ রকম রিপোর্টও হয় নাকি?

কে জানে! এদের মধ্যে কি যে হয় আর কি হয় না তা এরাই জানে। এই সামান্য ছোট ছোট জিনিসগুলোই দেখ, একজন পেসেন্ট মরে গেলে তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় তা ঐ ক'জন ছাড়া আর কেউ জানে না। কাল ঐ মৃতদেহ সৎকারের দলে যেতে চাইলুম, ওরা কিছুতেই যেতে দিল না। যারা নিয়ে গেল তারা কত রাত্রে ফিরল তাও জানা গেল না। ঐ কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসাও করেছিলুম। সে হাসল, কোন উত্তর দিল না। আর অত কথা কি, সুশান্তদার ঐ খোড়ো ঘরটার ভেতর কি আছে তাও কি কেউ জানে? তুমি জানো, ঐ ঘরে কি আছে?

না, অবাক বিস্ময়ে মেয়েটা উত্তর দিয়ে খুকীসুলভ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি আছে গো?

কে জানে, উত্তর দিল প্রসাদ, তারপরেই বল্ল, আমার মনে হয়—। প্রসাদ থেমে গেল।

কি মনে হয়? দীপ্তির সাগ্রহ প্রশ্ন।

প্রসাদ থেমে থেমে বল্ল, ঠিক জানি না, তবে অনুমান করি, বোধ হয় ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার আছে।

কি করে বুঝলে?

ভোরবেলা দাঁত মাজতে মাজতে ঐ ঘরের পেছন দিকে গিয়েছিলুম। মনে হোল ঘরের ভেতর কে যেন কথা কইছে। একজনের গলাই শুনতে পেলুম। ওধারের দিকে চেয়ে দেখি ছাঁচের তলায় আড়ালের ভেতর রয়েছে চাকা-দেওয়া ট্রান্সমিশন এ্যানটেনা। সেই তখনই মনে হোল—

ও জিনিসটা কি?

মৃদু হেসে প্রসাদ বল্ল, ওটা হচ্ছে ছোট ব্রডকাস্টিং সেটের এরিয়াল।

তোমার আমার বাড়ীতে যে রেডিও আছে সেগুলোয় সমস্তই একতরফা বাইরের কথা শোনা যায়, বলা যায় না, এগুলোয় বলাও যায়, শোনাও যায়।

বা রে! এ ত বেশ মজা। এ জিনিস তুমি দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি। এই সেটে কথাও বলেছি। অনেকটা ফোনের মত। মাউথ পিস্-এ কথা বলা হয়, হেড ফোনে শোনা যায়।

তোমার বাড়ীতে আছে? দেখাবে? দীপ্তির চোখে মুখে উজ্জ্বল আগ্রহ।

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রসাদ বল্ল, না, এখন আর নেই। তা ছাড়া আমার বাড়ীতে কোনো কালেও ওসব ছিল না। ছিল আমার বোনের বাড়ীতে। আমার ভগ্নীপতির ঐ সবের সখ ছিল প্রচুর। ট্রান্সমিশনের লাইসেন্স সে নিয়েছিল। তার কয়েকজন বন্ধুরও ঐ রকম সেট ছিল। ঐ সেট-এ সে তাদের সঙ্গে গল্প করত। আমিও দু'তিন দিন ঐ সেট-এ কথা বলেছি।

এখন আর নেই কেন?

ওর লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে। সেই যে বছর চীনের সঙ্গে ভারতের লড়াই হোল সেই সে বছরেই আমাদের গভর্ণমেণ্ট সমস্ত প্রাইভেট ট্রান্সমিশন লাইসেন্স বাতিল করে সমস্ত সেট বাজেয়াপ্ত করেন।

প্রসাদ উঠে দাঁড়াল। দীপ্তিও উঠল। বল্ল, এরা কি তাহলে ঐ রকম একটা সেট রেখেছে?

তাই ত মনে হয়।

চলতে চলতে দীপ্তি বল্ল, এরা লাইসেন্স পেল কি করে?

হুঁঃ, এদের কোনটার লাইসেন্স আছে? এই যে এদের প্রত্যেকের পকেটে পকেটে পিস্তল ঘুরছে সেগুলোর কি লাইসেন্স আছে?

দীপ্তি যেন খুবই ঘাবড়েছে এমনই ভঙ্গী করে ধীরে ধীরে প্রসাদের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

রাত্রে আহারের পরে প্রসাদ এক সময় সুশান্ত ডাক্তারকে বল্ল, আর কত দিন থাকতে হবে সুশান্তদা?

কেন? খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

প্রসাদ বল্ল, না, সে জন্য বলছি না। তবে কিনা এখনও ইচ্ছে আছে পড়াশোনাটা চালাব, এরই মধ্যে বন্ধ করব না। তাই—

ও, আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, কাল পরশুর মধ্যে চলে যেও। তোমাকে ছাড়তে আমার খুব অসুবিধে নেই। কিন্তু নার্সিং স্টাফের ওপোর ভয়ানক চাপ পড়ছে, তাই ভাবছি দীপ্তিকে ছাড়লে এখানে যারা আছে তারা মনঃক্ষুন্ন হবে।

কিন্তু সুশান্তদা, অজিতদা বলে দিয়েছেন ওকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে।

তাই বুঝি? তাহলে ভাই আরও কয়েকদিন তুমিও থেকে যাও। সাত, বারো, একুশ আর বাইশ এই চারটে পেসেন্ট একটু সজ্ঞান হলে আমি দীপ্তিকে ছাড়তে পারব।

একুশ বাইশ কি সারবে?—প্রসাদ সন্দেহ প্রকাশ করে।

আমরা ডাক্তার হিসেবে অবশ্যই আশা রাখব, তবে তুমি যা বলছ, মনে হয়, ইউ আর রাইট।

সাত নম্বর?

আমরা চেষ্টা করব, ফলাফল ভগবানের হাতে।

আচ্ছা ওদের বাড়ীর লোক ওদের খবর কিছুই জানে না তো?

ডাক্তার প্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

সে রাত্রে ডাক্তার প্রসাদ ও দীপ্তিকে নাইট ডিউটি দিয়েছিলেন।

লোকালয়হীন জঙ্গলের মাঝখানে নিশুতি রাত। থম্‌থমে অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। নক্ষত্রের আবছা আলো এবং কালি মাখিয়ে ব্ল্যাক আউট করা দুটি মাত্র হ্যারিকেন সম্বল করে বাষট্টি জন রোগীর গুপ্ত হাসপাতাল। ডিউটি দেবার নিয়ম অনুযায়ী একজন বাইরে, একজন ভেতরে; বাইরে ছিল প্রসাদ, চালার ভেতর দীপ্তি। দু'জনের কাছে দুই হ্যারিকেন, তাতে ঘরে বাইরে মাকড়া মাকড়া অন্ধকার। সমস্ত জায়গাটা ঘিরে আছে গভীর জঙ্গল। সেখানে গাঢ় অন্ধকার, থমথমে

জমাট নীরবতা, সাহিত্যিকের ভাষায় বলতে গেলে 'বরফ-কঠিন নিশ্ছিদ্র অন্ধ নীরবতা'। প্রসাদ ভাবতে লাগল এই নীরবতাকে বরফ-কঠিন বলা হয় কেন? তার মনে হোল, যে লেখক এই নীরবতাকে বরফ কঠিন বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই এই রকম অন্ধকারকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, ভালবেসেছেন। প্রসাদের মনে পড়ল বিভূতি বাবুর আরণ্যক। ভাষাটি প্রসাদের ভালো লেগেছিল কিন্তু বর্ণিত সেই পরিবেশ কলকাতার আবহাওয়ায় প্রসাদের ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম হয় নি। প্রসাদ ভাবল, বাড়ী ফিরে আর একবার আরণ্যক বইটা পড়তে হবে। এবার এই অভিজ্ঞতার পরে ঐ বইটার বর্ণনা বোধ হয় সঠিক উপলব্ধি করতে পারব।

অনেক দূরে একদল শেয়াল ডেকে উঠল,—শৃগালের প্রহর ঘোষণা। প্রসাদের মনে পড়ল প্রথম রাত্রের শিবারব দীপ্তির সমস্ত লজ্জা ভেঙ্গে দিয়েছিল। আজ সে একা-একা চালার মধ্যে কি করছে কে জানে? আজও কি ভয় পেয়েছে? বোধ হয় নয়। এই ডাকে সে এখন অভ্যস্ত। তবুও—

প্রসাদ উঠল। ভাবল, দেখে আসি, চালার মধ্যে কি করছে সে।

ধীর-পায়ে নিঃশব্দে প্রসাদ নিজের জায়গা ছেড়ে চালাঘরের দরজায় এসে দেখল দীপ্তি চালাঘরের দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তার পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে কথা কইছে।

ঘরে না ঢুকে দরজার পাশের প্রায়-অন্ধকার কোন্ থেকে প্রসাদ তীক্ষ্ণভাবে দেখার চেস্টা করতে লাগল দীপ্তির সঙ্গীটি কে?

অন্ধকারে চেনার কোন সম্ভাবনাই নেই। ' দু'টি ফিগার দাঁড়িয়ে আছে, তবে ওদের মধ্যে ব্যবধানও আছে, সেটাই ভাল ভাবে নজর করল দ্বারপ্রান্তের প্রসাদ। কোনও রোগী কি? হতেও পারে। কিন্তু চালাঘরের সমস্ত রোগীই শয্যাশায়ী। একটু সুস্থ হলেই তাদের জায়গা হয় বাইরে। এর কারণ প্রসাদ যতদূর বুঝেছে, সেটা এই যে, হঠাৎ বৃষ্টি নামলে কিম্বা অন্য কারণে বাইরে থেকে ভেতরে যাবার

দরকার হলে যে সব রোগী নিজের ক্ষমতায় হাঁটতে পারবে তাদেরই বাইরে রাখা হয়েছে। তাহলে ভেতরে ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ও কে?

দেখে দেখে প্রসাদের মনে হোল—না, ও রোগী নয়। তাহলে কে হতে পারে? আজ রাত্রে ডিউটিতে আছে ওরা মাত্র দু'জন। বাকীরা সবাই ঘুমুচ্ছে, যেমন আগের দু'টো রাত্রিতে ওরা দু'জনে ঘুমিয়েছিল। তবে কি কোন রোগীর জন্য দীপ্তি ডাক্তারকে ডেকেছে? কিন্তু তাও ত হবে না। কথা আছে কোন রোগীর জন্য দরকার হলে দীপ্তি প্রথম ডাকবে প্রসাদকে। প্রসাদ যদি দরকার মনে করে তাহলে ডাকবে এখানকার ডাক্তারদের।

প্রসাদ জোর করে চালার ভেতর ঢুকল। মনে ভাবল, আমি আজ রাতের চার্জে আছি। আমার পক্ষে এ রকম ইতস্তত করার কোন কারণ নেই। ইচ্ছে করেই পায়ের শব্দ করে ঢুকল।

ওরা দু'জনেই একসঙ্গে ঘুরে দেখল। যেন কিছুই হয় নি এমনই ভাবে ওরা প্রসাদের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে ওকে বোধ হয় আমন্ত্রণই জানিয়েছিল। দীপ্তি বল্ল, কি হোল, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ? ঘুম পাচ্ছে বুঝি?

প্রসাদ দেখল, দীপ্তির সঙ্গে যে রয়েছে সে এই হাসপাতালের নবম কর্মী। রোগীর সেবা থেকে মৃতকে কবর দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজই সে করে। সে-ই একমাত্র লোক যে সুশান্তদার গোপন কক্ষে যায় আবার পাচকের রান্নাতেও খুন্তি নাড়ে। কোন কিছুতে না থেকে নিজের নাম পর্যন্ত প্রকাশ না করে নীরবে সব কিছুর তদারকি যার হাতে সেই লোকই দীপ্তির সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছিল। এতেও প্রসাদ বিস্মিত হয়েছিল কারণ গত দু'দিনে প্রসাদ তাকে কারুর সঙ্গে তেমন কোন কথা কইতে দেখে নি। সেই নীরব কর্মীটি এতক্ষণ ধরে দীপ্তির সঙ্গে কি এমন পরামর্শ করতে পারে! কথা বলার ধরণ দেখে এরকম সন্দেহও করা যায় না যে তরুণী দীপ্তির ওপোর কোনও রকম আকর্ষণ তার আছে। এটা একদিকে প্রসাদের পক্ষে যেমন তৃপ্তিকর

অন্যদিকে তেমনই বিস্ময়ের। প্রসাদ তাকেই লক্ষ্য করে বল্ল, আপনি? আপনারও কি আজ নাইট ডিউটি?

সে বল্ল, না, এমনিই ঘুরছি। ঘুম ভাঙ্গল, উঠলুম, ভাবলুম ঘুরে আসি।

রুগীদের খবর কি? দীপ্তি প্রশ্ন করল।

সবাই ঘুমুচ্ছে, প্রসাদের উত্তর।

নবম কর্মীটি পায়ে পায়ে বাইরে চলে গেল।

ঘরের দিকে চোখ বুলিয়ে প্রসাদ বল্ল, একুশ বাইশকে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে?

হ্যাঁ, দীপ্তি উত্তর দিল।

রাত কত হোল, দীপ্তির প্রশ্ন।

হাতের ঘড়ি দেখে প্রসাদ বল্ল, আড়াইটে, এখনও তিন মিনিট দেরি আছে।

ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটিয়ে দীপ্তি বল্ল, সূর্য ওঠার দেরি আছে ক' মিনিট?

কোন্ সূর্য? আকাশের, না আমাদের? প্রসাদের রহস্যময় জিজ্ঞাসা।

দীপ্তি হাসল। বল্ল, তুমি এবার ভেতরে থাকো, আমি বাইরে যাই।

কেন? নতুন বন্ধু বাইরে গেল, সেই জন্যই বুঝি?

যাঃ, ভারী অসভ্য! ওর সঙ্গে আমার কি?

যাও যাও, রাগ কোরো না, আমি না হয় কিছুক্ষণ এখানেই থাকছি।

থাকো ভাই, লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না, আমার বাইরে যাবার দরকার হয়েছে। যাব আর আসব। তারপর তুমি তোমার নিজের জায়গায় চলে যেও, কেমন?

প্রসাদের মতামত বা উত্তরের অপেক্ষা না করেই দীপ্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নবম ব্যক্তি আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল, এখান থেকে তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না।

প্রসাদ কিছুক্ষণ টুলের ওপোর বসে রইল, তারপর কি ভেবে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দীপ্তি যে জন্য বাইরে গেছে বলে প্রসাদ অনুমান করেছে সে জন্যে গেলে এত দেরি হবাব ত কথা নয়! মেয়েটা গেল কোথায়!

বাইবে কেউ কোথাও নেই। আব একটু এগিয়ে প্রসাদ দেখল বাইরের রোগীবা যথাপূর্ব সকলেই শুয়ে আছে। প্রসাদের পরিত্যক্ত টুলটার কাছে স্তিমিত হ্যারিকেন পূর্বের মতোই জ্বলছে। ধারে কাছে কোথাও দীপ্তি বা সেই নবম ব্যক্তির কোন চিহ্নই নেই।

হাসপাতাল অঞ্চলের শেষ প্রান্তে একটি চলমান মূর্তি। তীক্ষ্ণভাবে প্রসাদ সেই দিকে চেয়ে রইল। কে,—কে হতে পারে? পরে দেখল এক সাঁওতাল। বুঝল নাইট গার্ড।

মূর্তিটি নীরবে দৃষ্টির বাইরে সরে গেল।

মরুক গে—বিরক্তিভরে প্রসাদ ঐ শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করেছিল।

ভেতরে একজন রোগীর অস্ফুট কাতরানি। কর্তব্যরত প্রসাদ চালা ঘরে ঢুকে তার কাছে যেতেই সে বল্ল, একটু জল।

প্রসাদ জল দিল। বল্ল, কষ্ট হচ্ছে? কোনো কষ্ট হচ্ছে আপনার?

সে বল্ল, না। প্রসাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সে বল্ল, আপনাকে তো আগে দেখি নি! আপনি কে ভাই?

আমি এক কমরেড, প্রসাদ উত্তর দিল।

কম্‌রেড, শব্দটা আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে সে বল্ল, একটা উপকার করবেন ভাই?

বলুন।

এঁড়েদায় আমার বাড়ী। এত নম্বর এ. সি. সরকার রোড। সেখানে আমার বিধবা মা আর আইবুড়ো বোন আছে। যদি না বাঁচি

তাহলে তাদের একটু দেখাশোনা করবেন? কেউ না দেখলে তারা না খেয়ে মরে যাবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয় দেখব, কিন্তু ভাবছেন কেন, আপনি ঠিক সেরে উঠবেন। প্রসাদ তাকে সাহস দিল।

সে ঘাড় নাড়ল। বল্ল, না, এ যাত্রায় আর নয়। শরীর খুব খারাপ লাগছে। কেন মরতেই যে এ দলে এসেছিলুম!

কেন এসেছিলেন ভাই? প্রসাদ প্রশ্ন করে।

টাকা,—টাকার জন্যে। থেমে থেমে সে বল্ল, কাজ কম্ম কিছু ছিল না, এরা টাকা দিত। অনেক রকম আশা দিয়েছিল, সেই লোভে এসেছিলুম। সেই আসাই কাল হল।

ঠিক আছে। সেরে উঠে ঘরে ফিরবেন, ভয় কি?

সেই রোগী ফের মাথা নাড়ল! বলল, উপায় নেই। মাথার ওপোর পুলিসের খাঁড়া ঝুলছে। ধরা পড়লে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হবে।

না না, তা হবে কেন? আপনি ঘুমোন, শিগ্‌গীরই সেরে উঠবেন—প্রসাদ রোগীকে সান্ত্বনা দেয়।

রোগী বলে, না ভাই, সেরে ওঠার ইচ্ছে আর নেই। বরং চটপট ওষুধ দিয়ে খতম করে দিন। আমার মা বোনের ভার যদি কেউ নেয় তাহলে—

আমি তো নিলুম! এত নম্বর এ. সি. সরকার রোড, এঁড়েদা তো? আমি নিজে যাব।

আঃ, বাঁচলুম, নিশ্চিন্ত হলুম। পরম তৃপ্তিতে রোগী নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল।

বাঁ হাতটা তার ভাল ছিল। পরক্ষণেই হাতটা কাঁপাতে কাঁপাতে প্রসাদের দিকে তুলে ধরে বলল, আপনাকে কোনো দিনও দেখি নি, আপনার নামও জানি না, কিন্তু যে উপকার আমার করলেন তা এ জীবনে ত নয়ই, কোনো জীবনেও শোধ করতে পারব না।

প্রসাদ তার শীর্ণ কম্পিত হাতটা নিজের ডান হাতের মুঠিতে পরম

আগ্রহে ধারণ করে বলল, এতখানি জখম আপনি কোথায় হলেন? কবে?

কবে? কোথায়? সে আপন মনেই শব্দ দুটো উচ্চারণ করল। পরে বলল, বেস্পতিবার রাত্তিরে। আজ কি বার তা ত জানি না।

কোথায় হল?

তাও ঠিক জানি না। বুধবারে আমরা গিয়েছিলুম এক জংলা জায়গায়। সেখানেই বেস্পতিবার রাত্তিরে পুলিশ আমাদের ঘেরাও করে। রীতিমত যুদ্ধ হয়। তারপর কি হয়েছিল, মনে নেই।

কিছুক্ষণ থেমে দম নিয়ে সে বল্ল, ক'দিন কি ভাবে কেটেছে জানি না, কাল থেকে দেখছি এখানে রয়েছি। আমার বন্দুকটা কি আপনারা এনেছেন, না পুলিস নিয়ে গেছে?

আমরাই এনেছি। আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি চুপ চাপ ঘুমিয়ে পড়ুন—প্রসাদ স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেয়।

এনেছেন? আপনারা এনেছেন? ভাল। ক্লান্তি ও শান্তিতে সে চোখ বুজল। তার হাতখানি ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে প্রসাদ পুনরায় টুলের কাছে এসে হ্যারিকেনের আলোয় নিজের হাত-ঘড়িতে দেখল রাত তিনটে। তারপর আবার দরজার কাছে এসে এদিক ওদিক দেখে বিরক্ত হয়ে টুলে এসে বসল। মেয়েটা গেল কোথায়?

এইমাত্র এই রোগীর মুখে যে কাতরোক্তি শুনল সেটাই প্রসাদের মনে তখনও পর্যন্ত আনাগোনা করছিল। তার মনে হোল, এই হচ্চে ওদের শেষ পরিণতি! ওরা সকলেই গান্‌-ফডার।

চুপিসাড়ে দীপ্তি এসে ঘরে ঢুকল। আঁচলে হাত মোছার ভঙ্গী করে প্রসাদের কাছে এসে বল্ল, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো, কেমন জব্দ! দুষ্টুমির হাসি হাসছিল প্রসাদের বিয়ে-না-করা-বউ।

প্রসাদ উঠে দাঁড়াল, এত দেরি?

বিকেল থেকেই পেটটা ভাল যাচ্ছে না। এখনও পেটের মধ্যে মাঝে মাঝেই কষ্ট হচ্চে। কি করি বলো ত?

তা হলে ঐ ভদ্রলোককে বলে তুমি ছুটি নিলেই ভালো করতে। এখনও একটু ঘুমিয়ে নিলে পেটটা সারতে পারত।

দীপ্তি কোনও উত্তর না দিয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ও ভদ্রলোক কি বলছিল? প্রসাদ জিজ্ঞাসা করে।

কিছুই না।

কিছুই না? এতক্ষণ ধরে শুধু শুধু---

বাবা রে বাবা! কি সন্দেহ তোমার? উনি বলছিলেন, আমি কত দিন নার্সিংএর কাজ করছি, পার্টিতে কত দিন এসেছি, এখানে কত দিন থাকতে পারব এই সব কথা। আর কিছু নয়।

কোথায় গেলেন উনি?

তা তো জানি না। তুমি আসার পরেই তো উনি চলে গেলেন।

বাইরে বেরিয়ে ওঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি?

না গো না, ওঁর সঙ্গে অভিসারে যাই নি। আমি তোমারই আছি, বুঝলে মশাই! দীপ্তি প্রসাদের হাত দুটো ধরেছিল।

এই! এটা কি হচ্চে, রোগীদের দিকে নজর দিয়ে প্রসাদ দীপ্তিকে সাবধান করেছিল।

সবাই ঘুমুচ্চে, আড়ি পাতার জন্য কেউ জেগে নেই, ফিস্‌ফিস্ করে দীপ্তি বলেছিল।

বাইরে যেন কে আঃ, উঃ করে উঠল। উঃ, কেউ নেই? রাত্রির নীরবতা ভেদ করে সেই শব্দ ভেতরেও এসেছিল।

প্রসাদ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল বাইরের শুয়ে-থাকা রোগীদের একজন উঠে বসে এদিক ওদিক চাইছে।,

প্রসাদ কাছে যেতেই সে বল্ল, একটু ধরবেন, বাইরে যাব।

প্রসাদ বল্ল, রাতে আর বাইরে যেতে হবে না, বোতল চাই, না প্যান?

সে বল্ল, প্যান।

এ কাজও প্রসাদকে করতে হয়েছিল। বিনা বিরক্তিতে মেডিকেল

কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ধনীপুত্র প্রসাদ বিনিদ্র রাত্রে এই ভাবেই পার্টির কাজ করেছিল।

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ দেখা গেল সেই দু'জন আদিবাসী দু'টো বড় বড় বাক্স মাথায় নিয়ে আসছে। তাদের পেছন পেছন আসছেন প্রফেসব অজিত বোস। তাঁর এক হাতে ছোট ব্যাগ, অন্য হাতে কাগজ মোড়া বড় একটা প্যাকেট।

প্রসাদ বিস্মিত হলো। তারপর ভদ্রতা বজায় রাখতে এগিয়ে গিয়ে বল্ল, এখন আসছেন অজিতদা?

হ্যাঁ ভাই, স্মিতমুখে অজিতদা উত্তর দিলেন। কেমন আছ? কাজ কর্ম কেমন চলছে?

ভালই। এত সকালে কি করে এলেন? রাতে তো বাস্ চলে না। ট্রেণে এলেন?

সে কথায় আমল না দিয়ে অজিত বাবু বল্লেন, দীপ্তি কোথায়? কেমন আছে সে? '

ভালই আছে। বোধ হয় ঘুমুচ্ছে।

এখনও ঘুমুচ্ছে? নাইট ডিউটি ছিল বুঝি?

হ্যাঁ। কাল ওর আমার দু'জনেরই নাইট ডিউটি ছিল।

তুমি ঘুমোও নি?

কথা বলতে বলতেই ওরা চালা ঘরের কাছে এসে গেল। প্রসাদ বল্ল, সকালে আমি ঘুমুতে পারি না। দুপুরে ঘুমিয়ে নিলেই চলবে।

সুশান্ত ডাক্তার এসে গেল। বল্ল, গুড্ মর্নিং প্রফেসার।

অজিতবাবুও বল্লেন, গুড্ মর্নিং। খবর ভালো?

ভালো। সুশান্তবাবু অজিতবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। প্রসাদ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ওরা ডাকলে ওদের সঙ্গে যেত, কিন্তু ওরা ডাকলেন না, প্রসাদের দিকে অজিত বোস চেয়েও দেখলেন না।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সেই সাঁওতাল দু'জন দু'টো বস্তা মাথায়

নিয়ে পুনরায় এসে সুশান্তবাবুর গোপন-ঘরের দরজায় সেই বস্তা দু'টো নামাল।

প্রসাদ ভাবল, অনেক মাল। তাহলে কি কলকাতা থেকে বরাবর গাড়ীতেই এসেছে ? অথবা ট্রেনে এসে—কে জানে ?

সাঁওতাল দুটো আবার দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রসাদের মনে হোল, হয়ত আরও মাল আছে।

প্রসাদেরই অনুমানটাই ঠিক। এবার দুই সাঁওতালের একজন একটা বড় ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কাঁধে জলের বোতল ঝুলিয়ে এল এবং অন্যজন কাগজ মোড়া ফ্রেমের মতো কি একটা ভারী জিনিস নিয়ে সেই গুরুভারে বেশ যেন হাঁপাতে হাঁপাতেই আসছিল। প্রসাদ দেখল, সব মালই ঐ খড়ের ঘরে চলে গেল, কেবল ফলের ঝুড়িটা ঘরের বাইরে উঁচু ঢিবিটার ওপোর রইল।

সাঁওতাল দুটো আবার চলে গেল কিন্তু আর ফিরল না। ঘণ্টা দুই পরে ওরা আবার ফিরেছিল প্রতিদিনের নিয়মিত বাজার নিয়ে। বাজারটা কোথায় তা প্রসাদ জানে না। রোজই দেখে ঐ সাঁওতাল দু'জন তরি-তরকারি, মাংস, ডিম, দুধ, এই সব নিয়ে আসে। আজও তেমনই ভাবে এসেছিল।

অজিতবাবু চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রসাদও মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে গাছতলার ছায়ায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে দীপ্তি এসে প্রসাদের গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকল বাবাঃ, কি ঘুম ঘুমুচ্ছ গো ? একেবারে কাল সকালে উঠবে নাকি ?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সলজ্জমুখে প্রসাদ বল্ল, ওঃ, বিকেল হয়ে গেছে ? আগে আমায় ডাকো নি কেন ?

দু'বার এসে দেখে গেছি। তোমার নাক ডাকছিল। ডাকতে মায়া হোল তাই চলে গেলুম। চলো, তোমার চা রেডি। আজ শুধু চা নয়, হুঁ হুঁ—

চায়ের সঙ্গে 'টা' আছে বুঝি ? কি গো, কি আছে ?

এক এক শ্লাইস কেক। অজিতদা আজ অনেক ফল, বিস্কুট, কেক এই সমস্ত এনেছেন। ফল বিস্কুট রোগীদের, কেকগুলো আমাদের।

চলো। তোমরা এখনও চা খাও নি ?

আমাদের কখন খাওয়া হয়ে গেছে! অজিতদা এখনও খান নি।

কেন ? এত দেরি কেন ?

চলতে চলতেই দীপ্তি বল্ল, উনি ত সকালে এসেই বেরিয়ে ছিলেন। এখন এই কিছুক্ষণ আগে আবার ফিরলেন।

বলতে বলতেই মেয়েটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

রোগী থাকার জায়গা থেকে খানিকটা দূরে দু'খানি টুল পেতে একখানিতে অজিতবাবু বসেছিলেন। প্রসাদ হাত-মুখ ধুয়ে নিজের সাইড ব্যাগ থেকে জামাটা বার করে গায়ে গলিয়ে পরনের প্যান্টখানা হাত দিয়ে ভদ্রস্থ করে অজিতবাবুর কাছে আসতেই তিনি বল্লেন, বোসো প্রসাদ, এসে পর্যন্ত নানা কাজে এত ব্যস্ত ছিলুম যে তোমার সঙ্গে কথা বলার ফুরসতই পাই নি। কেমন আছো বলো ?

ভালো। প্রসাদ টুলের ওপোর বসল। দীপ্তি চলে গেল।

আজ আছেন ত ?—প্রসাদ অজিতকে প্রশ্ন করল।

না ভাই, আজ থাকা হবে না, ওখানে অনেক কাজ পড়ে আছে।

গাড়ীতে এসেছেন ?

হ্যাঁ।

তা তাহলে পঞ্চুকে আনলেন না কেন ? সে—

সে তো সেরে গেছে হে। যিনি দেখছেন তিনি বল্লেন, দু'তিন দিনের মধ্যেই ও খাড়া হয়ে আবার কাজে লাগবে।

সেরে গেছে ? জ্বর নেই ? গ্যাংগ্রীন হয়নি ?—

না না, তুমি বাজে বাজে ভয় পেয়েছিলে। অজিতবাবু হাসতে লাগলেন।

অধ্যাপকের কথা প্রসাদের ঠিক বিশ্বাস হোল না। মুখে বল্ল,

তা হলে ভালো। প্রফেসার বল্লেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। এ আমি আগেই বুঝেছিলুম সে জন্যই তোমার মতো ব্যস্ত হই নি।

দূর থেকে দেখা গেল বীথি থালা নিয়ে আসছে। ওরা দু'জনেই বীথির দিকে চেয়ে রইল।

দু'বাটি চা এবং চার পিস কেক থালা সমেত ঘাসের ওপোর নামিয়ে দিয়ে বীথি চলে গেল। অধ্যাপক বল্লেন, নাও ভাই, চা খেয়ে নাও। নিজে একটা কাপ হাতে তুল্লেন।

এক চুমুক চা খেয়ে প্রসাদ বল্ল, অজিতদা, মিঃ ঘটকের কোনও খবর পেয়েছেন?

পেয়েছি, তুমি ভুল খবর দিয়েছিলে হে। উনি যেদিন ময়দানে গিয়েছিলেন সেদিন থেকেই অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে গিয়েছেন। ময়দান থেকে বাড়ী ফিরতেও হয়নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। পুত্রশোক নয়, অর্থশোক,—হাসিমুখে প্রফেসার কেক খেতে লাগলেন।

ওঁর টাকাটার ব্যবস্থা করেছেন? প্রসাদের কণ্ঠস্বর কেমন যেন গম্ভীর।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা হয়েই যাবে, অধ্যাপক প্রসাদকে আশ্বাস দিলেন।

আমাকে এখানে আর ক'দিন থাকতে হবে?

ভাল লাগছে না?

না, তা ঠিক নয়, তবে কিনা ক্লাসগুলো বাদ যাচ্ছে, লেকচার, ক্লিনিক্স, ল্যাবরেটারী সবই তো আছে, পার্সেণ্টেজ—

হাসিমুখে প্রফেসার বল্লেন, তুমি দেখছি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক, ট্রু টু হার্থ এণ্ড হোম। গাছেরও খাবে তলারও কুড়ুবে। একটু থেমে বল্লেন, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে হলে আজও যেতে পারো।

আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

আর কে যাবে ? দীপ্তি ?

না, ও এখানে আরও কিছুদিন থাকবে। দু'জন নার্সে এত রুগী সামাল দিতে পারছে না।

তাহলে আমিও না হয় থেকেই যাই। আপনি ত বলেছিলেন ওকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে।

হাসিমুখে আরও এক চুমুক চা খেয়ে প্রফেসর বল্লেন, ওর সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকা করতে চাও বুঝি ? ইয়ংম্যান, মনে রেখো, পার্টির কমরেডদের মধ্যে পার্মানেন্ট সম্বন্ধ করার সুসময় আমাদের এখনও আসে নি। এখানে তুমি যা বটিয়েছ সেটা ঠিক হয়নি।

আমি রটাইনি অজিত দা, ও-ই বলেছে।

যে-ই বলুক, এটা ভাল হয়নি। যাই হোক, তোমাদের রটনা আমি অনার করেছি।

প্রসাদ তৃপ্ত হোল। বল্ল, কে বল্লে ?

সবাই বল্ল। দীপ্তির সঙ্গেও কথা বলেছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তুমি তাহলে রেডি হয়ে নাও, আজই যাওয়া যাক।

না অজিতদা, আমি আরও কয়েক দিন থেকে ওকে সঙ্গে নিয়েই ফিরব।

অজিতবাবু প্রসাদের দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে বল্লেন, পার্টি ডিসিপ্লিন তুমি নিশ্চয়ই মেনে চলবে এ আশা পার্টি তোমার মত শিক্ষিত কর্মীর কাছে অবশ্যই করতে পারে।

ডিসিপ্লিন কি ভাঙ্গছি আমি ?

শিওর, প্রথমতঃ এ রকম রিলেশনসিপ পার্টি এখনও স্যাংশন করে নি ; দ্বিতীয়তঃ লীডারকে অমান্য করা আন্‌থিঙ্কেবল্‌।

প্রসাদ থতমত হোল। তারপরই নিজের মনকে দৃঢ় করে বল্ল, অজিতদা, আমরা কি সেই প্রাচীন যুগের গ্লাডিয়েটর ? স্পার্টাকাসের

যুগে একজন গ্লাডিয়েটর অপর গ্লাডিয়েটরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারত না, স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার থাকলেও সামাজিক সম্বন্ধ তাদের নিষিদ্ধ ছিল।

তার মানে কি বলতে চাও তুমি?

বলছি আমরা নিশ্চয়ই সেই স্লেভের যুগে ফিরে যাই নি। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এক উদ্দেশ্যে কাজ করব, সেই জন্যেই আমরা কম্‌রেড হয়ে মিলেছি।

অজিতবাবু নিশ্চল, নীরব।

একটু থেমে প্রসাদ বল্ল, সকলের মিলে-মিশে কাজ করা মানে একজনের হুকুম অন্ধভাবে তামিল করা এ রকম অন্যায় দাবী আপনি নিশ্চয়ই করবেন না।

তাহলে দেখছি মিলিটারী ডিসিপ্লিন তুমি এখনও বোঝো নি। আমাদের পার্টি যে মিলিটারী ডিসিপ্লিনে চলে তা তো জানো? এন্‌ সি সিতেও দেখে থাকবে অবস্টিনেটদের রাবিং দেওয়া হয়।

অজিতদা, আপনাকে আর কি বলব? কাকে রাবিং দিতে হয় সেটা যিনি রাবিং দেবেন তাঁর বোঝার শক্তি থাকা চাই। কাঁচা লোহাকে রাবিং দিলে সেই লোহা প্লেন হতে পারে কিন্তু ইস্পাতকে ঘষলে ইস্পাত আরো চোখা এবং ধারালো হয়। ঘাড় হেঁট করে ঘাসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কথাগুলো ধীরে ধীরে বলেছিল চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র প্রসাদ।

ইতিমধ্যেই অজিতবাবুর মনস্থির হয়ে গেল। আজ বিকালে দীপ্তির সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে প্রসাদ সম্বন্ধে অজিতবাবু হতাশ হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় অন্যায় প্রসাদ করেছে সুব্রত-ভারতীর কাহিনী দীপ্তির কাছে ব্যক্ত করে। ঐ সাজ্ঘাতিক ছোকরা না জানি আরও কত জনকে বলে বেড়াবে। তবুও শেষ চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু এবার তাঁকে হাল ছাড়তে হোল। তিনি মনে মনে বুঝলেন, প্রসাদকে পার্টিতে রাখলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে।

মুখে বল্লেন, ঠিক আছে, তুমি তাহলে আরও কয়েকদিন এখানে থেকে দীপ্তিকে সঙ্গে নিয়েই ফিরো, কেমন?

খুশিমনে প্রসাদ বল্ল, তাই ফিরব অজিতদা।

ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়াল। অজিতবাবু সুশান্ত ডাক্তারের ঘরের দিকে গেলেন, প্রসাদ গেল হাসপাতালের দিকে।

প্রসাদ নিজের মনেই জয়ের উল্লাস ভোগ করেছিল। প্রফেসর অজিত বোস তার কাছে হার মেনেছেন। এক সময় প্রসাদের বাবাও প্রসাদের কাছে হার মেনেছিল। কাঁচা সবুজের কাছে পাকা হলদের পরাজয়। জেনারেশন গ্যাপ এই ভাবেই পূর্ণ হবে। আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে এই ভাবেই ছোটদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা যারা কাজ করি, এগিয়ে চলি, আমরা কি প্রাচীন, স্থবির, অনড়দের কাছে বশংবদ হয়ে থাকতে পারি! স্পীড্ আমাদের, ব্রেক্ ওদের, এই ব্যবস্থা কিছুদিন পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু বেশীদিন নয়, বরাবর নয়।

প্রসাদের মনে হোল, অন্যায় সে কিছুই করে নি। প্রফেসার বোসই বারবার বলেন, পার্টিতে লীডার ফলোয়ার নামক স্থায়ী কিছুই নেই। সব দিক গুছিয়ে নেতৃত্ব দেবার শক্তি যার আছে সেই লীডার, তারপর নতুন যিনি ভার নেবেন তিনি হবেন নয়া লীডার, পুর্বের লীডার ফলোয়ার হবেন। এতে কোন লজ্জা বা অপমান নেই, নেই কোন ক্ষোভ বা শত্রুতা। প্রসাদ ভাবে, এমন দিনও আসতে পারে যে দিন সে হবে লীডার, অজিত ফলোয়ার! সেদিনের প্রসাদ ফলোয়ারদের সম্মান দেবে, কগ্ হুইল ভাববে না।

দীপ্তি ওর সামনে এসে বল্ল, তুমি কি আজই যাচ্ছ না কি?

কেন বলো তো?

শুন্‌ছিলুম।

কার কাছে দীপ্তি শুনেছে সেই প্রশ্নে সময় নষ্ট না করে নিজের জয়-গৌরব প্রকাশে অত্যুৎসাহী প্রসাদ বল্ল, সেই রকমই হুকুম হয়েছিল,

আমি সেটা নাকচ করে দিয়েছি। আরও কয়েকদিন থেকে তোমাতে আমাতে একসঙ্গে ফিরব।

সত্যি? মেয়েটার উল্লাস যেন চোখে মুখে ফুটে বেরুল। পরে বল্ল, ওরা রাজী হয়েছে?

হবে না মানে? আমরা কি শ্লেভ? আমরা ভলাণ্টারী ওয়ার্কার, স্বেচ্ছাসেবক। আমাদেরও একটা মতামত আছে। ক্রীতদাস তো নই!

চুপ চুপ, দীপ্তি ওকে থামিয়ে দিল।

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রসাদ দেখল, দলের সেই নবম ব্যক্তিটি কয়েকখানা চেটাই নিয়ে ওধার থেকে এধারে চলে গেল।

প্রসাদের হাত ধরে দীপ্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্ল। অস্ফুটকণ্ঠে বল্ল, বল্‌ছি একটা কথা, কিছু মনে করো না, তুমি দল ছেড়ে মন দিয়ে পড়াশুনা কর গে। শেষের দিকের কথাগুলো প্রায় যেন অনুচ্চারিত ভাবেই উচ্চারণ করল।

কেন?

তোমার এখানে পোষাবে না।

তোমার?

আমায় থাকতেই হবে, অন্য কোন উপায় আমার নেই।

কেন?

কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি বলতে পারব না, মাফ কোরো, লক্ষ্মীটি। তুমি নিঃশব্দে পার্টি ছেড়ে চলে যেও। আমার মিনতি।

ব্যাপার কি? প্রসাদ থেমে গেল, বল্ল, পার্টির মেয়ে হয়ে পার্টির লোককে ভাংচি দিচ্ছ?

ওর হাত ধরে সেই হাতে নিজের দেহভার খানিকটা ছেড়ে দিয়ে দীপ্তি বল্ল, আমি মেয়ে, সেটাই আমার প্রথম পরিচয়। পার্টি পরে, সেটা দ্বিতীয় পরিচয়।

মানে? কি বলতে চাও তুমি? ঘাড় হেঁট করে প্রায়-অন্ধকারেও প্রসাদ ওর মুখখানা খুঁটিয়ে দেখেছিল।

পারব না, আর কিছু বলতে পারব না, আমায় ক্ষমা কোরো, জোর করে প্রসাদের হাত ছাড়িয়ে দীপ্তি যেন প্রায় দৌড়ে ওর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

শেষের কথাগুলো ধরা-ধরা, কান্নায় ভেজা। ওর চোখ দিয়ে অবাধ্য অশ্রু কি আত্মপ্রকাশ করেছিল! বিস্মিত প্রসাদের মনে হোল, দীপ্তির চোখে জলই সে দেখেছে। দীপ্তি কাঁদল। কেন? কেন সে কাঁদে?

তবে কি দীপ্তি ওকে চায় না? নিশ্চয়ই তাই। প্রসাদ ফুর্তি করে বলতে গেল সে যাচ্ছে না, দীপ্তিকে নিয়ে এক সঙ্গে ফিরবে, অজিতের হুকুম নাকচ করার ক্ষমতা তার আছে। এত সবের উত্তরে দীপ্তি বল্ল, পার্টি ছেড়ে দাও। ওর আনন্দ-সংবাদের উত্তরে সে কেঁদে ফেল্ল কেন? এর মানে কি?

বেশ কিছুক্ষণ ভেবেও প্রসাদ কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না। শেষে অবজ্ঞাভরে ভাবল, পার্টির মেয়ে ত, কত ভাল আর হবে! দূর ছাই, যত সব রাবিশ।

অথচ দীপ্তিকে রাবিশ ভাবতেও প্রসাদের মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। অজিতের কাছে জয়লাভ করে যে আনন্দ তার হয়েছিল দীপ্তির ব্যবহারে সেটা নিমেষে মুছে গেল।

সন্ধ্যার পর পার্টির নবম ব্যক্তিটি প্রসাদকে ডেকে বল্ল, প্রফেসার বোস আপনাকে ডাকছেন। আসুন।

বোসের কাছে যেতেই তিনি বল্লেন, প্রসাদ, একটা কাজ আছে। তুমি—

কথা কইতে কইতে প্রফেসার হাঁটছিলেন। ধারে কাছে আর কেউ ছিল না। তিনি বল্লেন, তুমি একটু আমার সঙ্গে চলো তো। তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করাতে চাই।

কে অজিতদা? কার সঙ্গে—

আমাদের এক ওয়ার্কার। তোমার কোন অসুবিধে হবে না, গাড়ীতে যাব, গাড়ীতেই ফিরব।

আপনি আজ কলকাতায় যাবেন না ?

না ভাই, আটকে গেলুম। কাল দুপুরের আগে হবে না। আবার যে কাজে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সে কাজ না হলে আরও একদিন বেশী দেরি হতে পারে।

কখন যাবেন ?

এখনই, এই ত চল-না।

ও। তাহলে পাজামাটা বদলে আসি।

আরে না না, যা আছে এতেই চলে যাবে।

না অজিত দা, এ একটা বিচ্ছিরী ব্যাপার।

অজিতকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই প্রসাদ ছুটে চলে গেল।

পাজামা ছেড়ে প্যান্ট পরে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে এমন সময় দীপ্তি এসে কাছে দাঁড়াল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। দীপ্তি বল্ল, কোথায় যাচ্ছ ?

একটু কাজে। এখনই ফিরব।

অজিতদার সঙ্গে ?

হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে ?

সাবধানে যাবে, দীপ্তির কণ্ঠস্বর যত মৃদু তত গম্ভীর।

কেন ? ব্যাপার কি ? প্রসাদের কৌতুহলী প্রশ্ন।

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। বল্ল, না গিয়ে পারবে না ?

কেন ? গেলে ক্ষতি কি ? একজনের সঙ্গে আলাপ করে এখনই ফিরব।

যাও, কিন্তু খুব সাবধানে, ধরা-গলায় দীপ্তি বলেছিল।

ব্যাপার কি বলো ত ? তখন থেকেই এ রকম করছ কেন ?

আমি জানি না। আমার ভাল লাগছে না। তুমি বলেই বলছি,

অন্য কেউ হলে বলতুম না। আমি এদের চিনি,—সকলকেই চিনি, কান্নামিশ্রিত জড়িত্‌কণ্ঠে বলতে বলতেই মেয়েটা থেমে গেল।

ততক্ষণে প্রসাদ তৈরী হয়ে গেছে। অন্ধকারে দীপ্তির গালে টোকা মেরে আদর জানিয়ে বল্ল, ভয় নেই গো, আমার ক্ষতি করতে কেউ পারবে না। পরক্ষণেই প্যান্টের পকেটের ওপোর হাত দিয়ে কি একটা জিনিসের স্পর্শ অনুভব করল দীপ্তির নায়ক প্রসাদ। তারপরই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখল, অন্ধকারে দীপ্তি স্থানুর মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

চলুন অজিতদা।

ওরা দু'জনে বনপথ অতিক্রম করে গাড়ীর ধারে পৌঁছে গেল। অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ফিয়াট গাড়ীখানা, যেখানা ভারতীর গাড়ী বলে সুব্রতর জানা ছিল।

গাড়ীর চাবি খুলে অজিত বসল স্টীয়ারিং-এ, পাশেই বসল তার অবাধ্য শিষ্য প্রসাদ। কোন রকম আলো না জ্বেলে গাড়ীখানা ধীরে ধীরে জংলী পথ অতিক্রম করে চলতে লাগল।

যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি ইনি কে অজিতদা? ইনি কি আমাদের পার্টির?

হ্যাঁ। আগেই ত বল্লুম।

আমি দেখা করে কি বলব?

তোমায় কিছু বলতে হবে না, তাকে শুধু চিনে রাখবে।

বাস্। এইটুকু? এই কাজ আমার?

হ্যাঁ, আসল কাজ পরে হবে, মানে হতে পারে।

অজিতবাবু নীরবে গাড়ী চালাতে লাগলেন। প্রসাদ সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে থাকে দীপ্তি আমায় বার বার সাবধান করল কেন?

অজিত কি ওকে ধরিয়ে দেবার মৎলব করেছে। না, তা হতেই পারে না। ওরা বেইমানী করলে প্রসাদও বেইমানী করবে। গোটা

দলকে ধরিয়ে দেবার মতো প্রমাণ ওর হাতেই আছে। তবে কি ওদের কোন গুপ্ত আড্ডায় নিয়ে ওকে খতম করার চেষ্টায় আছে। স্বয়ংক্রিয়-ভাবেই প্রসাদের হাত নিজের প্যান্টের পকেটের ওপোর পড়ল। ডানদিকের প্যান্টের পকেট ছিঁড়ে এমন ব্যবস্থা সে করে রেখেছে যাতে ডান দিকের প্যান্টের পকেটে হাত ভরে এক নিমেষে আণ্ডারওয়ারের গুপ্ত খাপ থেকে সেই ছোট্ট ছ'ঘরা পিস্তলটা বার করতে পারে। বারোটা কার্তুজ ও নিয়েছিল। বার কয়েক খালি পিস্তলে ট্রিগার টিপে টিপে পিস্তলের ব্যবহারটা রপ্ত করে তিনটে গুলি ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদটাও বুঝে নিয়েছে। এন্ সি সি-তে মার্কসম্যানশিপ মেডাল সে পেয়েছিল। সেটা অবশ্য পয়েন্ট থ্রি ও থ্রি সার্ভিস রাইফেলে। তিনটে গুলি ছুঁড়ে পিস্তল সম্বন্ধেও তার আত্মবিশ্বাস হয়েছে, পিস্তলটা যতক্ষণ সঙ্গে আছে ততক্ষণ আধ ডজন লোকের জীবন ওর হাতের মধ্যে। ভয় কি, ছ'জনকে মেরে যদি নিজেকে মরতে হয় তা হলে তার দুঃখু নেই। কিন্তু এমনটাই কি হবে? এ কি হতে পারে?

পীচের রাস্তায় এসে প্রফেসার হেড লাইট জ্বাললেন। প্রসাদ বুঝল, ওর সন্দেহ অমূলক। অন্ধকারে জংলী পথে আশঙ্কা থাকলেও থাকতে পারত; এখানে সে নিরাপদ। মাঝে মাঝেই এক একখানা গাড়ী তীর বেগে সামনে থেকে এসে ঝড় তুলে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

একটা জায়গায় এসে প্রফেসার গাড়ীখানা রাস্তার পীচ থেকে নামিয়ে গাড়ীর বাঁ দিকের আধখানা মেটে রাস্তায় রাখলেন, গাড়ীটার ডানদিকের আধখানা পীচের রাস্তায় রইল।

এখানে পার্ক করছেন? প্রসাদ প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, এখানেই আমাদের নামতে হবে। সামান্য একটু হেঁটে যাব, প্রফেসার উত্তর দিলেন। এঞ্জিনের চাবি বন্ধ করে দেখলেন একখানা গাড়ী সামনে থেকে আসছে। প্রফেসার ধীরে সুস্থে হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতেই সেই গাড়ীখানা সবেগে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে

গেল। প্রসাদ দেখল আপ্ ডাউন কোনও দিকেই আর কোন গাড়ী নেই। প্রফেসার গাড়ী থেকে নেমে মৃদুকণ্ঠে বল্লেন, চলো হে, ও দিকেই যেতে হবে।

প্রফেসারের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন অভিনবত্ব।

প্রসাদ বাঁদিকের দরজা খুলে শুকনো পাতার ওপোর নেমে বল্ল, কাঁচগুলো বন্ধ করি? গাড়ীতে চাবি দেবেন ত?

না, থাক। এখনই ফিরব, দেরি হবে না।

গাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরে এসে প্রফেসার বল্লেন, এগিয়ে চলো।

ওরা দু'জনে পাশাপাশি চলতে লাগল।

বেশী নয়, দশ বারো গজ। পীচের রাস্তার পাশে এই বাঁ দিকটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। জায়গাটায় কম করেও ছ'ইঞ্চি পুরু শুকনো ঝরা বাঁশপাতা। রাস্তার পাশেই বাঁশবাগান, সেখানে বিরাট বাঁশঝাড়। সেই বাঁশ অনেক ওপোরে উঠে রাস্তার দিকে হেলে নুয়ে পড়াতে জায়গাটা ভয়াবহ অন্ধকার। প্রসাদের গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। সে ছিল বাঁ দিকে, অজিত ডান দিকে। প্রসাদ বল্ল, এই বাঁশঝাড়ে ঢুকবেন?

না, এখানেই অপেক্ষা করব।

প্রফেসার সহজ ভাবেই চলছিলেন। তাঁর হাত দু'টো দু'পাশে স্বাভাবিক ভাবেই দুলছিল। হঠাৎ ডান হাতটা উঁচু হবার উপক্রমেই প্রসাদ তার বাম হাতের ওয়েট-লিফ্টিং-করা বজ্রমুষ্টিতে প্রফেসারের ডান হাত ধরেই নিজের ডান হাত নিজের পকেটে ভরল। চাপা গলায় বল্ল, এতদূর!

এক ঝট্কায় প্রফেসার হাতখানা ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ শান্ত রাত্রি দিক্ থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বন্দুকের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠল। অনেকগুলো গুলির শব্দ প্রায় একই সঙ্গে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে মিলে মিশে একাকার হয়ে শান্ত নীরব পরিবেশটি কাঁপিয়ে আবার সেই প্রাক্তন অখণ্ড নীরবতায় স্তব্ধ হোল।

রাস্তার ওপোর গাড়ীখানা সেই ভাবেই খাড়া আছে। গাড়ীর মালিক প্রফেসার অজিত বসু ও তার সুযোগ্য সাকরেদ শ্রীমান প্রসাদ রক্তে ভেজা বাঁশপাতায় অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রইল। শৃগালের দল কখন এসে এমন উপাদেয় ভোজ খাবে কে জানে!

কি হোল, কেন হোল, কে বা কারা এই কাজ করল, এ সমস্ত জানবার জন্য কেউ কোথাও নেই। শুধু ঝিঁঝিঁরা গুলির শব্দে একবার থেমেই আবার একটানা ডেকে চলেছে, আর মাঝে মাঝে ডাকছে রাত্রিচর শিকারী পাখী। রাস্তা দিয়ে বহুক্ষণের মধ্যে একখানা গাড়ীও পাস্ করে নি।

সতের

ভদ্রার মনটা দু'দিন যাবৎ খুবই খারাপ। সদানন্দময় তাপসবাবু গত দু'দিন স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন ; কিন্তু ভদ্রার কি দোষ ! স্বামীর কাছেও মনের কথা যদি বলতে না পায় তাহলে কাকে বলবে ?

তার বাবা আজ তিন দিন হোল নার্সিং হোম থেকে বাড়ী ফিরেছেন। শরীর এখনও সুস্থ হয় নি, কবে হবে তার ঠিক নেই, আদৌ হবে কি না তাতেও সন্দেহ, এ অবস্থায় নার্সিং হোম-এ কতদিন আর থাকবেন ! এক রকম জোর করেই বাড়ী ফিরেছেন তিন দিন আগে। ওপোরে উঠতে পারেন নি। নীচের অফিস ঘরে সোফা-কাম্-বেড্-এ বিছানা করিয়ে সেখানেই শুয়েছেন। পাশেই আছে টেলিফোন। প্রথম দিনেই অনেক অনেক দরকারী কাজ ফোনে সেরেছেন। সুবো ফিরল কি না সেই খবর সে-দিনেই বিশ পঁচিশবার নিয়ে নিয়ে শেষে হতাশ হয়েছেন। হয়ত সন্দেহ করেছেন সুবো আদৌ ফেরে নি। মেয়ে জামাই তাঁকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছে। প্রথম দিন রাত্রে ভদ্রা ও-বাড়ী থেকে নিজেদের বাসায় ফেরা পর্যন্ত এই ছিল সেখানকার পরিস্থিতি।

পরের দিন অফিসে যাবার সময় তাপসবাবু ভদ্রাকে ঘটক বাড়ী নামাতে গিয়ে বাড়ীর সামনে পুলিসের জীপ দেখে শঙ্কিত হলেন। বাড়ীতে ঢুকেই বুঝলেন, যে ভয় তাঁরা করেছিলেন সেই ব্যাপারই হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে বি ঘটকের দেখা হয়েছে। ছেলের পরিণতি পিতার কর্ণগোচর হয়েছে। নিজের বিছানায় স্থির হয়ে বসে আছেন মিঃ ঘটক। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা প্রশস্ত শীর্ণ গাল বেয়ে গেঞ্জির ওপোর গড়িয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতর চেয়ারে বসে পুলিস অফিসার, দাঁড়িয়ে এক সহকর্মী, দরজার কাছে ম্লানমুখে বাদল, বাইরে

চারু-ঝি, সিঁড়িতে বৈজু ড্রাইভার, রান্না বন্ধ করে ঠাকুরও এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল।

ভয়ে ভয়ে ভদ্রা ঘরে ঢুকেছিল, তাপসবাবু হেঁটমুখে নীরবে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্বশুরের কান্নাকাটির ভয়ে ভেতরে ঢুকতে সাহস পান নি।

মেয়ের দিকে ঘটক নীরবে স্থিরভাবে প্রায় এক মিনিট তাকিয়ে-ছিলেন। মেয়েও কথা বলতে সাহস পায় নি। পুলিশ অফিসারও নীরব। শেষে ক্রুদ্ধভাবে ঘটক বলেছিলেন, এসেছিস্? কেন এলি? কি দেখতে এলি?

এতটা বলার পর ঘটক হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। এক মিনিট থেমে দম নিয়ে বল্লেন, জামাই এসেছে?

ঘাড় নেড়ে মেয়ে সায় দিয়েছিল।

ডাক্ তাকে। ঘটকের কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক রুক্ষতা।

তাপসকে কেউ ডাকে নি। শ্বশুরের কথা শুনে তিনিই পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। পুলিস অফিসারটি ভদ্র। তিনি চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে—ঘটক তাঁর কম্পমান শীর্ণ তর্জনী তুলে জামাইকে বল্লেন। খবরদার এ বাড়ীতে ঢুকবে না। ঢোকার চেষ্টা করলে জুতো মেরে বার করব।

ক্ষোভে দুঃখে রাগে মিঃ ঘটক কাঁপতে লাগলেন।

ঘটকের ব্যবহারে সকলেই চম্‌কে ছিল। পুলিশ তার স্বভাব সন্দিগ্ধ মন নিয়ে খুনের নতুন হদিস্ আবিষ্কারের কথাও ভেবেছিল।

আমি—আমি, তাপসবাবু এইটুকু বলার পর আর কিছুই বলতে পারেন নি।

হ্যাঁ তুমি। তুমিই তার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে ওর চিঠি দেখিয়ে ভুল করেছি। তুমি-না বলেছিলে ঐ চিঠি পুলিশকে দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে? তুমি আমায় টাকা নিয়ে একা যেতে দাও নি। কেন?

কি জন্যে তুমি আমার সঙ্গে গিয়েছিলে? তুমি বেশ জানতে ওদের ধরা যাবে না। বাজে হ্যাঙ্গাম করে গুণ্ডাদের চটিয়ে ছেলেটাকে তুমিই খুন করিয়েছ। তুমি শয়তান, তুমি পিশাচ। ঘটকের গলা ভেঙ্গে গেল। তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

আপনি স্থির হোন বাবা, আপনি স্থির হোন, ভদ্রা বাবার বিছানায় বসে বাবার হাতখানা নিজের হাতে ধরতেই ঘটক এক ঝট্‌কায় মেয়ের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,. ছুঁস্ নি, ছুঁস্ নি আমাকে, তোরা সব সমান। সুবোর রক্ত তোদের হাতে লেগে আছে।

কি বলছেন আপনি বাবা—

ঠিকই বলছি। সুবো না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি তোরা পাবি এটা কি আমি বুঝি না? গুণ্ডা ক্ষেপাতে তাই তোরা পুলিস লাগিয়েছিলি।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটক তাঁর নিজের বিছানায় পড়ে গেলেন। ভদ্রা তাঁর বুকের ওপোর হাত বুলোতে লাগল।

বাদল, বাদল, ঘটক ডাক দিলেন।

বাদল ঘরে ঢুকে বিছানার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

লোভী শয়তান দুটোকে মারতে মারতে বার করে দে। ভাঙ্গা গলায় শেষ শক্তি প্রয়োগ করে ঘটক নিজের খাস বেয়ারাকে হুকুম দিলেন।

তাপসবাবু বোধ হয় যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে পিছু হটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বেরো, বেরো বলছি, প্রিয় কন্যা ভদ্রাকে ঘটক হুকুম দিলেন।

জলভরা চোখ নিয়ে ভদ্রা বাবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এ বাড়ীতে ইহ, জীবনে আর আসবি না, আমার একটা নয়া পয়সাও তোরা পাবি না, এত লোভ! বেরো—দূর হ—

ভদ্রা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়েছিল। তাপসবাবু বল্লেন, এসো।

ঘাড় হেঁট করে ভদ্রা স্বামীকে অনুসরণ করেছিল। সিঁড়ির কাছে ঠাকুরমা দাঁড়িয়েছিলেন। ডেকেছিলেন, ভদ্র, তাপস, তোমরা যেও না, শুনে যাও—

ওরা শোনে নি, ফিরেও চায় নি। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে তাপসবাবু বাড়ীর দিকেই ফিরেছিলেন। বাড়ী ফিরে অফিসেও আর যান নি। সারা দিন নিজের ঘরে শুয়েছিলেন।

সেই দিনেই এক সময় ভদ্রা বলেছিল, পুলিশে খবরটা না দিলেই ছিল ভাল।

তার মানে? ক্রুদ্ধ রুষ্ট মূর্তিতে তাপসবাবু স্ত্রীকে খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, তোমারও কি মনে হয় আমি পুলিশে খবর দিয়েছি?

দিলে ত। আমারই সামনে,—সে দিন সকালে—

ইডিয়ট, নন্‌সেন্স! সে খবর দিয়েছি কবে? ছুটো কাটা মুণ্ডু বাড়ীতে এসে পড়েছে সে খবরটা দিতে হবে না?

ভদ্রা নীরব। তাপস বাবু বল্লেন, তোমার বাবার বিশ্বাস, টাকা দেবার আগেই আমি পুলিশে খবর দিয়ে গুণ্ডাদের ইচ্ছে করে চটিয়েছি, যাতে তারা তোমার ভাইকে খুন করে, আর আমি তোমার বাবার সম্পত্তিটা পেয়ে যাই। তিনি ব্যবসাদার, চিরকাল টাকা টাকা করেই মরেছেন, তিনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মতই বলেছেন, কিন্তু তুমিও কি তাই বলবে?

ভদ্রা নিরুত্তর। স্বামী বল্লেন, বল্‌বেই ত! ঐ বাপের মেয়ে আর কত ভাল হবে! সেই থেকেই স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ!

কিছু সংখ্যক মানুষের তৈরী-করা ঘূর্ণি ঝড়ে সাজানো সুখী পরিবারের সুন্দর আবহাওয়া হারিয়ে গেল, ওদের চোখের জল আর চাপা নিঃশ্বাসই সার হোল।

ভদ্রা আপন মনেই কাঁদে আর কেবলই ভাবে, কেন এমন হো'ল? কার শাপে এমনটা হয়?

ভারতীর মায়েরও সেই চিন্তা। মেয়েটা এক মাসের ওপোর চলে গেছে। একখানা চিঠিও কি দিতে পারে না! বাপ মা ভাই-বোনদের কথা কি একেবারেই ভুলে গেল! ওর মাস্টারও আর আসে না। সেই যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মাস্টারের বুড়ী ঝিটা ভারতীর ঘর থেকে

তার বাক্স বিছানা নিয়ে চলে গেল তারপর আর কারুর কোন সাড়া শব্দই নেই। কেন? কেন এমন হো'ল! কার শাপে এমনটা হয়?

ভারতীর বাবাও স্কুলে গিয়ে সেক্রেটারী-বাবুর খবর নেবার চেষ্টা করে। নতুন খবর কিছুই নেই। ক'দিন আগে ওর বরাদ্দ কুড়িটে টাকাও পেয়েছে। স্ত্রীকে দিয়েও দিয়েছে। স্ত্রী যে কি করে সংসার চালায়, কি করে দু'বেলা দু'মুঠো সকলের পাতে যোগান দেয় তা সেই প্রাক্তন জোয়ান, বর্তমানের কুড়ি-টাকা-মাইনের ড্রিল মাস্টারের বুদ্ধিতে কুলোয় না। এই দুর্মূল্যের বাজারে মন্টির মা যে কি করে সে-ই জানে! মেয়েটার জন্যও মাঝে মাঝে মনটা বেজায় খারাপ হয়। এত বড়টা হোল, এবারে তার বি. কম দেবার কথা, কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে কোথায় সেই কুচবিহারে গেল চাকরি করতে, কিছুই জানা গেল না! মেয়েটা কেমন আছে কে জানে! একটা চিঠিও সে দেয় না কেন? মন্টি যাবার পর থেকে একটাও ডাক পিওন এ বাড়ীর গলি মাড়ায় নি। ভারতীর বাবা আপন মনেই ভাবে, 'কেন এমন হোল'! ভাবে, আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মাঝে মাঝে নিজের হাঁটু দুটোয় নিজেই তেল মালিশ করে। কুচবিহারে আমার সহকর্মী আর একজন সৈনিক যে ছিল তার ঠিকানাটাও যদি জানতুম তাহলে তাকে একটা চিঠি লিখে—

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘটকের মেজো ভাই পরেশ অবাক হয়ে গেল। এতকালের মধ্যে দাদার কোন চিঠিই সে পায়নি। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত চিঠিখানা পড়ে ফেল্ল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, কিন্তু কি ব্যাপার! 'শম্ভুকে নিয়ে পত্রপাঠ চলে আসবে। ছেলে মেয়ে বউমাদের কাউকেই আনবে না। বিশেষ দরকার। মা ভাল আছে। ইতি তোমার বড়দা'।

শম্ভুকে কিছুই বলার ইচ্ছে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে দুই ভায়ের মধ্যে বাক্যালাপ বড় একটা ছিলই না।। কিন্তু বড়দা যখন লিখেছে তখন তাকে বলতেই হয়। অথচ শম্ভুটাকে ডাকতেও ইচ্ছে হয় না।

ছোট মেয়ের হাত দিয়ে মেজ ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাইয়ের চিঠিখানা পাঠিয়ে দিল।

অনেক জল্পনা কল্পনার পর পরের দিন সকালে আহারাদি সেরে পরেশ ও শম্ভু দু'জনেই দেশ থেকে রওনা দিয়েছিল এবং যোধপুর পার্কের বাড়ীতে যখন ঢুকল তখন বেলা প্রায় দুটো।

বাদলকে দেখে শম্ভু বল্ল, কি ব্যাপার হে? দাদা এই চিঠি পাঠিয়ে আমাদের ডেকেছেন কেন? দাদা কোথায়?

চিঠিখানা বাদলকে দেখানর কারণ যে কি, তা শম্ভু নিজেও ঠিক বোঝেনি, কিন্তু তবুও সে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দেখিয়েছিল। হয়ত তার অবচেতন মনে এ বাড়ী থেকে যাবার সময় দাদা চাকরদের ওপোর শেষ হুকুম যা দিয়েছিল সেটার জন্যই চিঠিখানা দেখিয়ে চাকরকে বোঝাতে চেয়েছিল যে তারা স্ব-ইচ্ছায় আসেনি, দাদা ডেকেছে বলেই এসেছে।

বাদল বল্ল, উনি ঘরে আছেন।

কোন ঘরে?

বাইরের অফিস ঘরে। এখন অন্য লোক রয়েছে। আপনারা ওপোরে ঠাকুরমার কাছে যান, বাইরের লোক চলে গেলেই আপনাদের ডাকব।

শম্ভু এ বাড়ীর সমস্তই চেনে। সে দোতলায় উঠে গেল। পরেশ তাকে অনুসরণ করল।

বিভু ঘটক কথা কইছে আগরওয়ালার সঙ্গে। আজ আর ঘটকের কোন রকম লুকোচুরিই ছিল না। মান-সম্মান, প্রেস্টিজ, মন্ত্রগুপ্তি আজ তিনি সব কিছুর বাইরে। আগরওয়ালাকে সব কথা জানিয়ে তিনি আগরওয়ালার হাতখানা সাগ্রহে ধারণ করে বল্লেন, আর কিছু দিন, দিয়ে বাড়ীখানা কবলা করে নিন।

আপনি থাকবেন কোথায়, গভীর দুঃখের সহিত আগরওয়ালা প্রশ্ন করেছিল।

ঠিক করিনি, তবে এ বাড়ীতে থাকব না, থাকতে পারব না। কেনই বা থাকব!

আপনার অফিস?

ছেড়ে দিচ্ছি। লোক ঠিক হয়ে গেছে।

আগরওয়ালা বল্ল, এর পরে আমার আর বলার কিছু নেই মিঃ ঘটক! আপনি কত পেলে খুশি হবেন বলুন।

আমি আর কি বলব মিঃ আগরওয়াল। আমি জানি মিঃ হাওার খরচ পড়েছিল এক লাখ নব্বুই হাজার। সেটা হোল উনিশশ' সাতচল্লিশের হিসাব। তারপর আমি অল্প কিছু এডিশনও করেছি, তাতে আমার পড়েছে বাইশ হাজার। এখন আপনি যা দেবেন তাতেই আমার বাকী জীবন চলবে।

বড় মুস্কিলে ফেল্লেন মিঃ ঘটক। আপনার ত আবার সবই হোয়াইট মানি চাই।

আপনার যা খুশি। না না না, দাঁড়ান। ব্ল্যাক, ব্ল্যাক—ব্ল্যাক মানিও কিছুটা ছিল আমার, সেই জন্যই কি এমনটা হোল!

ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও মাঝের আঙুল দিয়ে নিজের রগ চেপে চোখ বুজে নিজের বিছানাতেই বসে রইলেন প্রবীণ ব্যবসায়ী মিঃ ঘটক। পরে হাত নামিয়ে চোখ খুলে বল্লেন, নো মোর ব্ল্যাক বিজনেস। মিঃ আগরওয়াল, হোয়াইট যা দিতে পারেন দেবেন, ব্ল্যাকের সঙ্গে সম্বন্ধ আর রাখব না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল, আগরওয়ালা এক ইঞ্জিনীয়ার পাঠাবেন। তিনি বাড়ীর দাম যে রকম ধার্য করবেন সেই মত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন মিঃ আগরওয়াল। বাড়ীটা তার নিজের জন্য নয়, তার হাতে কয়েকজন ধনী ক্রেতা আছে। বেশী দামে বিক্রী হলে আগরওয়াল শতকরা হিসেবে বেশী টাকাই কমিশন পাবেন।

শেষ অনুরোধ জানিয়ে ঘটক বল্লেন, যা করবেন দু' সপ্তাহের মধ্যেই করে ফেলুন, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

তাড়া-হুড়া করলে দাম ভাল উঠবে না মিঃ ঘটক—

নেভার মাইণ্ড। দু'সপ্তাহের মধ্যে যে দাম পাব তাতেই আমার চলবে।

আগরওয়ালা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। যাবার সময় কেবলই ভেবেছিল, ঘটক অত বড় নামকরা ব্যবসাদার, তাঁর এমন অবস্থা কেমন করে হোল? এমনটা কেন হয়?

ঘটকও ভাবতে লাগলেন, দুনিয়ায় আর তাঁর কেউই রইল না। নার্সিং হোম থেকে বাড়ী ফিরে প্রথম দিনেই ফোন করেছিলেন বন্ধু ডাক্তারকে, যার নার্সিং হোমে অনুকে ভর্তি করেছিলেন। সেখানকার খবর শুনে মুষড়ে পড়েছিলেন, পরে আবার খুশিও হয়েছিলেন। ভালই হোল, অন্ধ অশক্ত অবস্থায় বেঁচে থেকেই বা কি হোত! সে গেছে, বেঁচে গেছে, তবে দুঃখ এই যে শেষ দেখাটা হোল না। হিসেব করে বুঝলেন, তিনি নিজে নার্সিং হোমে যাবার পর চতুর্থ দিনে অনু চোখ বুজেছে। ডাক্তার ফোন করে ওঁদের কাউকে না পেয়ে একদিন অপেক্ষা করে শেষে নিজেই সৎকারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। আন্‌ক্লেম্‌ড্‌ বডি, অনুর দেহটা শেষ পর্যন্ত হোল কি না আন্‌ক্লেম্‌ড্‌! তার জীবনের সব চেয়ে বড় কামনা ছিল কলকাতায় নিজের বাড়ী হবে। তার স্বামী তার সেই কামনা পূরণ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। আমি পেরেছি, কিন্তু সে ঐ কানেই শুনে গেল, দেখে যেতে পারল না। কেনার আগেও যদি চোখের দেখা দেখিয়ে দিতে পারতুম! সে দেখতে চেয়েছিল, আমিই দেখাই নি। ভেবেছিলুম একেবারে গৃহপ্রবেশের দিনে তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করব। এমনটা যে হবে তা কে জানত! তাই ভাবছি আর নয়, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, শেষ ব্যবস্থা। ডাকলেন, বাদল, বাদল আছিস?

বাদল এসে ঘরে ঢুকল।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে ঘটক বল্লেন, বোস্‌।

বাদল অবাক হোল। বাবু তাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলছেন। সে বাবুর সামনে বসবে!

বোস্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

বাদল তবুও দাঁড়িয়ে রইল।

কিরে, যা বলছি শোন্। চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে কাছে এসে বোস্।

চেয়ারটা খাটের পাশে টেনে এনে বাদল ভয়ে ভয়ে চেয়ারের কোণে কোনও মতে বসেছিল।

ঘটক বল্লেন, শোন, কতকগুলো কথা তোকে বলব, কিছু মনে করিস নি।

বাদল নীরব।

কিছুক্ষণ স্থির থেকে ঘটক ধীরে ধীরে বল্লেন, তোকে আমি ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তুই ছাড়া এখন আমার আর কেউ রইল না। যে ক'দিন বাঁচব তুই আমায় ছাড়বি না ত? বল্, মনের কথা খোলাখুলি বল্।

মিঃ বি ঘটক নিজের মাইনে করা চাকরের কাছে কৃপাপ্রার্থী।

অমন চালাক চতুর চট্‌পটে বাদলেরও আজ মুখে যেন কথা আট্‌কাচ্ছে। কোনও মতে অস্ফুট স্বরে বাদল বল্ল, কি বলছেন বাবু, আপনাকে এ অবস্থায় কি ছাড়তে পারি!

ঘটক খুশি হলেন। বল্লেন, শোন্, এই বাড়ী আমি ছেড়ে দিচ্চি। আমার আর একটা বাড়ী আছে ভবানীপুরে। সেখানে দুটো ঘর খালি আছে। একটা ঘরে আমি থাকব, অন্য ঘরটায় তুই থাকবি। আর হ্যাঁ, তোর সঙ্গে চারুর কি সম্বন্ধ রে?

বাদল মনে মনে ভীত হোল। মুখে বল্ল, সম্বন্ধ,—ওর সঙ্গে সম্বন্ধ আর কি?

সত্যি কথা বল্। ঘটক আশ্বাস দিয়ে পুনরায় বল্লেন, সত্যি কথা বল্, আমার মনে হয়,—সে যাক, তোর ত কেউ কোথাও নেই, তুই বিয়েও করিস নি, তুই যদি ওকে নিয়ে থাকতে চাস, ও যদি তোর কাছে

থাকতে চায়, তাহলে ভবানীপুরের বাড়ীতে যে ঘরটা তোকে দিচ্চি সেই ঘরে তুই চারুকে নিয়ে থাকতে পারিস্। আমাকে দুটি দুটি খেতে দিবি, আর আমি যতদিন থাকি, ঐ ঘরে তোদের আশ্রিত হয়ে থাকব। আমায় রাখবি ত?

আপনি যা হুকুম করবেন তাই হবে।

হুকুম—আমি হুকুম করব? হ্যাঁ,—ওরে, হুকুম আমার ফুরিয়ে গেছে। আর আমি এ জীবনে কাউকে হুকুম করব না। আমার হুকুমের দিন শেষ হয়ে গেছে। তবে শেষ কথা তোকে বলি শোন। তোদের ঐ মনোরমা জেঠাই-মা তোদের জেঠাই-মা ছিল না, সে ছিল তোদের মা।

বাদল অবাক হয়ে শুনতে লাগল।

তার ছেলে, ঐ খোকা, ও আমারই বড় ছেলে। ওর চিকিৎসা করিয়েছি অনেক। ও সারল না, হয়ত মানুষ হয়ে দাঁড়াতেও পারবে না। আছে এখন লুম্বিনী পার্কে। ওর জন্য মাসিক তিনশ' টাকা দিতে হয়। ও যতদিন থাকবে, তা ওখানেই থাকুক, কি বাড়ীতেই আসুক, ওর যা দরকার হবে তুই করবি, টাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। তোকে বিশ্বাস করি, সে জন্যই তোকে এই ভার দিচ্চি, আমার কথামত চলবি তো, ওকে পথে বসাবি না তো?

কি বলছেন বাবু! আমি আমার জীবন দিয়ে আপনার হুকুম মেনে চলব। বাদল ধীরে ধীরে উত্তর দিল।

তাই চলিস্, তাই চলিস্ রে! যে কদিন থাকবি, সৎপথে থাকলে কোন দুঃখ পাবি না। এখনও, এই শুয়ে শুয়েও আমি যতটা পারি তোদের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

বাদলের চোখ ছাপিয়ে জল এল। তার কেবলই মনে হচ্ছে, সে কি দেখছে! অমন বাঘের মতো সাহেব, যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সে তো কোন ছার, অনেক বড় বড় লোকও কেঁপে উঠত, তাঁর এই অবস্থা!

কাঁদিস্ নি। কেউ যাতে চোখের জল না ফেলে সে জন্যই সারা জীবন খেটেছি রে। এখন এই পড়ে পড়েও তোদের জন্য যতটা পারি ব্যবস্থা করে যাব।

নিজেকে সামলে নিয়ে বাদল বল্ল, দেশ থেকে মেজবাবু ছোটবাবু এসেছেন।

এসেছে! ঘটক যেন কেমন একটু বিব্রত বোধ করলেন। পরক্ষণেই বল্লেন, তা ত আসবেই। ওদের আসতে বলেছি তাই এসেছে। ওরা কোথায়?

ওপোরে ঠাকুরমার ঘরে। ডাকব?

ডাক্। তারপর আপন মনেই বল্লেন, চট্‌পট্ কাজ সারি। কোনো কাজ আর ফেলে রাখার সময় নেই। কাজ আমায় সারতেই হবে। ফেলে রাখার জন্যই অনু তার নিজের বাড়ীখানা চোখের দেখাও দেখে যেতে পারল না!

পরেশ শম্ভু দু'জনকে সামনে বসিয়ে বিভু ঘটক বল্লেন, সবই ত শুনেছ, এখন আরও শোন, আমি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমরা মায়ের ভার নেবে। এল্ আই সি-র এ্যানিউটি স্কীম করছি মায়ের নামে। মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন মাসোহারা পাবেন। যেদিন চোখ বুজবেন সেদিন থেকেই টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। এই বুঝে মাকে যত্ন-আত্তি করবে। উনি থাকলেই তোমাদের লাভ, গেলেই লোকসান, এটা ভুলো না।

কত টাকা? শম্ভু আড়ষ্ট স্বরে প্রশ্ন করে।

এক টুকরো ম্লান হাসি ঘটকের মুখের ওপোর ভেসে উঠল। বল্লেন, ওঁর জন্য মাসিক যত টাকা তোমাদের খরচ হবে তার চেয়ে কিছু বেশীই তোমরা মাসে মাসে পাবে।

তবুও কতো সেটা শুনলে ভাল হোত, পরেশ বলেছিল, যে দুর্মূল্যের বাজার, ওঁর ওষুদ-বিষুদ, ফল-পাকড়, দুধ-ঘি, সবই ত আছে!

কত হলে তোমাদের চলবে মনে হয়?

মাসে একশ' টাকা,— পরেশ কথাটা উচ্চারণ করা মাত্রই শম্ভু বল্ল, একশোয় কি হবে দাদা, দু'শো আড়াইশো'র কমে কুলোতেই পারবো না।

শম্ভুর মনে আছে দাদার মানিব্যাগে সব সময় প্রচুর টাকা থাকে। পরেশ অতটা ঠিক জানত না।

দরজার পরদা সরিয়ে ঠাকুরমা ঘরে ঢুকলেন। ওরা সকলেই তাঁর দিকে চেয়ে দেখল। ঠাকুরমা বল্লেন, তুমি যাবে কোথায় বিভু, তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

তুমি তো ওদের কাছেই থাকতে ভালবাস মা। তোমার ইচ্ছামত ব্যবস্থাই আমি করছি, ঘটক মাকে বলেছিলেন।

না বাবা, তোমাকে ছেড়ে দেশে আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব।

এ বাড়ী আমি বেচে দিয়েছি মা।

কেন? এ মৎলব তোমাকে কে দিল?

কেউ দেয় নি মা, বাধ্য হয়ে বেচতে হোল। খরচ-পত্র সামলাতে পারলুম না।

কোথায় থাকবে তুমি?— মা প্রশ্ন করলেন।

সে আমি বলতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমার থাকা চলবে না। তোমার দেখা শোনা করবে কে? তুমি দেশে যাও।

তোমার দেখা শোনা কে করবে?— মায়ের প্রশ্ন।

সে যা হয় হয়েই যাবে।

সেই ভাবেই আমার হবে, মা জিদ করলেন।

আঃ মা, তুমি আমাকে আর বকিও না। চিরটা জীবন তোমার কথা শুনে মাতৃভক্তির চুড়ান্ত করেছি। আর পারব না। তুমি ওদের কাছেই থাকবে, তোমার খরচ যাতে ভাল ভাবে চলে সে ব্যবস্থা আমার সাধ্যমত করেছি।

কি ব্যবস্থা করেছ তুমি? তোমার সঙ্গে আমার কি শুধুই টাকার সম্বন্ধ! জ্ঞানবান ছেলে হয়ে এটাই তুই মনে করিস?

শম্ভু এবার মায়ের কথার উত্তর দিল। বল্ল, মা, তুমি বুঝছ না কেন, দাদার অসুখ, শরীর মন দুইই খারাপ। উনি যদি তোমার ঝক্কি নিতে না চান। তা ছাড়া এত দিন তো দাদার কাছে রইলে, এবার আমাদের কাছে থাকো। আমরা কি তোমার ছেলে নই ?

মা নীরব।

শম্ভু বল্ল, ঝি বামনীর হাতে পড়ে থাকতে এতই ভাল লাগে ? তোমার ছোট বউমা রয়েছে, ঝাড়া-হাত-পা মানুষ, তার ছেলেপিলের ঝক্কি নেই, মেজবৌদি তোমার তদারক ঠিকমত রাখতে না পারলেও ছোট বৌ তো পারবে। তার কি ইচ্ছে হয় না তোমার সেবা-শুশ্রূষা করতে ?

মেজই বা পারবে না কেন ? ছেলেপুলে থাকলে কী শাশুড়ীকে কেউ ফেলে দেয় ? পরেশ ছোট ভাইয়ের কথার প্রতিবাদ করে।

ঘটক বল্লেন, তর্ক করে লাভ নেই মা। যা করব বলে ঠিক করেছি তা আমার করা হয়ে গেছে। তুমি ওদের সঙ্গে দেশে যাও। তা ছাড়া তুমি তো তাই চেয়েছিলে। তোমার ইচ্ছাই ভগবান পূরণ করেছেন। এখন তোমার ঘরে যাও, এদের সঙ্গে দরকারী কথাগুলো আমি সেরে নিই।

ঘরে যাও মা, ঘরে যাও, শম্ভু চেয়ার ছেড়ে উঠে মাকে যেন ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই দাঁড়াল।

নিরুপায় বৃদ্ধা ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল, ক'দিন আগে তিনি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখেছিলেন, এই বাড়ীর মজবুত ছাতখানা অজানা এক ভূমিকম্পে চড়্ চড়্ করে ফেটে গিয়েছিল। সেদিনের দিবাস্বপ্ন কি এইভাবেই বাস্তবে পরিণত হোল !

বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ির ওপোর বসে পড়ে বৃদ্ধা নিজের কপালে করাঘাত করেছিলেন।

আপন মনেই ভেবেছিলেন অমন ছেলে, এমন বাড়ী, কি করে কার শাপে এমনটা হোল ? এমনটা কেন হয় ?

টাকাটা কি ভাবে আমাদের কাছে যাবে? পরেশ প্রশ্ন করেছিল ঘটককে।

সে আমি এখনও সঠিক বলতে পারব না পরেশ। ইন্সিওরের লোককে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। আজ-কালের মধ্যেই সে আসবে। সে এলে তার সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেব, তোমরা বুঝে নিও।

ওঁর কিঁ ইন্সিওর আছে?—শম্ভু প্রশ্ন করে।

না, উত্তর দিলেন ঘটক, ইন্সিওরকে এক-কালীন টাকা দিয়ে এমন একটা পলিসি করাব যাতে করে মাসোহারার টাকাটা তারা মাসে মাসে মায়ের নামে পাঠায়।

ও, তা-তা বড়দা, এই ভাবে ঘরের টাকা পরের হাতে দেবার কি দরকার? জানেন ত, পরহস্তগতং ধনং। পরের মুখ চেয়ে থাকা কি ভাল?

তা হলে কি করতে হবে? ঘটক প্রশ্ন করলেন।

ঐ টাকায় মায়ের নামে জমি কেনা যেতে পারে। সেই জমির আয় থেকে—

তোমাদের আমি চিনি পরেশ। তোমরা আমার কাছে নতুন নও। অনেক ভেবে এটাই ঠিক করেছি যে মা যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিনই টাকাটা মায়ের নামে যাবে। এর ফলে তোমরা মাকে যত্ন-আত্তি করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, এই আমার বিশ্বাস।

না হলে মেরে ফেলব, এই কথাই তুমি বলতে চাও, পরেশের রাগত স্বর।

অসম্ভব নয়। তাপস কি করল? ঘটক উত্তর দিলেন।

আঃ দাদা, তুমি বুঝছ না, কথাতেই ত আছে, যম জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা।

মা ত আমাদের পর নয়, যেমন তোমার তেমনি আমাদেরও তো? কথাটা বলেছিল শম্ভু।

তর্ক ছাড়ো শম্ভু, যা করব ঠিক করেছি তা আমি অনেক ভেবেই

ঠিক করেছি। ঐ হবে। তোমরা যদি রাজী না হও তবে তাও খোলাখুলি বলো, আমি এখনও এই বিছানায় শুয়ে শুয়েও অন্য ব্যবস্থা করতে পারি। সে ক্ষমতা আমার এখনও আছে।

পরেশ বল্ল, না দাদা, তোমার কথার অবাধ্য আমি হব না, তবে কি না যেটা ভাল মনে করেছি সেটাই বলেছি।

বেশ ত, তুমি বলেছ, আমি শুনেছি। এখন আমি যা করব তাই বল্লুম। তোমার, মানে তোমাদের পোষায় তোমরা বলো, না পোষালে ফিরে যাও, আমি অন্য ব্যবস্থা করি।

না, না, দাদা, রাগ কোরো না। তোমার হুকুমই আমার শিরোধার্য, বর্ধমান কোর্টের মুহুরী পরেশ ঘটক দাদার কথাই শিরোধার্য করল।

শম্ভু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমারও।

সেই বিকালেই ইন্‌সিওরের এজেন্ট এসেছিল। এসেছিল সেল্‌স্ বুরোর লোক, তারা নীলামদার। বাদলকে ডেকে ঘটক বল্লেন, আমার ঘরটা বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত ঘরে একে নিয়ে যা। বই এবং বইয়ের আলমারি ছাড়া অন্য জিনিসপত্র যা আছে সমস্ত দেখাবি। তারপর এঁকে আমার কাছে নিয়ে আয়।

নীলামদারের লোক সব দেখে এসে বলেছিল, আমাদের পাঁচ পার্সেণ্ট বাদ দিয়ে আপনি আশা করতে পারেন হাজার আস্টেক টাকা। নয় দশও উঠতে পারে।

ছুটো ফ্রিজ, একটা হট্ কেস্, আটখানা পাখা, গিজার, রেডিওগ্রাম, ছুটো বাথ টব্, এত ফার্নিচার, গ্রাণ্ড ফাদার ক্লক, ওভেন, এই সমস্তর দাম মাত্র এই?

সব দেখেই বলছি স্যার। শ'তুয়েক টাকা বাড়তি বিজ্ঞাপন খরচ করতে রাজী হোলে আরও কিছু খদ্দের বেশী হতে পারে। সেটা কি করব স্যার?

করবেন। ঘটক উত্তর দিলেন।

তারিখটা কবে দেব স্যার ?

সামনের রবিবারের পরের রবিবার। ওটা কত তারিখ ?

ওটা—ওটা ছ'তারিখ।

ঠিক আছে, ঐ তারিখেই সেল্ হবে। ঘটক হুকুম দিলেন।

নিলামওয়ালা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকালে এলেন প্রফেসার সিন্‌হা। ঘটকের বাণিজ্যবন্ধু কমলকুমার সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণকুমার সিংহ। গতকাল রাত্রেই তাঁকে টেলিফোনে ডেকেছিলেন বি. ঘটক। অরুণবাবু এই বয়সেই ডি. ফিল, ডি. লিট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক।

কেমন আছেন কাকাবাবু ? ডঃ সিন্‌হা নমস্কার করে পায়ের ধুলো নিলেন। ঘটক তার মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, হিসাব নিকাশ করছি হে, তাই তোমাকে ডেকেছি।

আজ সকালে ঘটককে কিছুটা সুস্থ দেখাচ্ছিল। কিছুটা প্রফুল্লও বটে। বল্লেন, শোনো, লেখাপড়ার রাজ্যে তোমার কাছে আমি নাবালক। তাই তোমার সাহায্য চাই। আমার কাছে ভাল ভাল বই আছে প্রায় দু'হাজারের মতো। সারা জীবন পছন্দমত বই আমি কিনেই গেছি, পড়ি নি, পড়ার সময়ও পাই নি, বিদ্যেও নেই। সখ করে কিনেছি, আলমারি সাজিয়ে রেখেছি। এখন আমি তোমাকে ডেকেছি ওগুলোর ব্যবস্থা করার জন্য। তুমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কেউ-কেটা। তাই না ?

সলজ্জভাবে সিন্‌হা বল্লেন, হ্যাঁ, আমি পরিষদে আছি।

তুমি এক কাজ করো। আলমারি সমেত সমস্ত বই আমি পরিষৎকে দান করতে চাই। তুমি ওদের বলে ওগুলো নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।

এখনই দেবেন ? আপনার দরকার হবে না ?

না হে না, দরকার আমার কোনও দিনও হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। ভেবেছিলুম, ছেলের দরকারে—। কিন্তু থাক সে কথা, তুমি ওগুলো পরিষদে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। গাড়ী ভাড়া যা লাগে আমি

দেব। আর এক কথা, তোমাদের বিজ্‌নেস ম্যানেজমেণ্ট ইনস্টিটিউট না কি ঐ রকম নামের একটা কলেজ হয়েছে না?

হ্যাঁ হয়েছে। অনেকদিন হোল হয়েছে।

আচ্ছা, সেই কলেজে আট দশ হাজার টাকা, ঠিক কত তা আমি এখনই বলতে পারছি না, ঐ টাকাটা আমি লেট্‌ জে, আর, হাণ্ডার নামে এন্‌ডাওমেণ্ট করাতে চাই। হাণ্ডাকে তোমার বাবা ভালভাবেই চিনতেন। এক সময় বিজনেস্‌ ওয়ার্লডে হাণ্ডার প্রতিপত্তি ছিল। সেই তাঁরই নামে একটা স্থায়ী কিছু কি করা যায় সেটা ভেবে আমাকে বলবে এবং ব্যবস্থা করবে। ঐ সামান্য টাকায় স্কলারশিপ বোধ হয় হবে না, ফ্রি স্টুডেণ্টশিপ্‌ কিংবা দু'একখানা মেডেল বছরে বছরে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। যা করলে ভাল হয় তুমি করিয়ে দাও। টাকা আমি তোমাকে সামনের মাসের সাত তারিখে দিয়ে দেব।

মনে ভাবলেন নীলামের টাকাটা নিলামের দিনে না হলেও পরের দিনে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

তা কাকাবাবু, বইগুলো ত পরিষদে আপনার নামেই জমা হবে?

নামে? ভাবতে ভাবতে ঘটক বল্লেন, ডোনারের নাম থাকে না কি?

থাকে। গোটা আলমারি শুদ্ধ দিলে সেই দাতার কলেক্‌শন বলে আলাদা রাখা হয়। প্রত্যেক বইয়ের মধ্যেও ডোনারের নাম থাকে।

অ। তাহলে—তাহলে ঐ বইগুলো থাকবে 'সুব্রত ঘটকস্‌ কলেক্‌শন', এই নামে, বুঝলে? আর হ্যাঁ, শোনো—আচ্ছা থাক, তোমাকে আর কত খাটাবো?

না না, বলুন না কাকাবাবু, আপনি যা বলবেন—। আপনি আমাকে পর ভাবছেন কেন?

না না না, তুমি পর হবে কেন, পর হলে কি আর তোমাকে ডাকতুম? তুমি কমলের ছেলে, তোমার অন্নপ্রাশন থেকে বিয়ে পর্যন্ত বরাবর নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি; কমল আজ নেই, আর তুমি অন্য লাইনে

চলে গেছ সে জন্যই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ তেমন নেই, না হলে তুমি ত আমাদের সেই অরুণই আছ। তুমি তা হলে আর একটা কাজ করো বাবা, আমার ছেলের একখানা মোটর বাইক আর একটা দামী ক্যামেরা আছে। সেই দুটো বিক্রী করে যা দাম পাবে সেটা তোমার কোনো জানা স্কুলে জমা দিয়ে গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র যারা বই কিনতে পারে না তাদের বই কিনে দেবার জন্য একটা ফাণ্ড করিয়ে দাও। ওটাও আমার ছেলের নামে হবে, বুঝলে ?

সব শুনে ডঃ অরুণ সিন্‌হা কিছুটা ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ও-বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলেন। আগে এমন একটা সময় ছিল যখন বিভূতি কাকা হাজার কাজ ফেলেও সপ্তাহে অন্তত একটা দিন বাবার ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিতেন, না হয়ত বাবা আসতেন কাকার বাড়ীতে। অরুণের সে সব দিন স্পষ্ট মনে আছে ; সে তখন কলেজের ছাত্র। সেই কাকার এই অবস্থা ! মানুষের জীবনে এমনটা যে কেন হয় ?

দিন দুয়েক পরে ঘটক তার পাচককে ডাকলেন। ঘটকের ঘরে তখন ছিলেন এক অবাঙ্গালী ব্যবসাদার। ঘটক পাচককে দেখিয়ে সেই ভদ্রলোককে বল্লেন, এই আমার কুক্‌। অনেক রকম খাবারই তৈরী করতে জানে।

সেই ভদ্রলোক বল্লেন, ঠিক হ্যায়, আপনি যখন রেকমেণ্ড করছেন—

ঘটক বল্লেন, শোনো ঠাকুর, আমার অফিসটা ইনিই নিচ্ছেন। ঐ পাড়ায় এঁর নিজেরও একটা বড় অফিস আছে। সেই অফিসের ক্যান্টিনে তুমি সামনের মাস থেকে হেড্‌ কুক্‌-এর কাজ করবে। একশ' পচিশ টাকা মাইনে আর খাওয়া থাকা পাবে। ওখানে কাজ করবে ত ?

জী। ঠাকুর এক লম্বা সেলাম দিল।

ওরা চলে যাবার পর ঘটক ডাকলেন বৈজুকে। বল্লেন, বৈজু, সুখে-দুঃখে অনেক দিনই আমার সঙ্গে তুমি রয়েছ। তুমি আমার

গাড়ীর ড্রাইভার। গাড়ীতে যখন যেতুম তখন তোমার হাতেই জীবনটা ছেড়ে দিয়ে যেতুম। এখন আমি সকলের সব কিছু হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। তোমাকে আর কি দেব বলো! তোমাকে আমার গাড়ীখানাই দিয়ে যাব। তুমি আমার চিঠি নিয়ে এই ঠিকানায় যাবে। তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, চিঠিতেই সব লিখে দিয়েছি, ফোনেও কথা বলেছি। মাসখানেকের মধ্যেই তুমি ট্যাক্সির পারমিট পেয়ে যাবে। যা লিখে পড়ে দিতে হয় সব করে দেব। ঐ গাড়ীটাই ট্যাক্সি হবে, সিক্সটি এইট্ মডেলের এ্যামবাসাডর, কোন অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া যতদিন পারমিট না পাও ততদিন প্রাইভেট ট্যাক্সি হিসাবে অফিস টাইমে প্যাসেঞ্জার ক্যারি কর। বুঝলে?

চোখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বৈজু ঘটকের ঘর থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল।

প্রসাদের মা-ও চোখে আঁচল চাপা দিয়ে প্রসাদের বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাক-পিয়ন চার-পাঁচখানা চিঠি আজ এই মাত্র দিয়ে গেল। মায়ের আশা হোল, হয়ত প্রসাদের কোন খবর এসেছে, কিন্তু না, কোনো খবরই নেই। সেই যে সেদিন ভোরবেলায় ছেলে চলে গিয়েছিল বলে ঝিয়ের কাছে তিনি শুনেছিলেন তারপর থেকে কোনও খবরই তার নেই। যত জায়গায় সম্ভব খোঁজ নেওয়া হোল,—ভাইয়ের কাছে, জামাইবাড়ী, প্রসাদের বন্ধু যারা মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করত সকলের কাছে, কিন্তু না, ওর কোন খবরই কেউ জানে না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল, ফটো ছাপানো হোল, কোথাও কোন পাত্তা নেই। অমন থান্ ইটের মতো ছেলে—

বাবা বলেন, আমার স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে, সে যে কী হোল, কোথায় গেল, তার সন্ধান দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে কাগজে ছাপালুম—

মামা বলেন, ব্রিলিয়ান্ট, ছেলেটার ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার, সে গেল কোথায়?

ভগ্নীপতি বলেন, মিস্টিরিয়াস, সে ত বেহিসেবী নয়! তবে দিনকাল যা পড়েছে, কোথাও কেউ মেরেই ফেল্ল, না কি—ওঁরা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে ভাবেন। ভাবেন, কেন, কেন এমন হয়?

ভাবেন পুলিশ অফিসারও। ইন্‌ভেস্টিগেটিং অফিসার অনুসন্ধানে যতটা পেয়েছেন সবই তাঁর উপরওয়ালার কাছে প্লেস করে বল্লেন, প্রফেসার অজিত বসুর কেস্‌টা স্যার অত্যন্ত জটিল। কেমন যেন সন্দেহ হয় তিনিই কাল্‌প্রিট, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ কিছু নেই। অপর পক্ষে তিনি আবার পি আর বণ্ডে বেল্‌-এ আছেন।

হুঁ, ওঁর সম্বন্ধে কি কি পেয়েছেন বলুন ত, গম্ভীর কণ্ঠে অফিসার চোখ তুলে প্রশ্ন করেন।

তাহলে শুনুন স্যার। উনি কলেজের অধ্যাপক, ছাত্রমহলে সুনাম আছে। কোনো পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বার উনি নন তবে বামপন্থী, লিনিংস্‌টা ঐ দিকেই।

এগুলোর কোনটাই অপরাধ নয়।

না স্যার। ওঁর সম্বন্ধে যা পেয়েছি সবটাই বলছি। উনি কৃতী অধ্যাপক, উত্তর কলকাতার তিনটে স্কুলের গভরণিং বডির মেম্বার, একটা স্কুলের সেক্রেটারী। নিজে ব্যাচিলর, চরিত্রবান বলেই শুনলুম। মধ্য কলকাতার এক ধনী গৃহে পেয়িং গেস্ট হয়ে একখানা ঘরে একা থাকেন। একখানা ফিয়াট গাড়ী ওঁর আছে। ওঁর হবি হচ্ছে সেই গাড়ী নিয়ে বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ মাইল ঘুরে বেড়ানো। অবসর সময়ে কবিতা লেখেন। ওর ঘর সার্চ করে কিছু ম্যানাস্ক্রিপ্ট কবিতা এবং মাসিক পত্রে ছাপানো কবিতাও বেশ কিছু পেয়েছি।

কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু কি?

ব্যঙ্গ কবিতা, হাসির কবিতা, প্রেমের কবিতা এই সবই আছে, পলিটিক্সের নাম গন্ধ কোথাও নেই।

তবে ওকে কালপ্রিট মনে হয় কেন? আচ্ছা উনি ডায়েরী-টায়েরী কিছু লেখেন?

বোধ হয় না। সে রকম কিছু পাইনি।

হিসেবের খাতা ?

তাও না। ব্যাঙ্কের পাস বই পেয়েছি, তাতেও লক্ষ্য করার মতো কিছু নেই। তবে এটা তো ঠিক যে ওঁর নামে একটা ক্রিমিন্যাল কেস রয়েছে ? উনি বেল্-এ আছেন।

জানি।

ছাব্বিশ তারিখে ওঁর কোর্টে এপিয়ার হবার কথা ছিল কিন্তু ছাব্বিশ তারিখে উনি ছিলেন হস্‌পিট্যালে, কাজেই—

আচ্ছা, ও কেসটায় কিছু পাওয়া গেছে কি ?

কিচ্ছু না। শুধু সন্দেহের ওপোর ধরা হয়েছিল।

সে রাত্রের ইন্‌সিডেণ্ট সম্বন্ধে ওঁর ডিপোজিসন কি ?

সেইটেই বলছি স্যার। উনি বলেন, উনি পুরুলিয়া থেকে ফির-ছিলেন। পথে ওঁর নামার দরকার হয়েছিল। রাত তখন আটটা হবে। গাড়ীটা রাস্তা থেকে অল্প সরিয়ে উনি নেমেছিলেন।

নামার দরকার হোল কেন ?

উনি বল্লেন, প্রস্রাব করার জন্য গাড়ী থামিয়ে নেমেছিলেন। যেমনি রাস্তার পাশে বাঁশতলায় গেলেন, উনি বল্লেন, একজন লোক অন্ধকার থেকে দৌড়ে এসে ওঁকে ধরার চেষ্টা করে। তার হাতে ছিল রিভলবার। উনি, নিজে ত ইয়ং ম্যান, বেশ শক্তিও রাখেন, উনি তার ওপোর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রিভলভার কেড়ে নেন। তারপর নাকি আরও একজন লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ওঁকে আক্রমণ করে। উনি সেই কেড়ে নেওয়া রিভলভার থেকে গুলি চালিয়েছিলেন, এ পর্যন্ত ওঁর মনে আছে, কিন্তু তারপর কি হয়েছিল তা আর বলতে পারেন না।

তা হলে এটা ঠিক যে উনি দুর্দান্ত সাহসী এবং রিভলভার চালাতে জানেন।

হ্যাঁ স্যার। তা ত জানবেনই। উনি এন্ সি সি-র অফিসার, তা ছাড়া নর্থ ক্যাল্‌কাটা রাইফেল ক্লাবের অনারারি ট্রেনার।

অ। আচ্ছা যে বডিটা পাওয়া গেছে সেটা আইডেন্টিফাই করা গেল না?

না স্যার। যে রিভলভারটা উনি কেড়ে নিয়েছিলেন সেটা কুইক রিপিটার। সবগুলো গুলি ঐ আততায়ীর মুখের ওপোর এমন ভাবে পর পর পড়েছিল যে আততায়ীর মুখখানা একেবারে স্ম্যাস্‌ড্‌ হয়ে গেছে। দাড়ী থেকে মাথা পর্যন্ত সবটাই শেপ্‌লেস্‌ অবস্থায় পেয়েছি।

তাহলে আপনি বলছেন দ্বিতীয় আততায়ী প্রফেসারকে পিস্তল দিয়ে মেরেছিল?

সিচুয়েশন থেকে তাই তো মনে হয়।

সে পিস্তলটাও ওখানে পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ স্যার। মার্কা থেকে দেখা যায় সেটা পাকিস্তানী। সম্ভবত স্মাগল্‌ড্‌ আর্ম, ছ'ঘরা পিস্তল। তা থেকে একটা মাত্র গুলিই ছোঁড়া হয়েছে এবং সেটাই প্রফেসারের পেটে বিঁধেছিল। বাকী পাঁচটা কার্টিজ ইন্‌ট্যাক্ট পাওয়া গেছে।

তা হলে একটা জিনিস ভাবতে হবে মিঃ ঘোষ, দ্বিতীয় আততায়ী দ্বিতীয় পিস্তল দিয়ে প্রফেসারকে মারল এবং পালিয়েও গেল, কিন্তু তার পিস্তলটা সে ফেলে গেল কেন?

সেটাই ত আমার সন্দেহ! তবে এ সূত্রে এও মনে করা যেতে পারে যে, বড় রাস্তার ওপোর ঘটনাটা ঘটেছে, রাত্তিরও বেশী হয়নি, হয়ত ঘটনাটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কোন গাড়ী-টাড়ী এসে পড়ায় লোকটা পালিয়েছে। এ রকম ভাবেও জিনিসটা এক্সপ্লেন করা যায়।

তা না হয় বুঝলুম সে পালাল, কিন্তু পালাবার সময় পিস্তলটা ফেলে পালাল কেন? তার পক্ষে ওটাকে এবং পারলে তার মৃত সঙ্গীর রিভলভারটাও নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, তাই নয় কি? তা ছাড়া আর একটা কথা। প্রফেসারই যদি ওদের টারগেট হয় তাহলে ঘটনার পরে অতটা সময় পেয়েও আবার ফিরে এসে প্রফেসারকে খতম করে নি কেন?

হাঁ স্যার এ সবের কোন মীমাংসা আমি পাচ্ছি না। এ সম্বন্ধে

প্রফেসারের কথাগুলোও সন্দেহজনক, এলোমেলো। তিনি যেন ধরেই নিয়েছেন যে ও দুটো ওখানেই পাওয়া যাবে।

তাই নাকি? আচ্ছা। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন, ওখানে ফুট প্রিন্ট কিছু আছে?

আছে। প্রফেসার স্টিয়ারিং থেকে পীচের রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁর জুতোর রবার সোলের দাগ পাওয়া গেছে, কিন্তু আর কোন দাগ নেই। তিনি গাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরে রাস্তার বাঁ দিকে গিয়েছিলেন সে চিহ্নও পাচ্ছি, কিন্তু অন্য কোন ফুট প্রিন্ট ওখানে নেই, কারণ প্লেস অফ্ অকারেন্স-এ পুরু হয়ে শুকনো বাঁশপাতা এত রয়েছে যে সেখানে কোন চিহ্নই পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রফেসার আছেন কেমন? ডাক্তার কি বলে?

ভাল নয়। জ্ঞান হয়েছে, কথাও বলছেন, কিন্তু লস্ অফ্ ব্লাড এত হয়েছে যে বেশ কয়েক বোতল ট্রান্সফিউজ করার পরেও এখনও দারুণ দুর্বল। তাছাড়া ওঁর পাকস্থলীতে পিস্তলের গুলিটা এমন ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে অপারেশনের পরেও ডাক্তারেব মতে ওঁর সেরে ওঠা খুব দুরূহ।

আচ্ছা, প্রফেসর ওখানে জখম হয়ে ঠিক কতক্ষণ পড়েছিলেন মনে হয়? ওঁদের ঘড়ি থেকে কিছু আন্দাজ পাওয়া গেল কি?

না স্যার। প্রফেসার এবং আততায়ী দু'জনেরই হাতে ঘড়ি ছিল কিন্তু ঘড়ি দুটোর কোনটাই বন্ধ হয়নি। প্রফেসারের হাতে ছিল দামী ক্রনোমিটার, এইটিন ক্যারেট গোল্ড, আততায়ীর হাতে ছিল রোমার, এমনি একটা সাধারণ ঘড়ি। রাত্রি সাড়ে দশটায় চৌকীদার থানায় খবর দেয়। থানা ওদের পিক আপ করে এগারটার পর।

আততায়ীর পকেটে কিছু পাওয়া গেছে?

কিছু না। সিগারেট, লাইটার, একটা কলম, মামুলি এক চামড়ার মানি ব্যাগে গোটা কুড়ি টাকা, কিছু খুচরা পয়সা। এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কাগজপত্র কিছুই ছিল না? কোনও বাসের টিকিট, কারুর কোন চিঠি বা ঠিকানা, কোন রকম হাতের লেখা?

না স্যার। কিচ্ছু না।

জামা প্যান্টে ধোবী মার্ক?

আছে স্যার। ডাইং ক্লিনিং-এর কয়েকটা নম্বর। জামা প্যান্ট ইন্‌ভেস্‌স্টিগেশন্‌-এ পাঠানো হয়েছে।

বডিটা ডিস্‌পোজড হয়েছে?

হ্যাঁ স্যার। পোস্ট মর্টেমের পর বডিটা আন্‌ক্লেমড্‌ হিসেবে ডিসপোজড হয়েছে।

উপরওয়ালা অফিসার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্লেন, এক কাজ করুন, হসপিটালে প্রফেসারের কাছে প্লেন ড্রেসে লোক রাখুন। প্রফেসারের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে, তাদের ওপোর ওয়াচ রাখুন। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কি হয় সমস্ত নোট্‌ নিন। আমার বিশ্বাস, যে মেরেছে সে প্রফেসারকে মারবে বলেই তৈরী ছিল। প্রফেসার তাকে চিনতেও পারেন, বিশেষ কোন কারণের জন্যই তিনি বলেছেন, চিনি না।

কিম্বা এও হতে পারে যে আততায়ী ভুল করে প্রফেসারকে অন্য লোক ভেবে মেরেছে? তাও ত সম্ভব স্যার।

সে রকম ভুল বোধ হয় সম্ভব নয়, কারণ প্রফেসার তাঁর নিজের গাড়ী থেকে নেমেছেন। এ কাজ যারা করবে তারা প্রফেসারের গাড়ী-খানা নিশ্চয়ই চিনবে, গাড়ীর নম্বরটা অবশ্যই মুখস্থ রাখবে। কি বলেন?

তা অবশ্য বটে।

আপনিই ত বলছেন প্রফেসারকে কেমন যেন সন্দেহ হয়। বলছেন না?

তা বলছি স্যার। ওঁর ঐ যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোটা উনি বলছেন 'হবি', কিন্তু সেখানেই কেমন যেন সন্দেহ হয়।

ওঁর পুরুলিয়া যাবার সঙ্গত কারণ উনি কিছুই দিতে পারলেন না?

না।

তাহলে আরও এক কাজ করুন। ডাক্তারকে বলে ড্রাগ দিয়ে ওঁকে সেমি-ডিলিরিয়াস্ করে সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় কোশ্চেন করে দেখুন যদি কোন ক্লু পাওয়া যায়। সেই টাইমে আমাকে বলবেন, আমিও সঙ্গে থাকব।

আচ্ছা স্যার।

পরের দিন বেলা চারটের পরেই হাসপাতালে প্রফেসারের বিছানার ধারে দু'টি কম বয়সী ছেলে মেয়ে এসেছিল প্রফেসারকে দেখতে। এরা এর আগেও একদিন এসেছিল,—সেই যেদিন প্রফেসারের দুর্ঘটনার সংবাদ নিয়ে পুলিশ থেকে প্রফেসারের বাড়ীতে অনুসন্ধানের জন্য আই-বি-র লোক গিয়েছিল সেই দিনেই ওরা খবর পেয়ে এসেছিল।

ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যেদিন ওপোরওয়ালার সঙ্গে প্রফেসার সম্বন্ধে আলাপ করলেন সেই দিনের অপরাহ্নেই প্রফেসারকে সাধারণ বেড্ থেকে সরিয়ে আলাদা একটা কেবিনে রাখা হয়েছিল এবং সেই বিকাল থেকেই দু'জন বিশেষ ব্যক্তিকে দিনে এবং রাতে প্রফেসারকে দেখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সব খরচ কে বহন করছে তা প্রফেসার জানতেও চেয়েছিলেন কিন্তু সঠিক উত্তর তিনি পান নি। প্রফেসার মনে মনে সেই কথাই ভাবছিলেন যে, এত খরচ স্বেচ্ছায় করার জন্য তার কোন্ বন্ধু এগিয়ে এসেছে! পার্টি থেকেই কি এটা করা হচ্ছে?

প্রফেসার বিরক্ত হয়েছিলেন। পার্টি যদি এই কাজ করে, তা হলে পার্টির খুবই অন্যায় হয়েছে। এই ভাবেই সব কিছু ফাঁস হয়ে যায়। কি দরকার ছিল এসব করার!

ছেলে মেয়ে দু'টি প্রফেসারের নতুন কেবিন খোঁজ করে ওঁর বিছানার ধারে এসে দাঁড়াতেই ওঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হোল। ভাবলেন, এরাই বোধ হয় এই কাজ করেছে। সেই পরশু দিনে প্রথম যখন ওরা এসেছিল তখন ওই ছেলেটি প্রফেসারের সাধারণ ওয়ার্ডে থাকায় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। যদিও উনি বলেছিলেন, এ আমি ভালই আছি,

পাঁচজনকে দেখতে পাচ্ছি, সময় বেশ কাটছে, কি দরকার কেবিনের, তবুও এখন ভাবলেন, ঐ ছেলেটি নিশ্চয়ই ওঁর কথা শোনে নি এবং ওরাই এই ব্যবস্থাটা করেছে। মনে মনে খুশিও হলেন।

এক বোতল হর্লিক্স এবং কয়েকটা কমলালেবু ও মুসাম্বি ওঁর সাইড ক্যাবিনেটে রেখে ছেলেটি বল্ল, আজ কেমন আছেন অজিতদা।

সে টুলটা টেনে নিয়ে মুখের কাছে বসল, মেয়েটি ওঁর মাথার কাছে ওঁরই বিছনায় বসেছিল। প্রফেসারের বিশেষ এ্যাটেণ্ডাণ্ট ওদের কাছেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

প্রফেসর বল্লেন, আছি, অমনি এক রকম। তা তোমরা এত খরচ করে কেবিনের ব্যবস্থা করলে কেন? সে দিন ত বলেই দিলুম, ওয়ার্ডে আমার কোন অসুবিধা নেই।

ছেলে মেয়ে পরস্পারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ছেলেটি বল্ল, আমরা তো এ ব্যবস্থা করি নি অজিতদা।

তাই নাকি? তা হলে কে করল?

ছেলেটির দিদি ঐ মেয়েটি বল্ল, সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না অজিতদা, যেই করুক এ ঢের ভাল হয়েছে। এ অবস্থায় সকলের সঙ্গে পড়ে থাকা কি আপনার মতো লোকের পক্ষে শোভা পায়!

অ। তা হলে তুমিই করেছ। স্মিতহাস্যে প্রফেসর চোখ বুজলেন। পরে বল্লেন, মাসীমার খবর কি? কেমন আছেন?

সেই রকমই। মা শোনার পর থেকেই আসার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে কিন্তু জানেন তো, সিঁড়ি ভাঙ্গার ক্ষমতা তাঁর এখনও নেই। এখানে না হয় লিফ্‌ট আছে, কিন্তু বাড়ীতে তিনতলা থেকে নামা, আবার বাড়ী ফিরে তিনতলায় ওঠা,—আমরাই মাকে আসতে দিলুম না।

বেশ করেছ, মিছিমিছি এসে আর কি হবে? এই ত তোমরা আসছ, দেখছ, এর ওপোর তাঁর আসার আর দরকার কি!

দিদি, সে কথাটা বলবি না? ছেলেটি তার বড় বোনকে কি একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চায়।

দিদি ইঙ্গিতে ছোট ভাইকে নিরস্ত করে। অজিত বাবুর চোখে সেটা পড়েছিল। তিনি বল্লেন, কি, কি কথা?

অজিত বাবুর বিশেষ এ্যাটেন্ড্যান্ট উৎকর্ণ হোল।

দিদি বল্ল, না অজিতদা, সে এমন কিছু নয়।

তবুও কি, শুনি-না।

দিদি বল্ল, সে এমন কিছু নয় অজিতদা। ওয়েল্থ্ ট্যাক্সের হিয়ারিং-এর নোটিশ এসেছে আজ দুপুরে। আমাদের উকীলকে ফোনে ডেকে মা বলেও দিয়েছে। তবে আপনি সুস্থ থাকলে যেমনটা হোত—

অজিত বাবু চোখ বুজলেন। একটু পরে বল্লেন, কবে? কবে দিন দিয়েছে?

আসছে মাসের দশ তারিখে বেলা সাড়ে বারোটায়। তত দিনে আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।

অজিত বাবু পুনরায় হাসলেন, মৃদু হাসি। মেয়েটি অজিত বাবুর কপালে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

অজিত বাবু মেয়েটিকে ভালবাসেন। সত্যিকারের ভালবাসা। এই মেয়ে এবং ওর ভাইকে নিয়ে ওদের মা বৈধব্য জীবন এবং হার্ট ডিজিজ একই সঙ্গে দুটোই ভোগ করছেন। ভদ্রমহিলার ভগ্নীপতির সঙ্গে অজিতের পরিচয় ছিল গৃহশিক্ষকরূপে। ভদ্রমহিলার বোন্‌ঝিকে অজিত বাবু বাড়ীতে গিয়ে পড়াতেন। তখন ওঁর কোন পার্টি ছিল না। সেই মেয়েটিকে অজিত বাবু এক বছর পড়িয়েছিলেন। মেয়েটি কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এতে অজিত বাবু পেয়েছিলেন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান। তা ছাড়া সেই ছাত্রীর ধনী পিতা গৃহশিক্ষকের সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় বুঝেছিলেন যে মাস্টার মশাইয়ের বিষয়বুদ্ধি এবং আইনজ্ঞান কোনটাই কম নয়। এর পরেই তিনি তাঁর ধনী শ্যালিকার গৃহে অজিত বাবুর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রভূত সম্পত্তির মালিক ঐ বিধবা শ্যালিকার এ্যাডভাইসার এবং তার দুটি ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার তত্ত্বাবধানের জন্য যদি এরূপ এক নিঃসঙ্গ, শিক্ষিত,

বৎসরাবধি পরীক্ষিত অধ্যাপককে পাওয়া যায় তা হলে তাকে ছাড়া কি উচিত! সেই থেকেই অধ্যাপক ওঁদের ঘরের লোক। নামে পেয়িং গেস্ট, কিন্তু 'পে' তিনি নগদ টাকায় বড় একটা করেন না। ও বাড়ীতে অজিত বাবুর কোন রকম অশোভন কি বিসদৃশ আচরণ কোনও দিনও প্রকাশ পায় নি। বাড়ীর গিন্নী মনে মনে অজিতকে জামাই করার কথাও ভেবেছেন। মেয়ে সেটা বোঝে, ভাবী জামাইটিও যে অনুমানে বোঝে না তা নয়। অনিচ্ছা বা আপত্তি কোনো পক্ষেরই নেই কিন্তু শুভ কাজটা আজও পর্যন্ত হয় নি। মেয়েটি এখনও পড়ছে, প্রফেসারও অসম্ভব সংযত, তাঁর মতো অধ্যাপকের কাছে সমাজ যেটা আশা করে। বাইরে তাঁর ব্যবহার যেখানে যাই হোক না কেন, ওবাড়ীতে তিলমাত্র অশ্রদ্ধার কাজ তিনি কোনও দিনও করেন নি।

প্রফেসারের দৃঢ় বিশ্বাস ওবাড়ীর মাসীমাই টাকা পয়সা খরচ করে কেবিনের বন্দোবস্ত করিয়েছেন। ছেলেটা হয়ত জানে না, মেয়েটি জানে। ওরা ছাড়া আর কেউ এ কাজ করবে না।

মেয়েটি বল্ল, অজিতদা, এ মাসের ভারতবর্ষ পেয়েছি। আপনার সেই কিস্তিমাৎ কবিতাটা বেরিয়েছে।

তাই না কি? বইটা সঙ্গে এনেছ?

না অজিতদা, সঙ্গে আনার জন্যে রেখেছিলুম কিন্তু বেরোবার সময় তাড়াতাড়িতে আনা হয় নি। কাল নিয়ে আসব।

অজিত বাবু মৃদু হাসলেন। মুখে বল্লেন, ঠিক অছে, যেদিন হয় এনো।

লেবুর রস করে দি' অজিতদা?

দিতে পারো।

মেয়েটি সযত্নে লেবুর রস তৈরী করল। এ্যাটেন্‌ডান্ট এগিয়ে এসে বল্ল, ছেঁকে দেবেন, কোন কিছু সলিড্ যেন না থাকে।

ওঠবার সময় মেয়েটি মন্-মন্ গেল নার্সের কাছে। শুনল, রোগীর অবস্থা ভাল, তবে এখনও আউট অফ ডেঞ্জার নয়।

ওরা চলে গেল।

অজিত বাবু ওদের কথাই ভাবতে লাগলেন। কোথা দিয়ে কেমন করে পর যে আপন হয়, কালকের অচেনা আজকের পরমাত্মীয়ে পরিণত হয় সেই কথাই প্রফেসারের মনকে বারবার নাড়া দেয়। তিনি ভাবেন, দুনিয়ায় সকলেই আমরা কখনও জেকিল কখনও হাইড। কত অসংখ্য ছেলে মেয়েকে তিনি পার্টির মধ্যে এনেছেন, ভীষণ বিপদ নিয়ে সাবধানে চলতে তিনি আনন্দ পান, ভবিষ্যতের বিরাট বিরাট পরিকল্পনায় তিনি মসগুল, আত্মহারা, আপনভোলা হয়ে যান কিন্তু ঐ দুটি ছেলেমেয়ে এবং ঐ বিশেষ বাড়িটিকে তিনি পার্টির সকল রকম ছোঁয়াচ থেকে সন্তর্পনে বাঁচিয়ে রাখেন। দিনে রাতে কতটুকু সময়ই বা ও বাড়িতে থাকেন, রাতেও ত মাঝে মাঝেই বাইরে থাকেন, মাসীমা এজন্য আগে আগে অভিযোগও করেছেন, তাঁর সকল অভিযোগ তিনি খণ্ডন করেছেন বেড়াবার নামে। আমার ভাল লাগে না মাসীমা, আমি একটু ঘুরে বেড়াই, বন্ধুরা ডাকে, তাই তাদের বাড়ী যাই, এমনি ধারা কত কৈফিয়ত। মাসীমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ের কথাও তুলেছেন, অজিত বাবু বলেছেন, বিয়ে ত করবই, তবে এখন নয়, আরও কিছুদিন যাক। এখন একটু ফুর্তি করে বেড়িয়ে নিই। ওর চাল-চলন, ধরন-ধারনে সন্দেহ যে হয় না তা নয়, কিন্তু মাসীমা দেখেছেন, খুব ঘনিষ্টভাবেই দেখেছেন, ছেলেটা ঐ দু'-চারটে সিগারেট ছাড়া আর কোন রকম নেশা টেশা করে না। তার বয়স্থা মেয়ের সঙ্গেও কোন রকম বেচাল, বাচালতা একটুও নজরে পড়ে নি, এমন কি বিয়ের কথা আভাসে ইঙ্গিতে বলার পরেও প্রফেসারের ব্যবহারে বিন্দুমাত্র আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নি। প্রফেসারও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই একটা বাড়ী এবং একটা ফ্যামিলি আমি সব কিছুর উর্ধ্বে রাখতে চাই। বিয়ে যদি করতেই হয়, বিয়ে করার ফুরসৎ যদি কখনও পাই তা হলে এখানেই করব, এই মেয়েকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করব যে শিক্ষিতা হয়েও চালবাজ নয়, আধুনিকা হয়েও কলুষিতা নয়।

অনেক রকম অন্যায় কাজ হয়তো করেছি কিন্তু নিজের আত্মাকে কখনও কলুষিত করি নি, আপন মনে মিঃ ঘটক কাঠের কড়ি ও কাঠের বরগা দেওয়া পুরাণো ধরনের সরু লম্বা ঘরের মাঝখানে নিজের চক্‌চকে খাটখানি পাতিয়ে তার ওপোর শুয়ে শুয়ে এই কথাই ভাবছিলেন। রামকান্ত বসু স্ট্রীটের একতলায় ভাড়াটে ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে পিতাপুত্রে কলকাতার জীবন সুরু করেছিলুম আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে, তারপর অসংখ্য পরিবর্তনের তুফান ঠেলে আজ আমি এলুম ভবানীপুরের বাড়ীর দোতলায়। এই সুদীর্ঘ সময় জুড়ে একটানা উর্ধ্বগতিই আমার হয়েছে, তবে মুখুজ্জে বাড়ীর ভাড়াটে হয়েই কর্মজীবন সুরু করেছি, মুখুজ্জ বাড়ীর ভাড়াটে হয়েই অবসর জীবন শেষ করব। কিম্বা ভগবানের ইচ্ছা কি আছে একমাত্র তিনিই জানেন!

বিভূতি ঘটকের মুখে এক ম্লান হাসির রেখা। সেখানে ভাড়া দিতুম আট টাকা, এখানে কত দেব?

দিতেই হবে। দেওয়াই উচিত, আইনের দিক দিয়ে ত বটেই। সেখানে বাড়ীওয়ালা ছিলেন সুরেন মুখুজ্জে, এখানে বাড়ীর মালিক পরলোকগতা অনুপমা মুখার্জীর একমাত্র পুত্র গদাধর মুখার্জী। পরের বাড়ীতে জীবন সুরু, পরের বাড়ীতেই জীবন শেষ। ওরা পর। পর ত বটেই। এই সভ্য জগতে আমি ছাড়া সবাই আমার পর।

সেই পরকে বাড়ীখানা দেখাতেও পারলুম না! শুধুমাত্র শুনেই গেল যে তার নামে বাড়ী কেনা হয়েছে, দেখতে পেল না, ভোগ ত নয়ই। দুনিয়াটা ভোগের জায়গা নয়। আমিও জীবনে ভোগ কাকে বলে জানলুম না। তার একখানা ফটোও যদি থাকত! ফটো থাকলে ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতুম, ঐ যেমন ও দিকের দেওয়ালে ঝুলছে স্ত্রীর ফটো তেমনই এদিকের দেওয়ালে অনুর ছবিখানা ঝুলিয়ে রাখতুম।

বি ঘটক ডাকলেন, বাদল, বাদল—

চারু এসে ঘরে ঢুকল। বল্ল, বাজারে গেছে বাবা।

বাজারে গেছে, ঘটক শব্দগুলো পুনরায় উচ্চারণ করলেন।

চারুর মাথায় কাপড় নেই। এই ক'দিনেই চারু-ঝিয়ের অনেক পরিবর্তন। আগে সে বড় একটা বাবুর সামনেই যেত না, এখন সে হামেসাই আসে। আগে সে বাবুকে সমীহ করে নিতান্ত প্রয়োজনে একটি দু'টি কথা বলত, এখন সে সহজভাবে অদরকারী কথাও অনেক বলে, বাবুর পায়ে হাত বুলিয়েও দেয়। বাবু এতে একটু আধটু আপত্তিও করেন কিন্তু নিষেধ করেন না। ঘটক বোঝেন, চারু এখন মেয়ে হয়ে গেছে, মেয়ের স্থান সে নিয়েছে।

এক একবার মনে হয় ভন্টুকে ডেকে পাঠালে হয়। হয়ত ভুল করেই ওদের ওপোর অবিচার করা হয়েছে কিন্তু তবুও ওঁর সেই বিশ্বাসটাই থেকে যায়। তাপসের কিসের অভাব! সে এ কাজ কেন করল? মেয়ে তার নিজের ভাইকে বাঁচাবার জন্য স্বামীকে বারণও করল না! সম্পত্তির লোভটাই ওদের কাছে বড়ো হয়ে উঠল!

চারু বল্ল, সে এলেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব বাবা।

ঘটক বল্লেন, তাই দিস্। একটু থেমে বল্লেন, চারু, যে জন্য তাকে ডাকছিলুম সেটা তোকেও বলে রাখি। তুই এখন আমার মেয়ে। তোকেও বলে যাই, আমি যখন না থাকব তখন মনে করে আমার সঙ্গে তোর মাকেও দিস্। হাত তুলে ইসারায় ঘটক দেওয়ালে ঝোলানো স্ত্রীর ফটোখানা দেখিয়ে বল্লেন, জীবনে সে আমাকে বড় একটা পায় নি, যাবার সময় তাকে আমি নিয়ে যেতে চাই রে।

একটু থেমে পুনরায় বল্লেন, তোরা যেন ভুলিস নি। মনে করে ছবিখানা আমার সঙ্গে দিবি।

আঃ, কি যে আজে-বাজে কথা সব বলেন বাবা, ও সব শুনতে আমার আদৌ ভাল লাগে না, চারু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

হাসেন বৃদ্ধ বিভূতি বাবু, দিন কয়েক আগে পর্যন্ত যিনি ছিলেন প্রবল প্রতাপ মিঃ বি ঘটক, অত বড় কোম্পানীর একছত্র অধীশ্বর,

লক্ষ লক্ষ টাকা, যোধপুর পার্কে যার রাজবাড়ীর মতো বাড়ী, অতগুলো লোক যার অধীনে কাজ করে, পৃথিবীর সব কটা বড়ো সহরের বেশ কিছু ধনী ব্যবসায়ী যার মুখাপেক্ষী! সেই তাঁরই বাড়ীর মাইনে-করা ঝি তাঁর কথার ওপোর স্নেহের ঝঙ্কার দিচ্চে এবং সেই ঝঙ্কার তিনি হজম করছেন আনন্দে ও স্মিতহাস্যে। এবং আজকের এমন জীবনটা যে ঘটকের খুব খারাপ লাগছে তাও ঠিক নয়। চলছে এক রকম; চলে যাচ্ছে!

জীবনের কাজ তিনি শেষ করেছেন। যে যা পেলে খুশি হয় তাকে তিনি তাই দিয়েছেন। অনুকে বাড়ী দিয়েছেন, বাদল ও চারুকে মিলিয়ে তাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ঠাকুরকে বড় ক্যান্টিনের হেড্ কুক করিয়েছেন, বৈজুকে ট্যাক্সি দিয়েছেন, মা দেশে গিয়ে ছেলেদের কাছে থাকতে চান, তাঁকে দেশে পাঠিয়েছেন। বাড়ী ও অফিসের সমস্ত নিজস্ব শেয়ার বিক্রী করে সেই টাকায় দুটো এ্যানিউটি করেছেন; একটা মায়ের নামে, মা যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন মাসিক তিনশো টাকা হিসাবে পাবেন, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই টাকা বন্ধ হবে। অন্যটা নিজের নামে পঁচিশ বছরের জন্য। এই সময়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে পঁচিশ বছরের অবশিষ্ট সময় ঐ টাকা আসবে গদাধরের নামে, যে গদাধরের গার্জেন হয়েছে বাদল, যে কোন মতে নাম সই করতে পারে, বাজারের ফর্দ লিখতেও পারে। তারপর? তারপর সব 'ডেলিউজ'।

সেই প্রথম জীবনে পল্লীর প্রাইমারী স্কুলে বিভূতি মাস্টার যখন মাস্টারী করতেন তখন ওঁকে স্কুলের বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ছেলেদের আবৃত্তি শেখাতে হোত। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার আবৃত্তি উনি শিখিয়েছিলেন। এখন এই এতদিন পরে সে সব আর কিছুই মনে নেই, শুধু একটা লাইন মনে পড়ল, 'আজিকার সুখ দুঃখ কে স্মরিবে কাল, শতবর্ষ পরে'। আপন মনেই সেই লাইনটা ঘটক বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন, আজিকার সুখ দুঃখ কে স্মরিবে কাল, শতবর্ষ পরে।

রোগশয্যায় পড়ে পড়ে অজিত মাস্টারও আপন মনে কি যেন আবৃত্তি করছিলেন। এ্যাটেণ্ডাণ্ট পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে বুঝল, গানের কলি। লোকটা মনে মনে বিরক্ত হোল। এই যে ক'দিন ধরে রোগীর আশে পাশে কান খাড়া করে রয়েছি এই ক'দিনের মধ্যে ওপোরওয়ালাকে জানাবার মত সামান্য মাত্র তথ্যও সংগ্রহ করতে পারলুম না। ওপোরওয়ালা কি ভাববে! ভাববে আমি কিছুই করি নি। ফাঁকি দিয়েছি।

ঐ, ঐ সেই ছেলে মেয়ে দুটো আসছে। এ্যাটেণ্ডাণ্ট ওদের চিনে ফেলেছে। যে বাড়ীতে প্রফেসার থাকে সেই বাড়ীর গিন্নীর ছেলে মেয়ে। প্রথমে ভেবেছিল, মেয়েটার সঙ্গে প্রফেসারের কিছু হয়ত আছে কিন্তু পরে ওদের কথাবার্তায় বুঝেছে, কিচ্ছু নয়। সি আই ডি-র ধুরন্ধর কর্মী এ জন্য অজিতকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে বাধ্য হচ্ছে।

কেমন আছেন অজিতদা, মেয়েটি কাছে এসে প্রশ্ন করে।

ছেলেটি হাতের জিনিসগুলো সাইড ক্যাবিনেটের দরজা খুলে সেখানেই রাখল।

এ্যাটেণ্ডাণ্ট ভাবল, এরা ছাড়া ওঁর কি দুনিয়ায় আর কেউ নেই? এরা ছাড়া একটা লোকও তো দেখতে এল না।

অজিত বাবু মেয়েটিকে বল্লেন, বোসো। সঙ্গে কাগজ কলম আছে?

মেয়েটি বল্ল, না অজিতদা। কাগজ কি হবে?

এ্যাটেণ্ডাণ্ট এগিয়ে এসে বল্ল, কিছু লিখবেন? কাগজ দেব?

দিন, অজিত বাবু উত্তর দিলেন।

অজিত বাবু মেয়েটিকে বল্লেন, লেখো ত। তোমার জন্যই মনে মনে ভেবে রেখেছি।

বলুন, মেয়েটি কলম খুলে রোগীর দৈনিক রিপোর্টের লোহার ফাইলটা হাতে নিয়ে তার ওপোর কাগজ রেখে লিখতে বসল। ছেলেটি বোনের পেছনে দাঁড়িয়ে দিদির লেখা দেখতে লাগল। এ্যাটেণ্ডাণ্টেরও কান খাড়া রইল।

অজিতবাবু ধীরে ধীরে গুন্ গুন্ করে বলেন, মেয়েটি লেখে—

হার্ট যদি ফেল করে করুক-না ক্ষতি কি
হার্ট বেটা বহু দিন খেটেছে।
লাব্-ডাব্ ধ্বনি যদি ভুলে যায় যাক ভুলে,
স্বেচ্ছায় হার্ট যদি খুশিতে পটল তোলে,
বলবার কিছু নাই, নিভে যাক রোশনাই,
তোমরা ভুলিয়া যেও অধমের আশনাই,
আমিও ভুলিয়া যাব লাভ লোকসান সব—
সারাটা জীবন মোর কি নিয়ে কি দিয়েছে ;
হার্ট যদি ফেল করে করুক-না ক্ষতি কি
হার্ট বেটা বহু দিন খেটেছে।

এত বড় জঙ্গলে ছোট্ট সে জোনাকি
চিক্ চিক্ জ্বলে জ্বলে নিভেছে।
ছোট তুটি ডানা মেলে হাওয়ায় সে ভেসেছিল,
ইতি-উতি চেয়ে চেয়ে কি না জানি চেয়েছিল,
ছোট্ট জোনাকি পোকা, সে ছিল নেহাৎ বোকা,
হিসেবের বাইরেতে একেবারে কচি খোকা,
সে আজ ফুরিয়ে গেছে কার তাতে ক্ষতি কি—
তু'শো পঞ্চাশ কোটী মানুষের একজন
এতদিন ছিল আজ গিয়েছে
হার্ট যদি ফেল করে করুক-না ক্ষতি কি
হার্ট বেটা বহুদিন খেটেছে।

লেখা শেষ হবার পর প্রফেসার বল্লেন, সবটা পড়ো ত, একবার শুনি।

মেয়েটি পড়ে গেল। শুনলেন অজিত বাবু, সেই ছেলেটি এবং এ্যাটেণ্ডাণ্ট।

প্রফেসার বল্লেন, তলায় আজকের তারিখ আর হাসপাতালের নামটা লিখে রাখ।

এই কবিতার মানে কি অজিতদা, এরকম কথা মনে করছেন কেন, মেয়েটি অভিযোগ করল।

প্রফেসার অজিত বসুর মুখের ওপোর ফুটে উঠল হাস্যের মৃদু রেখা। কোন উত্তর দিলেন না। হয়ত ভাবছিলেন, আমার কাজ করার ক্ষমতা ফুরিয়ে গেছে ক'দিন আগেই, এবার মনে করার ক্ষমতাও টুক্ করে এক সময় ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু কেন এমনটা হোল? কেন?